ধূসর মৃত্যুর মুখ

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর- ১৯৫৯

প্রকাশক ঃ প্রবীর মিত্র ঃ ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ঃ কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম রায়



অমৃতসর মেলে একটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত দু'বিছানার ক্যুপের নীচের বাঙ্কে বেডরোলের আরাম বিছিয়ে শুয়েও দু'চোখের পাতা এক করতে পারছিল না গার্গী। পৃথিবী এখন মধ্যরাতের মুখোমুখি, এ সময়ে মেল ট্রেনের গতিবেগ সবচেয়ে তুঙ্গে ওঠে, তীব্র গতির জন্যই এত বড় দূরপাল্লার ট্রেনটা দুলতে থাকে এক বিচিত্র শব্দের তালে তালে। সেই চমৎকার মন-জুড়োনো দুলুনিতে এমনিতেই নিদ্রারানির ছুটে এসে চোখের পাতায় পিঁড়ি পেতে বসে যাওয়ার কথা, ওপরের বাঙ্কে শুয়ে সায়ন অঘোরে ঘুমোচ্ছেও সেভাবে, কিন্তু নীচে একা উসিবিসি করছে ঘুমহীন গার্গী।

অমৃতসর মেলে আপাতত তাদের গন্তব্য লখনউ। সেখানে কয়েকদিন বিরতি দিয়ে অতঃপর তারা পাড়ি দেবে মহান হিমালয়ের গহন গভীরে, ঘুরে বেড়াবে লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন, আবিষ্কার করবে স্বর্গীয় সুষমায় আপ্লুত বরফে-ঢাকা অজস্র সব পর্বতশৃঙ্গ, ওতপ্রোত হয়ে থাকবে চমক দেওয়া বিচিত্র পাহাড়ি-পথ আর সার সার দেশলাই বাক্সের মতো পাহাড়ের গায়ে সেঁটে থাকা অচিন লোকালয় আর দোকানপাটের রহস্য উন্মোচনে, তারপর ফিরে এসে কলকাতার জটিল যন্ত্রণায় পুনর্বার ডুব দেবে পাহাড়ের জীবনযাপনের স্মৃতিতে রোমন্থিত হতে হতে। ট্যুর প্রোগ্রামটা এ ভাবেই ছকেছে সায়ন, অনেকদিন ধরেই বলছিল, চলো গার্গী, ভীষণ এক্‌জস্টেড লাগছে, এখন কিছুদিন হিমালয়ের নিভৃত কোনও আস্তানা ছাড়া পরিত্রাণ নেই।

কিন্তু বেরুব বললেই তো আর রুখস্যাক কাঁধে নিয়ে বাউণ্ডুলের মতো বেরুনো যায় না, সে-সব কলেজীয় উদ্দাম দিন কবেই তো ফেলে এসেছে পিছনপানে। এখন সায়নের, সেই সঙ্গে তারও কাঁধে 'প্যারাডাইস প্রোডাক্টস'এর এক বিশাল গন্ধমাদন, যে-সোপ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি সায়ন গড়ে তুলেছে তার মেধা, পরিশ্রম আর স্বপ্ন মিশিয়ে, যে কোম্পানিতে গার্গীর ভূমিকাও এখন সায়নের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়, তাদের সেই যৌথ দায়িত্ব হঠাৎ কাঁধ থেকে নামিয়ে হুট করে বেরুনো প্রায় অসম্ভব। তবু গার্গীরই কিছুদিন ধরে মনে হচ্ছিল, যাই, ক'দিন হারিয়ে যাই, কলকাতার এই রুদ্ধশ্বাস ভিড়, জ্যাম-যন্ত্রণা আর লক্ষ কাজের ঝামেলা থেকে রেহাই নিয়ে।

কিন্তু সায়নের এই পাহাড়-অভিযানে তার ঠিক সায় ছিল না। সে চেয়েছিল পশ্চিম-ভারতের কোনও নিরিবিলি সমুদ্র-উপকূল, যেখানে সোনালি বালির ওপর পা ছড়িয়ে বসে দু'দণ্ড উধাও হওয়া যাবে নীলজলের উচ্ছ্বাস-তোলা ঢেউয়ের সাদা ফেনার খুনসুটির ভেতর। হঠাৎ দু-একটা রঙিন পতাকা ওড়ানো জাহাজ সামনে সাঁতার কাটতে কাটতে চলে যাবে ঢিল ছোড়া দূরত্ব দিয়ে। সাদা সি-গালগুলো একটানা ওড়াউড়ি করবে মাথার ওপর।

আসলে ঐন্দ্রিলা পাহাড় পছন্দ করত খুব। কতবার গার্গীর সামনে, সায়নকে তার নরম, নিচু স্বরে বলেছে, চলো না, হিমালয়ে যাই। ছোটবেলা থেকেই আমার ভারি ইচ্ছে সেই বিখ্যাত পাহাড়চূড়াগুলো একবার নিজের চোখে দেখে আসি। এই মিতুন, তুইও চল্ না আমাদের সঙ্গে।

এতদিন পর সায়ন পাহাড়-প্রসঙ্গ তুলতেই তাই গার্গী আপত্তি করে বলেছিল, না, না, হিমালয় নয়, অন্য কোথাও।

কিন্তু তার সে ওজর-আপত্তি ধোপে টেকেনি সায়নের আপাত-উদাস কিন্তু চোরা একগুঁয়েমি বা জেদের জন্যই। পাহাড়ে যাওয়ার কথা যখন একবার ভেবেছে সায়ন, তখন পাহাড়ই তার এক এবং একমাত্র গন্তব্য। তার একান্ত ইচ্ছে ও জেদের কাছে হার মানতেই হয়েছে গার্গীকে, যেহেতু সে জানে, বেশিবার না-না বললে হয়তো শেষপর্যন্ত কণ্ঠস্বরে একরাশ অভিমান মাখিয়ে সায়ন বলবে, তা হলে এ-যাত্রা ভ্রমণ বন্ধ থাক, পরে আবার দেখা যাবে।

গার্গীর অনিচ্ছে অবশ্য পাহাড়ের কারণে নয়, ঐন্দ্রিলার কথা ভেবেই। ঐন্দ্রিলার আকস্মিক মৃত্যুর পর সে কখন কীভাবে জড়িয়ে গেল সায়নের জীবনে, তারপর ওতপ্রোত হয়ে পড়ল তার 'প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্'-এর ব্যস্তবহুল, দায়িত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গেও। সে-কথা এখন, মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তার কাছে কেমন একটা স্বপ্ন-স্বপ্ন ঘোর। ঐন্দ্রিলার ফেলে যাওয়া সংসারের হাল ধরতে সে ইতিমধ্যে নিজেকে উজাড় করে দিলেও একটা চোরকাঁটা খচ্‌খচ্ করে কখনও ফোটেও তার বুকের গহনে। সে-যন্ত্রণা যে খুবই অস্বস্তির, যথেষ্ট পীড়ার কারণ, তা সে অনুভব করে কোনও অবসরের মুহূর্তে। তা ছাড়া যে-পাহাড় ঐন্দ্রিলার এত প্রিয়, সেখানে যদি ঐন্দ্রিলাবিহীন হয়ে তাকে যেতে হয় সায়নের সঙ্গে, ঐন্দ্রিলা কষ্টই পাবে হয়তো।

অনেকক্ষণ এহেন ব্যথায় চুরমুর হতে হতে যখন কিছুতেই আর ঘুমোতে পারল না, গার্গী উঠে বসল বেডরোলের ওপর। একটানা ধকর-ধক ধকর-ধক শব্দ শুনতে শুনতে এখন কিছুটা ক্লান্তও সে। আসলে ঘুমবিহীন রাত যে কতটা দীর্ঘ হতে পারে, তা একমাত্র জানেন ইন্‌সোমনিয়ার পেশেন্টরা। গার্গীর জীবনে এ রকম না-ঘুম রাত এর আগে যে আসেনি তা নয়, তবে আজ তার খুবই কষ্ট হচ্ছিল এই দূরপাল্লার নিভৃত ক্যাপেটায়।

এখন এই মধ্যরাতে গোটা ট্রেনের অজস্র যাত্রী নিশ্চয় ঘুমের কবলে জব্দ হয়ে আছে, শুধু জেগে আছে সে-ই। এমন একটা ভাবনায় যখন সে টালমাটাল, সে-সময় তার ঠিক পাশের ক্যাপেয় এক নারীকণ্ঠের খিলখিল হাসির ছর্‌রায় সচকিত হয়ে উঠল। বাইরে বেড়াতে বেরিয়ে এমন উচ্ছ্বাস, কলরোল তো স্বাভাবিকই। সায়ন ভোঁস-ভোঁস করে না-ঘুমিয়ে এতক্ষণ জেগে থাকলে হয়তো তারও কোনও সরল মন্তব্যে গার্গীও হেসে উঠত এমনিভাবেই।

কিন্তু হঠাৎই এই হাসির বিস্ফোরণে সে একটু বেশিই কৌতূহলী হয়ে উঠল এই কারণে যে, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এই বগিটিতে একটি বড় দল উঠেছে তাদের সঙ্গী হয়ে, যারা কেউই পর্যটক নয়। গার্গীদের পাশেই পর পর গোটা চারেক ক্যাপে তাদের নামে সংরক্ষিত। চারটে ক্যাপেয় অন্তত বারোটা বার্থ। কোনওটা দু-বার্থের, কোনওটা চার বার্থের, কিন্তু ক্যাপেগুলোতে সাত-আটজনের বেশি লোক ওঠেনি। টিমে আরও দশ-বারোজন লোক আছে, যাদের কেউ প্রথম শ্রেণীতে, কেউ দ্বিতীয় শ্রেণীর সওয়ারি।

তাদের আরামের এহেন নির্দিষ্ট বিভাজন এই কারণেই যে, লোকগুলোর কথাবার্তা শুনে, চেহারা, ঠাটঠমক দেখে গার্গী যতদূর বুঝেছে, এরা দল বেঁধে চলেছেন কোথাও শ্যুটিং করতে। চলচ্চিত্র কিংবা দূরদর্শনের কোনও সিরিয়াল-সম্পর্কিত একটি দলের সদস্য। তাঁদের মধ্যে বাংলা চলচ্চিত্রের নামী-দামি নায়ক-নায়িকা যেমন আছেন, তেমনি আছে একদা-বিখ্যাত পরিচালকও। বাকিদের অবশ্য গার্গী চেনে না, কারণ পর্দার আড়ালে যে প্রয়োজনীয় কলাকুশলীরা থাকেন, যাদের ছাড়া ছবি তৈরি হয় না, অথচ তাঁদের ছবি ছাপা হয় না কাগজে

বা পত্রিকায়, সেই অদৃশ্য সৈনিকদের তাই চেনা সম্ভবও নয়। পদমর্যাদার দিকে নজর রেখেই সম্ভবত তাদের কারও জায়গা হয়েছে এই আরামদায়ক বগিতে, কারও প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে।

রুপোলি জগতের মানুষ বলেই গার্গী সেই হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকেই তাদের দিকে মাঝেমধ্যে তার নজর ন্যস্ত করেছে এক বিচিত্র কৌতূহল নিয়ে। যদিও সে আর পাঁচটা তরুণীর মতো সিনেমার নায়ক বা নায়িকা দেখে আদেখ্‌লেপনা করার মতো অপরিণতমনস্ক নয়, তবু সেল্যুলয়েডের চরিত্রদের সামনাসামনি দেখতে ঠিক কেমন লাগে, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনযাপন, আচারব্যবহারে কোনও চমৎকারিত্ব আছে কি না, তাঁরা কতখানি দূরত্ব রেখে চলেন সাধারণ মানুষদের থেকে, এমন কিছু গূঢ় ও অবশ্যম্ভাবী প্রশ্ন তার মনেও উঁকিঝুঁকি দিয়ে যাচ্ছে তখন থেকে।

বিশেষ করে ট্রেনের বগিতে ওঠার সময় দরজার পাশে টাঙানো লম্বা চার্টটিতে নিজেদের নাম খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎই সে আবিষ্কার করে, তাদের ঠিক পাশের ক্যুপেটিতেই বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম দুই বিখ্যাত নায়ক-নায়িকা বিবস্বান বসু ও রুমেলা রায় থাকবেন। দুই নায়ক-নায়িকাই অবশ্য তাঁদের যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময় পেরিয়ে আপাতত চল্লিশের ওপারে ছায়া ফেলেছেন, তবু তাঁদের ঝকমকে চেহারা, মায়াবি চাউনি, দুরন্ত গ্ল্যামার এখনও অনেক তরুণ-তরুণীর রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। বিবস্বান বসু লম্বা, সুদর্শন, তাঁর মেদহীন টানটান চেহারায় উপচে পড়ছে এক অদ্ভুত কমনীয়তা, এতই কমনীয় যে, ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে তাঁর ফর্সা, তেল-চুঁয়োনো ত্বক। রুমেলা রায় মাঝারি উচ্চতার, গোলাপের মতো গায়ের রং। সেই ত্বকের লাল আভা যেন সারাক্ষণ দীপ্তি ছড়াচ্ছে তাঁর গাম্ভীর্যে, হাঁটাচলায়, চাউনিতে

চার্টে আরও দেখেছিল পরিচালক ঋষভ মুখার্জির নাম। তাঁর একটি ছবি তো স্কুলের শে ক্লাসে পড়ার সময় দু'বার দেখেছিল গার্গী, তারপর বহুদিন তাঁর নাম শোনেইনি আর।

তবে বিবস্বান বসু ও রুমেলা রায়ের নাম একই ক্যুপেয় দেখে গার্গীর মধ্যবিত্ত মানসিকতা সে সামান্য ধাক্কাটুকু লেগেছিল, তৎক্ষণাৎ তা ব্যক্ত করে ফেলেছিল সায়নের কাছে, এই রে ওরা দু'জন একই ক্যুপেয় থাকবে নাকি!

সায়ন অবশ্য এই সব অপ্রয়োজনীয় আলোচনায় কোনও দিনই তেমন আগ্রহী নয় ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ নস্যাৎ করে দিয়ে বলল, তাতে আর কী হয়েছে, ফিল্ম লাইনে তো এ-স ঘটেই থাকে।

—তাই বলে সবাইকে এইভাবে জানিয়ে, সবার চোখের সামনে!

সায়ন একেবারেই আমল দিল না গার্গীর খুঁতখুঁতানিকে। তার মতে, এ ধরনের অ্যাফেয়া অহরহ ঘটে চলেছে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে। কোন নায়ক কোন নায়িকাকে নি অ্যাফেয়ার করছে, কার পারিবারিক জীবনে তাই নিয়ে অশান্তি চলছে, এ সব রুপোলি জগতে পটভূমিকায় নিতান্তই ক্লিশে। এ সব না-ঘটলেই ফিল্মের দর্শক, ফ্যান থেকে শুরু করে ফিল্ম ক্রিটিক, ফিল্ম-জার্নালিস্ট কিংবা ফিল্ম-ম্যাগাজিনের সম্পাদক সবাই গালে হাত দিয়ে ভাবে বসবে, তা হলে ফিল্ম-লাইনে আর রইলটা কী! লোকে আলোচনাই বা করবে কী নিয়ে, ফিল্ম ম্যাগাজিনগুলোই বা চলবে কীভাবে।

এখন গভীর রাতে পাশের কামরা থেকে নারীকণ্ঠের ঘন ঘন লহর, ফিসফিস সংলাপ অন্যান্য ইঙ্গিতবহ শব্দ শুনতে শুনতে বেশ নড়েচড়ে বসল গার্গী। চোখ তুলে একবার তাকাল ওপরে। সায়ন গভীর, গভীরতম নিদ্রায় কাদা হয়ে আছে একেবারে। তার পাশের ক্যুপেয় (

একটা জ্যান্ত সিনেমা সদ্য ঘটে চলেছে তা জানতেও পারল না বেচারি। তার সে কৌতূহলও নেই অবশ্য।

বহুকাল আগে কোনও একটা ফিল্ম-সংক্রান্ত গুঞ্জনে গার্গী পড়েছিল, বাংলা সিনেমার দুই বিখ্যাত নায়ক-নায়িকা, বিবস্বান বসু ও রুমেলা রায়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে গোপনে। তা জানাজানি হতেই দু'জনেরই সংসারে অনর্থ ঘটছে প্রায়ই, একজনের তো বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটতে ঘটতেও আর ঘটেনি শেষ পর্যন্ত। পরবর্তীকালে তাঁদের জীবনে যে কী ঘটেছিল তা আর গার্গীর জানা হয়ে ওঠেনি যেহেতু সে নিজেই তার জীবনযাপনের নানান টানাপোড়েনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আজ, এতদিন পর তার পাশের ক্যুপেয় সেই অ্যাফেয়ারের একটা ছোট্ট পরিচ্ছেদ ঘটে চলেছে দেখে সে আশ্চর্য হচ্ছিল কম নয়, একটা অদ্ভুত অনুভূতিও হচ্ছিল তার মগজের গভীরে।

পাশের ক্যুপেয় উচ্চরোলের হাসি, আর অস্ফুট স্বরধ্বনি নিয়ে যখন তার এহেন মাথাব্যথা, সেই মুহূর্তে সে হঠাৎই চমকে উঠল তাদের ক্যুপের বাইরে, ঠিক দরজার কাছেই প্যাসেজে, আর একজোড়া নারী-পুরুষের অস্পষ্ট কিছু সংলাপ শুনে। অবশ্য ঠিক সংলাপ নয়, যেন ক্ষোভের প্রকাশ চলছে কোনও বিষয়ে। নিশ্চয়ই ছায়াছবির জগতেরই কেউ। কিন্তু এই মধ্যরাতে ফিল্মি সাহেবমেমরা কেন এত উত্তেজিত হয়ে উঠল তা শুধু মেয়েলি কৌতূহলেই নয়, তার ভেতরে যে প্রবল অনুসন্ধিৎসা তাকে উসকোতে থাকে সারাক্ষণ সেই কারণেই জানতে ইচ্ছে হল গার্গীর।

দ্রুত তার বাঙ্ক ছেড়ে ছিটকিনি-আটকানো দরজার কাছে গিয়ে কান পাততেই শুনতে পেল, বেশ সিরিয়াস, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ আলোচনা চলছে দুই নারী-পুরুষের মধ্যে। নারীকণ্ঠের ক্ষোভই বেশি। কিন্তু কী নিয়ে এই ক্ষোভ, বাদানুবাদ, তা কতখানিই বা গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক বোধগম্য হল না তার। দরজাটা খুলে সে অবশ্য দেখে নিতে পারে কারা এই বিবদমান পাত্রপাত্রী, কেনই বা কথা-কাটাকাটি, কিন্তু তাতে সেই মুহূর্তেই ইতি পড়ে যাবে ক্যুপের বাইরের আলোচনায়। গার্গী তার জ্ঞানত ব্যাঘাত ঘটিয়ে ফেলবে দুই নারী-পুরুষের একান্ত নিভৃত আলাপচারিতায়, মোটেই তা চায় না গার্গী।

বরং সে নিজেকে আড়াল করে শুনে ফেলতে চায় কী সেই গভীর কারণ যা দু'টি নরনারীকে ক্যুপের বাইরে, চলাচলের প্যাসেজে উত্তেজিত করে তুলেছে এত গভীর রাতে!

প্রায় নিঃসাড়ে ছিটকিনি সরিয়ে, দরজাটা সামান্য ফাঁক করতেই বাইরে যে দৃশ্য-তার নজরে পড়ল, তাতে প্রায় ভূত দেখার মতোই চমকে উঠল। তাদের ক্যুপের ঠিক সামনেই, বগির গায়ে কাঁধ ঠেকিয়ে মুখোমুখি তর্ক করছেন অভিনেত্রী রুমেলা রায় ও পরিচালক ঋষভ মুখার্জি।

ঋষভ মুখার্জিকে অবশ্য তেমন ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে না, যতটা দেখাচ্ছে রুমেলা রায়কে। রুমেলার বয়স চল্লিশের ওপারে, কিন্তু অতিরিক্ত যত্নে, প্রসাধনে ও হয়তো শরীরচর্চাও এখনও তাঁকে মনে হয় মধ্য-তিরিশ। কিছুকাল আগেও তিনি নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন, কিন্তু শেষ ছবিটি একেবারে ফ্লপ হওয়ায় আপাতত মা-মাসি-পিসির রোল করে প্রায় বানপ্রস্থের পথে। তবু তাঁর যে আয়ত চোখদুটি এককালে ঝড় তুলত তরুণদের হৃদয়ে, এখন তাতে অস্ত-রবির রক্তিম গরিমা। ঝড় না তুলুক, তাঁর চাউনিতে আজও মৌসুমি হাওয়ার মিষ্টি চোরাটান।

কিন্তু রুমেলার সেই দীর্ঘায়ত চোখে এই মুহূর্তে রুক্ষ আগুন, তর্জনী তুলে ঋষভ মুখার্জিকে প্রায় ধমকের ভঙ্গিতে বলছেন, আগে জানলে আপনাদের সঙ্গে আমি আসতামই না—

ঋষভ মুখার্জিকেও যথেষ্ট ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছিল, বেশ বিব্রতও, হাত নেড়ে রুমেলাকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, বর্ণনা এ, রকম করবে তা আমি একবারও ভাবতে পেরেছি নাকি!

রুমেলা আরও উত্তেজিত হয়ে বললেন, বোঝা উচিত ছিল, ঋষভদা। বর্ণনা আপনারই রিক্রুট। সে কী চরিত্রের মেয়ে তা আপনারই জানার কথা। এখন যদি আপনি বলেন আপনার সঙ্গে তার সামান্যই আলাপ, তাতে আপনি দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। স্টেশন থেকেই আমি লক্ষ করছি, পুরুষ দেখলেই সে একেবারে গলে পড়ে। আই হেট অল দিজ—

—ইউ আর রাইট, রুমেলা। বর্ণনাকে এখানে আনার আগেই তোমাদের ব্যাপারটা তাকে ক্লিয়ার করে বলা উচিত ছিল আমার। কিন্তু ট্রেন স্টেশনে ইন করতেই কার কোথায় সিট, কে কোন বগিতে উঠবে, সে-সব খুঁজেপেতে নির্দেশ দেওয়ার আগেই ও যে বি. বি-র ক্যুপেয় ঢুকে 'আমি আজ নাইটে এই ক্যুপেই থাকছি, আঙ্কেল', বলে চট করে ছিটকিনি তুলে দেবে তা কী করে বুঝব! তা ছাড়া বি. বি-রও তো ওকে এ ভাবে অ্যালাউ করা উচিত হয়নি, রুমেলা।

—হি ইজ অ্যা উওম্যানাইজার, রুমেলাকে হিসহিস করে বলতে শুনল গার্গী. ওকে আমি আজ থেকে দেখছি নাকি! লখনউ পৌঁছে সে আমি ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেব। আমাকেও চেনেনি এখনও। আমাকে ও-ই তো রাজি করালো আপনার এই সিরিয়ালে কাজ করার জন্য। এখন নিজে আর একটা বিচের সঙ্গে—

ঋষভ ব্যস্ত হয়ে থামানোর চেষ্টা করলেন, প্লিজ রুমেলা, এখানে ট্রেনের মধ্যে আর কোনও সিনক্রিয়েট কোরো না। লখনউতে হোটেলে পৌঁছে ব্যাপারটা আমি দেখব, যাতে এ ধরনের ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি না হয়। এখন যাও, ও দিকের ক্যুপেটায় গিয়ে শুয়ে পড়। অনেক রাত হয়েছে—

বলে রুমেলার বাহু ধরে প্রায় টানতে টানতে অন্য দিকে নিয়ে গেলেন ঋষভ। গার্গীও এতক্ষণের রুদ্ধশ্বাস নাটকটি দেখতে দেখতে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল, এ ভাবে গোপনে অন্য নারী-পুরুষের আলাপ শোনা নীতিবিরুদ্ধ। তবু সেলুলয়েডের জগতের এক অনৈতিক, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের একটুকরো, ছোট্ট চালচিত্র তার সামনে উদ্ভাসিত হতে সে যেমন স্তম্ভিত হল, তেমনই বিচলিত হল ঘটনাটা তার ঠিক সামনেই ঘটে যাওয়ায়।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এঁদের সঙ্গে একটি সুন্দরী, অল্পবয়স্কা মেয়েকে সে দেখেছিল যে কিনা অকারণে উচ্ছল, প্রায় দেখনহাসির মতো সারাক্ষণ হেসে গড়িয়ে পড়ছে এর-ওর গায়ে। প্ল্যাটফর্মে যে-যুবকটির সঙ্গে সে দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে গল্প করছিল, তার চিবুকে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, কাঁধে ঝোলানো একটি দামি ক্যামেরা। মেয়েটা হাসতে হাসতে বারবার ঢলে পড়ছিল তার শরীরেও। সেই উচ্ছ্বাসপ্রবণ মেয়েটির নামই যে বর্ণনা, সে-ই তখন বি.বি. অর্থাৎ বিবস্বান বসুর ক্যুপেয় ঢুকে রুমেলা রায়ের জায়গায় নিজেকে আসীন করেছে, আর তার হাসির ঝর্নাধারায় স্নান করাচ্ছে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম বিখ্যাত নায়ককে, এ তথ্য অবগত হয়ে গার্গীর ভেতর কী এক অদ্ভুত দোলাচলতা।

কিছুক্ষণ এতোলবেতোল ভেবে গার্গী আবার তার বাঙ্কে ফিরে এল, বেডরোলের আরামের ভেতর ডুবে গিয়ে আমন্ত্রণ জানাতে শুরু করল ঘুমের মাসিপিসিকে। একটু আগের নিষিদ্ধ উত্তেজনা যদিও তোলপাড় করছে তার শরীরের শিরায় শিরায়, তবু এতক্ষণে একটু ক্লান্তিও লাগছে যেন।

পরদিন বাঙ্কের বিছানায় ঘুম ভাঙতে একটু দেরিই হল তার। ততক্ষণে সায়ন ক্যুপের

দরজায় ঠকঠক শব্দ শুনে, দরজা খুলে কফির কাপ আর বিস্কুট নিচ্ছে ওয়েটারের ট্রে থেকে। ধড়মড় করে উঠে বসে গার্গী বলল, স্যরি, মিস্টার।

—নট টু বি ওরিড, ম্যাডাম, নাও, কফি ধরো।

গার্গী দ্রুত হাতমুখ ধুয়ে এসে আরাম করে ঠোঁট ডোবাল কফির কাপে। অমৃতসর মেল তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে পার হয়ে চলেছে একের পর এক মাঠখেত, অজস্র টেলিগ্রাফের পোস্ট, অচেনা-অজানা সব দেহাতি দেশের স্টেশন। তারই মধ্যে কখনও দু-একটা জংশন স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে বড় বড় শ্বাস ফেলতে লাগল একনাগাড় দৌড়ের ক্লান্তিতে। পুজোর ঠিক পরেই এই সময়টায় সর্বত্রই বাঙালি ট্যুরিস্টদের উচ্ছ্বসিত ভিড়। এই ট্রেনের বেশির ভাগ যাত্রীই কুমায়ুন দর্শনে চলেছেন সপরিবারে। জংশন স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াতেই সেই ট্যুরিস্টদের একাংশ তীরবেগে ছুটছেন জলের ক্যান হাতে নিয়ে 'পিনে-কা-পানি' লেখা বড় বড় ট্যাঙ্কগুলোর ট্যাপের নীচে, অন্য ট্যুরিস্টদের সঙ্গে প্রায় মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন বলে। কেউ সংগ্রহ করছেন সকালের চা ও স্ন্যাক্স। কেউ তহবিলে জমা করে রাখছেন ব্রেকফাস্টের উপকরণ।

তাদের ক্যুপের দরজাটা সায়ন সামান্য খুলে রাখায় প্যাসেজ দিয়ে মানুষজনের চলাচল একটু একটু দেখতে পাচ্ছে গার্গী। ঋষভ মুখার্জিকে বার বার ব্যস্ত হয়ে একদিক থেকে আর একদিকে যেতে দেখা যাচ্ছে, তাঁর সঙ্গে একজন দীর্ঘদেহী, বয়স পঞ্চাশের ওপাশেই হবে, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, মাথার চুল হালকা, কিছু বোঝাতে চাইছেন ঋষভকে। ক্যামেরা কাঁধে সেই যুবকটির পরনে জিন্‌স্ ছিল কাল, এখন সবুজ রঙের পাজামা-পাঞ্জাবি, বার বার ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখে দেখে চলেছে চলমান পৃথিবী। বারমুডা-পরিহিত একটা ক্যাবলা ধরনের ছেলেও প্যাসেজে ঘোরাঘুরি করল কয়েকবার। রুমেলা রায়কেও একবার দেখা গেল গম্ভীর থমথমে মুখে।

রাতের সেই অ-সেলুলয়েডীয় নাটকের পরবর্তী অংশ আর শোনা বা জানার সুযোগ হয়নি গার্গীর। তবে বর্ণনা নামের সেই মেয়েটি সকাল হতেই বি. বি-র ক্যুপে থেকে বেরিয়ে ছটফট করে ঘুরছে তাদের অন্য ক্যুপেগুলোতে। টয়লেটে যাওয়ার সময় গার্গী একবার আড়চোখে দেখেও নিল, মেয়েটা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে হি হি করে হাসছে সেই দীর্ঘদেহী, সোনালি চশমা পরা ভদ্রলোকের ক্যুপেয় বসে। রাতে যেন কিছুই ঘটেনি এমন নির্লিপ্ত সহজ ভঙ্গিমা তার।

সে-দিন সারাটা ক্ষণই এর ওর সঙ্গে বর্ণনার মস্করা করার ধরন কম আশ্চর্য করছিল না গার্গীকে। একবার প্ল্যাটফর্মে নেমে ক্যামেরা-কাঁধে যুবকটির সঙ্গে মাটির খুরিতে করে চা-ও খেয়ে এল উল্লাসে চুরমার হয়ে। গার্গীও তখন চা খাচ্ছিল সেখানে। কান বাড়িয়ে শুনল মেয়েটির সংলাপ, 'কাল বিকেল থেকেই নাকি শুটিং শুরু! খুব ভয় করছে। ক্যামেরার সামনে এই তো আমার প্রথম, চায়ে চুমুক দিতে দিতে মেয়েটির আপাতনিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজতে চেষ্টা করছিল গার্গী।

বিবস্বান বসু অবশ্য সকাল থেকে সারাটা দিন তাঁর ক্যুপেয় অন্তরীণ। এহেন বিখ্যাত নায়কের পক্ষে অবশ্য বেশি ঘোরাফেরা করে অন্য যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা বেশ অসুবিধের। কিন্তু বিস্ময়ের এই যে, রুমেলাকে একবারও বিবস্বানের ক্যুপের ধারেকাছে দেখা গেল না। গত রাতের নাটকের কারণেই অবশ্য। বিবস্বান বসুও অবশ্য তাঁর স্বাভাবিক ইনটুইশনেই উপলব্ধি করছেন, রাতে তাঁর নতুনতম অ্যাফেয়ারটির পর একদম ফায়ার হয়ে আছেন রুমেলা রায়।

বেশ সুদর্শন এই নায়কটিকে গার্গী এর আগে বেশ কয়েকবার রুপালি পর্দায় দেখলেও চাক্ষুষ করল এই প্রথম।

এবং অবশ্যই পর্দার চেয়েও তাঁকে সুন্দর দেখতে।

সারাটা দিন এমন নানান কুটকচালি আর দোলাচলের পর লখনউ স্টেশন পৌঁছতে সন্ধে পেরিয়ে গেল। সায়ন আগে থেকেই চিঠি লিখে টাকা পাঠিয়ে ঘর বুক করে রেখেছিল একটা দামি হোটেলে। জমজমাটি লখনউ স্টেশন থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে হজরতগঞ্জের সেই বিখ্যাত 'হোটেল ইন'-এ পৌঁছে যখন গার্গী ভাবছে, সেলুলয়েডের জগতের সেই বিবস্বান-রুমেলা ঝড় কোথায় এবং কীভাবে ঠেক খাবে তা আর জানা হল না। কারণ পথের দেখা, পথের আলাপ তো পথেই শেষ হয়ে যায়, ঠিক সেসময় অবাক হয়ে দেখল, তাদের ঠিক পিছু পিছু বেশ কয়েকটা ট্যাক্সি করে তাদের হোটেলেই এসে পৌঁছেছে স্বর্গরাজ্যের মানুষেরা।



'হোটেল ইন' হজরতগঞ্জ এলাকার অন্যতম অভিজাত হোটেল। ইন অর্থে সরাইখানা, বোধহয় তাই-ই হোটেলটা সায়নের বেশ পছন্দ হয়েছে, রোমান্টিক নামেরও একটা চোরাটান আছে। তারই একটা ডাবল-বেডেড রুমে অন্তত দিনতিনেক থাকবে, এর মধ্যে কোনও দিন একটা ট্যাক্সি, কোনও দিন বা একটা বাহারি টাঙ্গা ভাড়া করে ঘুরে ফিরে দেখবে এই ঐতিহাসিক শহরটা ও তার চারপাশ—এমনই পরিকল্পনা করেছে সায়ন।

সাধারণত খুবই ভোরে ঘুম ভাঙে সায়নের। আজ চোখ মেলে দেখল সে-ই এদিন লেট-লতিফ, গার্গী বহুক্ষণ আগেই ঘুম থেকে উঠে, বোধহয় বাইরে কোথাও নিসর্গ দেখতে বেরিয়েছে। লখনউ শহরটার বেশির ভাগই অবশ্য ঘিঞ্জি। মুঘল আমলের অন্য সব শহরের মতোই পুরনো ধাঁচের, সঙ্কীর্ণ সব গলির ভেতর গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে জাফরি সেট-করা চকমিলান দোতলা তিনতলা প্রচুর বাড়ি। বাড়িগুলোর নীচেটা পুরনো পুরনো দোকানে ভর্তি। শহরে আগের তুলনায় টাঙ্গার সংখ্যা কমে গেলেও এখনও যা আছে, সেগুলোর বাহনজনিত দুর্গন্ধে রাস্তাঘাটে হাঁটা চলা করাই দায়।

এ হেন শহরে শোভা এতই কম যে নাই বললেই চলে। শহরের ঠিক মাঝখান দিয়ে গোমতী বয়ে যাওয়ায় যা একটু চোখের রিলিফ। তবে লখনউয়ের যে দিকে নতুন শহর গড়ে উঠেছে সে অঞ্চলটা দারুণ। হজরতগঞ্জ তারই একটি এলাকা। হয়তো চোখ-ধাঁধানো দোকানগুলোর সেই ঘুমন্ত চেহারাটা গার্গী দেখছে হোটেলের গেটে দাঁড়িয়ে।

ঘর থেকে বেরিয়ে দোতলার বারান্দা থেকে নীচে তাকাতেই অবশ্য সায়নের ভুল ভাঙল। রাতে হোটেলে চেক-ইন করার সময় 'হোটেল ইন'-এর আসল সৌন্দর্য এড়িয়ে গিয়েছিল তার

চোখ। এখন দেখল, হোটেলের সামনেই একটা মস্ত লন, তার সবুজ ঘাস এতই মিহি, এমনই নিখুঁত করে ছাঁটা যে, হঠাৎ নজরে পড়লে মনে হবে বুঝিবা পারস্য থেকে আনা একটা সবুজ ভেলভেটের গালিচা পেতে দিয়ে গেছে কেউ। সেই সবুজ লনের এখানে-ওখানে মস্ত মস্ত সব রঙিন ছাতা মেলা রয়েছে বোর্ডারদের আমন্ত্রণ জানিয়ে। তারই একটা মেরুন ছাতার নীচে লাল-নীল বেতের চেয়ারে গার্গী বসে আছে একা চুপচাপ।

এ হেন কুয়াশারং ভোরবেলায় বড়ই মায়াবী হয়ে ওঠে পৃথিবী, বিশেষ করে এ হেন সুদৃশ্য হোটেলের ততোধিক চমৎকার লনের পটভূমিকায়। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে সেদিকে এগোতে এগোতে সায়নের মনে হল, একটা ঘন তুঁতে রঙের শাড়িতে গার্গীকে দেখাচ্ছে চারপাশের প্রকৃতির মতোই অদ্ভুত সুন্দর।

সে কথা খুশি-খুশি মনে গার্গীকে বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই গার্গী ঠোঁটে আঙুল রেখে, দুচোখে ইশারা করে সহসা থামতে বলল তাকে। তার চোখের ইঙ্গিত অনুসরণ করে সায়ন লনের অন্য এক দুরূহ কোণে আবিষ্কার করল কাল রাতে ট্রেনে-দেখা প্রৌঢ় চলচ্চিত্র পরিচালক ঋষভ মুখার্জিকে।

ঋষভ মাঝারিচেহারার, মেদহীন, বয়স ষাটের ওদিকে, কিন্তু মাথার চুল সবটাই সাদা হওয়ার সুবাদে দশ বছর বেশিই মনে হয় বয়সটা। অবশ্য হাঁটাচলা, কথনভঙ্গি এখনও যুবকোচিত। বিশেষ করে তাঁর গলার স্বর আবৃত্তিকারদের মতো বেশ ভরাট আর সুরেলা।

ঋষভ মুখার্জিকে ট্রেনে যথেষ্ট সপ্রতিভ আর স্মার্ট দেখাচ্ছিল। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে তিনি থম হয়ে বসে আছেন লনের এক কোণের দিকে। একটা বিশাল, সবুজ রঙের ছাতার তলায়। একা, খুবই চিন্তিত মনে। সায়নের মনে হল, নিশ্চয়ই ঋষভ তাঁর সিরিয়ালের কোনও দৃশ্যের কথাই ভেবে চলেছেন নিবিষ্ট মনে। কাল ট্রেনে যেরকম শুনেছিল, আজ বিকেল থেকেই তাঁদের শুটিং শুরু হওয়ার কথা। সিরিয়ালের পুরোটাই লখনউয়ের পটভূমিকায়। দৃশ্য গ্রহণের আগে সব পরিচালককেই যেভাবে ডুব দিতে হয় নিজের ভেতরে, সেভাবেই তাঁকে ঘিরে নৈঃশব্দ্য। যে-দৃশ্যটিকে সেলুলয়েডে ধরবেন, সেটিকে চাক্ষুষ করে নেবেন, একা একা চোখ বুজে সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু গার্গী মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে গলার স্বর নামাল, মিঃ মুখার্জি কাল রাতে নাকি একটা ডেথ নিউজ পেয়েছেন। কলকাতা থেকে এস. টি. ডি.-তে খবরটা এসেছে হোটেলের রিসেপশন রুমে।

—ডেথ নিউজ! কার?

গার্গী এই ভোরবেলাতেই খবরটা জোগাড় করে ফেলেছে বেশ আঁতিপাতি করে। মৃত্যুর সংবাদ বলেই বোধহয় তার কৌতূহল একটু বেশিই। বলল, ওঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর। ভদ্রলোক ডাক্তার ছিলেন। সাদার্ন অ্যাভেনিউয়ের কাছাকাছি তাঁর চেম্বার। খুব পশার ছিল নাকি।

—তাই। সায়ন কৌতূহলী হল, কী নাম বলো তো ডাক্তারের?

—ডক্টর সুস্নাত তালুকদার। এম. ডি.।

সায়ন চমকে উঠে বলল, সে কী! ডঃ তালুকদার মারা গেছেন!

—চেন নাকি তুমি!

—একটু একটু চিনতাম বইকি। ওই এলাকার সব ডাক্তারই তো পেশার সূত্রে বাবার চেনা ছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর মাকে ফোনটোন করতেন। তা ঋষভ মুখার্জি ওঁর বন্ধু নাকি! তাহলে তো ভেঙে পড়ার কথা।

গার্গীর জ্ঞানভাণ্ডার তখনও শেষ হয়নি, আস্তে আস্তে বলল, আসলে নিউজটা ওঁর কাছে ভীষণ শকিং। যে কোনও মৃত্যুসংবাদই দুঃখের, বিশেষ করে কোনও বন্ধুর মৃত্যুর খবর হলে সেটা আরও নিদারুণ। কিন্তু ডঃ তালুকদারের মৃত্যুসংবাদ এতই আকস্মিক যে, ঋষভ মুখার্জি প্রথমে বিশ্বাস করতেই পারেননি। হোটেলে পৌঁছনোর একটু পরেই খবরটা শোনার পর উনি নিজেই নাকি টলে পড়ে যাচ্ছিলেন।

—তাই নাকি।

—হ্যাঁ। আসলে যেদিন সন্ধেবেলা ঋষভ মুখার্জি অমৃতসর মেলে চেপেছিলেন, সেদিন সকালেই অর্থাৎ পরশু, উনি ওই ডাক্তারবন্ধুর বাড়িতেই গিয়েছিলেন। বেলা এগারোটা পর্যন্ত আড্ডাও মেরেছেন দুজনে, দাবা খেলেছেন বেশ কয়েক দান। তারপর তিনি চলে আসার পর শেষদুপুরের দিকে, ভাতটাত খেয়ে যে, সময় ডাক্তার বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তাঁর শোওয়ার ঘরে, ঠিক তখনই—

—সে কী, সায়ন আশ্চর্যই হল, একজন সুস্থ, স্বাভাবিক লোক কীভাবে—

—নিশ্চয়ই স্ট্রোক, গার্গী বেশ নিশ্চিত মনেই রায় দিল, ওই একটা রোগই তো আপাতত বেশ জাঁকিয়ে বসেছে পৃথিবীতে। বলা নেই কওয়া নেই সামান্যতম নোটিস দেওয়া নেই, হঠাৎ এসে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে বাজপাখির মতো।

শুনতে শুনতে হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে কেমন গম্ভীর হয়ে গেল সায়ন। স্ট্রোক নয়, অন্য এক বাজপাখির নখ এসে মাত্র কিছুকাল আগেই ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেছে তার ঐন্দ্রিলাকে, যে ঐন্দ্রিলাকে তার বন্ধুরা বলেছিল, 'প্যারাগন অব বিউটি', পড়শিরা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল, 'ও মা, এ যে দেবীপ্রতিমার মতো মুখ।' পরক্ষণে সায়ন সম্বিৎ ফিরিয়ে এনে বলল, তা হলে তো ভদ্রলোকের মুষড়ে পড়ারই কথা। আসলে কী জানো, মৃত্যুসংবাদ এমনই ভয়ঙ্কর যে, শোনামাত্র প্রত্যেকের মনেই একটু হলেও ঠুকরে যাবে মৃত্যুভয়। হঠাৎ এক মুহূর্ত 'বেঁচে থাকার কোনও নিরাপত্তা নেই' বলে মনে হবে। বিশেষ করে বন্ধুর মৃত্যু হলে তো কথাই নেই।

গার্গী ম্লান হাসল, ঠিকই বলেছ।

—জানো, খুব ছোটবেলায় বাবার মুখে একটা গল্প শুনেছিলাম যা আমার আজও মনে আছে। গল্পটা অবশ্য বাবা শুনিয়েছিলেন আমার মাকে। আমার ঠাকুর্দার সম্পর্কেই গল্পটা। ঠাকুর্দারা দুই ভাই তিন বোন ছিলেন। সবারই বয়স তখন ষাটের এপাশে-ওপাশে। সে সময় তাঁর চেয়েও বয়সে ছোট যে-বোন তিনি হঠাৎ অম্বলের অসুখে ভুগে মারা যান। খবরটা শুনে ঠাকুর্দা স্তম্ভিত হয়ে বলেছিলেন, 'তা হলে আমাদের খাতায় হাত পড়ল!' তার বছরদুয়েক পরে ঠাকুর্দাও নাকি মারা গিয়েছিলেন! আমি তখন খুবই ছোট, কিন্তু এই খাতায় হাত পড়ার ঘটনাটা কেন কে জানে, এত দাগ কেটে বসে গিয়েছিল আমার মনে যে, আজও স্মৃতিতে কথাটা রয়ে গেছে বেশ বহাল তবিয়তে। বন্ধুর মৃত্যুতেও ঠিক এরকমই মনে হয় কারও কারও।

কথা বলতে বলতে খুবই ইমোশনাল হয়ে পড়ছিল সায়ন। তার গলার স্বর ভারী হয়ে আসছে দেখে গার্গী মুহূর্তে আলোচনার খেই অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করল, আপাতত সিরিয়ালের কাজ বন্ধ। রাতে খবরটা পাওয়ার পর ঋষভ মুখার্জি ওদের প্রোডাকশন ম্যানেজারকে ডেকে বলেছেন, 'প্যাক আপ, প্যাক আপ। ছবি হবে না। ইট'স টেরিব্‌লি শকিং টু মি। চলো, কলকাতা ফিরে যাই।'

সায়ন বিস্মিত হচ্ছিল, বেশ বিচলিতও হল এ হেন অদ্ভুত খবরটা শুনে। এত লোকলস্কর, যন্ত্রপাতি, এত সব নামী দামি অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে কলকাতা থেকে এতো দূরে একটা

ছবির কাজ করতে এসে এক রিল ছবিও না তুলে, হঠাৎ যদি পুরো টিম নিয়ে আবার কলকাতা ফিরে যেতে হয়, তা হলে ছবির বারোটা তো বাজলই, উপরন্তু কত টাকা নষ্ট হল প্রযোজকের, সেটাও তো ভাববার। তা ছাড়া এতজন শিল্পী ও কলাকুশলীর কত মূল্যবান সময়ের যে অপচয় হল তাও তো মোটেই ফেলনা নয়।

সায়ন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তার মানে ভদ্রলোক খুবই শক্‌ড্ হয়েছেন বোঝা যাচ্ছে।

গার্গী ঘাড় নেড়ে সায় জানাল তার কথায়। ততক্ষণে তার নজর চলে গেছে সবুজ লনের সেই নিভৃত কোণের দিকে-যেখানে বিষণ্ণ, হতাশ এক পরিচালক ভোর থেকে একা একা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলেন নিজের মনে। এখন সায়ন তাকিয়ে দেখল, গতকাল ট্রেনে দেখা সেই দীর্ঘদেহী প্রোডাকশন ম্যানেজার বেশ সন্তর্পণে গিয়ে বসলেন ঋষভ মুখার্জির সামনের চেয়ারটিতে। হঠাৎ ছবির কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অন্য সবাইকার মতো, কিংবা হয়তো একটু বেশিই মর্মাহত প্রোডাকশন ম্যানেজার, সেটা তাঁর মন্থরগতিতে হাঁটার ধরন, চেয়ারে বসার ভঙ্গিমা, কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকা পরিচালকের মুখের দিকে, ইত্যাদি অনুসরণ করলেই বোঝা যায়। আর এটা তো স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার মতো একটা ঘটনাই যেহেতু সায়ন নিজেও উপলব্ধি করতে পারে যে, একজন এন্টারপ্রেনার, তিনি সায়নের মতো সোপ-ম্যানুফ্যাকচারারই হোন, অথবা ঋষভ মুখার্জির মতো ছায়াছবির পরিচালকই হোন, একটা বড় কাজে হাত দিয়ে গোড়াতেই বা মাঝপথেও যদি কেউ একটা বড়সড় ধাক্কা খায়, তা হলে তার কাজের উৎসাহ, গতি, এমনকী উদ্ভাবনীশক্তিও খর্ব হয়ে যেতে বাধ্য।

প্রোডাকশন ম্যানেজার ততক্ষণে বোধহয় বোঝাতে চাইছেন, হঠাৎই এত দূরে এসে কাজ বন্ধ করে প্যাক-আপ করে ফিরে যাওয়াটা কতখানি অসুবিধের ও অর্থসংকটের। কিন্তু ঋষভ মুখার্জি মনে হচ্ছে তাঁর কোনও কথাই মানতে চাইছেন না, বারবার মাথা ঝাঁকাচ্ছেন, কখনও দু'হাতে মাথা চেপে ধরে ঝুঁকে পড়ছেন টেবিলের ওপর, কখনও নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকছেন শূন্য আকাশের দিকে, যেন প্রোডাকশন ম্যানেজারের কোনও অনুনয়-বিনয়, যুক্তিজাল তাঁর কানেই পৌঁছচ্ছে না।

ইতিমধ্যে, হয়তো প্রোডাকশন ম্যানেজারই রিসেপশনে বলে গিয়ে থাকবেন তাঁদের টেবিলে দু'কাপ কফি দিয়ে আসার জন্য। একজন ওয়েটার ট্রেতে করে কফি নিয়ে যেতেই তৎক্ষণাৎ তাকে জোরে জোরে হাত নেড়ে না বলে দিলেন ঋষভ মুখার্জি। ওয়েটার ফিরে যেতে প্রোডাকশন ম্যানেজার খুবই বিব্রত, মনঃক্ষুণ্ণ! কী করবেন, ভেবে না পেয়ে তিনিও মাদাম তুসোর স্ট্যাচুর মতো বসে রইলেন চুপচাপ।

বোধহয় ওয়েটারকে দেখেই এতক্ষণে সায়নেরও কফির পিপাসা পেল। সকালে ঘুম থেকে উঠেই পায়ে পায়ে দোতলা থেকে নীচে নেমে এসে, গার্গীর মুখ থেকে এই আকস্মিক অঘটনের সংবাদ শুনতে শুনতে বেমালুম ভুলে গিয়েছিল তার অন্য সব রোজনামচা। গার্গীকে বলল, চলো তোমার বাকি গল্প কফি খেতে খেতে শুনি—

একঢাল সবুজ লনটি ছাড়া 'হোটেল ইন'-এর আরও যে দুটি অনন্য আকর্ষণ ট্যুরিস্টদের মুগ্ধ করবেই তার একটি হল, একতলায় মস্ত লাউঞ্জ, অন্যটি দোতলায়—বিশাল ডাইনিং হল। দারুণ দারুণ সব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেওয়ালে সেঁটে, ঝকেঝকে সোফা, সেন্টার টেবিল, রকমারি ফুলভর্তি ফ্লাওয়ারভাস, উঁচু উঁচু পেতলের ছাইদান, এককোণে টেলিফোন ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে যেমন লোভনীয় তার লাউঞ্জটি, তেমনই চমৎকার ডাইনিং হল যার বিশাল পরিসরে

জাফরি-কাটা প্লাইউডের পার্টিশনের মধ্যে এক একটি রঙিন দৃশ্যময় সানমাইকা সেট করা টেবিল, চারপাশে চারটে বা দুটো চেয়ারসহ। কিন্তু সায়ন আপাতত এই হিম-হিম সকালে রুমসার্ভিসই পছন্দ করল কফির সদ্ব্যবহারে। তাদের ডাবল-বেডেড ঘরটি বেশ প্রকাণ্ড, সকালে এ. সি বন্ধ করে জানলা খুললেই প্রশস্ত বড় রাস্তা, তার দুপাশে সাজানোগোছানো ছবির মতো দোকানপাট। কফি আসতেই তাতে বড় করে একটা চুমুক দিয়ে সায়ন বলল, তা হলে আজ আমাদের কী প্রোগ্রাম? লখনউ শহরের সাইট-সিয়িং, না কি ট্যাক্সি নিয়ে আরও দূরে কোনও আউটিঙে, অযোধ্যা, কিংবা শ্রাবস্তী।

গার্গী অনেকক্ষণ ধরে কেন কে জানে বেশ অন্যমনস্ক, সায়নের কথার উত্তরে চমক ভেঙে বলল, আজ দিনটা রেস্ট নিলে হয় না?

—রেস্ট! সায়ন অবাক হচ্ছিল, মাত্র তিন দিনের সফর এ হেন একটা ঐতিহাসিক শহরে। তিনটে দিন তন্নতন্ন করে দেখে নিতে চাই লখনউয়ের এ-কোণ ও-কোণ। যাই হোক, যদি না বেরুই, তা হলে সারাদিন কি ঘরে বসে আড্ডা, আর লখনউয়ের বিখ্যাত সব মোগলাই আইটেমগুলোর একে একে স্বাদ নেওয়া? এখানকার স্পেশ্যাল পোলাওয়ের সঙ্গে মুর্গমশল্লম, কিংবা কুলফি বা ফালুদা!

ঘরের জানলা দিয়ে চট করে কী যেন চোখে পড়তেই গার্গী দ্রুত বেরিয়ে গেল বারান্দায়। দেখল, সে আর সায়ন এতক্ষণ লনের ঠিক যে মেরুন ছাতাটির নীচে বসে ছিল, সেখানে গিয়ে বসলেন রানাজি স্যান্যাল নামের সেই দীর্ঘদেহী সুদর্শন প্রোডাকশন ম্যানেজার, সঙ্গে বর্ণনা নামের অল্পবয়সী মেয়েটি। দুজনের বসার ভঙ্গি বেশ ঘনিষ্ঠ। সকাল থেকে তাদের টিমের বাকি সবার ভেতর যখন একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে, প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রী আর কলাকুশলীই যখন থম হয়ে আছে সিরিয়াল বন্ধ হয়ে যাওয়ার সংবাদে, তখন বর্ণনা তাদের প্রোডাকশন ম্যানেজারের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে বসে হাসির ফুলঝুরি ছড়াচ্ছে দেখে বেশ আশ্চর্যই হল গার্গী। ঘরে ঢুকে প্রায় নিজের মনেই বিড় বিড় করল, মেয়েটা এ-লাইনে নতুন তো, তাই এরকম জার্কিং-এও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

সায়ন কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, নতুন নাকি?

—হ্যাঁ, ঋষভ মুখার্জির নতুন রিক্রুট।

সায়ন কফির কাপপ্লেট নামিয়ে রেখে বলল, তুমি এত সব খবর এর মধ্যে পেলে কী করে! ঋষভ মুখার্জির বন্ধু সম্পর্কেও এত ডিটেইল্‌স্ বললে এতক্ষণ, যেন ওদের টিমের সঙ্গে তোমার বহুকালের জানাশোনা।

গার্গী এক অদ্ভুত রহস্যময় হাসি তার দুঠোঁটে ছড়িয়ে বলল, আমার বোধহয় একটা তৃতীয় নয়ন আছে, তাইই—

সায়ন বিভ্রান্ত হল প্রথমটা, পরক্ষণে ঘাড় নেড়ে বলল, উঁহু।

গার্গী হেসে বলল, আসলে ভোরবেলা ওই যে ছেলেটা, সারাক্ষণ একটা দামি ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে নিজে থেকেই সিঁড়ির মুখে আলাপ করল আমার সঙ্গে।

—তাই!

—হ্যাঁ। ওর নাম রোমিও দত্তগুপ্ত। ওদের টিমটার নাম 'সিনেমুভি'। এর আগে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছে ও, কিন্তু ক্যামেরাম্যানের পুরো দায়িত্ব এই প্রথম। হঠাৎ আমার সঙ্গে ভোরে দেখা হতেই দাঁড়িয়ে বলল, ম্যাডাম, আপনার ফেসটা ভীষণ ফোটোজিনিক।

সায়ন আরও আশ্চর্য হল, সেটা ও জানল কী করে!

সায়ন যেমন বিস্মিত হচ্ছে, রোমিওর কথা শুনে সেই মুহূর্তে গার্গীও অবাক হয়েছিল কম নয়। প্রথমে আন্দাজই করতে পারেনি, কী বলতে চায় ছেলেটা! কিন্তু রোমিও পরমুহূর্তে তার ক্যামেরা রাখার ব্যাগটিতে যে-একটা ছোট্ট পকেট আছে তার ভেতর হাত ঢুকিয়ে হতবাক গার্গীর চোখের সামনে বার করে আনল একটা পোস্টকার্ড সাইজের রঙিন ফটো। ফটোটা গার্গীর। গতকাল বেলা এগারোটা নাগাদ যখন সে আর সায়ন বেনারস স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মাটির খুরিতে করে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল বেশ তারিয়ে তারিয়ে, তখনই ফটোটা তোলা। ফটোতে সে অবশ্য একাই, বেশ নিবিষ্ট হয়ে চা খাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে, তাতে তার গোলছাঁদের মুখের প্রোফাইল বেশ ভালই লাগছে মনে হল।

গার্গী স্তম্ভিত হয়ে তাকাতেই রোমিও তার ফ্রেঞ্চকাট মুখে বেশ অপরাধী-অপরাধী ভঙ্গি করে হাত জোড় করল, অধমের গোস্তাকি মাপ করবেন ম্যাডাম, ক্যামেরা চোখ দিয়েই সারাক্ষণ পৃথিবীটাকে দেখি। সেরকম দেখতে গিয়েই হঠাৎ আপনার মুখটা ধরা পড়ে যায় আমার ক্যামেরার ফ্রেমে। প্রিন্সেস ডায়ানার মতোই বুদ্ধিদীপ্ত লাগছিল আপনার মুখখানা। সেই মুহূর্তে শাটার টেপার লোভ সামলাতে পারিনি।

সায়ন প্রায় হাঁ করে শুনছিল কথাগুলো, গার্গীর কথা শেষ হতেই শুধু বলতে পারল, মাই গড। কই দেখি ফটোটা?

গার্গী তৎক্ষণাৎ তার ব্লাউজের ভেতর থেকে বার করে আনল ফটোটা। সায়নের সামনে রাখতেই সায়ন অনেকক্ষণ ধরে বেশ খুঁটিয়ে পরখ করল গার্গীর প্রোফাইল। গার্গী ঐন্দ্রিলার মতো অসাধারণ সুন্দরী নয়, কিন্তু তার চোখেমুখে এমন একটা বুদ্ধির চটক সারাক্ষণ খেলা করে, তার চাউনি এতটাই তীক্ষ্ণ যে, হঠাৎ তার দিকে নজর পড়লে সে একটা সম্ভ্রম আদায় করে নেবেই। ফটোতে তার মুখের একটা দিক ধরা পড়েছে, তাতে তার চোখ, নাক, ঠোঁটের একটা কোণ, চিবুক, সব মিলিয়ে ভারি আকর্ষক লাগছে গার্গীকে। ফটোটা কিছুক্ষণ দেখে ফিরিয়ে দিল সায়ন। বলল, হুঁ ছেলেটির একটা নান্দনিক দৃষ্টি আছে।

গার্গী সামান্য গম্ভীর হয়ে বলল, কিন্তু সিরিয়ালটা যদি সত্যিই না তোলা হয়, তা হলে ওর একটা সুযোগ মিস্ হবে। বলল, এতদিন পরে স্বাধীনভাবে একটা কাজ দেখানোর সুযোগ পেয়েছিলাম, হঠাৎ এরকম একটা দুর্ঘটনা পিছু নেবে তা আমরা কেউই অনুমান করতে পারিনি।

সায়ন একটা রঙিন ম্যাগাজিন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করেছিল, হঠাৎ কী যেন ভেবে মুখ তুলল, কিন্তু একটা কথা ভেবে খুব অবাক লাগছে। হঠাৎ পরিচালক তাঁর বন্ধুর মৃত্যুতে এতই শক পেলেন যে, সিরিয়াল তোলার প্রোগ্রামটা ক্যানসেল করে দিলেন!

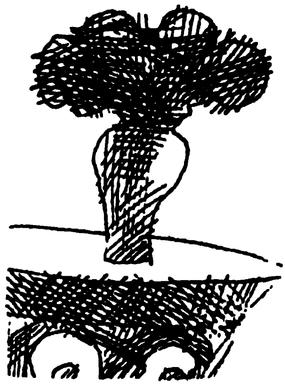
গার্গীকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল। সায়ন যে-কথা ভেবেছে, সেও ভোর থেকে এই আকস্মিক দুর্ঘটনা ও পরিচালকের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এ পর্যন্ত সেরকমই ভাবছিল নিজের মনে।

আসলে কোন দুর্ঘটনা কখন, কীভাবে মানুষকে আলোড়িত করবে, কোন সিদ্ধান্তে উপনীত করবে তা বোঝা মুশকিল। এক এক মানুষের মনে অনুভূতির বিন্যাস এক এক রকম, তাই জাগতিক এক একটি ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কাছে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণে ধরা পড়ে। তার প্রতিক্রিয়াও হয় ভিন্ন। ঋষভ মুখার্জি শিল্পী মানুষ, হয়তো তাই একটু বেশিই অনুভূতিপ্রবণ, সেইজন্যেই প্রিয়বন্ধুর এই আকস্মিক মৃত্যুতে একেবারেই বিভ্রান্ত, দিশেহারা।

সেদিন সারাদিন হোটেলের ঘরে, লাউঞ্জে, আর বার দু'তিন ডাইনিং হলে কেটে গেল

সায়নদের। ডাইনিঙে তাদের পাশের টেবিলেই খেতে বসেছিল দুটি নতুন মুখ। একজনের বেশ লম্বা দাড়ি, চোখে স্টিলফ্রেমের চশমা, অন্যজনের মিঠুন-ছাঁট চুল, ক্লিন-সেভ্‌ড্‌ মুখ, খেতে খেতে নিচু স্বরে বলাবলি করছিল, ঋষভদা বরাবরই এরকম ফ্রিক্‌ল্‌-মাইন্ডেড, এর আগে আরও দু-তিনবার ছবি আরম্ভ করে আবার বন্ধ করে দিয়েছেন সামান্য কারণেই।

সকাল থেকে এমন অনেকবারই তাদের মুখোমুখি হতে হল, 'সিনেমুভি' টিমের অভিনেতা-অভিনেত্রী ও কলাকুশলীদের। ট্রেনে দেখা সেই বারমুডা পরিহিত ক্যাবলাকান্তটিকেও উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখা গেল মাঝেমধ্যে। খুবই দ্রুত চেনা হয়ে উঠেছে মুখগুলো, কিন্তু প্রতিটি মুখই এখন অন্যরকম। গত দেড়দিনে ট্রেনে দেখা উজ্জ্বল স্বপ্নালু মুখের পরিবর্তে বিষণ্ণ, মনমরা কিছু মুখ। দপ করে নিভে-যাওয়া মোমবাতির মতোই চোখেমুখে কালচে সল্‌তে। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর গার্গীকে নিয়ে সায়ন বেরিয়েছিল টুকটাক মার্কেটিঙে। হজরতগঞ্জ থেকে আমিনাবাদের শোরুমগুলোতে ঘুরে বেড়িয়েছে লখনউয়ের বিখ্যাত চিকনের উৎস সন্ধানে। সন্ধের মুখে যখন হোটেলে ফিরল, 'সিনেমুভি'র হতশ্রী মুখগুলো জরিপ করতে করতে যে চমকপ্রদ তথ্যটি জোগাড় করে আনল গার্গী তা হল, বিকেলে ঋষভ মুখার্জি কলকাতায় এস টি ডি করে শেষ যে-খবর জানতে পেরেছেন, ডঃ সুস্নাত তালুকদার স্ট্রোকে মারা যাননি, সুইসাইড করেছেন। তাতে আরও ভেঙে পড়ে ঋষভ মুখার্জি কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলেছেন, আমি জানতাম এরকম কিছু একটা হবে।



কলকাতার এক বর্ষীয়ান ডাক্তার সুস্নাত তালুকদারের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে প্রথমে স্ট্রোক, পরে সুইসাইডের কথা শুনে কেন যেন সহসা খটকা জাগল গার্গীর মনে। সম্ভবত তার একটা তৃতীয় নয়ন আছে, যে-চোখ দিয়ে আজকাল যে-কোনও ঘটনার সে অনেকটা ভেতর পর্যন্ত দেখতে পায়। কৈশোরকাল থেকে আজ পর্যন্ত একের পর এক অনেক ছোট বড় রহস্যময় ঘটনার জড়িয়ে পড়ে তার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, সব অস্বাভাবিক ঘটনার ভেতর নিহিত থাকে আরও অনেক ঘটনার বীজ। ঘটনার গভীরে ঢুকলেই দেখতে পায়, যা সে একেবারেই ভাবেনি এমন অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাহিনী অবয়ব পাচ্ছে ক্রমশ। তাই যত দিন যাচ্ছে, গার্গীর ভেতর জন্ম নিচ্ছে এক বিশাল অনুসন্ধিৎসার জগৎ।

এ নয় যে, কোনও অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে গার্গীকে আমন্ত্রণ করে সেটি তদন্ত করতে নিয়ে যায় কেউ। সে নিজে থেকেও কখনও কোনও ঘটনার পেছনে ছোটে না। কিন্তু শখের

গোয়েন্দা না হয়েও বিষয়গুলো কীভবে যেন হামলে পড়ে তার সামনে। সে-সব ঘটনা এড়াব এড়াব করেও শেষ পর্যন্ত পাকেচক্রে জড়িয়ে পড়ে তার সঙ্গে। তখন আর ঘটনার গভীরে না ঢুকে উপায় থাকে না। এভাবেই তো বহু ঘটনার সঙ্গে সে ওতপ্রোত হয়েছে তার সেই স্কুল-কলেজে পড়ার দিনগুলি থেকে। চেনাজানা কে যেন একজন তার সঙ্গে দেখা হলেই মুচকি হেসে বলেছিলেন, তোমার ম্যাথ্‌স্ পড়ার অভিজ্ঞতাটা বেশ কাজে লাগল কিন্তু—

গার্গী পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি কথাটা। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে উত্তর পেয়েছিল, ম্যাথ্‌সের স্টুডেন্টদের মাথাটা অন্যের থেকে একটু বেশিই পরিষ্কার হয়। তাইই তুমি কোনও নিরীহ ঘটনার মধ্যেও একটা অন্য মাত্রা আবিষ্কার করতে পারো।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের ছাত্রী হওয়ার কারণেই কি না জানে না, গার্গীর নিজেরও ইদানীং মনে হয়, কোনও ঘটনার উত্তর খুঁজতে গিয়ে একটু বেশিই দেখতে পায় যেন। অঙ্কের ছাত্রী হিসেবে সে যে খুব একটা মেধাবী ছিল তাও নয়। বিষয় হিসেবে অঙ্ক খুব পছন্দেরও ছিল না তার। কোনও একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয় তার দরকার ছিল, তাইই অঙ্ক। ছাত্রীজীবনে পুরোপুরি অঙ্কে মনোনিবেশ করলে পরীক্ষার ফলাফল আরও একটু ভাল করা যেত তা হয়তো ঠিক, কিন্তু সেটা তার খুব দরকার মনে হয়নি। ম্যাথ্‌সের জটিল রহস্যগুলো সমাধান করার ফুরসতে তার ছোট্ট মগজটা পৃথিবীর আরও নানা কর্মকাণ্ডের দিকে ঠেলে দিয়েছে তখন। প্রথম জীবনে নানান অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয় নিয়ে তার ছিল ফিচার লেখার ঝোঁক। হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেট-কমপিটিশনে নেমে চ্যাম্পিয়নও হয়ে গেল একবার। কিছুকাল একটি সোসিও-ইকনমিক রিসার্চ অ্যাকাডেমিতে চাকরি করতে গিয়ে জড়িয়ে পড়েছিল আরও এক আশ্চর্য জটিলতার ভেতর। সেখান থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে একটু থিতু হতে না হতেই সায়ন চৌধুরির সোপ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে একেবারে খোদ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ভূমিকায়। তার ঝামেলা থেকে রেহাই নিতে-কয়েকদিনের এই আউটিং। লখনউয়ে এসে ডঃ সুস্নাত তালুকদারের অস্বাভাবিক মৃত্যুসংবাদ শুনে হঠাৎ কেন যেন মনে হচ্ছে এর ভেতরেও কোনও রহস্য আছে!

বিশেষ করে সায়ন যখন কথাপ্রসঙ্গে একটু আগেই বলল, কী আশ্চর্য, একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার হঠাৎ সুইসাইড করতে গেল কেন বলো তো! আমার বাবা সুইসাইড করেননি, তবে তাঁর মৃত্যু প্রায় সুইসাইড করার মতোই। তার পেছনে কিন্তু একটা কারণ ছিল। তবে কি ডাঃ তালুকদারেরও তেমন কিছু—!' বলে হেসে উঠল কিরকম অন্যমনস্কের মতো। ঠিক তখনই গার্গীর মনে হল সায়ন কথাটা খারাপ বলেনি। কলকাতায় একটা ফোন করে দেখা যাক।

ল্যান্সডাউন রোডের যে এলাকাটায় গার্গী আর সায়ন থাকে, ঘটনাচক্রে সাদার্ন অ্যাভেনিউয়ে ডাঃ সুস্নাত তালুকদারের বাড়িও সেই একই থানা এলাকায়। আর সৌভাগ্য এই যে থানার নতুন পুলিশ অফিসার তুষারশুভ্র মিত্র গার্গীর পূর্বপরিচিত। হোটেলের কামরায় ফিরে একটু একান্ত হতেই টেলিফোনের বোতাম টিপল গার্গী। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওপ্রান্তে থানার ইনস্পেক্টার-ইন-চার্জের গম্ভীর গলা, হ্যালো।

—মিঃ মিত্র বলছেন? আমি লখনউ থেকে গার্গী চৌধুরি বলছি। চিনতে পারছেন নিশ্চয়ই! কয়েকদিন আগেই আমাদের ল্যান্সডাউন রোডের ফ্ল্যাট থেকে আপনার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল—

তুষারশুভ্র মিত্র বুদ্ধিমান অফিসার। একটু পরিচয় দিতেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেললেন

গার্গীকে, ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলুন। তা লখনউ থেকে কেন!

গার্গী তার সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতাটি সংক্ষেপে বিবৃত করে ডঃ সুস্নাত তালুকদারের মৃত্যুর সংবাদ জানতে চাইতেই পুলিশ-ইনস্পেক্টর বিস্ময় চেপে রাখতে পারলেন না, হা ঈশ্বর, এ-খবর এত দ্রুত লখনউ পর্যন্ত পৌঁছে গেল কী করে!

গার্গী তাও কিছুটা বিবৃত করে জানতে চাইল, বলুন তো মিঃ মিত্র, একজন প্রতিষ্ঠিত সফল ডাক্তার হঠাৎ সুইসাইড করতে গেলেন কেন!

তারের ও-প্রান্ত থেকে ভেসে এল, একটু আগে ওখান থেকেই ইনভেস্টিগেশান করে এলাম, মিসেস চৌধুরি। ঘটনাটা খুবই অদ্ভুত। ডাক্তার ব্যাচেলর ছিলেন, তাঁর উত্তরাধিকারী বলতে দুই ভাইপো। তাদের সঙ্গে ডাক্তারের কোনও যোগাযোগ ছিল তাও না। অথচ কী অদ্ভুত, তিনি হঠাৎ দিনেদুপুরে খুন হলেন!

—খুন! রিসিভার হাতে ধরে গার্গী ছিটকে উঠতে চাইল, তবে যে শুনলাম সুইসাইড!

—সুইসাইড বলেই আপাতদৃষ্টিতে সবার মনে হচ্ছে। যে চেয়ারটিতে ডাক্তারের ডেডবডি আড় হয়ে পড়ে আছে, ঠিক তার পাশেই যখন রিভলভারটা পাওয়া গেল, তার একটু দূরেই সেন্টারটেবিলের ওপর যখন পেপারওয়েট দিয়ে চাপা রয়েছে একটা সুইসাইডাল নোট 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়', তখন যে-কেউ ভাবতেই পারে, এটা আত্মহত্যা।

—কী আশ্চর্য! তারপরও এটাকে মার্ডার বলে ভাবছেন কেন! সুইসাইডাল নোটটা কি ডাক্তার নিজের হাতে লেখেননি!

—সেটা এখনও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। আসলে ডাক্তার সারাজীবনে যা লিখেছেন তা হল লক্ষ লক্ষ প্রেসক্রিপশন। আর তা সবই ইংরেজিতে লেখা। হিজিবিজি অক্ষরে সেই প্রেসক্রিপশন পড়ে তাঁর বাংলা হস্তাক্ষর কীরকম তা তো জানা সম্ভব নয়।

—তা হলে!

—সমস্ত ব্যাপারটাই ভারি রহস্যজনক, মিসেস চৌধুরি। সম্ভবত এর ভেতর কোনও মহিলাঘটিত ব্যাপার আছে।

—সে কী! গার্গী তার বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না, কোনও প্রমাণ পাওয়া গেছে!

—যে-ঘরে ডাক্তারের ডেডবডি পড়ে আছে, সেখানে একটা লেডিজ হ্যান্ডব্যাগ পাওয়া গেছে।

—লেডিজ হ্যান্ডব্যাগ! আর কিছু?

—একটা সোনালি ফ্রেমের নতুন চশমা। সেটা সম্ভবত কোনও পুরুষের। ডাক্তার তালুকদারেরও হতে পারে।

—ও, গার্গী কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, কিন্তু দিনে দুপুরে খুন হলেন ডাক্তার। সেসময় তাঁর বাড়িতে আর কেউ ছিল না?

—কে আর থাকবে, মিসেস চৌধুরি! ডাক্তার ব্যাচেলর। তাঁকে দেখভাল করত যে-ঠাকুর আর চাকর, তাদের দুজনকেই নাকি প্রতিদিন দুপুরবেলা ছুটি দিয়ে দিতেন। জেরার উত্তরে দুজনেই তাই বলেছে।

—ওদের দুজনকে কি অ্যারেস্ট করেছেন?

—এখনও করিনি। দুজনকেই নজরে রাখা হয়েছে। তবে দুজনকে দুজায়গা থেকে ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় মনে হল, কেউ মিথ্যে বলছে না। দুজনেই বলেছে, দুপুরের দিকে একা থাকতে চাইতেন ডাক্তার। সেসময় মহিলাদের আনাগোনা ছিল তাঁর বেডরুমে।

—তাই! এদিনও কি সেরকমই কেউ এসেছিলেন বলে প্রমাণ পেয়েছেন?

তুষারশুভ্র মিত্র হেসে উঠে বললেন, সেরকম একটা প্রমাণ পাওয়া গেছে বলেই আমাদের ধারণা এটা সুইসাইড নয়, ইট'স অ্যা ব্রড ডে-লাইট মার্ডার। তবে এর চেয়ে আর কিছু বলা আমার পক্ষে এই মুহূর্তে সম্ভব নয়, মিসেস চৌধুরি।

—থ্যাঙ্ক ইউ, মিঃ মিত্র। হঠাৎ ঘটনাটা শুনে কৌতূহল হল বলেই এত কথা জানতে চাইলাম। ঘটনাটার জের লখনউয়ে এসে আছড়ে পড়েছে এখন। ঠিক আছে, পরে কথা হবে আবার।

রিসিভার নামিয়ে রেখে গার্গী বহুক্ষণ চুপচাপ সোফায় বসে একমনে ভাবল ব্যাপারটা। তাহলে তার তৃতীয় নয়নে যে-দৃশ্যটা একটু আগে প্রত্যক্ষ করেছিল, সেটা কী অদ্ভুতভাবে মিলে গেল প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে! সঙ্গে সঙ্গে এও ভাবল, ঘটনার সঙ্গে যখন কোনও মহিলার যোগসূত্র পাওয়া গেছে, পুলিশি-তদন্তে আরও অনেককিছুই প্রকশিত হবে ক্রমশ।

তার খুব ইচ্ছে করছিল ঘটনাটার আরও অনেক তন্নতন্ন বিবরণ জেনে নিতে পুলিশ-অফিসারটির কাছ থেকে। তার মনে তখন ভিড় করছিল অজস্র খুঁটিনাটি প্রশ্নমালা। কিন্তু কলকাতা থেকে এতদূরে এসে, তার পক্ষে তো সম্ভব নয় কলকাতার এক ডাক্তারের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্তের কাজে জড়িয়ে পড়া! এখন শুধু একটা কাজই তার পক্ষে করা সম্ভব তা হল, ডাক্তারের মৃত্যুর ফলে এই সিরিয়াল-টিমটার কী হাল হয় তার ওপর সতর্ক নজর রাখা, সেই সঙ্গে কলকাতায় ফোন করে তদন্তের কাজ কতদূর এগুল, তা মঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেওয়া।

সায়ন অবশ্য তার এই অনাবশ্যক কৌতূহল পছন্দ করবে না। সায়ন এখন বুঁদ হয়ে আছে তার হিমালয় ভ্রমণের স্বপ্নে। কখন লখনউ দেখা শেষ করে বেরিয়ে পড়বে কুমায়ুনের পথে—সেই চিন্তায় মশগুল। গার্গীর মনে এখন যে লক্ষ প্রশ্নের ঝাঁপি উপুড় হয়ে ছড়িয়ে ঢেউঢক্কার, সে-খবর তো আর সায়ন রাখে না। এখন গার্গীর সামনে রুপোলি জগতের অনেক চরিত্র, অনেক রহস্যের ভিড়। একটা দমকা হাওয়ায় রূপোলি জগতের মায়াজাল ছিঁড়েখুঁড়ে সেই অজস্র চরিত্র যে ভাবে স্তব্ধ হয়ে গেছে সহসা, তা সংক্রামিত হচ্ছে গার্গীর ভেতরও। শ্মশানের সেই স্তব্ধতার ভেতর বসেই গার্গী আবিষ্কার করছে আর এক আশ্চর্য পৃথিবী।



'হোটেল ইন'-এর দোতলায় এল-প্যাটার্নের মস্ত বারান্দাটার দক্ষিণকোণে একটা ছোট্ট ওপেন-এয়ার লাউঞ্জ, ডাইনিং হলের ঠিক পেছনেই, চট করে নজরে পড়ে না কারও, যেখানে

ইচ্ছে করলে কিছুক্ষণ সবার চোখের আড়াল হয়ে গা এলিয়ে ডুবে থাকা যায় ফোল্ডিং আরাম চেয়ারগুলিতে। শেষ-দপুরের দিকে, হোটেলের বেশিরভাগ বোর্ডারই বাইরে বেরিয়ে গেছেন সাইট-সিয়িঙে। যাঁরা যাননি তাঁদের অনেকেই হোটেলের বিছানায় সুখনিদ্রায় মগ্ন। সেরকমই একটি নিরালা মুহূর্তে রোমিও থম হয়ে একা-একা ভেবে চলেছে গত দু'দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাবলি। তার মন ভাল নেই, একদম ভাল নেই। ক্যামেরাম্যান হিসেবে এই সিরিয়ালটিই ছিল তার কেরিয়ারের একটা ব্রেক। এখন সিরিয়াল বন্ধ হওয়ার সংবাদে শুধু তার কেন, তাদের 'সিনেমুভি' টিমের প্রায় কারওরই মন ভাল নেই।

চৌঠা সেপ্টেম্বর লখনউ রওনা দেওয়ার ঠিক দু'দিন আগে হঠাৎই যখন টেলি-সংবাদটা পেয়েছিল পরিচালক ঋষভ মুখার্জির কাছ থেকে, 'রোমিও, একটা নতুন সিরিয়ালের কাজে হাত দিয়েছি, ক্যামেরার দায়িত্ব তোমার হাতে দেব ভেবেছি, গেট রেডি বাই টুমরো,' তখন উল্লাসে, বিস্ময়ে, রোমাঞ্চে প্রায় বোবা হয়ে গিয়েছিল রোমিও। এর আগে অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যামেরাম্যান হিসেবে দু-তিনটে ফিচারফিল্মে কাজ করে থাকলেও স্বাধীন দায়িত্ব কখনও পায়নি কোনও ফিল্ম বা টিভি সিরিয়ালে। ঋষভদার এই অফার তো তার কাছে প্রায় আলাদিনের প্রদীপ হাতে পাওয়া।

আসলে ক্যামেরাই তার ধ্যানজ্ঞান, স্বপ্ন। গোল লেন্সটার ভেতর দিয়ে পৃথিবীটাকে দেখাই তার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে এখন। এ দেখার শুরু অবশ্য তার সেই শৈশব থেকেই। তার দাদার একটি পুরনো, ঘষা-কাচের ক্যামেরা ছিল যার লেন্সে চোখ রাখলে তার একটু অন্যরকম লাগত চারপাশের দৃশ্যাবলি।

হয়তো তখন তার সেই দাদা টোকিও বেঁচে ছিল না বলেই।

রোমিওর চেয়েও প্রায় সতেরো বছরের বড় টোকিও একসময় কলেজের চত্বরে জঙ্গি-জঙ্গি মুখ করে আন্দোলনের পতাকা উড়িয়েছে, সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে যে-বিপ্লবী-আন্দোলন এ-রাজ্যে হাড় কাঁপিয়ে দিয়েছিল বঙ্গবাসীর। পতাকা অবশ্য বেশি দিন ওড়ানো হয়নি তার। টোকিওর লাশ কিছুদিন পর উত্তর কলকাতার এক খালে বুলেট-জর্জরিত অবস্থায় ভেসে থাকতে দেখা যায়। সেকথা বলতে গিয়ে তার মা কেঁদে ফেলতেন, আর বাবার মুখ ব্ল্যাক-আউট হয়ে যেত মুহূর্তে। রোমিও বড় হয়ে বহুদিন তার বুকের ভেতর সযত্নে, সক্রোধে বয়ে বেড়িয়েছে সেই চাপ-চাপ অন্ধকার। সে-কথা মনের ভেতর ঢালা-উপুড় হলে এখনও আক্রোশে তার ফ্রেঞ্চকাট, ফর্সা মুখ লাল হয়ে ওঠে, কিন্তু ভেবে পায় না কীভাবে সেই ক্রোধের উপশম করা যায়।

দাদাকে কখনও দেখেনি রোমিও, কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া তার ক্যামেরাটার ভেতর দিয়ে দেখতে শুরু করেছিল পৃথিবীর রূপ, রং, দৃশ্যপট। একটু বড় হতে বুঝেছিল, ক্যামেরাটার লেন্স ঘষা, তার ভেতর দিয়ে ভারি বিবর্ণ দেখায় ছবিগুলো। কিন্তু ক্যামেরার নেশা তার ভেতরে তখন চারিয়ে গেছে বলে আর একটা নতুন ক্যামেরা কিনতে হয়েছিল তাকে। আর তখনই অনুভব করেছিল, সাদা চোখে পৃথিবীকে যেরকম দেখতে পায় সে, তার চেয়ে ঢের সুন্দর তার ক্যামেরায় দেখা পৃথিবী।

যেমন, এই তো কাল দুপুরেই, যে-ইয়াং কাপ্‌লটি তাদের সহযাত্রী হয়ে আসছিল অমৃতসর মেলে, জংশন স্টেশনে নেমে তাদের যৌথ চা-খাওয়ার তৃপ্ত মুহূর্তটিতে সে হঠাৎই একটা স্ন্যাপ নিয়েছিল যুবতীটির। নেগেটিভটা কাল রাতে ওয়াশ করার পর বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে

সে খুশি হল যে, তার ক্যামেরার চোখ মেয়েটির বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার ওপর একটা অন্য সৌন্দর্য আরোপ করেছে। ছবিটা ডেভেলপ করে আজ ভোরেই গার্গী চৌধুরি নামের সেই যুবতীর হাতে দিতেই কী যে খুশি হল সে!

নিজের ছবি দেখতে ভালবাসে না এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই। তার ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে ঘুরতে শুরু করার প্রথম দিন থেকেই এটা তার অন্যতম উপলব্ধি। তেমনই এটাও জেনেছে, ক্যামেরার চোখ দিয়ে পৃথিবীর সব সৌন্দর্যকেই করে তোলা যায় আর একটু কাব্যময়, আরও একটু নান্দনিক। রেল স্টেশনের ভিড়ভিড়াক্কার প্ল্যাটফর্মের পটভূমিকায় গার্গী চৌধুরির মাটির খুরিতে চা-খাওযার মুহূর্তটি সেরকমই এক অপার্থিব সৌন্দর্য রচনা করেছিল তার ক্যামেরার লেন্সে।

ঋষভ মুখার্জির মতো এক প্রবীণ পরিচালকের কাছ থেকে ফোন পাওয়ার পর দুদিন সে প্রায় না-ঘুম, উত্তেজিত, রোমাঞ্চিত। অনেকদিন বানপ্রস্থে থাকার পর হঠাৎ ঋষভ মুখার্জি সিনেমা না তৈরি করে কেন সিরিয়ালে ঝুঁকলেন সেটা তার কাছে কিছুটা বিস্ময়ের। অবশ্য বেশ কিছুদিন সিনেমালাইনে ঘোরাঘুরি করে সে এটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছে, এখন একটা ফিচারফিল্ম তৈরি করতে এত-এত অর্থব্যয় করতে হয় যে, রিটার্ন পাওয়া খুবই অনিশ্চিত। তার চেয়ে দূরদর্শনের জন্য সিরিয়াল তৈরি ঢের কম ঝুঁকির। ফিল্ম বা সিরিয়াল যাই হোক, একজন তরুণ ক্যামেরাম্যানের কাছে এহেন দুর্দান্ত একটি সুযোগ তার কেরিয়ার তৈরির প্রেক্ষাপটে নিঃসন্দেহে এক মাইলস্টোন।

সেই প্রবল উল্লাস সে টায়টায় বহন করেছে পরশু সন্ধেয় হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বড় ঘড়িটার নীচে জমায়েত হওয়া থেকে শুরু করে কাল 'হোটেল ইন'-এ ইন করা পর্যন্ত। সারাক্ষণ আনন্দে, উচ্ছ্বাসে ফুরফুর করে আড্ডা মেরেছে তার আরও আরও সহকর্মীর সঙ্গে। কাঁধের ক্যামেরাটা চোখে তুলে সারাক্ষণ ধরে রেখেছে চলমান ট্রেনের এক ছন্দোময় গতি, তার যাত্রীদের রকমারকম ভঙ্গি, ট্রেন থিতু হয়ে প্ল্যাটফর্মে দুদণ্ড দাঁড়াতেই ব্যস্তসমস্ত হকার আর রুদ্ধশ্বাস যাত্রীদের নানান ধাঁচের কোলাজ। তারই মধ্যে তুলে রেখেছে এক-একটি চমৎকার মুখ, লাল জামা পরিহিত পরিশ্রান্ত কুলি থেকে গার্গী চৌধুরিও।

কিন্তু গোটা ছন্দটা হঠাৎ প্রবলভাবে ঝাঁকুনি খেয়ে গেছে 'হোটেল-ইন'-এ পৌঁছবার অব্যবহিত পরেই, কলকাতা থেকে একটা বিটকেল ফোন আসায়। গোটা ট্রেনজার্নির পথ যে আত্মবিশ্বাস আর সৃজনশীলতায় ভরপুর হয়ে এসেছিলেন ঋষভদা, হঠাৎই একটা কয়েক লাইনের সংবাদ সহসা যেন তাঁকে প্রবলভাবে আছড়ে ফেলল মাটিতে।

এ পর্যন্ত যতটুকু শুনেছে রোমিও, ডঃ সুস্নাত তালুকদার ঋষভদার প্রাণের বন্ধু। এলাকায় তিনি একজন ভাল ডাক্তার ছিলেন শুধু তাই নয়, চৌখশ দাবাড়ু হিসেবেও তাঁর একটা অলিখিত খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল পরিচিত মহলে, বন্ধু-বান্ধবদের ভেতর। রোজই নিয়ম করে বেলা দশটার মধ্যে রোগীটোগি দেখা শেষ করে অন্তত ঘণ্টা দু-আড়াই কোনও না কোনও বন্ধুর সঙ্গে দাবা না খেললে ব্যাঘাত ঘটত তাঁর দিবানিদ্রায়।

মাঝেমধ্যে এমনও হত, একটু বেলার দিকে সিরিয়াস রোগীদের বাড়ি থেকে কল এলেও গজ কিংবা বোড়ে এগিয়ে দিতে দিতে বলতেন, 'খুব ব্যস্ত আছি, বিকেলের আগে যেতে পারব না', কিংবা আরও পীড়াপীড়ি করলে বলতেন, 'হাসপাতালে নিয়ে যাও, সারাজীবন রোগী দেখতে দেখতে হেজে গেলাম, অ্যাঁ?'

বস্তুত গত দু-তিনবছর দাবার মায়াজালে নাকি এমনই আটকে গিয়েছিলেন যে, পশারও কমে আসছিল দ্রুত।

কিন্তু তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ ছিল না ডঃ সুস্নাত তালুকদারের, যেহেতু মানুষটা ছিলেন ব্যাচেলর, প্রায় চল্লিশ বছর ডাক্তারি করে তিনি এত টাকা উপার্জন করেছিলেন যে, তা খরচ করার লোকই ছিল না তাঁর সংসারে। ডাক্তার নিজেও ছিলেন নিরামিষাশী। দাবা আর সিগারেট ছাড়া অন্য কোনও নেশাও তাঁর ছিল না যে, তার পেছনে টাকা ওড়াবেন। কু-লোকে অবশ্য বলে, শেষ দিকে মেয়েমানুষ-সংক্রান্ত কিছু বদভ্যাস নাকি রপ্ত করেছিলেন, কিন্তু তার ডিটেলস উহ্য রাখতেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মারার সময়েও।

যাই হোক, এহেন ডাক্তার-বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ঋষভ মুখার্জি যেভাবে ভেঙে পড়েছেন, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সমস্ত জিনিসপত্র প্যাক-আপ করে গোটা টিম নিয়ে কলকাতা ফিরে যাওয়ার, তাতে অন্য আরও অনেকে মতো রোমিও-ও স্তব্ধ। একটা দারুণ ব্রেক পাওয়ার মুহূর্তে যতটাই টগবগ করে ফুটছিল সুখস্বপ্নে, উল্লাসে, উৎসাহে, কাল রাত থেকে ততটাই মুষড়ে পড়েছে ভীষণ। সারা দিন কারও সঙ্গে ভাল করে কথাই হয়নি, যেহেতু প্রায় সব্বাই বোবা হয়ে আছে তখন থেকে। একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় বর্ণনা, সে যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিমায় শরীর দুলিয়ে, লং স্কার্টের ফ্রিল বা শালোয়ার-কামিজের রঙিন ওড়না উড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে গোটা হোটেল। আজ সকালেও দেখেছে প্রোডাকশন ম্যানেজার রানাজি স্যান্যালের সঙ্গে লনের কোণে সবুজ ছাতাটার নীচে বসে চুটিয়ে আড্ডা মারছে।

আর রানাজি সান্যালকেও বলিহারি। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, এখনও তাঁর অর্ধেকের চেয়েও কমবয়সী একটি মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে ইয়ার্কি করছেন, হাসাহাসি করছেন যে, ঘটনাটা যে-কারওরই বেশ দৃষ্টিকটু ঠেকবে। তবে রোমিও এও ভেবেছে, রানাজি সান্যালের আর কী দোষ, মেয়েটা আসলে অতিরিক্ত গায়ে-পড়া। সে যদি তার দ্বিগুণ বয়সী একজন লোকের সঙ্গে মাখামাখি করতে চায় তো রানাজি সান্যাল সে সুযোগ ছাড়বেনই বা কেন!

বর্ণনার ব্যাপারস্যাপার দেখে সে পরশু ট্রেনে ওঠার সময় থেকেই খুব বিভ্রান্ত। হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ির নীচেই তার সঙ্গে প্রথম আলাপ বর্ণনার। সাতটা কুড়ির অমৃতসর মেল ধরার জন্য ঋষভদার কথামতো 'সাড়ে ছটার আগেই বড় ঘড়ির নীচে দাঁড়াবে' এই নির্দেশ মেনে ছটা দশেই সে এসে হাজির হয়েছিল। এসে দেখেছিল, সে একাই পৌঁছেছে তখনও পর্যন্ত, বাকি কারওরই পাত্তা নেই। একটা সিগারেট ধরিয়ে কোনও চেয়ারে নিজেকে ন্যস্ত করবে কি না এমন যখন প্ল্যান করছিল, ঠিক সে সময় একটি তরুণী, জিনসের টাইট প্যান্ট আর ঢোলা জামা পরে হাতে-কাঁধে ব্যাগ বাক্স ঝুলিয়ে সেখানে হাজির। রোমিও তার চেনা নয়, চেনার কথাও নয়, তবু কী এক টেলিপ্যাথির টানেই বোধহয় শরীর ঝাঁকিয়ে মেয়েটি তাকে বলে উঠল, আপনিও কি সিনেমুভির টিমের?

রোমিও বিস্মিত হয়ে জবাব দিয়েছিল, হ্যাঁ। আপনিও!

—হ্যাঁ, তবে আর আপনি নয়, দুজনেই যখন একই পথের পথিক, তখন 'তুমি' বললেই আবহাওয়াটা একটু তরল থাকে। নইলে কেমন গুমোট-গুমোট লাগে। তাই — বলে আরও সহজ হয়ে মেয়েটি বলেছিল, আমি বর্ণনা সেনগুপ্ত, তুমি নিশ্চয়ই ক্যামেরাম্যান রোমিও দত্তগুপ্ত?

রোমিও একটু বিপর্যস্ত হয়ে বলল, তুমি আমাকে চিনলে কী করে?

বর্ণনা হাসল, ওর হাসিটা বেশ মিষ্টিই লাগল রোমিওর, বিশেষ করে ঠোঁট আর চিবুকের গড়নে এমন একটা শৈল্পিক টাচ আছে যে, তৎক্ষণাৎ ক্যামেরার ফ্রেমে মেয়েটাকে ধরতে ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু সে-ইচ্ছে দমন করতে হল, কেননা ভাল করে আলাপই হয়নি যে তরুণীর সঙ্গে, এখনই তাকে ফটো তোলার প্রস্তাব দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে না। বর্ণনা ততক্ষণে হাসি-হাসি মুখে বলছে, আঙ্কেলই তো আমাকে ড্রেসক্রিপশন দিয়ে দিলেন বেশ নিখুঁতভাবে। বললেন দেখবি চিবুকে ফ্রেঞ্চকাট, কাঁধে ক্যামেরা, আর চোখদুটোয় শুধু স্বপ্ন আর স্বপ্ন—

রোমিও প্রায় ফ্ল্যাট হওয়ার উপক্রম, নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, তা সিনেমুভির টিমে এত লোক থাকতে হঠাৎ ঋষভদা তোমাকে আমার ড্রেসক্রিপশন দিতে গেলেন কেন!

—বাহ্, এই সিরিয়ালে তো আর সবাই পুরনো আর্টিস্ট, শুধু আমি আর তুমি নতুন। আঙ্কেল বললেন, এই সিরিয়ালে তোদের দুজনের ড্যেবু হচ্ছে—

—ড্যেবু!

—ড্যেবু বুঝলে না! প্রথম অ্যাপিয়ারেন্সকেই তো ড্যেবু বলে। তোমার ড্যেবু ক্যামেরায়, আর আমার অভিনয়ে।

'ড্যেবু' ব্যাপারটা জানতই রোমিও, বর্ণনার মুখে তার ব্যাখ্যানা শুনে যেমন শিহরন হচ্ছিল তার মনে, তেমন এও মনে হচ্ছিল ড্যেবু শব্দটা সে এর আগে নিজের সম্পর্কে ভাবতে পারেনি ঠিক। রোমিওকে অবাক করে বর্ণনা আরও বলেছিল দুই ড্যেবু কিন্তু এরপর জোড় বাঁধতে পারে। র‍্যাদার আই উড বি গ্ল্যাড—

সদ্য-পরিচিত হওয়া একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে এভাবে ঝোড়ো ঘূর্ণির মতো সংলাপ বিনিময় রোমিওর জীবনে এক লাল অক্ষরের অভিজ্ঞতা। সে অবশ্য আগে জানতও না যে এই মেয়েটি অভিনেত্রী, বস্তুত এ-ব্যাপারে তার কোনও কথাই হয়নি ঋষভ মুখার্জির সঙ্গে। সিরিয়ালের গল্পটা অবশ্য তিনি মুখে-মুখে সংক্ষেপে কিছুটা শুনিয়েছিলেন রোমিওকে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত গোটা ছবির চেহারা পরিষ্কার হয়নি রোমিওর মগজে। লখনউয়ের বাইজিদের নিয়ে যে গল্পটা সংগ্রহ করেছেন ঋষভদা, তার মধ্যে অভিনবত্ব আছে বটে, কিন্তু তার চিত্রনাট্য সে এখনও দেখেনি। ছায়াছবির জগতে চিত্রনাট্যের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দৃশ্যের পর দৃশ্যের সংস্থাপন, তার সংলাপ, সংলাপের ভেতর দিয়েই ফুটে উঠবে এক-একটি চরিত্র। আস্তে আস্তে গল্পটা এগোবে তার পরিণতির দিকে। সেইসঙ্গে প্রতিটি দৃশ্যে ক্যামেরার অবস্থানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ক্যামেরা কীভাবে রোল করে এগোবে অথবা পিছোবে, কখন লংশটে দৃশ্যগ্রহণ করা হবে, কখন নেওয়া হবে ক্লোজ-আপ, এ সবই বুঝে নিতে হবে চিত্রনাট্য থেকে।

তবে যেহেতু এটা দূরদর্শনের সিরিয়াল, বেশিরভাগই শট ক্লোজ-আপে নিতে হয়। ছোটপর্দায় লংশট প্রায় বাতিল।

ট্রেনে আসতে আসতে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবনাটা ভেবে রেখেছিল রোমিও, সেই ছক অনুযায়ী আজ সকালে ঋষভদার সঙ্গে তার বেরুনোর কথা লখনউয়ের পুরনো বাইজি পাড়ায়। ঘুরে ঘুরে লোকেশন বাছবে, যাতে সারা দুপুর ধরে দুজনে বসে কীভাবে শটগুলো নেওয়া হবে, কোনটার পর কোনটা কতগুলো শট তারা একদিনে নিতে পারবে, সেসব সিদ্ধান্ত নেবে একে-একে। বাকিদের সঙ্গে খুঁটিনাটি আলোচনা করে ধার্য করবে শুটিংয়ের দিনক্ষণ। হাতে সময়ও বেশি নেই তাদের, কারণ এত বড় একটা টিম নিয়ে কলকাতা থেকে এত দূরে শুটিং করতে আসা মানে প্রতিদিনই বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ। তবে ঋষভদা এ-ও বলেছিলেন, শুধুমাত্র

আউটডোরের শুটিংটাই লখনউতে হবে, সেইসঙ্গে এখানকার অভিজাত বাইজিপাড়ার একটা চেহারাও বিভিন্ন শটে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে কলকাতায়। বাকি ইনডোর শুটিং হবে কলকাতার স্টুডিওতে।

ঋষভদা বহুদিনের পুরনো পরিচালক, মাঝে ছবি করা ছেড়ে দিলেও এখনও তাঁর ধ্যানধারণার পুরনো স্পার্কগুলোও যেমন ফিরে আসছে তাঁর ভাবনাচিন্তায়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বয়সের অভিজ্ঞতা, ম্যাচিওরিটি।

কয়েকদিনের টুকরো-টুকরো আলোচনাতেই ঋষভদা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বাংলা ছায়াছবি কিংবা সিরিয়ালের ক্লিশে বিষয়গুলো থেকে সরে এসে এবার একটা দারুণ চমক দিতে চান সিনেমারসিক মহলে। রোমিওর সঙ্গে তাঁর মাত্র দু-তিন বছরের আলাপ হলেও তার ফটোগ্রাফির হাত এতই পছন্দ হয়েছে ঋষভদার। বিশেষ করে তার ভেতরে যে-একটা কাব্যিক চেতনা আছে যা দিয়ে সে যে-কোনও দৃশ্যকেই ক্লাসিক পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে, আরোপ করতে পারে একটা অন্য মাত্রা, তা দেখেই ঋষভদার তাকে এই মহান দায়িত্বের কাজে নির্বাচন।

কিন্তু সেই সমস্ত সুখস্বপ্ন আপাতত ভেঙেচুরে তছনছ। ক'দিন ধরে সে যে পইপই করে ভাবনা-চিন্তা করেছিল, কীভাবে লখনউয়ের দৃশ্যপট তার ক্যামেরার চোখে ধরে রাখবে পুরনো যুগের এক অনন্য শৈল্পিক নিদর্শন হিসেবে, কীভাবে স্বপ্নের রঙে সেলুলয়েডের পৃষ্ঠায় ধরে রাখবে অভিজাত বাইজি পাড়ার ঘরবাড়ি, জীবনযাপন, এ সব এলাকার কোনও বিশেষ চরিত্র, এমনকি বাড়িউলি মাসি থেকে পানদোকানি পর্যন্ত, কিংবা ঘরের ঝাড়লণ্ঠন পিলসুজ থেকে ঘুঙুরের গড়ন, অথবা উঁচু-উঁচু অট্টালিকার কারুকাজময় জাফরির ভেতর রকমারকম পায়রা। ঠিক যেভাবে একজন লেখকের কলমে প্রাণ পেয়ে ওঠে এক-একটি মহল্লা, নড়ে-চড়ে ওঠে চরিত্ররা, ক্যামেরাম্যানের চোখদুটিও তেমনই কলমের মতো। ক্যামেরাম্যানও তেমনই নিখুঁতভাবে ভরিয়ে তুলতে থাকবে তার সেলুলয়েডের পৃষ্ঠাগুলি। কিন্তু সে সবই এখন স্রেফ স্বপ্নই।

বোধহয় বহুক্ষণ নিজের ভেতর এভাবে ঢালা-উপুড় হচ্ছিল রোমিও। একা-একা এই ছন্ন-দুপুরে কীই বা আর করতে পারে! মনে মনে তৈরিও হচ্ছিল কখন তাদের ব্যবস্থাপক এসে গ্রিন-সিগন্যাল, না গ্রিন তো নয়, রেড-সিগন্যাল দিয়ে বলবেন, রিটার্ন টিকিট প্রস্তুত, গুছিয়ে নিন ব্যাগ-বাক্স, ঠিক সেসময় রানাজি সান্যালকে একঝলক দেখতে পেল ডাইনিং হলের কাছে। খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছে রানাজিকে। সেই সকালে তাঁকে দেখেছিল বর্ণনার সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা মারতে, তারপর কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গিয়ে ছিলেন কে যেন বলল বর্ণনাকে নিয়েই বেরিয়েছিলেন লখনউ শহর দেখতে, তারপর এখন হঠাৎ এমন বাতি-নেভা অন্ধকার কেন তার চোখে মুখে, বুঝে উঠতে পারল না রোমিও। কী মনে হতে হঠাৎ ডাকল তাঁকে, কী সান্যালদা, কখন ফেরা হচ্ছে?

পঞ্চাশ পেরিয়েও রানাজি সান্যাল এখনও প্রায় যুবকের মতো। চেহারায়, চাউনিতে, কথাবার্তায়, তাঁর ক্লিন-শেভড গালে একটা চমৎকার সবুজ ছাপ যা তাঁকে ঢের আকর্ষক করে রেখেছে তরুণীদের চোখে, বললেন, বস এখনও কিছু বলেননি দিনক্ষণ।

—ও, রোমিও মুখটা করুণ করল, তাহলে সত্যিই বন্ধ হয়ে গেল কাজটা!

রানাজি মুখটা নিচু করলেন, তা ছাড়া কোনও উপায় নেই তো—

—কেন! সবাই মিলে ভাল করে বোঝান না ঋষভদাকে। না হয় দু-একদিন ওভারস্টে করি আমরা। সব শোকই তো মানুষ ভুলে যায় একদিন।

রানাজি হাসলেন, তা হয়তো যায়। কিন্তু এখানে শোকটাই শুধু ফ্যাক্টর নয়। এখন শুনলাম, সেই ডাক্তার ভদ্রলোকই তো সিরিয়ালটার একজন বড় ফিন্যান্সার। ডাক্তারের তো প্রচুর টাকা ছিল। সারাজীবন ধরে সঞ্চয় করেছেন, খাওয়ার লোক নেই, তা ঋষভদা বহুদিন পয়সার অভাবে ছবি করতে পারছেন না শুনে একদিন দাবা খেলতে খেলতে বলেছিলেন, ঠিক আছে, আবার আরম্ভ করো ঋষি, কিছুটা আমি বিয়ার করি।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ, দশ লাখ মতো দেবেন এমন আশ্বাস দিয়েছিলেন। লখনউ আসার দিন সকালে দু-লাখ দিয়ে বলেছিলেন, আউটডোরটা সেরে এসো, তারপর কলকাতা এলে আস্তে আস্তে বাকিটা—

—তা হঠাৎ তিনি সুইসাইড করতে গেলেন কেন!

—সেইটেই তো সবচেয়ে আশ্চর্য করেছে ঋষভদাকে। বললেন, সকাল এগারোটা পর্যন্ত যে লোকটা হাসি-আড্ডায় ব্যস্ত থাকল, সে হঠাৎ দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সুইসাইড করবে তা ভাবতেই পারছেন না উনি। যদি ট্রেন ছাড়ার আগেও খবরটা পেতেন, তাহলে ট্যুরটাই ক্যান্সেল করতেন।

—কী হবে এখন, সান্যালদা?

—দেখি, সন্ধের পর একটা মিটিং ডেকে দিয়েছি লাউঞ্জে। ঋষভদাকেও আসতে বলেছি। সবাই আলোচনা করে ফাইনাল ডিসিশন নিতে হবে। এদিকে হিরো তো বলছেন, তাঁর পুরো পেমেন্ট দিয়ে দিতে হবে, কারণ কলকাতায় তাঁর সমস্ত শুটিং ক্যান্সেল করে এখানে এসেছেন—

—তা তো চাইতেই পারেন। শুধু হিরো কেন, আরও অনেকেই চাইবেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে পড়লেন রানাজি, দেখা যাক, সন্ধের মিটিঙে কী হয়। ফিন্যান্সারই যদি মারা গিয়ে থাকে, তখন কি আর ছবি করা যাবে!

রানাজি সান্যাল খুবই চিন্তিত মুখে ওপেন-এয়ার লাউঞ্জ ছেড়ে চলে যেতেই আবার একরাশ বিমর্ষতার গভীরে ডুবে যেতে চাইল রোমিও। একটা বড় দীর্ঘশ্বাস তারও বুক থেকে মুচড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, কিন্তু থেমে গেল মাঝপথে, সামনে হাসি-হাসি মুখে বর্ণনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই। তার পরনে বেশ জমকালো ঘাঘরা-চোলি। একেবারে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেওয়ার মতো সাজ। হয়তো এক্ষুনি কিনে নিয়ে এল। ধুপ করে রোমিওর সামনের চেয়ারে বসে পড়ে বলল, দেখে এলাম বাইজিপাড়া। অভিনয়ের চান্স তো আর পাওয়া গেল না, কলকাতা ফেরার আগে জায়গাটা অন্তত একবার চোখের দেখা—

রোমিও সহসা আরও গম্ভীর হয়ে গেল। নিশ্চয় রানাজিই তাকে কিনে দিয়েছেন ঘাঘরা-চোলিটা।

তাকে অমন নিশ্চুপ, অভিমানে চুবচুব দেখে বর্ণনা আরও মিষ্টি করে হাসল, রাগ হয়েছে, মিস্টার!

দাঁতে দাঁত চেপে রোমিও বাইরে নীল আকাশের বুকে সঞ্চারমান সাদা মেঘের ভেলা দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বর্ণনা চট করে রোমিওর একটা হাত তুলে নিল তার নরম দু'হাতের ভেতর, আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, কী ছেলেমানুষ তুমি, হ্যাঁ! তোমার জন্য একটা উপহার কিনতেই তো বেরিয়েছিলাম—

রোমিও ভুরু কুঁচকে তাকাল বর্ণনার দিকে, তার দুচোখে যেন লখনউয়ের বাইজিদের

ঠারঠমক। তখনও কোনও কথা বলল না।

—ইস, কী রাগ দ্যাখো। উপহারের কথা বললাম, তাতেও খুশি হলেন না উনি। গ্রিক নাটকে পড়নি, উপহার পেলে স্বয়ং ঈশ্বরও খুশি হন।

তাতেও রোমিওর ভাবলেশহীন, নৈর্ব্যক্তিক মুখ দেখে যেন রাগ করেই উঠে পড়ল বর্ণনা. চলে যেতে গিয়েও সহসা দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর একবার আমার রুমে আসবে? তোমাকে এমন একটা উপহার দেব, যা তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না।



হোটেলের মস্ত লাউঞ্জটা প্রায় সারাদিনই ফাঁকা থাকে, সন্ধের পর তো আরও। দূরপাল্লার ট্রেনগুলো লখনউ স্টেশনে ইন করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু নতুন ট্যুরিস্ট আসে এখানে। লাউঞ্জে দু-চার মিনিট বসতে না বসতেই রিসেপশনের সদা হাস্যময়ী, সুশ্রী, স্মার্ট তরুণ-তরুণীরা তাদের নাম ঠিকানা, কোথা থেকে আসছেন, কোথায় যাবেন ইত্যাদি রুটিন তথ্যাবলি হোটেল-রেজিস্টারে লিখিয়ে নেওয়ার পর বেয়ারার হাতে সুদৃশ্য চাবির রিং ধরিয়ে দিয়ে খুশিয়াল মুখে জানিয়ে দেয় ঘর তৈরি।

এ. সি. কিংবা নন-এ. সি, ডাবল কিংবা সিঙ্গল যাই হোক না কেন, রুমগুলোয় হাজার আরামের উপকরণে ভর্তি। প্রতিটি স্যুটেই টেলিফোন-টি. ভি. থেকে টেপ রেকর্ডার ও গুচ্ছের হিন্দি ইংরেজি ক্যাসেট। আলমারির র‍্যাকে ক্ল্যাসিক ও থ্রিলারের সহাবস্থান, সেইসঙ্গে মাখন-নরম গদিঅলা প্রশস্ত বিছানা, সোফা ও সেন্টারটেবিল। রুমের এককোণে লেখাপড়ার চেয়ারটেবিলও—যাতে ঘর ছেড়ে বোর্ডারদের লাউঞ্জে গিয়ে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন হয় না।

সেই সাধারণত-ফাঁকা লাউঞ্জের এককোণে মিটিং করার একটা স্পেসও আছে যেখানে এই মুহূর্তে 'সিনেমুভি'র কুশীলবদের ভিড়ে ভরভরন্ত। খুবই নিচুস্বরে, প্রায় শোকসভা পালন করার আবহে আলোচনা চলছে বহুক্ষণ। দু-একজন ভুলে গিয়ে হঠাৎ কণ্ঠস্বর উচ্চকিত করে ফেললে বাকিরা তিরস্কারের চোখে তাকাচ্ছে তার দিকে, যেন আলোচনা বেশি উচ্চগ্রামে উঠে গেলে ভেস্তে যাবে এখনও অনারব্ধ কাজ। ঋষভ মুখার্জি এক কোণে বসে আছেন বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত চেহারায়। সাদা চুলগুলোর ভেতর অন্যমনস্কভাবে আঙুল চালাতে চালাতে মাঝেমধ্যে চেপে ধরছেন এক রাশ চুল। কথা প্রায় বলছেনই না, যা বলার বলছেন প্রোডাকশন ম্যানেজার রানাজি সান্যাল, আর সাধারণত গম্ভীর থাকা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর শাম্ব সামন্ত।

রোমিও দত্তগুপ্তও যে মাঝে মধ্যে দু-চারটে কথা বলছিল, তা লনের ঘন অন্ধকারে একটা

চেয়ারে গা এলিয়ে বসে নজর করে দেখছিল গার্গী। মাত্র দু'দিন আগেও 'সিনেমুভি'র এই টিমটার একজন কুশীলবকেও চোখে দেখেনি সে। বিবস্বান বসু বা রুমেলা রায়ের মতো খ্যাতনামা দুই অভিনেতা-অভিনেত্রীকে সিনেমায় কিংবা টি. ভি-র পর্দায় দু-চারবার দেখা ছাড়া ছায়াছবির এই জগৎটা সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না তার। অথচ মাত্র দু-আড়াইটে দিন একই ছাদের নীচে পাশাপাশি থাকার সুবাদে হঠাৎই এই রুপোলি রাংতায় মোড়া পৃথিবীটা আপাতত তার অপার কৌতূহলের লক্ষ্যবস্তু।

অবশ্য কৌতূহল তার মাত্রা ছাড়াত না, যদি না এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় হঠাৎ জড়িয়ে পড়ে গোটা 'সিনেমুভি'র টিমটাই না পিনফোটা বেলুনের মতো এ-ভাবে চুপসে প্রাণহীন, নিস্পন্দ হয়ে যেত। এরা সবাই জানে, ডঃ সুস্নাত তালুকদার আত্মহত্যা করেছেন। যদি জানত, অতবড় একজন ডাক্তার প্রকাণ্ড প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হয়ে গেছেন, তাহলে প্রতিক্রিয়াটা কী হত কে জানে! ইতিমধ্যে, খুবই আচমকা তার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে ক্যামেরাম্যান রোমিও দত্তগুপ্তের। না-হলে আর সব মুখগুলো তার মুখচেনা হয়ে গেলেও এখনও অপরিচিত। বেচারি রোমিও এতই হতাশ হয়ে পড়েছে যে, তার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তার গত দু'দিনের আত্মজীবনী শুনে বেশ দুঃখবোধ করছে গার্গী।

সায়ন অবশ্য তার এই অনাবশ্যক কৌতূহলকে আমল দিচ্ছে না কিছুতেই। একটু আগেই তাকে মৃদু ধমক দিয়ে বলেছে, ছাড়ো তো ওইসব আজেবাজে ভাবনা। রুপোলি জগতের ব্যাপার-স্যাপারই এরকম। ওদের জগতে কোনও কিছুই স্বাভাবিক নয়। নইলে সবে নতুন একটা মেয়ে অভিনয় করতে এসেছে, তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে কী নির্লজ্জভাবে! মেয়েটাই বা কী, বলো!

গার্গী সায়নের কথায় ঠিকঠাক সায় দিয়ে উঠতে পারেনি। দু'দিন ধরে তার অনুসন্ধিৎসু স্বভাব তীক্ষ্ণচোখে লক্ষ করে চলেছে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মানুষের ভাবভঙ্গি, চালচলন, কথাবার্তা। তাদের হতাশা, ক্ষোভ, টানাপোড়েনের মধ্যে কখন যেন শামিল হয়ে পড়েছে সেও। হয়তো রোমিওর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরই তার এ হেন কৌতূহল বেড়েছে। যুবকটি হঠাৎই তার ফটো তুলে চমকে দিয়েছে বলেই সে আরও ফুল্ল, রোমাঞ্চিত। কিন্তু আসলে যে-ঘটনাটা তাকে প্রভাবিত করেছে তা হল, সুদূর কলকাতায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা কীভাবে তোলপাড় করছে লখনউতে শুটিং করতে আসা একটি চলচ্চিত্র শিল্পের টিমকে।

মার্কেটিং সেরে ফেরার পর ডাইনিঙে কফি আর ওমলেটের অর্ডার দিয়ে এসেছে সায়ন। ততক্ষণে সন্ধে অতিক্রান্ত, আলোয় ঝলমল করছে হোটেলটা, শুধু অদ্ভুত আলো-আঁধারি হয়ে আছে লনের ওদিকটা। লনের চেয়ারে নিজেদের ন্যস্ত করার পর সায়ন ততক্ষণে ব্যস্ত হতে চাইছে লখনউয়ের বাকি দু'দিন কীভাবে ঘোরাঘুরি করা যায় তারই ছক কষতে। সায়ন যখন তার অফিস, ফ্যাক্টরির জটিল ঘেরাটোপের বাইরে বেরিয়ে আসে, তখন সে এই পৃথিবীর প্রায় অলিখিত রাজা। কীভাবে ছুটির দিনগুলো সবচেয়ে ভালভাবে, সুপরিকল্পিত রুটিন অনুযায়ী উপভোগ করা যায় সেটাই বোঝাতে চাইছিল গার্গীকে। একটা ঐতিহাসিক শহরে এসে ইতিহাসকে খুঁজে বার করাও যেমন তার ইচ্ছে, তেমনই এই শহরের আধুনিকতাও তাকে টানে। এই যেমন একটু আগেই চকবাজার থেকে অমিনাবাদের বিভিন্ন শো-রুমে ঘুরে বেড়িয়েছে গার্গীকে নিয়ে। যে লখনউয়ের চিকন প্রায় জগদ্বিখ্যাত, তারই নমুনা হিসেবে গার্গীর জন্য গোটা দুই চিকনশাড়ি, দুটো চুড়িদার, আর নিজের জন্যও দুটো চিকনের কাজ করা পাঞ্জাবি কিনেছে, অবশ্যই প্রচুর বাছাবাছির পর। কিন্তু কেনাকাটির বিল দেখে গার্গীর চক্ষু চড়কগাছে, মৃদু আপত্তি

জানিয়ে বলেছিল, কী দরকার এত দাম দিয়ে দু'দুটো চুড়িদার কেনার! আমাকে কি এসব মানায়!

সায়নের কিন্তু তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, তুমি তো এখন কেবল হাউস-ওয়াইফ নও। রীতিমতো প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সায়নের তিলতিল করে তৈরি করা সোপ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি 'প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্'-এর ভবিষ্যৎ যে এখন সায়নের সঙ্গে গার্গীর কাঁধেও বর্তেছে, সে-কথা সায়ন তাকে মাঝেমধ্যেই মনে করিয়ে দিতে ভোলে না। হেসে গার্গী বলল, তা-হলে তো আমার আরও আপত্তি। অত বড় একটা কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর তো আর চুড়িদার পরে অফিস করতে পারে না।

সায়ন হেসে উঠে বলল, তাতে আপত্তি কীসের। এটাই তো এখন বাঙালি মেয়েদের ন্যাশনাল ড্রেস। যাই হোক অন্তত হিমালয়ের পাকদণ্ডি বেয়ে ট্রেক করার জন্যও তো চুড়িদার খুব এফেক্টিভ।

বোঝাই যাচ্ছে সায়ন কলকাতা থেকে বাইরে বেরিয়ে বেশ খোসমেজাজে আছে। সারাক্ষণ কোন্ দিন কোথায় ঘুরবে, কোথায় ইউ. পি ট্যুরিজমের ভাল ভাল লজ্ আর রেস্টশেড আছে, তার খবরাখবর নিচ্ছে এখান-ওখান থেকে। কাল সকালে উঠে একটা ট্যাক্সি নিয়ে লখনউ থেকে ঘণ্টা আড়াই তিনের জার্নি অযোধ্যা অথবা শ্রাবস্তী, কোথায় যাওয়া যায় তা নিয়েও কফিতে চুমুক দিতে দিতে মহড়া দিল কিছুক্ষণ।

কথা বলতে বলতে গার্গীর নজর কিন্তু ঘুরেফিরে হোটেলের লাউঞ্জের দিকেই আছড়ে পড়ছিল। 'সিনেমুভি'র মিটিঙে ওদের অনেককেই দেখতে পাচ্ছে সে, কেবল নায়ক বিবস্বান বসুকেই অনুপস্থিতির তালিকায় ফেলা যায়। শুটিং ক্যানসেল জেনে সকালে উঠেই নাকি একটা হায়ার্ড্ গাড়িতে কানপুর গিয়েছিলেন, ফিরেছেন দুপুরের পর। ওখানে ওঁর কে এক আত্মীয় আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসে হোটেলের রুমে ঢুকে রেস্ট নিচ্ছেন আপাতত। সিনেমুভির সিরিয়াল হল কি না হল তা নিয়ে ওঁর কোনও মাথাব্যথা নেই। থাকার কথাও নয় যেহেতু উনি নামী অভিনেতা, যে পারিশ্রমিকের চুক্তিতে কলকাতার শুটিং ক্যানসেল করে লখনউ এসেছেন, তা ওঁকে দিয়ে দিতে হবে চুলচেরা হিসেব করে। রুমেলা রায়ের বাজার অবশ্য এখন আগের মতো রমরমা নেই, বরং পড়তির মুখেই, সব খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রীরই একটা বয়সের পর যে পরিণতি হয়ে থাকে আর কি। তাই নামী অভিনেত্রী হওয়া সত্ত্বেও মিটিঙে গরহাজির থাকতে পারেননি।

লাউঞ্জের মিটিং তখনও শেষ হয়েছে কি হয়নি, গার্গীর নজরে পড়ল, বর্ণনা হঠাৎ সোফা থেকে উঠে দোতলার সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে। একটু যেন শ্লথ পদক্ষেপেই। বর্ণনার সাজগোজ সবসময়েই চোখে পড়ার মতো। এ-বেলা অবশ্য একটা ঝকমকে দামি শাড়ি পরেছে, তাতে তার চেহারাটা বেশ খোলতাই লাগছে দূর থেকে। হঠাৎ মিটিং থেকে উঠে বর্ণনা কোথায় চলল, তা ভেবে কী জানি কেন বেশ উদ্বিগ্ন বোধ করল গার্গী।

কিন্তু উদ্বেগ তার যত নয়, তার চেয়েও ঢের বেশি যে রুমেলা রায়ের তা একটু পরেই বোধগম্য হল তার। বর্ণনা উঠে যাওয়ার একটু পরেই রুমেলা রায়ও, বেশ একটু দ্রুত পায়েই, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন। সকাল থেকে এ-পর্যন্ত যতদূর খবর পেয়েছে গার্গী, তাতে ট্রেন থেকে নামার পর থেকে বিবস্বান বসুর সঙ্গে রুমেলা রায়ের একটা মৃদু কোল্ডওয়ার চলছেই এক নাগাড়ে। দু'জনের মধ্যে কথা তেমন হচ্ছেই না। অথচ গার্গী জেনেছে, বিবস্বান বসুর অনুরোধেই এ ছবিতে রুমেলা রায়ের অন্তর্ভুক্তি। এ সব লাইনে এরকমই হয়ে থাকে নাকি।

কফির কাপ শেষ হতেই গার্গী সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এবার রুমের দিকে গেলে হয়।

একটু রেস্ট নিই—

—রেস্ট! সায়ন অবাক হচ্ছিল, কারণ গার্গীরকে অফুরন্ত এনার্জি, লখনউয়ের চকবাজার আর আমিনাবাদের ক'টা শোরুমই বা তারা আর ঘুরেছে যে এখনই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। কাল থেকে দু'দুবার রেস্ট নেওয়ার কথা বলল সে।

শরতের শেষ, হেমন্তের দোরগোড়ায় পৌঁছে উত্তরপ্রদেশের কোথাও কোথাও হিম পড়লেও লখনউয়ে এখনও কিছুটা গুমোট। সায়নদের রুমটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হলেও লনে এমন একটা ফুরফুরে মিঠেন হাওয়া বইছে যে, এহেন চমৎকার আরাম ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না সায়নের। তবু গার্গীর ইচ্ছেকেই প্রাধান্য দিল এখন।

আসলে লনে বসেই গার্গী অনুভব করছিল, দোতলায় নিশ্চয়ই ঘোরতর একটা নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছে এতক্ষণে। সেটা কী পর্যায়ে পৌঁছুল, কোন ক্লাইম্যাক্সে তা একবার চাক্ষুষ করা দরকার। সে-জন্যেই লনের মায়াবী হাওয়া ছেড়ে দ্রুত উঠে এল ওপরে। লাউঞ্জে অবশ্য তখনও কথাবার্তা শেষ হয়নি। তবে যা মনে হল, ঋষভ মুখার্জি কিছুটা সহজ হয়ে কথাবার্তা বলছেন, মৃদুস্বরে। মিটিঙের আবহও তরল।

ওপরে উঠে দেখল, যা ভেবেছিল অনেকটা সে-রকমই ঘটছে নাটকটা। কিন্তু তার অনুমানের থেকে ঢের অন্যরকম। যে এ. সি. ডাবলবেডেড ঘরটায় বিবস্বান বসু আছেন, সেটি ভেতর থেকে লক করা। ভেতরে নারীকণ্ঠের খিলখিল হাসির আওআজ, ঠিক যে-রকমটি গার্গী শুনেছিল অমৃতসর মেলে তার পাশের ক্যুপেয়। তবে নারীকণ্ঠ এবারও রুমেলার নয়, কারণ রুমেলা তখন প্রায় বাঘিনীর মতো ঘোরাফেরা করছেন সেই ঘরটার সামনের করিডোরে। ভেতরে বর্ণনা।

গার্গীদের ঘরটা একেবারে কোণের দিকে। রুমেলার পাশ দিয়ে করিডোর পার হতে হতে সে অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখে নিল রুমেলা রায়ের রক্তের পারদ কতখানি উর্ধ্বমুখী। করিডোর জুড়ে ফ্লুরোসেন্টের জমেজমে আলোয় যেটুক দেখতে পেল, তাতে সেলুলয়েডের নায়িকার প্রসাধনে উপছে-পড়া মুখ আপাতত গনগনে লাল। একটুও অভিনয় নয়, সেন্টপার্সেন্টি জীবনমুখী নাটক।

সায়নের মতো অন্যমনস্ক, উদাসীন পুরুষও বোধহয় কিছু একটা অনুভব করে থাকবে। রুমের ভেতর ঢুকেই দরজা লক করে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল গার্গীর দিকে, এনিথিং রং!

রহস্যময়ীর মতো হাসল গার্গী, বলল, কিছু একটা রং লেগেছে নিশ্চয়ই। তবে সেটা ঈর্ষার সবুজ, না কি ক্রোধের লাল তা নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে কিছুক্ষণ।

সায়ন ধবধবে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল, সে নিয়ে তুমি গবেষণা করতে পার, কিন্তু আমি ওসবে নেই। আমি যে-বিষয়ে উৎসাহ বোধ করছি তা হল, হিমালয়ে জম্পেশ শীত পড়েছে, একটা কম্বল গায়ে দিয়েও নাকি শীত মানাচ্ছে না, লোকে হি হি করে কাঁপছে।

গার্গী অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল মেঝের ওপর। কী যেন ভাবছিল অন্যমনস্কভাবে, হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলল, দ্যাট গার্ল, বর্ণনা, ইজ ইররেজিস্টেব্‌ল।

সায়ন অবাক হয়ে বলল, মাই গড। তুমি কি ওদের কথা ভেবে এখনও সময় নষ্ট করছ? বর্ণনাকে নিয়ে আমি মাথা ঘামালেও তবু না হয় কথা ছিল, কিন্তু তুমি তাকে নিয়ে অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন! সেদিন কাগজে একালের একজন নামী অভিনেত্রী তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছেন সিনেমা লাইনে নতুন মেয়ে এলে তাকে নিয়ে প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতারা এ-রকম এক-আধটু করবেনই।

গার্গী অবাক হয়ে বলল, তুমি আবার এ-সবও পড় নাকি!

সায়ন বিব্রত হল বেশ, না, তা নয়, সে-দিন হঠাৎ চোখে পড়ে গেল লেখাটা।

এ. সি মেসিনটা চালু থাকার জন্য সব ক'টা দজা-জানালাই বন্ধ। এরকম বন্ধ ঘর আবার গার্গীর পছন্দ নয়। দক্ষিণকোণের ঘরে জানলা খুলে রাখলে বেশ একটা ফুরফুরে হাওয়া আসত এতক্ষণে, কিন্তু ঘরে ঢুকে সায়নের আবার এ. সি-ই বেশি পছন্দ। হাওয়াই যদি খাবে, তা-হলে লন ছেড়ে হঠাৎ ঘরে আসার সিদ্ধান্ত নিলে কেন!

আসলে গার্গী যে শুধুমাত্র রুমেলাপর্ব স্টাডি করার জন্যই লনের রোজি কর্নার ছেড়ে হোটেলের রুমে চলে এসেছে, সে কথা তো আর সায়নকে বলা যায় না। হয়তো হো-হো করে হেসেই উঠবে সায়ন তার এই অতলান্ত ছেলেমানুষি আর কাণ্ডভাণ্ড দেখে।

রাতে ডাইনিং হলে ডিনার খাওয়ার পর গার্গী হঠাৎই প্রায় আবদার ধরল সায়নের কাছে, এই, একটা পান খাওয়াবে?

—পান! ওটাও সায়নের কাছে আর এক বিস্ময়। কিন্তু হয়তো লখনউয়ের বিখ্যাত পান খাওয়ার হঠাৎ শখ হয়েছে গার্গীর, এই ভেবে 'ঠিক আছে তুমি ঘরে যাও, আমি পান নিয়ে এখনই আসছি' বলে নেমে গেল নীচের দিকে।

আসলে গার্গীর তখন কৌতূহল উপচে পড়ছে 'সিনেমুভি'র সর্বশেষ সিদ্ধান্ত কী হল তাই নিয়ে। ডাইনিঙে ভারি সুন্দর সুস্বাদু বিরিয়ানি খেতে খেতে সে আড়চোখে দেখতে পাচ্ছিল, ডাইনিঙের বাইরে যে-ছোট্ট ওপেন-এয়ার লাউঞ্জটা আছে, তাতে ভারি বিষণ্ণ আর উদাসীন হয়ে বসে আছে রোমিও। সায়ন নীচে নেমে যেতেই গার্গী দ্রুত এগিয়ে গেল সে-দিকে। রোমিওর পাশেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলল, অনেকক্ষণ ধরে মিটিং হল আপনাদের, তাই না!

রোমিও হাসল, হ্যাঁ, তা ঘণ্টাদুয়েক।

—কী সিদ্ধান্ত হল শেষ পর্যন্ত? ফিরে যাচ্ছেন কলকাতা?

—না, শুটিং করার সিদ্ধান্তই হল। সবাই একজোট হয়ে বুঝিয়ে বললাম ঋষভদাকে, এতদূর যখন এসেছি, ক্যামেরা, ফিল্ম সবই যখন আনা হয়েছে, তখন শট্‌গুলো নিয়ে নিই আপাতত। তারপর কলকাতা গিয়ে অন্য ফিন্যান্সার খুঁজে নেওয়া যাবে। তা ছাড়া—

—তা ছাড়া!

—আমরা অনেকেই বললাম, এখন আমাদের পারিশ্রমিক না দিলেও চলবে, ঋষভদা। শুধু যে দু'জন নামীদামি, বিবস্বানদা আর রুমেলাদির টাকাটা মিটিয়ে দেবেন। বাকিদের কথা পরে ভাবা যাবে। শুনে ঋষভদা একটা বড় করে শ্বাস ফেলে বললেন, কারওকে তো ফাঁকি দেওয়ার ইচ্ছে নয় আমার। দেবও না যদি প্রজেক্টটা ক্লিক করে। কিন্তু এত বড় একটা দুর্ঘটনার সংবাদ আমার মনটা ভেঙে একেবারে চুরমার করে দিয়েছে। কাজ করার ইচ্ছেটাই মরে গিয়েছে এখন। হঠাৎ সুস্নাত কেন যে সুইসাইড করতে গেল!

গার্গী তো ইতিমধ্যে জেনে গেছে, ওটা সুইসাইড নয়, মার্ডার। তা চেপে গিয়ে, তার কৌতূহল সামলাতে না পেরে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিল সে-দিকে, সত্যিই, কেনই বা সুইসাইড করতে গেলেন অতবড় ডাক্তার!

রোমিও হেসে ফেলল হঠাৎ, সে কথা আমি জানব কী করে ম্যাডাম! কারও যদি হঠাৎ মরতে ইচ্ছে হয় তা হলে কারই বা কী করার আছে।

—কিন্তু যার অত টাকা, দুঃখ বলে কিছু নেই জীবনে, সে-রকম একজন সফল মানুষ শুধু

শুধু মরতে যাবে কেন?

—কার মনে কী দুঃখ আছে তা কি বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায়, ম্যাডাম? আমাকে দেখে কি বোঝা যায়, হঠাৎ দু'দিনের মধ্যে কী একটা যন্ত্রণা পুড়িয়ে দিচ্ছে আমাকে! নিশ্চয় শুনেছেন ডাক্তার ব্যাচেলর ছিলেন, এই বয়সে বউ না থাকার একটা দুঃখ তো থাকতেই পারে।

এবার গার্গী গম্ভীর হল, তার জন্য কেউ সুইসাইড করতে যাবে না। বড় জোর বুড়ো বয়সে হঠাৎ একটা পাত্রী জুটিয়ে বিয়ে করে নিতে পারেন। অথবা কোনও গভর্নেস।

রোমিও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, নিশ্চয়ই কোনও দুঃখ ছিল, ম্যাডাম, নইলে নিজের রিভলভার দিয়ে কেউ ওভাবে ঘোর দিনদুপুরে আত্মহত্যা করে!

—রিভলভার দিয়ে!

—হ্যাঁ, একদম হৃৎপিণ্ড ঝাঁঝরা করে বেরিয়ে গেছে বুলেটটা। আজই ঋষভদা বিড়বিড় করে সে-সব বলছিলেন মিটিঙে। রিভলভারটা ওঁর শোওয়ার ঘরে একটা কাঠের আলমারির মধ্যে থাকত। ঋষভদা বলছিলেন সে-দিন সকালে যদি একটুও আঁচ করতে পারতেন ব্যাপারটা, তা-হলে শুটিঙে কাজে লাগবে বলে নিয়ে আসতেন ওটা।

গার্গী কিছুক্ষণ নিজের মনে কী যেন ভাবল, হয়তো ডঃ সুস্নাত তালুকদারের আত্মহত্যার দৃশ্যটি নিজের মনে ভেবে নিল স্তব্ধ হয়ে, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, কী করে বোঝা গেল ওটা আত্মহত্যা!

গার্গীর অহেতুক কৌতূহল দেখে ভারি বিস্মিত হচ্ছিল রোমিও। এই বিবাহিত তরুণীর সঙ্গে মাত্র আজ সকালেই তার আলাপ। তারও ছত্রিশঘণ্টা আগে, অমৃতসর মেলের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরায় গার্গীকে প্রথম দেখেছে যে। গার্গী নামটাও কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল তার। আলাপের যোগসূত্র এক চকিত মুহূর্তে এই তরুণীর একটি ফটো তোলা নিয়ে। এ-ভাবে আরও বহু বহু তরুণীর ফটো সে তার গত ছ বছরের ক্যামেরা-কাঁধের জীবনে তুলেছে, তার ফলে আলাপও হয়েছে বহুজনের সঙ্গে, কারও কারও সঙ্গে বন্ধুত্বও। কিন্তু গার্গী চৌধুরীকে তার কেন যেন বেশ অন্যরকম লাগছে। একটু আনকমন। হেসে বলল, আপনি এমনভাবে জেরা করছেন যেন আমরা সেই আত্মহত্যার ঘটনাটা কলকাতা থেকে দেখে এসেছি। সবটাই আসলে ঋষভদার মুখে শোনা। ঋষভদা টেলিফোনে যেটুকু জেনেছেন তাইই বলেছেন আমাদের। বলতে বলতে কেঁদেই ফেললেন তখন। আমরা আর সেই প্রসঙ্গে যাইনি আর।

গার্গীও প্রসঙ্গ বদলে ফেলল, অতএব তাহলে কাল শুটিং শুরু হচ্ছে? আপনারা সবাই খুব রিলিভড নিশ্চয়ই।

রোমিও ঘাড় নাড়ল, নিশ্চয়ই।

কিন্তু এই মুহূর্তে যতটা খুশি হয়ে ওঠার কথা, গার্গীর মনে হল, ততটা হল না রোমিও। একটু আগেই বলছিল কী একটা যন্ত্রণা-পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে তাকে। কী সেটা তা এখনই জিজ্ঞাসা করা যায় না।

ওপেন এয়ার লাউঞ্জে বসেই গার্গী দেখতে পেল, সায়ন তার পাজামা-পাঞ্জাবি পরা দীর্ঘ শরীর নিয়ে বেশ রাজকীয় মেজাজে ঢুকছে 'হোটেল ইন'-এর মস্ত গেটটা দিয়ে। 'ঠিক আছে, বেস্ট অব লাক' বলে সে উঠে দাঁড়িয়ে রোমিওকে বিদায় জানাল রাতের মতো।

—গুড নাইট, ম্যাডাম, রোমিও বলল প্রত্যুত্তরে।

ওপেন এয়ার লাউঞ্জের আরামচেয়ার ছেড়ে গার্গী পলক না ফেলতে একেবারে সিঁড়ির মুখে,

যেখানে ততক্ষণে পান হাতে নিয়ে সহাস্য সায়ন। সায়নের সঙ্গে এই সামান্য লুকোচুরিটুকু খেলতেই হল তাকে। সে জানে, সায়ন তার এই অনাবশ্যক কৌতূহল পছন্দ করবে না, সায়নের হাত থেকে গার্গী প্রায় ছিনিয়েই নিল পানের খিলিটা, যেন লখনউয়ের এই সুগন্ধী মশলা পানটির জন্য কত না আগ্রহেই সে অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ।

হাসি-হাসি মুখে সায়ন বলল, একটু দেরি করে ফেললাম, তাই না? আসলে হাঁটতে হাঁটতে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে চলে গিয়েছিলাম। কাল সকালে শ্রাবস্তী যাব বলে একটা ট্যাক্সি ঠিক করে এলাম।

—তাই! কী মজা! গার্গীকে উচ্ছ্বসিত দেখাল, একটু বেশিই যেন।

পরদিন সকালে সারা দিনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যখন কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে দরজা লক করে ওরা বেরোল, গার্গীর নজরে পড়ল, রোমিও হোটেলের মেন গেটের একপাশে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা বাংলা কাগজ পড়ছে। এত সকালে বাংলা কাগজ দেখে আগ্রহী হল গার্গী। কিন্তু রোমিও জানাল, এটা পুরনো কাগজ, ম্যাডাম, পরশুর। সকালে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলাম, এক চেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল, কাল পৌঁছেছেন এখানে। তাঁর কাছ থেকেই নিয়ে এলাম।

—ও, কিছু ইমপর্ট্যান্ট নিউজ আছে নাকি?

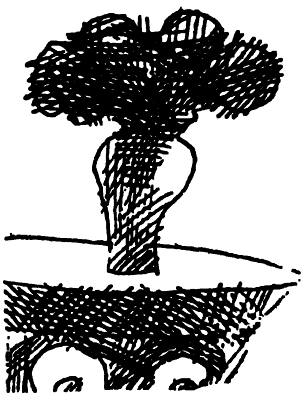
—আছে, ম্যাডাম, এটা পাঁচ তারিখের কাগজ তো, ডাঃ সুস্নাত তালুকদারের ডেথনিউজটা বেরিয়েছে বেশ বড় করে।

—তাই! গার্গী খুবই কৌতূহলী হয়।

—হ্যাঁ, কিন্তু কলকাতা থেকে এস. টি. ডি-তে যে-রকম খবর পেয়েছিলেন ঋষভদা, আসল খবরটা সে-রকম নয়। ডাক্তার নাকি খুন হয়েছেন। অন্তত পুলিশ তাই মনে করছে।

—সে কী!

—হ্যাঁ, কিন্তু খবরটা ঋষভদাকে এখন জানাব না ভাবছি। তা-হলে যাও বা রাজি হয়েছেন শ্যুটিং করতে, সেটাও হয়তো ক্যানসেল করে দেবেন।



হোটেলের প্রশস্ত ঘরটিতে সোফায় হেলান দিয়ে বসে, গরম কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে, স্ক্রিপ্টের ফাইলটায় এলোমেলো চোখ বোলাচ্ছিলেন ঋষভ মুখার্জি। তাঁর পৃষ্ঠা ওলটানোর ছটফটে ধরন, চঞ্চল চাউনি, কফির কাপে ঘন ঘন চুমুক দেওয়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুবই অন্যমনস্ক হয়ে আছেন নিজের ভেতর। স্ক্রিপ্ট দেখছেন, অথচ দেখছেন না, কিছু ভাবছেন, অথচ

ভাবছেন না, এমনই টালবাহানার মধ্যে সেন্টারটেবিলের একপাশে লাগানো কলিংবেলে আঙুল ছোঁয়ালেন বেশ অধৈর্য হয়ে।

বার দুয়েক এমন তুরন্ত বেল বাজানোর শব্দে সচকিত হয়ে একজন ঢাউস চেহারার ওয়েটার দরজা খুলে মুখ বাড়াতেই রুখে ওঠার ভঙ্গি করে ঋষভ চেঁচালেন, ভরদ্বাজবাবুকে বোলাও। আভি। রুম নম্বর দোশো সাত।

ওয়েটারের মোচওয়ালা বৃহৎ মুখখানা অদৃশ্য হতেই ঋষভ আবার ডুবে যাওয়ার চেষ্টা করলেন স্ক্রিপ্টের ভেতর। হাতেই কব্জিতেও বার দুয়েক চোখ রাখলেন অস্থির হয়ে, তাতে অসহিষ্ণুতার তাপমাত্রা একটু বাড়লই বরং। বেলা আটটা বাজতে চলল, অথচ টিমের একজন সদস্যের এখনও সময় হল না তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার! সাড়ে আটটার মধ্যেই তাঁরা কয়েকজনে মিলে লোকেশন দেখতে বেরোবেন। যে-মহল্লায় বাইজিরা থাকে, সেটা তন্নতন্ন সরেজমিন দেখে আজ দুপুরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে কখন শুটিং শুরু হবে, কীভাবেই বা শটগুলো তোলা হবে পর পর। কাল একটা পুরো দিন নষ্ট হয়ে গেছে তাঁদের। যে-কাজগুলো গতকাল সকালে করার কথা ছিল তাঁদের নির্ধারিত শিডিউল অনুযায়ী, হঠাৎ একটা দমকা ঝড়ে তা একদিন পিছিয়ে গেল। মাত্র একটা দিন যদিও, তবু লখনউয়ের মতো একটা শহরে শুটিং করতে এসে একদিন পেছোনো মানে একধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে গেল প্রোডাকশনের খরচ।

অবশ্য ঝড়টা এতখানিই প্রবল যে, শ্যুটিং শুরু করার পরিবর্তে এতক্ষণে প্যাক-আপ করে সদলবলে কলকাতা ফিরে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত ছিল। সেরকম সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন পরশু রাতে ফোনটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

ঠিক সিদ্ধান্তই, কারণ যে প্রিয় বন্ধুটির ভরসায় তিনি এত বড় একটা কাজে হাত দিয়েছিলেন এতদিন পর, তাঁরই আকস্মিক মৃত্যুতে আর না এগোনই সঙ্গত ছিল। কিন্তু গোটা টিম এমন সাংঘাতিকভাবে ভেঙে পড়েছিল তাঁর সিদ্ধান্তে যে, বাধ্য হয়েই—

তবে এটাও ঠিক, এত বড় একটা আঘাতের পর, এতটা ঝুঁকি নিয়ে এরকম সিরিয়াস একটা সিরিয়াল তোলার কাজে সত্যিই কি আর মন দিতে পারবেন!

কফির কাপে শেষ চুমুক দেওয়ার পর হঠাৎই খেয়াল হল, তাঁর সিগারেটটি অনেকক্ষণ ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে আপাতত নির্ধূম অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সেন্টার-টেবিলের ওপর। এই হল তাঁর অনেক বদভ্যাসের একটি। সিগারেট ধরিয়ে, দু-এক টান দেওয়ার পর তিনি প্রায়-সময়ই জ্বলন্ত সিগারেটটি মনুমেন্টের মতো দাঁড় করিয়ে রাখেন সেন্টার-টেবিলের ওপর। অগ্নিকুণ্ডটির ধোঁয়া উদ্‌গীরণ দেখেন আনমনে, তারপর বেমালুম ভুলে যান সেটির পুনর্বার সদ্ব্যবহারে। অবশ্য সুস্নাত প্রায়ই বলত, এটি বদভ্যাস নয় হে, ঋষি, সু-অভ্যাস। এরকম যতবার ভুলে যাবে, ততই কয়েক মিনিট করে আয়ু বাড়বে তোমার।

সুস্নাত তালুকদারের কথা মনে পড়তেই সহসা আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন ঋষভ মুখার্জি। ডাক্তার তাঁকে এভাবে ডোবাবে, তা তিন দিন আগেও তাঁর অনুমানের জগতে লেশমাত্র চিহ্নটি পাননি। তা হলে কি আর—

ভাবতে ভাবতে আর একবার কব্জির দিতে তাকিয়ে, সময় হিসেব করতে দ্রুত পকেট থেকে বার করলেন ডিজিটাল ডায়েরিটা। বেশ কিছুদিন হল হাতের তালুর সাইজের এই ইলেকট্রনিক্স কলাকৌশলটি উপহার হিসেবে পেয়েছেন তাঁর এক গুণমুগ্ধের কাছ থেকে। প্রথমে খুব একটা গুরুত্ব দেননি প্রযুক্তিবিদদের এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আবিষ্কারটিকে কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে নিজেই

আবিষ্কার করে আশ্চর্য হলেন যে, স্মৃতিশক্তিকে চাঙ্গা করতে এই বালখিল্য যন্ত্রটি কম উদ্যমী নয়। বেশ কিছু জরুরি টেলিফোন নম্বর যেমন একমুহূর্তে উজ্জীবিত করতে পারে ছোট স্ক্রিনটি, তেমনই মনে করিয়ে দিতে পারে, আজ তিনি কী কী করবেন ভেবেছিলেন, কিংবা কোথায় যাওয়ার কথা ছিল তাঁর, অথবা কে আজ তাঁর বাড়ি আসবে জানিয়েছিল ফোনে ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন অনেক স্মরণীয় তথ্য এটি লহমায় উসকে দিতে পারে একজন ব্যস্ত মানুষের স্মৃতিতে।

আজও ডিজিটাল ডায়েরিটায় নির্ধারিত বোতামটি পুশ করতেই পুরো দিনটার শিডিউল উদ্ভাসিত হল তাঁর চোখের সামনে। আজ সাতুই, কিন্তু স্ক্রিনে তাঁর পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ছ' সেপ্টেম্বরের তালিকাটাই দেখতে হচ্ছে তাঁকে—যাতে সকাল আটটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত কর্মসূচি ঠাসা। লখনউয়ে প্রতিদিনই যে এরকম ঠাসবুনোট, ব্যস্তসমস্ত প্রোগ্রাম তাঁদের অনুসরণ করতে হবে, তার একটা আভাস তিনি টিমের প্রতিটি সদস্যকে আগেই দিয়ে রেখেছেন। আর তারা সবাই জানে অযথা কালহরণ করা ঋষভ মুখার্জি কোনওদিনই পছন্দ করেন না। তবু সওয়া আটটা বাজতে চলল, কী আশ্চর্য, এখনও একজন লোকেরও পাত্তা নেই। ভরদ্বাজকে খবর দিয়েছেন, তাও মিনিট পনেরো হতে চলল। সেও কি এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি! বাকিরা কে কোথায় আছে তাও বুঝে উঠতে পারছেন না। নাহ, এরা বোধহয় ঠিক গুরুত্ব দিচ্ছে না ব্যাপারটা।

অধৈর্য হয়ে নিভে-যাওয়া সিগারেটটা টান মেরে ঘরের কোণে ছুড়ে দিয়ে নতুন করে ধরালেন আর একটা। দ্রুত কয়েকবার ধোঁয়া ছেড়ে আবার তীব্রভাবে পুশ করলেন কলিংবেলের বোতাম। তারপর সিগারেটটা পুনর্বার মনুমেন্ট করে দিয়ে অধৈর্য হয়ে ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন সোফা ছেড়ে।

এবং আশ্চর্য, এবার ওয়েটারটারও দেখা নেই।

অথচ কাল রাতে লাউঞ্জের মিটিঙে টিমের সব সদস্যই একযোগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আজ সকাল থেকেই একেবারে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সিরিয়ালের কাজ শুরু করা হবে। বাইজিদের মহল্লায় ঘুরে ঘুরে—

বাইজিদের মহল্লার কথা একঝলক মগজে টুঁ দিতেই আবার সহসা অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন ঋষভ মুখার্জি। আসলে যে-সিরিয়ালটা তুলতে চলেছেন, তার গল্পটার টানে-টানেই হঠাৎ এতকাল পর তাঁর পুনর্বার ছবির জগতে ফিরে আসা। এর আগে যে ক'টি ছবি করেছেন, প্রায় প্রতিটি ছবিই হিট হয়েছিল প্রধানত গল্পের কারণেই। সমালোচকদের অবশ্য ধারণা ফিল্ম-মেকিংটা তিনি ভালই জানেন। গল্পের ভেতর যে দু-চারটে সূক্ষ্ম টাচ তিনি দিয়ে থাকেন, তাতেই নাকি ফিল্মটা একটা হাইটে পৌঁছে যায়। যাই হোক, অনেককাল পরে একটা অদ্ভুত গল্প প্রায় অলৌকিকভাবে তাঁর হাতে পৌঁছনোয় তিনি রীতিমতো থ্রিল্ড্। গল্পের বিষয়। তার নাটকীয়তা যত না পছন্দ হয়েছে তাঁর, তার চেয়েও আকৃষ্ট হয়েছেন গল্পের আবহে।

লখনউয়ের বাইজিদের নিয়ে গল্প আগেও লেখা হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে, কিন্তু যে-কারণে গল্পটির বৈশিষ্ট্য তাঁকে চমৎকৃত করেছে তা হল, কাহিনীর মেজাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাইজি কালচারের খুঁটিনাটি, সেই সঙ্গে লখনউ ঘরানার ক্ল্যাসিকাল গান ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকা।

আসলে ঋষভ নিজেও এককালে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রেমে মজে ছিলেন আকণ্ঠ। বহু সন্ধে, বহু রাত তিনি ক্ল্যাসিকাল গানের শ্রোতা হয়ে তাল ঠুকেছেন এক স্বর্গীয় অনুভূতির আরকরসে বিলীন হয়ে। তাই বিষয় হিসেবে লখনউয়ের বাইজিদের জীবন যাপন, তাদের কাহিনী যেমন

দর্শকদের কাছে গ্রহণীয় হবে, তার সঙ্গে লখনউ ঘরানার গান—যাকে বলে মণিকাঞ্চন যোগ।

কিন্তু এ সবের চেয়েও যে বিষয়টি সবচেয়ে নাটকীয়, এবং সেটাই স্তম্ভিত করেছে তাঁকে, তা হল এই গল্পের লেখকের আশ্চর্য-জীবন কথা। উপন্যাসের কাহিনীর চেয়ে লেখকের নিজের জীবনকাহিনী যে বেশি বৈচিত্র্যময়, অধিকতর চমকপ্রদ হতে পারে, তা 'সোনালি ঘুঙুর' নামের এই পাণ্ডুলিপিটি হাতে না পৌঁছলে তিনি হয়তো ঘটনাটি জানতেই পারতেন না কোনও দিন।

উপন্যাসের লেখক রুদ্রাক্ষ ভট্টাচার্য মাত্র আটাশ বছরের এক যুবক, দেড় বছর পরিশ্রম করে লিখে শেষ করেছিলেন লখনউয়ের পটভূমিকায় এক বাইজির এই অপরূপ জীবন কথা। এটাই লেখকের প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসের শুরুতে একটা ছোট্ট ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'এই উপন্যাসের কোনও চরিত্রই কাল্পনিক নয়', আর যা ভূমিকায় লেখেননি তা ঋষভ শুনেছিলেন লেখকের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে। এক টুকরো অহঙ্কার মিশিয়ে লেখক হয়তো গল্পচ্ছলেই বন্ধুকে বলেছিলেন, এই একটি উপন্যাসেই তিনি নির্ঘাত বিখ্যাত হবেন। যাই হোক, দীর্ঘ পরিশ্রমের পর লেখাটি শেষ হতেই লেখক তখন তৃপ্ত, মুগ্ধ, ভারমুক্ত, সৃষ্টির আনন্দে টগবগ করে ফুটতে ফুটতে প্রেমিকাকে বলেছিলেন, 'চলো, দূরে কোথাও গিয়ে সেলিব্রেট করে আসি'। সেলিব্রেট করার জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন কল্যাণীর কাছেই কোনও একটা নির্জন বাগানবাড়ি। সেদিন সন্ধে ছ'টা নাগাদ প্রেমিকাকে স্কুটারের পিছনে বসিয়ে বিদ্যুৎবেগে রওনা দিয়েছিলেন সেই বাগানবাড়ির উদ্দেশে। তার একঘণ্টা পরেই এক দূরপাল্লার বাসের সঙ্গে হেড-অন কলিশন, তৎক্ষণাৎ দুজনেই স্পট ডেড।

ঘটনাটা ঋষভ মুখার্জিকে এতটাই আলোড়িত করেছিল যে, তিনি পাণ্ডুলিপি হাতে পাওয়া মাত্র পড়তে শুরু করেছিলেন গভীর অভিনিবেশে। প্রায় একটা গোটা রাত নিবিষ্ট হয়েছিলেন উপন্যাসের চরিত্রগুলির ভেতর। কাহিনীতে চমক আছে সন্দেহ নেই, তবে এ-উপন্যাস ছাপা হলে সেই আঠাশ বছরের আনামী যুবক বিখ্যাত হতেন কি না তা তিনি জানেন না। বইটি ছাপা হয়ওনি আর। তিনি অবশ্য ঠিক করেছেন, সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকেই সিরিয়ালটি তৈরি করবেন। চিত্রনাট্যও তৈরি রয়েছেন খুবই সাবধানে, অনেক হিসেবনিকেশ করে, যাতে প্রতিটি এপিসোডেই কাহিনীর কৌতূহল টানটান বজায় রাখতে পারেন। উপন্যাসটি পাঠ করার সময় তাঁর এটাও ভাবনা ছিল যে, এ ধরনের লেখার চিত্রায়ণ কলকাতার কোনও স্টুডিওতে বসে সম্ভব নয়। অন্তত আউটডোরের শ্যুটিং স্পটে এসে না করলে ছবির আবহ আদপেই ধরা পড়বে না ভিডিওর ফ্রেমে। প্রোডাকশন ম্যানেজার রানাজি সান্যাল এ-প্রস্তাব শুনেই অবশ্য চমকে উঠেছিলেন, কেননা তাতে প্রোডাকশন কস্ট খুবই বেড়ে যাবে, ছবি শেষ করাই হবে অসম্ভব। কিন্তু ঋষভ মুখার্জি বরাবরই এ ধরনের জেদি, একগুঁয়ে মানুষ। ছবি পরিচালনা করতে নামার পর যা ভাববেন, যা বলবেন, তা-ই করবেন। তাঁর এ ধরনের একগুঁয়েমিতার জন্যই এর আগে দু-তিন বার ছবির কাজ আরম্ভ করেও মাঝপথে কিংবা শুরুতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে।

আজও তেমনই অধৈর্য হয়ে উঠেছেন সকাল থেকে। গতকালের প্রবল টানাপোড়েন আর টালবাহানার পর আশা করেছিলেন, আজ ভোর থেকেই সেই নিখুঁত তৎপরতা লক্ষ করবেন, যা তিনি প্রতি মুহূর্তে আশা করেন টিমের কাছ থেকে। কিন্তু হা হতোস্মি। কেউ বোধহয় ঘুম থেকেই ওঠেনি এখনও, বা উঠলেও এখনও পর্যন্ত তাঁর খোঁজখবর নেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করেনি।

খুবই ক্রুদ্ধভঙ্গিতে আরও একবার কলিংবেলের বোতামে আঙুল রাখতে যাবেন, ঠিক সে সময়ে দুম করে দরজা খুলে যে প্রবেশ করল, তাকে অবশ্য মনে মনে আশা করছিলেন তিনি। ফর্সা, গোলগাল, বিশাল কুমড়োর মতো একখানা ভুঁড়ি বাগিয়ে সজনী দত্ত হুম্‌হুম্‌ করতে করতে ঢুকে বাজখাঁই গলায় চেঁচালেন, কী একখানা মেয়েছেলে জুটিয়েছেন, স্যার, গোটা টিমটায় আগুন ধরিয়ে দিল যে—

ঠিক যতটাই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছিলেন ঋষভ সজনী দত্তর বাকভঙ্গিমায় ততটাই নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন মুহূর্তে, যদিও তিনি জানেন সজনী দত্ত লোকটি বরাবরের ঠোঁটকাটা এবং ইস্কাবনের উত্তরে ইস্কাবন ডাকতেও কখনও পিছপা হয় না। আসলে সজনী দত্তকে টিমের সঙ্গে আনা হয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোডাকশন ম্যানেজার হিসেবে, যেহেতু লোকটি বেঢপ চেহারা সত্ত্বেও ভারি কর্মঠ, চটপটে। এতটাই তৎপর যে, সুন্দরবনে গিয়ে ছবি তোলার সময় বাঘের দুধ দরকার হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই এক গামলা দুধ নিয়ে এসে ঘাম ঝরাতে ঝরাতে বলবে, স্যার, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দুইয়ে নিয়ে এলাম।

সেই সজনী দত্তের এহেন আল্‌গা মন্তব্যে কিছুটা আহতই হলেন ঋষভ, বিশেষ করে 'মেয়েছেলে' শব্দটি তাঁর অভিধানে খুবই অশ্লীল ও বর্জনীয়। সজনী কার কথা বলতে চাইছে তা অবশ্য বুঝে গেলেন তৎক্ষণাৎ, তবুও বললেন, কেন, আবার কী হল?

—কী আর হতে বাকি রইল, স্যার। এক-এক সময় এক-একজনের গায়ে লেপ্টে থাকছে, তাকে ছাড়তেই চাইছে না। আর তাতে বাকিদের প্রবল গাত্রদাহ শুরু হচ্ছে। ট্রেনে ওঠার সময় সবাই বেশ মিলেজুলে কেমন হইহই করতে করতে সিট দখল করেছে, এখন তাদের কেউ মজা লুটছে, আর কেউ দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে মনে মনে মুণ্ডুপাত করছে তাদের। কোত্থেকে স্যাম্পেলটা জোগাড় করলেন, স্যার?

ঋষভ এই অপ্রীতিকর আলোচনাটা করতে চাইছিলেন না সজনী দত্তর সঙ্গে, কিন্তু এও ভাবলেন, বর্ণনার জন্যে এখন তাঁরই সুনামে কালি পড়ার উপক্রম। সবাই নিশ্চয়ই মনে মনে তাঁকেই দুষছে। বাধ্য হয়ে গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, আগে তো কখনও দেখিনি ওকে। সুস্নাতই রেকমেন্ড করেছিল ওর নাম। একটা অফিস ক্লাবের নাটক দেখাতেও নিয়ে গেল একদিন। দেখলাম নায়িকার ভূমিকায় বেশ জমিয়ে ফেলল দু-তিনটে সিনের মধ্যেই। খুবই চটপটে, ফ্লার্ট করার ভূমিকায় ভারি সচ্ছন্দ। ভাবলাম আমার সিরিয়ালের রেশমবাইয়ের রোলটা ও নিশ্চয়ই উতরে দেবে। রোলটা ওর স্বভাবের সঙ্গে বেশ মানানসই, তা ছাড়া—

সজনী দত্ত কী একটা কথা বলার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতেই তাকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে ঋষভ মুখার্জি আবার বললেন, অভিনয়টা আমি কাউন্ট করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু আসল কারণ ওই সুস্নাত। সুস্নাতের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা কী তা আমি ঠিক জানি না, কিন্তু এই সিরিয়াল তোলার একটা বড় খরচ যেহেতু সুস্নাত বহন করবে বলেছিল, তাই তার সুপারিশ তখন ফেলতে পারিনি।

—ও! সজনী দত্ত তাঁর গোল গোল চোখ দুটো দ্বিগুণ সাইজের করে বললেন, ও, তা হলে এই কেচ্ছা। বুড়োবয়সে ভীমরতি। কিন্তু এখন তো আর তিনি নেই, স্যার, মেয়েটাকে এবার ফেরত পাঠিয়ে দিন কলকাতায়—

—ফেরত পাঠিয়ে দেব! ঋষভ বিস্মিত হলেন, তা হলে সিরিয়াল হবে কাকে নিয়ে! ওর রোলটা কি তুমিই করবে, সজনী?

—আমি করব কেন, স্যার। কলকাতায় একটা ফোন করে দিন, এরকম উঠতি নায়িকা এখন

ছড়াছড়ি যাচ্ছে হাটে-মাঠে-বাটে। ফোন পেলেই দেখবেন এক ডজন রূপসী ছুঁড়ি নাচতে নাচতে এসে হাজির হবে আপনার কাছে। তখন কাকে নেবেন কাকে নেবেন না এই নিয়ে আপনি জেরবার হয়ে যাবেন।

শুনতে শুনতে ঋষভ তখন স্তম্ভিত হয়ে সজনী দত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। লোকটার কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি এমনই অশালীন, অরুচিকর যে, মনে হচ্ছিল ঘর থেকে বার করে দেন। কিন্তু লোকটার এলেম এতই বেশি যে, তাকে ছাড়া তাঁর 'সিনেমুভি' একেবারেই অচল। হঠাৎ একটা ক্রাউডের সিনে দু'শো লোক লাগবে, কিংবা কোনও সিনে একটা কাবুলিঅলা লাগবে, অথবা একজন পাঁচাশি বছরের বৃদ্ধা, বলামাত্র সজনী দত্ত মুহূর্তে বগলদাবা করে নিয়ে এসে বলবে, এই নিন, স্যার।

স্যার শব্দটি সিনেমা লাইনে প্রায় অচল, হাস্যকর, কিন্তু সজনী দত্ত নাকি সব পরিচালককেই এই অভিধায় সম্বোধন করতে ভালবাসে, তাতে তার বশংবদ হয়ে কাজ করার এলেমটিও যেমন পরিস্ফুট হয়, তেমনই তার তৎপরতাও।

কিন্তু ঋষভ হঠাৎ খুবই রেগে গেলেন সজনী দত্তর ওপর, দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, তা হলে তুমিও পরিচালক হয়ে উঠলে, সজনী! নাচতে নাচতে এলেই যদি নায়িকা হওয়া যেত, তা হলে তুমি আর এক্সট্রা-আর্টিস্টদের জোগাড়ে হয়ে থাকতে না। নায়ক, পরিচালক—সবই হতে পারতে। বুঝলে! বলতে বলতে হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে নজর পড়তে লাফিয়ে উঠতে চাইলেন, ইট'স নাইন, অ্যাঁ? তোমরা সব কী ভেবেছ বলো দেখি? সাড়ে আটটায় লোকেশন দেখতে বেরোব বলে ঠায় বসে আছি, আর তোমরা সব—বলি, আর সব কোথায়? ভরদ্বাজ, রানাজি, রোমিও?

সজনী দত্ত তার পরিচালকের এহেন ফায়ারিঙে বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে গেলেন না। যেহেতু জিনিয়াসদের মেজাজ, মর্জি, খেয়াল, বে-খেয়াল—সবেরই সঙ্গে তিনি আগাপাশতলা পরিচিত। বললেন, ভরদ্বাজবাবু তো বেরোলেন মেয়েটার সঙ্গে একটু ইয়ে করতে।

—ইয়ে! ঋষভ প্রবলভাবে ভুরু কোঁচকালেন।

—হ্যাঁ। সকালে উঠেই আমাকে বললেন, 'সজনীবাবু, বর্ণনার লিপস্টিক ফুরিয়ে গেছে, নতুন একটা কিনে আনতে হবে', বলে এমন একটা কোম্পানির নাম বললেন তা বাপের জন্মে শুনিনি। তাতে বললাম ওই আমেরিকান কি ফরাসি কোম্পানির লিপস্টিক তো আর লখনউতে পাওয়া যাবে না। তা হলে আমি বিকেলের ট্রেনে কলকাতা গিয়ে নিয়ে আসব খন, তাতে ওনার গোঁসা হল। মেয়েটাকে নিয়ে একটা বাহারি টাঙা ভাড়া করে বেরোলেন লিপস্টিকের খোঁজে।

ঋষভ স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, বাহ, চমৎকার।

—আর সেই দৃশ্য দেখে রানাজিবাবু মুখ অন্ধকার করে তাঁর রুমে দরজা বন্ধ করে অন্তরিণ। ওদিকে রোমিওবাবু তাঁর জুলিয়েট-বিহীন হয়ে একা-একা ওপেন এয়ার-লাউঞ্জে বসে আকাশ দেখছেন।

—হরিব্‌ল, ঋষভ মুখার্জি তাঁর সিরিয়াল-টিমের এই বিভীষিকাময় পরিণতি শুনে কী করবেন, কার ওপরে তাঁর ক্রোধ বর্ষণ করবেন কিছুই দিশে পেলেন না। সামনে সজনী দত্ত নিরীহ-নিরীহ মুখ করে বসে আছে দেখে তাকেই ফায়ারিং করতে যাচ্ছিলেন, সেই মুহূর্তে দরজা খুলে ধীরপায়ে ঘরে ঢুকল যে-শান্তশিষ্ট চেহারার যুবক, সে খুবই উদ্বিগ্ন মুখে, অথচ স্থির গলায় বলল, ঋষভদা, সকাল থেকে রুমেলা রায়কে তাঁর ঘরে পাওয়া যাচ্ছে না।

—রুমেলা! কেন, তার আবার কী হল? ঋষভ মুখার্জির মাথায় যেন আর কিছুই ঢুকছে না।

—কী জানি, কাল রাতে বি. বি-র সঙ্গে না কি ভীষণ ঝগড়া হয়েছে। রাতে রুমেলার ঘরে ডিনার পাঠানো হয়েছিল, আজ সকালে দেখা গেল ঢাকনাই খোলেননি ক্যাসারোলের, ঘরেও নেই উনি।

—স্ট্রেঞ্জ। তারপর?

—বি. বি-র কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, উনি বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি কী করে জানব! সেসব খোঁজখবর রাখার দায়িত্ব তো আপনাদের।

ঋষভ মুখার্জি খেপে গিয়ে বললেন, রানাজি কোথায়?

—রানাজিদা সকাল থেকে খোঁজাখুঁজি করলেন কিছুক্ষণ। হোটেলের রিসেপ্‌শনিস্টরা জানিয়েছে, খুব ভোরে একজন মহিলাকে তারা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে দেখেছিল, তারা ভেবেছে মর্নিং ওয়াক করতে যাচ্ছেন উনি। রানাজিদা স্টেশনে গিয়েও খোঁজাখুঁজি করে এসেছেন—

—ব্যস, তা হলেই হয়ে গেল! তা হলে তো এ বার প্যাক-আপ করে কলকাতা রওনা দিলেই হয়। যাও সজনী, এবার সত্যিই টিকিট বুক করে এসো। এনাফ ইজ এনাফ। সিরিয়াল করার নেশা শিকেয় উঠেছে আমার।



রুমেলা রায় কোথায় গেলেন, হঠাৎ কীভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলেন হোটেল থেকে, তা নিয়ে প্রোডাকশন ম্যানেজার রানাজি সান্যাল থেকে স্পটবয় ভলা, সবাই ভাবতে ভাবতে, খুঁজতে খুঁজতে একদম জেরবার। খবরটা ঋষভ মুখার্জিকে দিয়ে, নিজেও একগলা ভাবনার মধ্যে আবর্তিত হতে হতে দ্বিত্বম রায় বেরিয়ে এল পরিচালকের ঘর থেকে। সজনী দত্ত নামের লোকটাকে তার একেবারেই না-পসন্দ। লোকটা অনেকক্ষণ আগেই ঢুকেছে ঋষভ মুখার্জির ঘরে। হুড়মুড় করে আগড়ুম বাগড়ুম বকছিল অনেক কিছু। কিন্তু রুমেলা রায়ের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মতো এত বড় একটা খবর এতক্ষণ পরিচালকের কানে তোলেনি দেখে ভারি আশ্চর্য হচ্ছিল দ্বিত্বম। লোকটা আসলে মাথামোটা। কিন্তু একই সঙ্গে খাটিয়ে আর মো-সাহেব ধরনের।

রুমেলা রায় বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম খ্যাতিমান নায়িকা। কলকাতার মতো জায়গা হলে, নিদেন গ্রামবাংলার কোনও মফস্বল শহর হলেও এভাবে সশরীরে হাপিস হয়ে যাওয়াটা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। নেহাত লখনউ বলে তিনি হোটেলের রুম থেকে অতিভোরে বেরিয়ে চলে

যেতে পেরেছেন নির্বিঘ্নে। নইলে রাস্তায় এতক্ষণে তাঁকে ঘিরে ভিড় তৈরি হয়ে যেত নিশ্চিত।

তবু জায়গাটা লখনউ বলে দ্বিত্বমের ভাবনাটা আরও টাল খাচ্ছে বেশি। ভারি খতরনাক শহর। গতকাল গোটা 'সিনেমুভি' টিম যখন ঋষভ মুখার্জির সেই ডাক্তার-বন্ধুর মর্মান্তিক আত্মহত্যার ঘটনায় শোক পালন করছে, সিরিয়ালের শুটিং বন্ধ হওয়ার সংবাদে মুণ্ডুপাতও করছে সেই দাবাড়ু ডাক্তারের কাণ্ডজ্ঞানহীনতায়, সেসময় দ্বিত্বম সবার অলক্ষে বেরিয়ে পড়েছিল লখনউ শহরটা ঘুরেফিরে দেখার জন্য। সে 'সিনেমুভি' সংস্থার সঙ্গে লখনউ এসেছে সাউন্ডরেকর্ডিস্ট হিসেবে। রোমিও দত্তগুপ্তর ক্যামেরা যখন শুটিঙের দৃশ্যাবলি ধরে রাখবে ভিডিওর ফ্রেমে, সেসময় দ্বিত্বম তার শব্দযন্ত্রের সামনে বসে মাথায় হেডফোন টাঙিয়ে রেকর্ড করে রাখবে কুশীলবদের সংলাপ। 'সোনালি ঘুঙুর'-এ কাজ নেওয়ার আগে বেশ কয়েকটি 'তেরো সন্ধ্যা' পর্যায়ের সিরিয়ালে সে শব্দযন্ত্রীর কাজ করেছে, তখন পরিচালক মহলে দ্বিত্বম রায়ের নাম সাউন্ড রেকর্ডিস্ট হিসেবে মোটামুটি পরিচিত। সিনেমুভির কাজটা সে পেয়েছে ভরদ্বাজ মুখার্জিরই সুবাদে। ভরদ্বাজ তার ঠিক বন্ধু নয়, তবে বিভিন্ন স্টুডিওতে যাতায়াত করার সুবাদে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কিছুকাল আগে। বড়লোকের ঘরের বখাটে ছেলে। সে-ই 'আমার কাকা ঋষভ মুখার্জি নতুন সিলিয়ালে হাত দিয়েছেন' জানিয়ে তাকে অনুরোধ করেছিল অবিলম্বে যোগাযোগ করতে। যোগাযোগ করার পর রীতিমতো একঘণ্টা ইন্টারভিউ নিয়ে তার কাজের বহর মাপজোক করে তবেই তাকে নির্বাচিত করেছেন ঋষভ মুখার্জি।

তো, সেই দ্বিত্বম গতকালের দুর্ঘটনাজনিত স্থিতাবস্থায় কিছুটা নিঃসঙ্গ, কিছুটা বোরড্, কিছুটা বিরক্ত হয়েই নিজের মনে বেরিয়ে পড়েছিল লখনউয়ের পথে। ব্যস্ত শুটিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে এই প্রাচীন ঐতিহাসিক শহরটা ঘুরে ফিরে দেখে নেবে এমন একটা রোমান্টিক ইচ্ছে তার ছিলই। হঠাৎ এসেই কলকাতা ফিরে যেতে হবে এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিতে তাই এই চুপিচুপি লখনউ-পরিক্রমা। কয়েক ঘণ্টা ঘুরে একইসঙ্গে পুরনো লখনউ আর নয়া লখনউ দেখার পর ভারি জটিল মনে হয়েছে আড়াইশো বছরের পুরনো শহরটাকে। একদিকে নতুন শহরের বৈভব, অন্যদিকে পুরনো শহরের ঘিঞ্জিময় ইতিহাসময়তা তাকে বিভ্রান্ত করেছে খুবই। এরকম একটা জটিল নগরীতে রুমেলা রায়ের হঠাৎ ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে যাওয়াটা কারও পক্ষেই স্বস্তিকর নয়। যৌবন যাই-যাই করলেও এখনও রুমেলা রায়ের শরীরের চটক, মুখের জেল্লা ও সৌন্দর্য যে-কোনও পুরুষের পক্ষে খুবই আকর্ষক। আর লখনউ তো গান, সুরা, নারী ও রসিক পুরুষের সুবাদে, বরাবরই অতীব খ্যাতিমান। কাজে-কাজেই রুমেলা রায়ের পক্ষে একা লখনউয়ের পথে ঘোরা—

দ্বিত্বমের ফিল্ম লাইনের নামার ইতিহাস খুব একটা পুরনো নয়। সে আদতে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিঙের ছাত্র। বরাবর মেধাবী হিসেবেই পরিচিত। হঠাৎই পড়া ছেড়ে দিয়ে সে চলে এসেছিল শব্দযন্ত্রের কলাকৌশল শিখতে, সেখান থেকে অনিবার্য কারণে ফিল্ম-লাইনে। কিন্তু সে একটু গুডি-গুডি টাইপের, বরাবর নিস্পৃহ থাকতে চাইত রুপোলি জগতের এইসব পাত্রপাত্রীর আওতা থেকে। তার স্বভাব অনুযায়ী শুটিং-স্পটে যতক্ষণ থাকে, একটা নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তির খোলসে সে মুড়ে রাখে নিজেকে তাকে চট করে কেউ ঘাঁটায় না, সেও আশ্চর্য উদাসীন ভিডিও পৃথিবীর কুটকচালি থেকে।

কিন্তু, ট্রেনে ওঠার পর থেকেই সে উপলব্ধি করছে ফিল্ম-লাইনের আঁচ সারাক্ষণ ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে শব্দ শোনাচ্ছে তার শরীর ও মনে। এত বড় একটা টিমের ভিতর রাগ করে সব ব্যাপারে

যে নির্লিপ্ত থাকা যায় না, তা অনুভব করে সে ত্রস্ত, আতঙ্কিত। এখন রুমেলা রায়কে কীভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে, না পাওয়া গেলে শুটিংয়ের অনিবার্য ইতি, সেই সরল সত্যটা তো প্রকাশ করেই দিলেন পরিচালক।

বোধহয় তাদের যাত্রাটাই খারাপ, না হলে ট্রেনে ওঠার পর থেকেই একের পর এক অঘটন তাড়া করে ফিরছেই বা কেন।

ইতিমধ্যে রুমমেট রোমিওর কাছ থেকে যে এও জানতে পেরেছে, ডঃ সুস্নাত তালুকদার নাকি খুন হয়েছেন। খুবই রহস্যজনক খুন। কোনও মহিলাঘটিত ব্যাপারেই নাকি! কী আশ্চর্য, ব্যাচেলর ডাক্তার—

দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে নীচে তরতর করে নেমে এল সে ওপরের ঘূর্ণির আবহ থেকে কিছুক্ষণ নির্লিপ্ত হতে। গতকাল হজরতগঞ্জ থেকে বেরিয়ে আমিনাবাদ হয়ে স্টেশনের দিকে চলে গিয়েছিল লখনউয়ের ব্যস্তসমস্ত স্পন্দনের গতিপ্রকৃতি বুঝতে। আজ কি তাহলে ইমামবাড়ার দিকে যাবে! এই টালমাটাল পবিস্থিতি। ফুরসতে লখনউয়ের প্রধান আকর্ষণ ভুলভুলাইয়ার গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে যদি ভুলে থাকতে পারে উটকো ঝামেলার ঝড়।

নীচে নামতেই কিন্তু দ্বিত্বম আচমকা জড়িয়ে পড়ল আরও বিপুল, প্রায় ভুবন-কাঁপানো টাইফুনে। সিড়ি দিয়ে নেমেই বাঁদিকে রিসেপশন। দুই সুন্দরী তরুণী সারাক্ষণ হাসির চশমা পরে অপেক্ষা করে কীভাবে বোর্ডারদের আরও একটু সেবা করা যায় তারই প্রতিশ্রুতির বিজ্ঞাপন হয়ে। একজনের কোঁকড়া ঝোপা চুল, তো অন্যজনের বয়কাট। বেলা নটায় তাদের তৎপরতাও তুঙ্গে অবস্থান করে। যেহেতু সকালের ট্রেনে নতুন বোর্ডাররা লাগেজ-সহ আসতে থাকে একের পর এক। আজও প্রায় সেরকমই ব্যস্ততা, শুধু সুন্দরীদের ঠোঁটে সেই হাসির প্রলেপটি উধাও। কেন, তাও সহসা আবিষ্কার করল দ্বিত্বম।

কাউন্টারের এপাশে জমজমাটি উর্দি-পরিহিত একজন তাগড়াই গোঁফওয়ালা পুলিশ অফিসার ঝুঁকে পড়ে সামান্য নিচুগলায় কী যেন আলোচনা করছেন রিসেপশনিস্ট রূপসীদের সঙ্গে। এমন জবরদস্ত পুলিশ অফিসার সামলাতে স্বভাবতই দুই রিসেপশনিস্ট ঘেমেনেয়ে অস্থির। সুন্দরীদের একজন শঙ্কিতমুখে জবাব দিয়ে যাচ্ছে কঠিন কঠিন সব প্রশ্নের, অন্যজন দ্রুতহাতে কী-একটা রিপোর্ট তৈরি করছে হোটেলের রেজিস্টারটা সামনে খোলা রেখে। তরুণী খুবই চটপটে, নইলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই দু'পাতার একটা রিপোর্ট তৈরি করে পুলিশ-অফিসারটির হাতে তুলে দেবেই বা কী করে।

দ্বিত্বম সামান্য বিভ্রান্ত হয়ে জরিপ করছিল ভিনরাজ্যের এই আইনরক্ষকটিকে। বেশ জাঁদরেল চেহারা, মহিষের মতো গায়ের রং, চোখমুখে প্রবল কাঠিন্য, বুরুশের মতো গোঁফ জোড়ার নীচে শক্ত ঠোঁট। রিসেপশনিস্টদের কাছ থেকে রিপোর্টটি পেতেই কাউন্টারের অদূরে দাঁড়ানো দ্বিত্বমের লম্বা চুল, নিখুঁতভাবে কামানো মুখের দিকে একবার কঠিন চাউনি আছড়ে ফেলে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন পুলিশ অফিসারটি। এমনিতে নিস্পৃহ দ্বিত্বম সহসা কী যেন ভেবে ঠিক উপেক্ষা করতে পারল না ঘটনাটাকে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তার নায়ক-নায়ক চেহারায় একঝলক হাসি উগরে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল তার তত-চোস্ত-নয় ইংরেজিতে, ম্যাডাম, হোটেলে হঠাৎ খাকি পোশাকের আমদানি কেন?

রিসেপশনিস্ট তরুণীরা প্রথমে শুকনো হেসে ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাইল, ইটস নাথিং। জাস্ট রুটিন এনকোয়ারি।

—রুটিন এনকোয়ারি! দ্বিতম হাল ছাড়ল না, রোজই পুলিশকে এভাবে রিপোর্ট দিতে হয় নাকি!

—না, তা নয়, কোঁকড়াচুলো সুন্দরী আমতা-আমতা করে ফেলল তার স্বাভাবিক স্মার্টনেস ভুলে, মন গিয়েছিল জবুদস্ত পুলিশ অফিসারটির সামনে।

—তা হলে!

দ্বিতম হঠাৎ তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠে একটু জেরা, একটু জোরাজুরি করতেই বয়কাট্ সুন্দরী গলা নামিয়ে বলেই ফেলল, স্যার, কলকাতা থেকে নাকি একটা মেসেজ এসেছে, গত পাঁচুই সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে যে টিমটা এসে পৌঁছেছে তাদের একটা লিস্ট পাঠাতে হবে এক্ষুনি।

—সে কী, কেন? দ্বিতম আশ্চর্য হল।

—তা ঠিক বলতে পারব না, বয়কাট-সুন্দরী হাসার চেষ্টা করল।

—আপনি কি এতক্ষণ সেই লিস্ট তৈরি করছিলেন?

—একজ্যাক্টলি, স্যার।

দ্বিত্বম কৌতূহলী হল, লিস্টটা একবার দেখাবেন?

দুই সুন্দরী একবার নিজেদের মধ্যে তাকাতাকি করে নিঃশব্দে কিছু একটা বার্তা বিনিময় করল, তারপর প্রায় অনিচ্ছায় ড্রয়ার খুলে বার করল দীর্ঘ কাজগখণ্ড, সেটা দ্বিত্বমের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে নিচুস্বরে বলল, দেখুন ব্যাপারটা সিক্রেট। আমাদের ম্যানেজার এখনও এসে পৌঁছননি হোটেলে, তাঁর অনুপস্থিতিতে রিপোর্টটা দিতে হল পুলিশকে। এরকম দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই, কিন্তু বুঝতেই পারছেন, কোতোয়ালির অর্ডার। প্লিজ, কাউকে বলবেন না কিন্তু—

দ্বিতম তখন অপার কৌতূহলে ঝুঁকে পড়ে দেখছে তালিকাটা, আরও অনেকের সঙ্গে দ্বিত্বম রায় নামটিও দিব্যি জ্বলজ্বল করছে দেখে তার শরীরে ঘনিয়ে এল কী একটা শঙ্কা। হঠাৎ বিভুঁয়ে এসে, বলা-নেই কওয়া-নেই দুম করে পুলিশ-কেসে জড়িয়ে পড়াটা কোনও খুশির ব্যাপার নয়। হঠাৎ কী কারণে কলকাতার পুলিশ এতদূরে তাদের টিমের খোঁজখবর নিতে আগ্রহী হল, তা তার ইলেকট্রনিক্স্ পড়া মগজে একবিন্দু সেঁধাল না। তালিকাটায় তাদের টিমের যারা যারা 'হোটেল ইন'-এ উঠেছে তাদের প্রত্যেকের নাম তো আছেই, সেইসঙ্গে সায়ন চৌধুরির নামটাও দেখে সে দ্বিগুণ হতবাক। সায়নি চৌধুরি নামে তাদের টিমে কেউ নেই, একটা কাপল্ তাদের সঙ্গে একই ট্রেনে এসেছে, উঠেছে তাদেরই পাশাপাশি ঘরে, নিশ্চয়ই সেই যুবকটিই সায়ন চৌধুরি।

তালিকার নীচে আলাদা করে, স্পেশাল অ্যাসটারিক্স দিয়ে তিনজন মহিলার নাম লেখা। সেখানেও রুমেলা রায়, বর্ণনা সেনগুপ্তর সঙ্গে গার্গী নামের এক মহিলার নামও বেমালুম জায়গা করে নিয়েছে।

তালিকাটা বার তিনেক মুখস্থ করে নিজের নামটা বার ছয়েক ছানাবড়া চোখে দেখে, এও ভাবল, হয়তো সায়ন চৌধুরি আর গার্গীকেই পুলিশের দরকার। দ্বিত্বমরা ফিফ্থ্ সেপ্টেম্বর 'হোটেল ইন'-এ ইন করেছে বলে সায়ন চৌধুরিদের সঙ্গে সিনেমুভির লোকগুলোও কলকাতা চালান হয়ে গেল লখনউ পুলিশের তালিকা মারফত।

কোঁকড়া-চুলওলা সুন্দরী শঙ্কিত-শঙ্কিত মুখে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, ওয়েল, মিস্টার, আপনাদের টিমের কেউ কেউ কি মুনলাইট লজে উঠেছেন?

দ্বিত্বম চমকে উঠে বলল, হ্যাঁ। কেন বলুন তো!

—পুলিশ-অফিসারটি 'হোটেল ইন' থেকে বেরিয়ে মুনলাইট লজের দিকে যাবেন বললেন। ওখান থেকেও একটা লিস্ট নিতে হবে ওঁকে।

—তাই! দ্বিতম পুনর্বার চিন্তিত হল, বুঝেই উঠতে পারছে না লখনউয়ে শুটিং করতে এসে কোনও ফালতু ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়ছে কি না। কী ভেবে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, মেয়েদের নাম আলাদা করে লিখে ব্রাকেটে অ্যাসটারিস্ক দেওয়া আছে কেন।

—কলকাতার পুলিশ নাকি মেয়েদের তালিকাই বিশেষভাবে জানতে চেয়েছে।

—তাই! দ্বিত্বমের মগজের মধ্যে গোটা সিনেমুভির সমস্যাটা জিলিপির আড়াই প্যাঁচে জড়িয়ে গেল ক্রমশ। রুমেলা রায়কে ভোর থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, বর্ণনা সেনগুপ্তকে নিয়ে টিমের ভেতর ঘোর অশান্তি, আর গার্গী নামের ওই চোখে এক্স-রে লাগানো, গম্ভীর মহিলাকে সে তো চেনেই না। হঠাৎ তাদের নাম বিশেষভাবে তলব করার এই পুলিশি প্যাঁচ-পয়জার খুব একটা সুবিধার যে নয়, তা অনুমান করতে অসুবিধে হল না তার।

কাউন্টারে অন্যমনস্কভাবে একটা ছোট্ট থ্যাঙ্কস্ জানিয়ে শব্দযন্ত্রী দ্বিত্বম রায় এই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে পারল না, কলকাতা পুলিশের এই টেলিফোনিক টহল টিমের ইনমেটদের কাছে প্রকাশ করবে কি না। বললেই অবশ্য একটা অদৃশ্য ত্রাস প্রবলভাবে চারিয়ে যাবে প্রত্যেক সদস্যের ভেতর। সেক্ষেত্রে সিরিয়ালের বারোটা তো বাজতে চলেছে, তখন তেরোটাও বাজবে নিশ্চিত।

আপাতত মুখে কুলুপটি এঁটে সে ঠিক করল একটা রিকশা নিয়ে সে ভুলভুলাইয়ার গোলকধাঁধায় একা-একা ঘুরপথে যাবে কিছুক্ষণ। ততক্ষণে সিনেমুভির ঘুলিয়ে ওঠা সমস্যাবলি হয়তো হিল্লে হয়ে যাবে কিছুটা।

কিন্তু লাউঞ্জ পেরিয়ে হোটেলের প্রধান ফটকের দিকে তক্ষুনি পা বাড়ানো হল না দ্বিত্বমের, কেননা তখন প্রবল উত্তেজিতভাবে ওপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন ঋষভ মুখার্জি। তাঁর হাতে সিগারেট, ঠোঁটে একইসঙ্গে ধোঁয়ার উদগীরণ আর কথার ফুলঝুরি। তাঁর পেছনে শুকনো আমসি হয়ে প্রোডাকশন ম্যানেজার রানাজি সান্যাল। ঋষভ মুখার্জি তখন গলাটা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক ডিগ্রি উচ্চগ্রামে তুলে বলছেন, তোমরা সব যার-যার রুমে কেউ ফুর্তি করছ, কেউ নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছ, আর তোমাদের নাকের ডগা দিয়ে একটা জলজ্যান্ত হিরোইন হাওয়া হয়ে গেল, কেউ তার হদিস করতে পারলে না!

রানাজি সান্যালের চোখে এই মুহূর্তে তাঁর সোনালিফ্রেমের বাহারি চশমাটা নেই, তাতে তাঁর মুখের চেহারাটা বেশ সাদামাঠা গ্ল্যামারহীন হয়ে পড়েছে। অবশ্য লম্বা-চওড়া চেহারা দিয়ে বোকা-বোকা মুখের খামতিটি পুষিয়ে যায় ঠিক। ঋষভ মুখার্জির ধমকানিতে বেশ অপ্রতিভ হয়ে কিছু একটা বলছেন মিনমিন করে, তা অবশ্য দ্বিত্বমের কর্ণকুহরে পৌঁছল না।

ঋষভ মুখার্জি তখন বলছেন, কলকাতা হলে তো এতক্ষণ কাগজে কাগজে টি টি পড়ে যেত। এত বড় একজন অ্যাকট্রেস, সে কি না হোটেল ছেড়ে পালিয়ে গেল! এখন দ্যাখো গিয়ে, কোথাও অঘটন কিছু ঘটিয়ে ফেলল কি না। তাহলে তো এক্ষুনি থানা-পুলিশ হবে। আর আমারও হয়েছে ভীমরতি, এতকাল পরে হঠাৎ সিরিয়াল তৈরি করার ভূত চাপল মাথায়। এনাফ ইজ এনাফ।

কথা বলতে বলতে দুজনে ততক্ষণে এসে পৌঁছলেন চমৎকার কার্পেট-ঢাকা লাউঞ্জের মুখে। রানাজি সান্যাল বললেন, সজনী দত্তকে বলেছি খুঁজে বার করতে। সজনীবাবু বললেন, এটা

কোনও ব্যাপারই না। ডাইরেক্টর হুকুম করলে সমুদ্দুরে ডুব দিয়ে ঝিনুকের ভাঁজ খুলে মুক্তো পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারি। আর ও তো একটা অ্যাকট্রেস।

ঋষভ মুখার্জি তেমনই কর্কশকণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, সজনী দত্ত ধরে আনবে ঠিকই, তবে রুমেলা রায়ের পরিবর্তে কোনও পামেলা দত্তকে হাজির করে বলবে, রুমেলা রায়ের মুখে তো বয়সের একটা ছাপ পড়ে গিয়েছিল, তাই প্লাস্টিক সার্জারি করে মুখের খুমাটা একটু বদলে এনেছি, স্যার।

কোনও কারণে ওপর থেকে সজনী দত্তর নামতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, গোলগাল ঢাউস শরীরটা নিয়ে প্রায় গড়াতে গড়াতে দ্রুত নেমে এলেন সিঁড়ি বেয়ে। শেষ কথাটা বোধহয় তাঁর কানে গিয়েছিল, তেমনই হোঁত হোঁত করতে করতে বললেন, একটু ভুল বললেন, স্যার, আমি খুঁজে পেতে একটা পামেলা দত্তকেই নিয়ে আসব বটে, কিন্তু তার মুখখানা প্ল্যাস্টিক সার্জারি করে রুমেলা রায় করেই আনব, নইলে তো দর্শক হলে, থুড়ি, ঘরে বসে সিটি দেবে, স্যার।

ঋষভ মুখার্জি সে-কথা কানে না নিয়ে বললেন, গাড়ি কোথায়, গাড়ি? আমি লোকেশন দেখতে যাব। কই, ক্যামেরা কোথায়?

রোমিও দত্তগুপ্ত একটু আগে নীচে নেমে এসেছে ওপেন-এয়ার লাউঞ্জের নিরালা কোণটি থেকে, সম্ভবত ঋষভ মুখার্জি তাঁকে খুঁজতে পারেন সে-সম্ভাবনা মাথায় রেখেই। রোমিওকে নজরের মধ্যে পেতেই পরক্ষণে, সাউন্ড, সাউন্ড কোথায়?

দ্বিত্বম ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে বলল, লোকেশন দেখতে তো আর সাউন্ড লাগে না, ঋষভদা। শুধু ক্যামেরা নিয়ে গেলেই হবে। শুটিং শুরু হলে তো আমাকে সারাক্ষণ হেডফোন কানে লাগিয়ে বসতে হবে, আর ভি. টি. আর রোল করাতে হবে আপনার হুকুম অনুযায়ী। এ-বেলাটা আমি বরং একটু ভুলভুলাইয়ার দিকে—

ঋষভ মুখার্জি একমুহূর্ত জলন্ত চোখে তাকালেন দ্বিত্বমের দিকে, 'দাউ টু-উ-উ ব্রুটাস' ভঙ্গিতে, পরক্ষণে 'হু-উ-উ' বলে রানাজির দিকে তাকিয়ে বললেন, স্টার্ট। ক্যামেরা—

ক্যামেরাকে সঙ্গে নিয়ে স্টার্ট করেও হঠাৎ একলহমা থমকালেন, সজনী দত্তর দিকে ফিরে প্রায় ফায়ারিং করলেন, ঘণ্টা দু-তিনের মধ্যে আমি হোটেলে ফিরে আসছি। দুপুরের পর থেকে শুটিং শুরু হবে। এর মধ্যে যেখান থেকে পারো রুমেলা রায়কে ধরে নিয়ে এসো। তারপর কলকাতার একটা টিকিট কেটে ওকে ট্রেনে চাপিয়ে দাও। এখানে ওকে সিন ক্রিয়েট করার জন্য আনা হয়নি। আর ওই যে বলছিলে, তোমার হাতে ডজন ডজন অ্যাকট্রেস আছে, কলকাতায় ফোন করে রুমেলার এজের একজন অ্যাকট্রেস আনিয়ে নাও কালকের মধ্যে।

বলতে বলতে লনের একপাশে পার্কিং স্পেসে দাঁড়ানো একটা হালকা সবুজ-রঙের হায়ারড্ অ্যাম্বাসাডারে গিয়ে উঠলেন তিনজনে। বোঝাই যাচ্ছে, এমনিতেই মেজাজি মানুষ ঋষভ মুখার্জি, হঠাৎ নানান্ টানাপোড়েনে একদম ফায়ার হয়ে আছেন।

গাড়িটা রওনা দেওয়ার একটু পরেই দ্বিত্বম প্রায় ভূত দেখার মতোই দেখল, এবং শুনলও, একজন বেশ মাস্তান-মাস্তান চেহারার লোক, গায়ে সাদা টাওয়েল-গেঞ্জি, নেভি ব্লু রঙের প্যান্ট পরনে, কাউন্টারে গিয়ে ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করছে, হোটেলমে বর্ণনা সেনগুপ্ত কোই হ্যায়?



একরাশ গাঢ় বিষণ্ণতা মগজের ভেতর ভরে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটা হাতলঅলা বেঞ্চে একা-চুপচাপ বসে ছিল রোমিও। প্রায় শেষ দুপুর অবধি ঋষভ মুখার্জি আর রানাজি স্যান্যালের সঙ্গে লখনউয়ের বাইজি-মহল্লায় সে আঁতিপাতি ঘুরে বেড়িয়েছে লোকেশন ঠিক করতে। ঋষভ মুখার্জি খুবই খুঁতখুঁতে, সিরিয়াস ধরনের পরিচালক। এ-গলি সে-গলি ঘুরে, এক একটা কোঠির পটভূমি বিশ্লেষণ করেন, পরক্ষণেই বাতিল করে মাথা নাড়েন, 'না হে, হল না, চলো ওদিকটায়' বলে ঘুরতে থাকেন, ঘুরতেই থাকেন পাগলের মতো। ঘুরতে ঘুরতে অবশ্য চেনা হয়ে গেল এই প্রাচীন শহরটির কিছু রেডলাইট এরিয়াও।

শেষ পর্যন্ত কিছু গলি, কিছু কোঠি পছন্দ হল বটে, কিন্তু ঋষভ মুখার্জি যেমন ভেবেছিলেন, তাঁর নির্ধারিত শিডিউল অনুযায়ী শুটিং শুরু করা যায়নি বিকেলে, যেহেতু সিরিয়ালের নায়ক শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসলেন এই বলে যে, আগে রুমেলাকে খুঁজে বার করুন।

সন্ধে পর্যন্তও রুমেলা রায়কে খুঁজে পাওয়া যায়নি এই সত্যটাই এখনও পর্যন্ত খুবই টেনশনে রেখেছে 'সিনেমুভি'র প্রতিটি সদস্যকে। এমন নয় যে, একজন খ্যাতনাম্নী হিরোইনকে কেউ কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। তাঁকে সশরীরে হেঁটে গেটের বাইরে যেতে দেখেছে হোটেল ইনের দারোয়ান থেকে রিসেপশনিস্ট, সবাই। স্বেচ্ছায়ই গেছেন বটে, কিন্তু কোথায়, কত দূরে, সে হদিস না পাওয়া পর্যন্ত কারও একবিন্দু স্বস্তি নেই। সজনী দত্ত স্টেশনে এসে তন্ন তন্ন খুঁজে গেছেন রিজার্ভেশন চার্ট, কিন্তু কোথাও রুমেলা রায়ের নামের উল্লেখ নেই।

শুটিং হল না, অতএব সারাটা সন্ধে নির্ভেজাল ছুটি, রোমিও তাই তুমুল শূন্যতায় চুরচুর হয়ে স্টেশনের ব্যস্তসমস্ত চেহারাটা দেখেই চলেছে তখন থেকে। তার কাঁধে যথারীতি প্রিয় ক্যামেরাটি, অভ্যেসমতো কিছু দৃশ্যপট এর মধ্যে তুলে ফেলেছে এক অপরূপ সৌন্দর্যে বুঁদ হয়ে।

আসলে যে কোনও বড় স্টেশনের জীবনযাত্রায় যে একটা অদ্ভুত গতিময়তা আছে সেটা বেশ রেলিশ করে রোমিও। অনবরত ট্রেন যাচ্ছে, আসছে, যাত্রী উঠছে, নামছে, কুলির মাথায় ব্যাগ-বাক্স-বেডিং চাপিয়ে ঢুকছে, বেরিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে হইচই, হাঁকডাক, ট্রেনের হুইশ্‌ল—সব মিলিয়ে একটা বিচিত্র জগৎ, যা-যে কোনও মন খারাপকে কিছুক্ষণ ভুলিয়ে রাখতে পারে।

তা ছাড়া সন্ধের পর চারদিকে যখন আলো ঝলমল করে ওঠে, তখন যে-একটা আলো-আঁধারি শেড খেলা করে দৃশ্যপটে, সেটাও তার ভারি পছন্দের। সবখানেই যেন একটা রঙের খেলা। কোথাও বড় বড় বাল্‌ব থেকে ঝরে পড়ছে গাঢ় হলুদ রঙের রোশনাই, কোথাও টিউবের ঝকঝকে দুধসাদা আবহ, কোথাও নীল-লাল-সবুজ বিজ্ঞাপনের নিয়ন, আবার কোথাও

অন্ধকারের রকমারি শেড। তাতে কখনও হালকা ছায়া, কখনও গভীর। এই রঙের আশ্চর্য খেলাটাই তার কাছে ঢের আকর্ষণীয়।

বেশ অনেকক্ষণ বসে থাকার পর সে বেঞ্চের এই কবোষ্ণ আরাম ছেড়ে উঠে সহসা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে দাঁড়াল কাছেই নানান পত্রপত্রিকা আর হিন্দি-ইংরেজি বইয়ের স্টলের সামনে। খুঁজে পেতে হঠাৎই পেয়ে গেল গতকালের একটা বাংলা দৈনিক, যা আজ কোনও এক সময় ট্রেনে এসে পৌঁছেছে। খবরের কাগজ পড়াটা তার অন্যতম প্রিয় নেশা, সকালে উঠেই কাগজে একবার চোখ না বুলোলে সারাটা দিন কেমন তেতো-তেতো লাগে তার। এ যাত্রা লখনউ এসে তাই্‌ই বোধ হয় তার মনে হচ্ছে, সে বহুকাল ঘরছাড়া, কলকাতার সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনও এক দ্বীপে এসে বসবাস করছে। এ শহরে বাংলা কাগজ হয়তো পৌঁছয়, কিন্তু হকারদের কাছে কয়েকবার খোঁজ করেও পায়নি। গতকালের কাগজটা সে পড়ে ছিল কলকাতা থেকে আসা এক ট্রেনযাত্রীর কাছ থেকে নিয়ে। আজ দৈবক্রমে পেয়ে গেল এই স্টলটাতে।

কাগজটা কিনে বগলদাবা করে বেরুতে বেরুতে সে তখনও ভেবে চলেছে রঙের আশ্চর্য কারুকাজ ও মনের ওপর তার প্রতিক্রিয়ার কথা। আজ লোকেশন নির্বাচন করতে বেরিয়ে ঋষভদার সঙ্গে আলোচনা শুরু করতেই ঋষভদা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, কালার ইজ নট সো ইম্পর্ট্যান্ট ইন ফিল্ম। ভাল গল্প, আর অভিনয়, দ্যাটস সাফিসিয়েন্ট।

রোমিও কিছুতেই বোঝাতে পারেনি ফিল্মে রঙের গুরুত্বের কথা। শুধু অভিনয় করে একটা ভাল গল্পকে দর্শকের সামনে উপস্থিত করাই যদি পরিচালকের লক্ষ্য হয়, তা হলে তো একটা ফিল্ম-দেখা আর একটা উপন্যাস পড়া একই অভিজ্ঞতার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। ফিল্ম একটা ভিন্ন মিডিয়া, সেখানে শব্দ, ইমেজ, ফর্ম, কনটেন্ট, সেই সঙ্গে দৃশ্য অনুযায়ী রঙের ব্যবহার, সব মিলিয়ে দর্শকের কাছে একটা ভিন্ন অভিজ্ঞতা উপস্থাপনাই হবে পরিচালকের কাজ। কিন্তু ঋষভদা তার যুক্তি নস্যাৎ করে, ফর্ম, কনটেন্ট ইত্যাদি বঙ্গোপসাগরে বিসর্জন দিয়ে বলেছেন, হ্যাঙ ইয়োর কালার অ্যান্ড আদার থিংস—

বর্ণনার কারণে রোমিওর মনটা এমনিতেই ভাল ছিল না। তার ওপর ঋষভদার এই অ-ফিল্মি কথাবার্তায় একেবারে দরকচা মেরে গেছে মেজাজ। সিরিয়াল আর ফিল্ম যদিও এক নয়, তবু ভিস্যুয়াল মিডিয়ার যে একটা আলাদা অ্যাডভান্টেজ আছে, সেটা তো ধরতেই হবে ভিডিও-ক্যাসেটের টেপে। যাই হোক, সে দেখা যাবে শ্যুটিঙের সময়, আপাতত—

পুনর্বার প্ল্যাটফর্মের সেই বেঞ্চিটায় হেলান দিয়ে জুতজাত করে বসে সে নিজেকে নিবিষ্ট কাল সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। কিছুক্ষণ চোখ বুলোতেই তার প্রিয় কলকাতা শহর হুড়মুড় করে ছুটে যেতে শুরু করল সেলুলয়েডের রিলের মতো। একদিন আগের খবর যদিও।

গতকালও প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে গোটা কলকাতা বেহাল, জল জমে গেছে এ-রাস্তায় ও-রাস্তায়, অফিসযাত্রীদের প্রবল দুর্ভোগের পাশাপাশি, জমা জলে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে বস্তির খালি-গায়ে বাচ্চারা। বিরোধী দলের রাস্তা-অবরোধে তিনঘণ্টা জ্যামজট এসপ্ল্যানেড মোড়ে, দক্ষিণ কলকাতার হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্মঘট ইত্যাদি কিছু ধূসর সংবাদের পাশে শিয়ালদহে রাজনৈতিক খুন, তালতলায় গৃহবধূর আত্মহত্যার মতো কিছু রক্তের ছোপও এ-পৃষ্ঠায় ও-পৃষ্ঠায়। খেলার পৃষ্ঠায় কিছু সোনালি আর সবুজে মেশানো খবরও।

দ্রুত চোখ রাখতে রাখতে হঠাৎ তৃতীয় পৃষ্ঠার বাঁ-দিকের কলামে ডঃ সুস্নাত তালুকদারের হত্যাকাণ্ডের কিছু পোস্ট-মর্টেম খবর। উত্তরাধিকার কায়েম করতে ডাক্তারের দুই ভাইপো একই

সঙ্গে বাড়ি দখল করতে এসে বিরোধে লিপ্ত হয়। তাদের একজন ডাক্তার, আহত অবস্থায় তাঁকে গ্রেফতার করে প্রথমে হাসপাতালে, পরে পুলিশ-হাজতে আটক। অন্যজন ব্যবসায়ী, কিছুটা সমাজবিরোধী হিসেবে খ্যাত, সে পুলিশি নজর এড়িয়ে কোথাও উধাও। খবরে আরও প্রকাশ, ডঃ তালুকদারের প্রচুর কালো টাকা তাঁর আলমারি থেকে নিপাত্তা। বাড়ির দুই চাকর আর রাঁধুনিকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আরও তদন্ত চলছে।

সংবাদটি ৫ সেপ্টেম্বরের, ডঃ তালুকদারের হত্যাকাণ্ডের ঠিক পরদিনের ঘটনা, প্রকাশিত হয়েছে ৬ সেপ্টেম্বরের সংবাদপত্রে, আর সেই রোমহর্ষক খবর রোমিও লখনউ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে পড়ছে ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধের পর। খবরটি পড়ে, তার গুরুত্ব অনুধাবন করে ভারি উদ্বেগজনক মনে হল রোমিওর, যেহেতু আজ দুপুরে চকবাজার থেকে লোকেশন দেখে ফেরার পর দ্বিত্বম রায় তাকে একফাঁকে চুপিচুপি জানিয়ে গেছে, কোনও একজন মাস্তান চেহারারা লোক সকালে রিসেপশনে বর্ণনা সেনগুপ্তর খোঁজ করছিল লোকটির কথা, বলার ঢংঢং, চাউনি, ভাবভঙ্গি মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়।

বর্ণনা সেনগুপ্ত নামের মেয়েটিকে প্রতিমুহূর্তেই অন্যরকম, অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে তার। কখনও সে যেন সরল, স্বাভাবিক, ফিল্ম-লাইনে প্রথম অভিনয় করতে আসা তরুণীদের মতো ভীতু আনাড়ি সংশয়ে টালমাটাল। কখনও প্রবল রোমান্টিক, মিষ্টি, দেখনহাসি, আবার কখনও ভারি রহস্যময়। তার এই রহস্যময়তাই ভারি ধন্দে ফেলেছে রোমিওকে।

আজ সকালে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ভরদ্বাজ মুখার্জির সঙ্গে টাঙায় চড়ে বর্ণনার লিপস্টিক কিনতে যাওয়ার ঘটনাটি মোটেই পছন্দ করেনি রোমিও। ভরদ্বাজ পরিচালকের সম্পর্কে ভাইপো। তার এই ভাইপো পরিচিতিটাই তাকে অযথা ক্ষমতাবান করে তুলেছে সিনেমুভি-সংস্থায়, যা রোমিও এমনকি রানাজি সান্যালও মনে করেন এক্সট্রা-কনস্টিটিউশনাল।

কারণে-অকারণে সে খবরদারি করে টিমের অন্যান্য সদস্যের ওপর, যেন তাকে ঋষভ মুখার্জি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন অন্যদের গতিবিধি, চালচলন, এমনকি খরচখরচার ওপরও নজর রাখতে। এ নিয়ে প্রোডাকশন ম্যানেজার রানাজি সান্যালের সঙ্গে ভরদ্বাজের খটাখটিও হয়ে গেছে ট্রেনে আসার সময়, হোটেল ইনে ঢোকার পরও দু-একবার। শুধু তাই-ই নয়, বর্ণনা সেনগুপ্ত যেহেতু ঋষভ মুখার্জির রিক্রুট, অতএব সেও ভরদ্বাজের অলিখিত সম্পত্তি, এমন একটা ভাবভঙ্গি দেখাচ্ছে লখনউয়ে এসে। যখন-তখন বর্ণনার ঘরে ঢুকেই পড়ছে শুধু নয়, সকালে বর্ণনার ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রোমিও শুনল, ভরদ্বাজ প্রায় ডিক্‌টেট করছে, না, না, শালোয়ার-কামিজই তো ভাল, লখনউয়ের কালচারের সঙ্গে বেশ মানানসই, এখন তোমাকে শাড়ি পরতে হবে না।

তার পর থেকে সারাটা দিনই রোমিওর ভেতর-শরীরে একটা তীব্র উচাটন তাকে অস্থির করে তুলেছে। ভরদ্বাজের অতীত ইতিহাস সে খুব একটা জানে না। কিন্তু তার হোঁতকা চেহারা, মুখের ঘন চাপদাড়ি, চোখে স্টিল ফ্রেমের চশমা, গলায় সোনার চেন, চেনের লকেটে অকারণে যিশুর ছবি, যদিও সে খ্রিস্টান নয়, পরনে মোটা জিনসের সঙ্গে প্রায়ই বিদেশি ঢঙের টি-শার্ট, হাতে সব সময়েই দামি সিগারেট (ঋষভ মুখার্জির সামনেও), আর কথাবার্তায় যে-জমিদারি ভাবটা ফুটিয়ে তোলে ভরদ্বাজ, সেটা যে-কোনও আত্মসম্মান বজায় রাখতে চাওয়া মানুষের গা-জ্বালানোর পক্ষে যথেষ্ট।

রোমিও যেমন সেটাও বরদাস্ত করতে পারছে না, তেমনি বর্ণনা যে সবার গায়েই যখন-

তখন ঢলে পড়ছে, তার সেই অতি-প্রগল্‌ভতাও সহ্য হচ্ছে না। হঠাৎ এক দিনেই সে যে কীভাবে বর্ণনার প্রেমে পড়ে গেল, হয়তো প্রেমের আইনকানুন এরকমই, অথবা এও হতে পারে তার প্রেমে-পড়ার ইনস্টিংক্টটা একটু প্রবলই। এর আগে তার প্রথম কৈশোরেও সে একবার প্রেমে পড়েছিল তার এক দূর-সম্পর্কিত দিদির সঙ্গে। তার চেয়ে বছর দুয়েকের বড় সেই দিদির ভূমিকাই অবশ্য প্রধান ছিল সেবারে। তার সঙ্গে কিছুদিন খুনসুটি, ফষ্টিনষ্টি, আগডুম বাগডুম করে সে-দিদি হঠাৎ আবার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল অন্য একজন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক পুরুষের। সেটা রোমিওর পক্ষে ছিল একটা প্রচণ্ড আঘাতের। হয়তো তার কৈশোর-বয়স বলেই, হয়তো-তার প্রথম প্রেম বলেই সে সময় প্রবল ক্ষোভে ইচ্ছে হয়েছিল সেই বয়স্ক লোকটির প্রতি প্রতিশোধ নিতে। সে অবশ্য কিছুকালের মধ্যে সামলেও নিয়েছিল তার শৈশবের প্রেম, ক্যামেরার প্রতি মনোনিবেশের সাহায্যে। তবে একটা প্রতিহিংসামূলক কাজ সে অবশ্য করেছিল, একদিন রাত গভীর হলে তার ঘরের ভেতর বড় একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে সেই সম্পর্কিত দিদির যে-ক'টা ফটো তুলেছিল, তা পুড়িয়ে ফেলেছিল একটা-একটা করে। খুব নিষ্ঠুরের মতোই পুড়িয়েছিল, যদিও সেই দুর্দান্ত সুন্দর ফটোগুলো পোড়াতে খুবই কষ্ট হয়েছিল সে-রাতে।

আজও সে-ধরনের একটা রাগ তার ভেতরে উসকে উঠছে বারবার, বারংবার। খবরের কাগজটা বগলের নীচে নিয়ে সে ধীর পায়ে স্টেশনের চত্বর ছেড়ে বেরোতে বেরোতে সে-রকমই একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটতে দেখছিল মাথার ভেতর। কাল সকালেও তাদের শ্যুটিং শুরু হবে কি না তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই, যদিও প্রথম কয়েকটা শট শুধুমাত্র বিবস্বান বসুকে নিয়েই হওয়া সম্ভব ছিল। কাহিনীর শুরু তো বিবস্বান বসুকে দিয়েই। না, বিবস্বান বসু নয়, গল্পের নায়ক পুলক লাহিড়ীকেই দেখা যাবে কাহিনীর প্রথম অংশে।

আজ সকালে শুটিং-স্পট নির্বাচন করতে করতে ঋষভ মুখার্জি একটু-একটু করে বলছিলেন কাহিনীর প্রথম কয়েকটি এপিসোড। পুরো কাহিনীটা এখনও ঋষভদা ভাঙেননি কারও কাছে। হয়তো কাহিনীর সাসপেন্‌স্ তাঁর টিমের কলাকুশলীদের কাছেও বজায় থাকুক, এটাই তাঁর ইচ্ছে বলে। কাহিনীর নায়ক পুলক লাহিড়ী কলকাতার একটি বিখ্যাত পত্রিকার সাংবাদিক, বয়স বিয়াল্লিশ, যাকে বলে টল, হ্যান্ডসাম চেহারা, হঠাৎই কলকাতায় বোমা-বিস্ফোরণে একটি পুরনো ত্রিতল বাড়ি ভেঙে পড়ার পর ছুটে গিয়েছিলেন সংবাদের খোঁজে। নিষিদ্ধ পল্লিরই কাছাকাছি বাড়ি সেটা, যখন একের পর এক লাশ বেরুচ্ছে ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে, আর সেই লাশ শনাক্ত করতে অকুস্থলে এসে পৌঁছেছে একের পর এক নিষিদ্ধ ব্যবসায়ে লিপ্ত সুন্দরীরা, তখন ঘটনার বিবরণ সংগ্রহের ফুরসতে তিনি সেই সুন্দরীদের ইন্টারভিউও নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন—যদি বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত কোনও অনাবিষ্কৃত তথ্য হঠাৎ পেয়ে যান হাতের মুঠোয়।

তাদেরই একজন, কিছুকাল আগেই লখনউ থেকে ভাগ্য ফেরাতে কলকাতায় পা দিয়েছে এমন একটি তরুণীকে জিজ্ঞাসা করতে করতে সহসা তাঁর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছিল তাঁরই জীবনের একটি পুরনো অধ্যায়। পুরনো, কিন্তু সেই প্রাচীন ক্ষতটি যে এখনও, এতকাল পরেও দগদগে ঘা হয়ে জেগে ছিল মনের ভেতর তা তাঁর ভাবনার জগতে ছিলই না। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন, কিংবা হয়তো ভোলেননি, শুধু ভুলে থাকার ভান করেছিলেন এই দীর্ঘ সময়, তাও বুঝতে পারছেন না। কিন্তু তার ঠিক পরই, কলকাতার বোমা-বিস্ফোরণের দগদগে ঘা শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তিনি বেরিয়ে পড়েছেন লখনউয়ের পথে।

লখনউ পৌঁছে বেশ কয়েকদিন ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করছেন চকবাজারের আশেপাশে, একদা বিখ্যাত বাইজি-মহল্লায়। তন্ন তন্ন খুঁজছেন কিছু, কী তা অবশ্য এখনও ঠিক বলেননি কাউকে। শুধু কয়েকদিন পরে একদিন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন একটা দোতলা কোঠির সামনে। কানে এল শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুর। রাত্রি প্রায় নটার মতো তখন, এ-পল্লিতে সে-সময় এক বিশেষ ধরনের পুরুষদের আনাগোনা, কিন্তু পুলক লাহিড়ীর সে-ব্যাপারে কোনও মন নেই। তিনি খুবই আনমনা, উদাসীন হয়ে শুনছেন গৌড়মল্লার রাগের সেই গানটি ; কহে হো হমসে পীতম আঁখে ফের ভারীরী।

দেওয়ালে-বারান্দায় চমৎকার জাফরি-বসানো যে দোতলা কোঠিটির ভেতর থেকে ভেসে আসছে আলাপ, সেটি খুব একটা পুরনো তা নয়, কিন্তু লখনউয়ের ইমারত-শিল্পের পুরনো ঐতিহ্যের বাহক। কিন্তু গানটি যে লখনউ-ঘরনার নয়, তা পুলক জানেন। সাধারণত বর্ষার যে কোনও সময় রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে ও-গান গাওয়া হয়, আর খাম্‌বাজ-ঠাটের এই খেয়াল গান তাঁর যেন খুবই চেনা, হয়তো বা শুনে থাকবেন তাঁর কৈশোরকালে।

গত কয়েকদিনে দু-একজন বাইজির কোঠিতে তিনি কিছুক্ষণ করে সময় কাটিয়েছেন। প্রথমজন হীরাবাই লখনউয়েরই আদি বাসিন্দা, বংশানুক্রমে বাইজি হওয়াই তাঁদের ভবিতব্য, গানে ততটা পারদর্শী নন, যত ঠাটঠমকে, ভ্রুভঙ্গি, নখ্‌রায়। প্রায় মধ্যবয়স্ক, কিন্তু চটুল। অন্যজন কমলাবাই, প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই এই বাইজির মা সেই সুদূর পারস্য থেকে এসেছিলেন কৈশোরে, এককালে তাঁর মায়ের মতো তিনিও খুবই রূপবতী ছিলেন, এখন নাচের তালিম দিয়ে থাকেন এ মহল্লার কিশোরীদের। কিন্তু পুলক যা খুঁজছেন, তা এঁদের কারও কাছেই হদিস পাননি, আজ হঠাৎ তাঁর পা নিথর হয়ে গেল এই বিলম্বিত একতালটি শুনতে শুনতে। না নিথর হয়ে গেল তা নয়, পায়ে একটা দোলনই এসে গেল তাঁর অজান্তে।

কিছুক্ষণ পর সামনে একটা পানের দোকান দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলেন পুলক, লখনউয়ের বিখ্যাত বেগমি-পান কিনতে কিনতে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়ে কিস্‌কি কোঠি?

এ-মহল্লার পানঅলার চেহারাও বেশ খানদানি। চাপদাড়ি, মাথায় পাঁচপানওয়ালি টোপি পরা পানঅলার কাছ থেকে সম্ভ্রম-মেশানো উত্তর পেলেন : রেশমবাঈ।

সকালের ভাবনাটা মগজে কয়েক চক্কর দিতে না দিতে ততক্ষণে রোমিওর অটো পৌঁছে গেলে হোটেল ইনের গেটে। রাত অনেকখানি অতিক্রান্ত, তবু হোটেল ইনের লনে এখনও রাত্রি যথেষ্ট যুবতী। কিন্তু তাতে যে একটুকরো বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল রোমিওর জন্য, তা হল রুমেলা রায় জাঁকিয়ে বসে আছেন একটা সবুজ ছাতার নীচে, তাঁর সঙ্গে একজন অপরিচিত মধ্যবয়স্ক পুরুষ, বেশ লম্বা, চাবুকের মতো চেহারা, পুরু ঠোঁটের ওপর পাকানো, তাগড়াই গোঁফ। দু'জনের সামনেই পানীয় ভর্তি গেলাস। হাস্য পরিহাসে দু'জনেই বেশ ফুর্তিতে আছেন। সিগারেটের ধোঁয়ায় চারপাশ আচ্ছন্ন।

সে-দৃশ্যে কিছুটা স্বস্তি, কিছু অস্বস্তি নিয়ে রোমিও ধীরপায়ে উঠে গেল দোতলায়, টানা লম্বা বারান্দা পেরোবার সময় দেখল, বর্ণনার ঘর ভেতর থেকে বন্ধ, কিন্তু ভেতর থেকে ঘুঙুরের আওয়াজ ঝমঝমাচ্ছে বেশ জোরেই। হঠাৎ রাত্রির এই প্রহরে বর্ণনা শুটিঙের মহড়া দিচ্ছে কি না তা বুঝে উঠতে পারল না রোমিও। একটু দূরে নজর করে দেখল, বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে গার্গী আর সায়ন চৌধুরী। দু'জনে সকালে উঠে কোথায় যেন বেরিয়েছিল একটা গাড়ি নিয়ে।

রোমিও বর্ণনার কথাই ভাবতে ভাবতে ডাইনিং পেরিয়ে পেছনদিকের ওপেন এয়ার

লাউঞ্জের একটা কোণের টেবিলে গিয়ে বসল, বেশ দুরূহ কোণ এটি, এখানে তাকে কেউ দেখতে পাবে না, কিন্তু সে দিব্যি লক্ষ করতে পারবে তার টিমের সবাই ডাইনিঙে খেতে আসছে কি না।

রুমেলা রায় ফিরে এসেছেন যখন, নিশ্চয়ই কাল সকালেই শুটিং শুরু হবে, অতএব টিমের সবাই আপাতত প্রস্তুতি নিচ্ছে কাল সকালের প্রোগ্রামে। রোমিওকেও তা হলে প্রস্তুতি নিতে হবে এখন। হয়তো ঋষভ মুখার্জি তাকে খুঁজছেনও অনেকক্ষণ।

ওপেন-এয়ার লাউঞ্জের এই রোজি কর্নার ছেড়ে উঠবে কি উঠবে না এমন ভাবছে রোমিও, হঠাৎ কেউ এসে তার চোখ দুটো টিপে ধরল সজোরে।

হুঁ, কোনও মেয়েলি হাতই।



যে-দুটো নরম হাত তার চোখ চেপে সহসা খিলখিল করে হাসির লহরী ছড়িয়ে দিল ওপেন এয়ার লাউঞ্জ ছাড়িয়ে হোটেল ইনের বহুদূর পর্যন্ত, তা যে বর্ণনারই, বুঝতে বাকি রইল না রোমিওর। প্রায় জোর করেই তার হাতদুটো ছাড়িয়ে চোখমুখে প্রবল রাগ বিছিয়ে বলল, কী হল, হঠাৎ?

রোমিওর পিছন থেকে বর্ণনা হাসি-হাসি মুখে সামনে আসতেই কিন্তু রোমিও একেবারে ফ্ল্যাট। ওপেন এয়ার লাউঞ্জটা হোটেলের অন্যান্য যে-কোনও জায়গা থেকে একটু কম-আলোর, আর আলো-আঁধারি বলেই এই নির্জন জায়গায় বসে থাকাটা রোমিও পছন্দ করে খুব। সেই না-আলো না-অন্ধকার পরিবেশে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে বর্ণনা এতই চমকে দিল রোমিওকে যে, কিছুক্ষণ স্তব্ধ, হতবাক হয়ে রইল সিনেমুভির নতুন ক্যামেরাম্যান। বেমালুম রাগ ভুলে সেইমুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল, এখনই কয়েকটা ফটো তুলে রাখে বর্ণনার।

না, বর্ণনার নয়, রেশমবাইয়ের।

আসলে বর্ণনা এই মুহূর্তে তার সামনে রেশমবাইয়ের ভূমিকায়। তার পরনে চমৎকার বট্‌ল্ গ্রিন রঙের সাটিনের মস্ত ঘাগরা, ওপরে খাটো চোলি, তার ওপর মিহি দোপাট্টা, মাথার চুলেও তেমনই অসাধারণ কারুকাজ। চোখে মুখে ঘন প্রসাধন। রোমিওর সামনে এসে শরীর ঝুঁকিয়ে তিনবার সেলাম জানিয়ে মিষ্টিকণ্ঠে বলল, আদাব।

রোমিও বুঝে উঠতে পারল না, বর্ণনা একটু আগেই রেশমবাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করে ফিরল কি না। অবশ্য ক্যামেরাম্যান রোমিও ছাড়া শুটিং সম্ভব নয় তা সে জানে। তবু ঋষভ মুখার্জি

যা পাগলা-ধরনের মানুষ, হঠাৎ রুমেলা রায় ফিরে আসতেই দু-চারবার 'ক্যামেরা, ক্যামেরা' বলে চিৎকার করে তাকে না পেয়ে হয়তো ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছেন, ঠিক আছে, আমিই ক্যামেরায় বসব, কই, সাইন্ড কোথায়?

রেশমবাইয়ের বেশে বর্ণনা ততক্ষণে এসে বসেছে ক্যামেরার সামনে, মুখে অহংকারীর পোজ দিয়ে বলল, নিশ্চয় মিস্টারের আবার খুব গোঁসা হয়েছে?

রোমিও স্থিরচোখে দেখছিল বর্ণনার হাসি, সাজপোশাক, বসার ভঙ্গিমা। কোনও কথাই অবশ্য বলল না।

বর্ণনা এর মধ্যে ঝুঁকে পড়ে রোমিওর একখানা হাত তুলে নিয়েছে তার হাতের মধ্যে। রোমিওর আঙুলে যে-আংটিটা প্রায় বর্মর মতো পরা থাকে, সেটা আঙুলের চারদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে ফিসফিস করে বলল, কাল রাতে তোমাকে যে আমার রুমে আসতে বলেছিলাম, এলে না কেন?

রোমিও আরও গম্ভীর হয়ে বর্ণনার দুষ্টু-দুষ্টু চোখে চোখ রাখল। কিছুই বলল না এবারও।

—কিছু বলছ না যে! এলে না কেন?

রোমিও খুবই নিস্পৃহ থাকার চেষ্টা করল, সকালে উঠে কোথায় গিয়েছিলে?

বর্ণনা হেসে উঠল, রাগ কি সেইজন্যেই? আঙ্কেলই তো কাল বলেছিলেন, ভরদ্বাজদাকে সঙ্গে নিয়ে লখনউয়ের মার্কেট থেকে ড্রেস পছন্দ করে কিনে আনতে। বাঈজিদের পোশাক। দ্যাখো, বেশ মানিয়েছে না আমাকে?

রোমিও পুনর্বার বর্ণনার শরীরের ওপর চোখ রাখল। বর্ণনা ফিল্ম-লাইনে নতুন, কিন্তু তার শরীরের বাঁধুনি যে বেশ মানানসই, তা স্বীকার করতেই হবে। বর্ণনার অভিনয় সে দেখেনি, দেখেছেন ঋষভদা। যদি অভিনয়ে বর্ণনা উতরে যায় তা হলে এ-মেয়ে ফিল্ম-লাইনে অবশ্যই শাইন করবে। ঋষভদা সে-দিন কথায় কথায় বলছিলেন, মেয়েটা ভাল ফ্লার্ট করতে পারে। রেশমবাইয়ের ভূমিকায় ভালই করবে মনে হয়।

বর্ণনা আবার বলল, তা ছাড়া আমার লিপস্টিক ফুরিয়ে গিয়েছিল।

রোমিওর অতএব আর কিছু বলার থাকতে পারে না। ফিল্ম লাইনে এসেছে যে-মেয়ে সে তো আর অত বাছবিচার করে চলতে পারে না রোমিওর ইচ্ছেমতো।

বর্ণনা পরক্ষণে বলল, তুমি কিন্তু আমার কথার জবাব দাওনি। কেন এলে না কাল রাতে! আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম।

রোমিও হঠাৎ, নিচুগলায় হলেও, প্রায় গর্জন করে উঠল, মিথ্যে কথা।

বর্ণনা একমুহূর্ত থতথত খেয়ে বলল, মিথ্যে কথা!

—হ্যাঁ। আমার জন্য অপেক্ষা করতে তোমার বয়ে গেছে।

—বাহ্‌, তুমি এলেই বুঝতে পারতে, আমি অপেক্ষা করছিলাম কিনা।

রোমিও কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, আমি গিয়েছিলাম।

বর্ণনা তার ফাঁপানো চুল ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, যাহ্‌, মিথ্যে কথা।

রোমিও প্রবল ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, মিথ্যে কথা!

বর্ণনা থতমত খেল আবার, সত্যি এসেছিলে?

—হ্যাঁ, ঘর ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।

—বন্ধ ছিল! কখন বলো তো?

—রাত তখন সাড়ে বারোটার মতো।

—সাড়ে বারোটা! তখন নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছি।

—না, তুমি ঘুমোওনি। তোমার ঘরে অন্য কেউ ছিল, রোমিও তখন প্রবল উত্তেজিত।

বর্ণনা একটুও অপ্রতিভ না হয়ে আশ্চর্য হওয়ার ভান করল, যাঃ, কেউ ছিল না।

রোমিও এবার গর্জন করে উঠল, আমি কারও গলার স্বর শুনেছি। পুরুষ-কণ্ঠ। ভেতরে তখন তোমার ঘুঙুরের শব্দ হচ্ছিল।

বর্ণনা হেসে উঠল হঠাৎ, তার চোখে সেই রহস্যময়তা উথলে ওঠে যা দেখে রোমিও তার প্রেমে পড়েছিল, বলল, তা হলে টেপ চালিয়ে তখন রিহার্সাল দিচ্ছিলাম।

রোমিও অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে থাকে বর্ণনার কৌতুক-উপচানো চোখের দিকে।

সেইরকমই একরাশ কৌতুক ছুড়ে দিয়েই বর্ণনা বলল, দরজা খোলাই ছিল, তুমি ঠেললেই—

বলে হেসে উঠল আবারও, ঠিক আছে, তা হলে আজ রাতে এসো।

রোমিও তখনও বুঝে উঠতে পারছে না বর্ণনাকে। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, সে একটা অদ্ভুত ঘোরের নাম বর্ণনা। মাত্র তিনদিন বর্ণনার সঙ্গে তার আলাপ, আর এই সামান্য ফুরসতে বর্ণনা তাকে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের জগতে একটা তুমুল ঝাঁকুনি দিয়ে চলেছে ক্রমাগত।

বর্ণনা হাসছিল তখনও, বলল, এসে দ্যাখোই না একবার—

রোমিও কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই ওপেন-এয়ার লাউঞ্জে হঠাৎ এসে আবির্ভূত হলেন রানাজি সান্যাল। চিকনের কাজ করা একটা মেরুন রঙের পাঞ্জাবি আর সাদা ধবধবে পাজামায় দারুণ ম্যানালি দেখাচ্ছে রানাজিকে। বর্ণনাকে দেখেই বললেন, এই যে হিরোইন, তোমাকে তখন থেকে খোঁজাখুঁজি করা হচ্ছে, আর তুমি এখানে পালিয়ে এসে দিব্যি আড্ডা মারছ!

বর্ণনা অবাক হয়ে বলল, কে খুঁজছেন?

—ঋষভদা, ওঠো, কুইক।

রোমিও লক্ষ করল, বর্ণনাকে নিয়ে রানাজি কিন্তু ঋষভ মুখার্জির রুমের দিকে গেলেনই না, বাঁক নিলেন সিঁড়ির দিকে। কোনদিকে গেলেন, ওপরে না নীচে, তা এত দূর থেকে ঠিক টাওর করতে পারল না রোমিও। শুধু তার বুকের ভেতরটা চিনচিন করে উঠল হঠাৎ।

হোটেলের প্রশস্ত লনে তখনও সবুজ হাতাটির নীচে রুমেলা রায় ও তাঁর পুরুষ সঙ্গীটি বসে। রোমিও তখনও জানে না রুমেলাকে কী করে খুঁজে পাওয়া গেল, কোথায় গিয়েছিলেন কাকভোরে উঠে, তাঁর সঙ্গের তাগড়াই গোঁফঅলা পুরুষটিই বা কে!

একা-একা কিছুক্ষণ ওপেন-এয়ার লাউঞ্জে সময় কাটিয়ে রোমিও উঠে দাঁড়াল রুমেলা-এপিসোড্টি জানার জন্যে। হয়তো সজনী দত্তই ঠিক খুঁজপেতে ধরে নিয়ে এসেছেন হারানো হিরোইনকে, সঙ্গে আর একটি ফাউও উপহার দিয়েছেন তাঁর উদ্বিগ্ন পরিচালককে। যাই হোক, এখন কখন শুটিং শুরু হবে, সারাদিনের সিডিউল কী, তা জেনে নিতেই পা বাড়াল বারান্দার দিকে।

বারান্দায়, এতক্ষণে দেখল রোমিও, দাঁড়িয়ে আছেন বিবস্বান বসু। পরনে গাঢ় নীলরঙের পাঞ্জাবি আর চোস্ত পাজামা, তাতে তাঁর চমৎকার চেহারাটা আরও ঝলমল করছে। কিন্তু তাঁর নজর নীচে লনের দিকে, যেখানে রুমেলা রায় তাঁর পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে বসে গলা ভেজাচ্ছেন সোনালি পানীয়ে।

সেদিকে বেশি নজর না দিয়ে রোমিও এগোল ঋষভ মুখার্জির কামরার দিকে। ঋষভ তাঁর ঘরেই ছিলেন, সোফায় বসে আছেন বেশ খানিকটা এলোমেলো হয়ে, সামনে সেন্টার-টেবিলে ছড়ানো চিত্রনাট্যের পৃষ্ঠাগুলি। বোঝাই যাচ্ছে, শুটিং শুরু করার আগে আস্তে আস্তে কাহিনীর ভেতর ডুব দিচ্ছেন পরিচালক। দৃশ্যগুলো একের পর এক সাজিয়ে নিচ্ছেন চোখের সামনে, যাতে কাল শুট করার সময় কোনও বিভ্রান্তিতে না পড়েন।

রোমিও নিজেও কি মনে মনে সাজিয়ে নিচ্ছে না শটগুলো! সকালে ঋষভদা তাঁর কাছে যখনই ব্যাখ্যা করছিলেন এক-একটা দৃশ্য, রোমিও-ও তার লেন্সে চোখ না দিয়েও স্পষ্ট দেখতে পারছিল কাহিনীর পুলক চৌধুরিকে, দোতলা কোঠিটি, পানওয়ালাকে।

রোমিওকে দেখেই ঋষভ তাঁর সম্বিত ভেঙে গলা চড়ালেন, কোথায় থাকো, অ্যাঁ?

রোমিও পাল্টা প্রশ্ন করল, কাল সকাল থেকেই শুটিং হচ্ছে?

—তাই তো হওয়া উচিত, না কি?

রোমিও পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করল, একটু নিচু গলায়ই, রুমেলা রায়কে কোথায় পাওয়া গেল!

—কোথায় আবার পাওয়া যাবে! ছিল আশেপাশে কোথাও। বি. বি-কে টাইট দিতে ডুব দিয়েছিল, ফিরে এসেছে দ্বিগুণভাবে টাইট দেবে বলে।

শেষ কথাটা রোমিও অবশ্য ঠিক বুঝে উঠতে পারল না, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ওঁর সঙ্গের ভদ্রলোকটি কে?

ঋষভ তখন একটা সিগারেট ধরিয়েছেন, ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, স্ক্রু।

—স্ক্রু!

—হ্যাঁ, টাইট দেবে বলে নিয়ে এসেছে।

—কাকে টাইট দেবে! রোমিওর তবুও বুঝতে বুঝিবা একটু অসুবিধে হয়।

ঋষভ হঠাৎ সচকিত হয়ে বললেন, হুঁ, কাল সকাল-সকাল রেডি হয়ে নেবে। বাই এইট পজিটিভলি, নো ফারদার ডিলে, রাইট?

রোমিও বেরিয়ে এল ঘাড় নাড়তে নাড়তে। দেখল, তাদের টিমের কয়েকজন ডাইনিঙের দিকে যাচ্ছে রাতের ডিনার খেতে, তাদের পেছনে দ্বিত্বম রায়ও। রোমিও-ও তার সঙ্গ নিল। বারান্দায় বিবস্বান বসুকে কিন্তু আর দেখতে পেল না। নীচে সবুজ ছাতার আরাম ছেড়ে রুমেলা রায় আর তাঁর পুরুষসঙ্গীও অদৃশ্য।

মস্ত ডাইনিঙে তখন আরও অনেক বোর্ডার ছড়িয়েছিটিয়ে মূল্যবান, সুস্বাদু সব খাদ্যদ্রব্যের সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত। চমৎকার গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে, রসনা সিক্ত হয়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল। কিন্তু রোমিওকে এসব কিছুই যেন স্পর্শ করছে না। তার ভেতর-শরীর কী এক বিপুল উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠায় টগু হয়ে আছে।

দ্বিত্বমের সঙ্গে একই টেবিলে বসে সে তার ভেতরের ঘূর্ণায়মান প্রশ্নটি আবার জিজ্ঞাসা করল, রুমেলা রায়ের সঙ্গে যে-ভদ্রলোককে দেখলাম উনি কে?

দ্বিত্বম সব ব্যাপারেই নিস্পৃহ, বরং সে খুব মন দিয়ে খেতে শুরু করেছিল সুগন্ধী আলুমটর। দেরাদুন চালের সাদা ধবধবে ভাত মুহূর্তে সোনালি হয়ে উঠেছে আলুমটর-কারিতে। বলল, কী জানি, বললেন ওঁর বন্ধু। লখনউতেই থাকেন। মিলিটারিতে ক্যাপ্টেন ছিলেন কোনও এক সময়।

—ও, রোমিও-ও সোনালি স্বাদ গ্রহণ করতে করতে বোঝার চেষ্টা করছিল মিলিটারির একদা-ক্যাপ্টেনকে রুমেলা রায় কীভাবে স্ক্রু হিসাবে ব্যবহার করছেন!

ডিনারের শেষে রোমিও আবার কিছুক্ষণের জন্য একা হয়ে গেল। হোটেলের রুমে দ্বিত্বমই তার রুমমেট। পরিচালক, হিরো, হিরোইনরাই একমাত্র হোটেলে এক-একটা করে রুম ব্যবহার করছেন। অন্যেরা শেয়ার করে আছেন ডাব্‌ল-বেডেড রুমে, দুটো আলাদা বেডে। তাতেও রোমিওর কিছুটা নিঃসঙ্গ লাগছে, যেহেতু দ্বিত্বম কথা বলে খুব কম। খুবই ইনট্রোভার্ট, কোনও ঝামেলার মধ্যে যাওয়া পছন্দ করে না সিনেমুভির এই সাউন্ড রেকর্ডিস্ট।

ঘড়িতে তখন সাড়ে দশটার মতো। রোমিও হোটেলের বারান্দায় কিছুক্ষণ দাঁড়াল, নীল আকাশের দিকে তার তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল দুটি চোখ রেখে দেখল, অজস্র নক্ষত্র মিটমিট করে তাকিয়ে দেখছে তার টেনশনে তুমুল-হয়ে-ওঠা শরীরটা, নীচের লন এতক্ষণে ফাঁকা। রাত যত গাঢ় হয়ে আসছে ততই হোটেলচত্বর ঝলমল করে উঠছে ফ্লুরোসেন্ট আলোর রোশনাইয়ে। ক্রমশ নিঝুম হয়ে আসছে গেটের বাইরের প্রধান সড়ক। মাঝেমধ্যে হুশ্‌হুশ্‌ করে বেরিয়ে যাচ্ছে দু-একটা ট্যাক্সি কিংবা অটো। অথবা টুংটাং শব্দ করতে করতে টাঙা। ঘোড়ার খুরের টগবগ শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। কিন্তু সেই টগবগানি পুনর্বার তুমুল হয়ে ফিরে আসছে রোমিওর বুকের ভেতর। একটু দূর থেকে দেখল, বর্ণনার ঘরের দরজা বন্ধ। বন্ধ না ভেজানো, তা সে জানে না। তখন বলেছিল দরজা ভেজানো থাকবে, ঠেললেই—

রোমিওর বুকের ভেতর তখন একশো ঘোড়ার দাপাদাপি। বর্ণনা বলেছিল রোমিওকে দারুণ একটা উপহার দেবে সে, এমন মহার্ঘ উপহার যা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। কী উপহার তা রোমিও জানে না। সে তো গোটা বর্ণনাকেই উপহার হিসেবে চাইবে।

সেই মুহূর্তে সে সচকিত হয়ে দেখল, সিঁড়ির দিক থেকে হঠাৎ রুমেলা রায় দারুণ উচ্ছ্বসিত টলোমলো পায়ে এসে ঢুকলেন বারান্দায়। সঙ্গী সেই পাকানো মোচওয়ালা ক্যাপ্টেন, হিন্দিতে কী যেন বলছেন হাসি হাসি মুখে, আর রুমেলার শরীরের উল্লাস ক্ষণে ক্ষণে ভেঙে পড়ছে হাসির লহর হয়ে। রোমিও বিস্মিত হয়ে দেখল, ক্যাপ্টেনের শক্ত বলিষ্ঠ হাতে রুমেলা রায়ের হাত ধরা। একটু পরে রোমিও আরও বিস্মিত হয়ে দেখল, দু'জনে বাতাসে ঢেউ ছড়াতে ছড়াতে ঢুকে গেলেন রুমেলা রায়ের নির্ধারিত রুমে। ভেতর থেকে দড়াম করে বন্ধ করে দেওয়া হল দরজাটা। এ-হোটেলের সব রুমেই অটোমেটিক লক।

বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজাটার দিকে কয়েক মুহূর্ত অপলক তাকিয়ে রইল রোমিও। তার জিবে একটু আগের চিকেনের স্বাদও এই মুহূর্তে তিত্‌কুটে, অসহনীয় মনে হল, কেন কে জানে। রুমেলা রায়কে এর আগে বহুবার সেলুলয়েডের পর্দায় দেখেছে, কখনও এভাবে সামনাসামনি দেখেনি। না দেখলেই বোধহয় ভাল হত।

হোটেলের লম্বা বারান্দাটা কিছুদূর গিয়ে এল শেপের মতো বেঁকে গেছে ডানদিকে। রোমিও তার শরীরের অস্থিরতা কাটানোর জন্য হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল সেদিকে। বাঁক নিতেই দেখল, ঠিক বাঁকের মুখেই দাঁড়িয়ে আছে গার্গী আর সায়ন। অপ্রস্তুত হয়ে একঝলক হাসল রোমিও। প্রথমে সায়নের দিকে, তারপর গার্গীর দিকে, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, কোথায় যেন গিয়েছিলেন সকালের দিকে?

গার্গী হেসে জবাব দিল, শ্রাবস্তী।

—শ্রাবস্তী! বাহ্, খুব রোমান্টিক জায়গা নিশ্চয়ই।

গার্গী হাসল, সব জায়গাই রোমান্টিক। শুধু যে যে-রকমভাবে দেখে।

রোমিও আর দাঁড়াল না, বাঁক নিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। সব রুমই ভর্তি, ভেতর

থেকে লক করা, নিশ্চয়ই সবাই এখন ঘুমের আয়োজনে ব্যস্ত। আর একটু পরেই গোটা হোটেল-ইন ডুবে যাবে গভীর ঘুমের ভেতর। আর রোমিও—

এগারোটা বাজতে তখনও কিছুটা দেরি দেখে রোমিও বারান্দার রেলিঙে ভর রেখে নীচে, লনের দিকে চোখ রাখল। কিছুটা অন্যমনস্কই ছিল, কিন্তু চমকে উঠল সহসা রানাজি স্যান্যালকে দেখে, রানাজি একা নয় তার সঙ্গে ভরদ্বাজ মুখার্জি। দু'জনের মধ্যে অনুচ্চ স্বরে হলেও কোনও একটা কারণে ক্রুদ্ধভঙ্গিতে কথা-কাটাকাটি চলছে। কী যে তাদের কলহের কারণ তা এত দূর থেকে বুঝে উঠতে পারল না রোমিও। সে হঠাৎ দ্রুত বারান্দা পেরিয়ে এসে বর্ণনার ঘরের সামনে দাঁড়াল, ভেতরে আলো জ্বলছে কি না দেখার চেষ্টা করল, তখনও এগারোটা বাজেনি দেখে দ্রুত নেমে এল নীচে। হোটেলের লনে নেমে ঘুরে চলে এল সেই জায়গাটায় যেখানে একটু আগেই বিবাদে ব্যস্ত ছিলেন রানাজি আর ভরদ্বাজ।

কিন্তু কী আশ্চর্য, দুজনের কেউই আর তখন সেখানে নেই। সমস্ত লনটা ঝলমলে, শুধু এ দিকটাই কেন কে জানে, একটু অন্ধকার। সেই নির্জন অন্ধকারে রোমিও কিছুক্ষণ পোড়োবাড়ির ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইল বেঘোরে। হঠাৎ কী কারণে ভরদ্বাজের সঙ্গে রানাজির এই কথা কাটাকাটি তা পুনর্বার ভাবতে গিয়ে মনে হল, বর্ণনাকে কেন্দ্র করেই তাদের এই ধুমকলহ নয় তো!

উদ্‌ভ্রান্ত এলোমেলো পায়ে আবারও হোটেলের বারান্দায় ফিরে এল রোমিও। একবার নিজের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, দ্বিত্বম তখনও শোয়নি, ঘরের আলো নেভানো, শুধু একটা টেবিল লাইট মৃদু হয়ে জ্বলছে কোণের দিকে, তার মনোরম আলোয় দ্বিত্বম গভীর অভিনিবেশে পড়ছে কী একটা ভারী বই।

রোমিও ততক্ষণে ধীর পায়ে চলে এসেছে বর্ণনার ঘরের সামনে। সেই একই ভাবে বন্ধ দরজাটা, কিন্তু এবার মনে হল ভেতরে আলো জ্বলছে, সেইসঙ্গে ঘুঙুরের রিমঝিম মৃদু আওয়াজ। দরজাটা একটু ঠেলল রোমিও, তার বুকের ভেতর তখন লক্ষ ঘোড়ার দাপানি, শিরশির করছে তার গোটা শরীর, নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসছে ক্রমশ।

কিন্তু দরজাটা ভেতর থেকে লক করা। রোমিও ভাবল, দরজায় নক করবে কি না, আঙুলে টুকটুক শব্দ করার আগেই সে বিস্মিত হয়ে শুনল ভেতরে কোনও পুরুষের কণ্ঠস্বর। রোমিও থমকে দাঁড়াল, কণ্ঠস্বর কোনও টেপরেকর্ডার থেকে বেরুচ্ছে কি না শোনার চেষ্টা করল, কিন্তু বুঝে উঠতে পারল না। তবে গলার স্বর তার চেনা, খুব চেনা। না কি চেনা নয়!

রোমিওর চোয়ালটা সহসা শক্ত হয়ে উঠল প্রবল ক্রোধে, হাতের আঙুলগুলো নিস্‌পিস। কিছুক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর সে চলে এল বারান্দার নির্জন বাঁকটার কাছে। স্তব্ধ নিথর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, ঘর থেকে কেউ বেরোয় কি না, কিংবা থেমে যায় কি না ঘুঙুরের শব্দ।



সকালে ঘুম ভাঙতে অন্যদিনকার চেয়ে বেশ দেরিই হয়ে গেল গার্গীর। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে খুবই অবাক হল কেননা সায়ন তখনও গভীর নিদ্রায়, যা তার একান্ত স্বভাববিরুদ্ধ। অবশ্য একটু থিতু হতে এও ভাবল, ব্যাপারটা তেমন বিস্ময়ের নয়। কাল সারাটা দিনই প্রায় গাড়িতে-গাড়িতে কেটেছে। রাস্তাও সব জায়গায় ভাল তাও নয়, ফলে যা ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে! গাড়ি থেকে রাতে যখন নেমেছিল, এত ক্লান্ত, বিধ্বস্ত যে দাঁড়াতেই পারছিল না তারা। সায়ন নিতান্তই পাগল না-হলে একদিনে এমন দীর্ঘ জার্নি কখনও সম্ভব!

তবু তাদের ঘুমোতে একটু রাতই হয়ে গিয়েছিল ট্রেনের সহযাত্রী সিনেমুভিদের কারণে। ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত গার্গী দেখেছে, একটা অদ্ভুত চোরাস্রোত বয়ে চলেছে টিমটার মধ্যে। কী এক ভীষণ অস্থিরতা ছড়িয়ে গিয়েছে প্রায় সবারই ভেতর যা, বলা ভাল, অস্বাভাবিক।

অথবা রুপোলি পর্দার মানুষদের ভেতর এমন অস্বাভাবিকতা থাকে বলেই হয়তো তাঁরা অসাধারণ, তাইই তাঁরা প্রতি মুহূর্তেই গুঞ্জনের বিষয়বস্তু কিংবা বিনোদনের কাগজে কাভার-স্টোরির উপাদান।

কাল সারাদিন এই অস্থিরতা থেকে দূরে ছিল বলেই বোধহয় সায়ন মুডে ছিল খুব। বেশ রাজা-রাজা মুখ করে দেখছিল লখনউ থেকে প্রধান সড়কগুলি গাঁও-গঞ্জ ফুঁড়ে চলে গেছে এক-একটি ঐতিহাসিক নগরে। লখনউ থেকে গোণ্ডা হয়ে একটি পথ চলে গেছে শ্রাবস্তীর দিকে। অন্য পথ অযোধ্যায়। অযোধ্যার কাছেই ফয়জাবাদ—যে-শহরদুটি কিছুকাল আগেই সংবাদপত্রের হেডলাইন হয়েছিল প্রায় রোজই। আসলে ইতিহাস এমন পরতে পরতে জড়িয়ে আছে এই সব ছোট-বড় নগরীতে যে, এত দীর্ঘ সময় পেরিয়েও বারবার ইতিহাসের পৃষ্ঠা হয়ে উঠতে চায় তারা। যেতে যেতে গাড়ির ড্রাইভার মগন সিং তাদের গাইডও হয়ে উঠেছিল কাল। লখনউ শহর ছেড়ে যখন গাঁওয়ের পথ ধরেছে, হঠাৎই গুনগুন করে উঠেছিল, 'যব ছোড় চলি লখনউ নগরী/কহ হাল আদম প্যারে কা গুজারি...', তখন খাম্বাজে এই লখনউ ঠুমরিটি শুনে কেমন চমকে উঠে সায়ন বলেছিল, বাহ, বেশ গাইছেন তো ড্রাইভারসাহেব।

মগন সিং-এর চেহারাটা চমৎকার। মাথার পিছনে সামান্য বাবরি চুল, বেশ লম্বা, সুঠাম চেহারা, অথচ মুখে পেলব কমনীয়তা। অনায়াসে পুরনো যুগের একজন কবি বলে মেনে নেওয়া যায়। সায়নের মুখে প্রশস্তি শুনে মগন সিং খুশি হয়ে বলেছিল, লখনউ শহরে যে আসে, সে-ই কবি হয়ে যায়, বাবুজি।

সায়ন আরও বিস্মিত, তাই নাকি! কেন?

—লখনউয়ের ইট-কাঠ-পাথরে তো কবিতা ছড়িয়ে আছে, গান ছড়িয়ে আছে। এককালে

এ-শহর তো মুশায়রা আর মেহ্‌ফিলে ভরে থাকত। রাজরাজড়ারা নিজেরাই কবি ছিলেন, গায়ক ছিলেন, তাই কবি-গায়ক-ড্যান্সারদের নিয়েই গড়ে তুলেছিলেন এক রঙিন লখনউ।

সায়ন খুশি হয়ে ওঠে, তুমি এত্ত খবর রাখো, মগন সিং!

—যেমন রকমারকম বাহারি প্রাসাদ আর অট্টালিকার শহর ছিল লখনউ, তেমনই 'শের' বলাটাও ছিল লখনউয়ের ফ্যাশন। এমনকি বোরখা পরা মেয়েরাও শের-শাইরির চর্চা করত। গজল, ঠুমরি, কত্থক, শের, শাইরি, এইসব নিয়েই তো নবাব-বাদশাহ্‌রা মেতে থাকতেন তখন।

বলতে বলতে রাস্তার ধারের ফুটে-থাকা একগুচ্ছ জংলিফুল দেখে আবার চোখ ঢুলু-ঢুলু করে বলল, আয় গুল বতুখুর সনদম তুবু অ্যায় কসে দারী।

গার্গী তৎক্ষণাৎ সেটি বাংলায় তর্জমা করে ফেলল, ও ফুল, ফুল, তোমাকে দেখে কী যে ভাল লাগছে আমার। তোমার শরীরে ও কিসের গন্ধ!

সায়ন সারাটা পথ বেশ মৌজ হয়েছিল মগন সিং-এর ইতিহাসচারিতায়। সব ড্রাইভার তো আর গাইড হিসেবে কাজ করতে পারে না, কেউ কেউ পারে। যে পারে, তার গাড়িতে চড়া কী যে আরামের, কী থ্রিলিং তা গার্গীরা বুঝতে পেরেছে কাল। সায়নের তো ঝোঁক চেপেই গিয়েছিল, সমগ্র হিমালয় সে মগন সিং-এর গাড়িতে চেপেই ঘুরবে, কিন্তু তা যে সম্ভব নয় তা গার্গী কাল বোঝাতে হিমশিম খেয়ে গেছে।

তবে মগন সিং-এর প্রভাবেই বোধহয়, সায়নও বহুক্ষণ অন্যমনস্ক থেকে হঠাৎ নিজের মনে আবৃত্তি করে উঠেছিল, চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।

শুনে গার্গী প্রথমে হতবাক, হঠাৎ কার কথা ভেবে সায়ন এত অন্যমনস্ক, কবি-কবি হয়ে উঠল তা অনুমান করছিল মনে মনে। হয়তো ঐন্দ্রিলার কথা ভেবেই। গার্গী তো তেমন সুন্দরী নয়, যতটা ঐন্দ্রিলা। হয়তো এমন রোমান্টিক মুহূর্তে সায়ন ঐন্দ্রিলার অসাধারণ মুখশ্রীর কথা মনে করে তলিয়ে যাচ্ছিল স্মৃতির গভীরে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর গার্গীকে হতচকিত করে সায়ন আস্তে আস্তে বলল, তোমার ফটোটা কিন্তু ভালই তুলেছিল সিনেমুভির ওই ক্যামেরাম্যান।

—তাই! গার্গী তখনও বিভ্রান্তিতে।

—ফটোতে তোমাকে কিন্তু আরও সুন্দর লাগে। এখন মনে হচ্ছে, কেন যে একটা ক্যামেরা আনিনি আসার সময়!

গার্গী রীতিমতো দ্বিধায় দুলছে তখনও। নিজের লেখাপড়া, অফিস, ব্যবসা নিয়ে এতই নিমগ্ন থাকে সায়ন যে, গার্গীকে নিয়ে কখনও কাব্য করেছে কি না, অথবা ভাল করে কখনও তার দিকে তাকিয়েছেও কি না সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে গার্গীর। আজ হঠাৎ লখনউ এসে সায়নও কবি হয়ে উঠল নাকি!

কাল সারাদিনই এমন তুমুল উচ্ছ্বাসে কেটে গেছে দুজনের। গার্গী ভাবতেই পারেনি, প্রায় জোর করে, কলকাতার হাজারো টানটোন ছিঁড়ে এভাবে বেরিয়ে পড়াটা এতখানি উল্লাসে উসুম হবে। এই কারণেই পায়ের তলায় সরষে রেখে দেওয়াটা সব মানুষের পক্ষেই জরুরি।

শীতাতপ যন্ত্রটি নিভিয়ে, গার্গী জানলা খুলে যখন কতখানি বেলা হল তার হদিস নিতে রত, সহসা বাইরে কীসের হইচই শুনে খুবই কৌতূহলী হল। সায়নকে ডাকবে কি ডাকবে না ভাবতে ভাবতে দ্রুত দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখল এক অদ্ভুত দৃশ্য। সিনেমুভির পুরো টিমটা দারুণ ত্রস্ত হয়ে, বিভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি করছে ওপরে-নীচে। সবারই মুখচোখ ফ্যাকাসে,

অসম্ভব গম্ভীর হয়ে একে অপরকে কিছু বলছে ফিসফিস করে, তারপর টানা বারান্দা পেরিয়ে একবার এ-রুমে, একবার ও-রুমে ঢুকে পরক্ষণে আবার বেরিয়ে ছুটছে সিঁড়ির দিকে। এমনকি রিসেপশনের সুন্দরী মেয়েরাও ছুটতে ছুটতে চলে এল ওপরে। সবাই একবার করে উঁকি দিচ্ছে যে-ঘরটায়, সেটি বর্ণনার।

গার্গী যেমন দ্রুত বেরিয়ে এসেছিল রুমের বাইরে, তেমনই চট করে ফিরে গিয়ে ঘুমন্ত সায়নকে নাড়া দিয়ে ডাকল, এই—

সায়ন গভীর ঘুমে মগ্ন ছিল, গার্গী এভবে অতর্কিতে ঘুম ভাঙানোয় সে হতভম্বের মতো উঠে বসে, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে জানতে চাইল, কী হয়েছে!

—কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই, এসো তো—, সায়ন প্রস্তুত হওয়ার আগেই গার্গী আবার ঘরের বাইরে। ততক্ষণে সিনেমুভির আরও কয়েকজন, সম্ভবত যাঁরা অন্য একটি হোটেলে উঠেছেন, খবর পেয়ে শঙ্কিত চোখেমুখে, প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছাচ্ছেন একে একে। সবাই ভিড় করছেন বর্ণনার ঘরের সামনে। গার্গীও এগিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিতে দেখল এক গা-শিউরানো দৃশ্য।

মেঝের ওপর সটান পড়ে আছে বর্ণনা, সংজ্ঞাহীন। শুধু তা-ই নয়, তার মাথার পিছনে একটা ক্ষত, তা থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরে ভেসে যাচ্ছে সাদা মোজাইকের মেঝে। বর্ণনার শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়ে আছেন রানাজি সান্যাল, আর দ্বিত্বম রায়। বোধহয় পাল্‌স্‌ দেখছে দ্বিত্বম। একপাশে ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে আছে রোমিও দত্তগুপ্ত। বাকিরা শঙ্কিত চোখে দাঁড়িয়ে আছে রুমের মুখে ভিড় করে। গার্গীও উঁকিঝুঁকি মারার চেষ্টা করল, তার মধ্যেই শুনল, দ্বিত্বম বলছে, পাল্‌স্‌ আছে কিন্তু রানাজিদা।

রানাজি পেছন ফিরে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বললেন, কিন্তু সজনীবাবু এখনও ফিরলেন না তো—

রোমিও আস্তে আস্তে বলল, গাড়ি নিয়েই তো গেলেন। সঙ্গে মাচানবাবুকেও দেখলাম।

দ্বিত্বম বলল, এই ভোরবেলা কি ডাক্তার অত চট করে পাওয়া যায়!

একজন টাক-মাথা প্রৌঢ় বললেন, ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা না করে হাসপাতালে পাঠানোই তো ভাল ছিল।

গার্গীর পিছু পিছু সায়নও এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। সায়ন অবশ্য একবার উঁকি দিয়েই পরক্ষণে জায়গা ছেড়ে পিছিয়ে গেল বারান্দার রেলিঙের দিকে, ভোরবেলা ঘুম ভেঙে হঠাৎ এরকম একটা অসহনীয় দৃশ্য দেখার জন্য কেউই ঠিক প্রস্তুত ছিল না, তবু সায়ন একটু বেশিই অস্থির হয়ে পড়েছে মনে হল। হয়তো ঐন্দ্রিলার কথা তার মনে পড়ে গেল সহসা। সেটাই তো স্বাভাবিক।

সায়ন রুমে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ করে গার্গীকেও ইশারা করল, চলে এসো।

কিন্তু গার্গী যাবে কি, তার ভেতরে তখন কৌতূহল উসকে উঠেছে প্রবলভাবে। সায়নকে ইঙ্গিতে রুমে ফিরে যেতে বলে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করে, কী হয়েছে?

—সুইসাইড, ছোট্ট উত্তর কাগজে লিখে রেখে গেছে 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়'।

গার্গীর তখন নজরে পড়েছে, সেন্টার-টেবিলের ওপর অনেকগুলো স্ট্রিপ ছেঁড়া-অবস্থায় পড়ে আছে, কয়েকটা স্ট্রিপ সাদা ঝকঝকে মেঝের ওপরও। তার মানে ঘুমের ট্যাবলেটই খেয়েছে বর্ণনা, সংখ্যায় অনেকগুলি। কিন্তু তাহলেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, এত রক্ত কেন!

হঠাৎ সবাইকে সচকিত করে, হুটারের তীব্র শব্দ তুলে 'হোটেল ইন'-এর গেট পেরিয়ে ঢুকে

পড়ল একটা প্রায়-নতুন অ্যাম্বুলেন্স। হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াতেই মোটাসোটা সজনীবাবু লাফ দিয়ে নেমে সোজা ছুটতে ছুটতে দোতলায়, তাঁর পিছনে রোগা টিঙটিঙে একজন মাঝবয়সী, বোধহয় ইনিই মাচানবাবু। এঁকে ঠিক গত দুতিন দিন দেখেনি গার্গী, এসে বললেন, নার্সিংহোমেই নিয়ে যাই, চলুন। ডাক্তার সেইরকমই অ্যাডভাইস করলেন।

অ্যাম্বুলেন্স আসার শব্দ পেতেই কোথায় ছিলেন ঋষভ মুখার্জি, প্রায় টলতে টলতে এলেন এ-ঘরে, স্তম্ভিত চোখে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন, আমি জানতাম, এরকম কিছু হবে। আমাকে নিঃস্ব করে দেওয়ার জন্যই—

ঋষভ মুখার্জির কনুইতে, কপালে ব্যান্ডেজ করা, চোখমুখ ঘোলাটে। গার্গী যা জানতে পারল, সকালে বর্ণনার এই ঘুমের বড়ি খাওয়ার কথা তাঁকে বলতেই বাথরুম থেকে পড়ে গিয়েছিলেন সপাটে। তখন বাথরুম থেকে বেরুচ্ছিলেন, ঠিক সেসময় দেওয়া হয়েছিল খবরটা। পড়ে গিয়ে কনুইতে আর মাথায় চোট পান। ভরদ্বাজ ছুটে গিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে তৎক্ষণাৎ। কিন্তু চোখে অন্ধকার দেখছিলেন বলে এতক্ষণ উঠতেই পারছিলেন না বিছানা থেকে।

ভরদ্বাজ মুখার্জিও এতক্ষণ পরে হঠাৎ এসে বেশ হম্বিতম্বির মেজাজে শুরু করল, সরুন তো, সরুন তো, হাওয়া ঘরের ভেতর আসতে দিন। যা ভিড় করছেন আপনারা, তাতে সাফোকেশনে এমনিতেই মারা যাবে লোকে। নিন, ধরুন, অ্যাম্বুলেন্সে তুলি—

বর্ণনার পরনে কাল রাতের সেই বাইজিদের পোশাক যা রাতের আলোয় ঝলমল করে খুবই রমণীয় করে তুলেছিল তাকে। বেশ সুন্দরীই বর্ণনা, তার ওপর এরকম ঝলমলে পোশাক তার সৌন্দর্যে একটা অন্য মাত্রা দিয়েছিল রাতের বেলা আজ সকালের এহেন থমথমে মুহূর্তে তার সংজ্ঞাহীন শরীর যেন কালির ছিটেয় ধেবড়ে দিয়েছে সেই অপরূপ সৌন্দর্য। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, অঘোরে ঘুমোচ্ছে বর্ণনা, কিন্তু চোখেমুখে কোথাও একটা যন্ত্রণার ছাপ।

সবাই ধরাধরি করে তাকে দোতলা থেকে একতলায় নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হুস করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

খুব অদ্ভুত লাগছিল গার্গীর, একটা গাঢ় বিষণ্ণতা গভীর হয়ে ঘিরে ধরছিল তার চেতনা। সিনেমুভির গত তিনদিনের চালচলন তার অস্বাভাবিক লাগছিল ঠিকই, কিন্তু এরকম একটা পরিণতিতে পৌঁছবে সিরিয়ালের ভবিষ্যৎ তা ঠিক ভেবে উঠতে পারেনি।

বর্ণনার সঙ্গে চারপাঁচজন গেলেও রোমিও যায়নি। রোমিওর একান্ত হয়ে ভাবার জায়গা ডাইনিঙের পেছনে ওপেন-এয়ার লাউঞ্জ, সেখানেই গিয়ে বসে পড়ল চুপচাপ। ঋষভ মুখার্জি একা-একা ভাবলেশহীন মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলেন অ্যাম্বুলেন্সটির চলে যাওয়া, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বকছিলেন নিজের মনে, তার কয়েক টুকরো বাক্যই মাত্র কানে পৌঁছল গার্গীর, আমার জন্যই এই সবকিছুর জন্যে আমিই দায়ী। আমি সিরিয়াল করতে না চাইলে তো—

একসময় পাথরের মতো শক্ত হয়ে টলতে টলতে গিয়ে সেঁধুলেন তাঁর রুমে। গার্গী আরও খেয়াল করে দেখল, এত যে হইচই, চেঁচামেচি, ভোর থেকে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার আবহ, তার মধ্যে একবারও বিবস্বান বসু তাঁর রুম ছেড়ে বাইরে আসেননি। তাঁর রুমের দরজা অবশ্য খোলা, গার্গী আড়চোখে দেখল, একটা পত্রিকার পৃষ্ঠা খুলে তাতে চোখ রেখেছেন, আর সিগারেটে ধোঁয়া উড়িয়ে চলেছেন গম্ভীরভাবে। তাঁর ঠিক পাশের ঘরেই রুমেলা আর সেই অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন, তাঁরাও প্রথমে বেরোননি, কেবল বর্ণনাকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার মুহূর্তে একবার বারান্দায় বেরিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে পরক্ষণেই ভেতরে ঢুকে লক করে দিয়েছেন দরজা।

গার্গী এরপর চোখ রাখল বর্ণনার রুমটিতে। ডাবল-বেডেড্ রুম। একাই থাকছিল বর্ণনা। তবু তার বিছানায় দুজন থাকারই ব্যবস্থা। বিছানা এলোমেলো, একটু বেশিই এলোমেলো, যেন একটা এলোঝড় বয়ে গেছে বিছানাটার ওপর দিয়ে। সেন্টার-টেবিলের ওপর সিগারেটের শরশয্যা, অ্যাশট্রেটাও ভর্তি। বোঝাই যাচ্ছে তার রুমে অনেকেরই আনাগোনা সারাদিন ধরে। রাতেও কি না তা বোঝা সম্ভব নয় অবশ্য। সে চিন্তা গার্গীর এ-কদিন ছিল না, এখন সে ভাবতে বসল সমস্ত ব্যাপারটা। বর্ণনাকে ঘিরে যে-বিপুল রহস্যময়তা তৈরি হয়েছিল এ কদিনে, তার এরকম একটা বিচিত্র পরিণতির মূলে কি শুধু প্রেম, শরীর, না অন্য কোনও গভীর রহস্য!

গার্গীর জিজ্ঞাসার উত্তরে মাঝবয়সী ভদ্রলোক তখন বলেছিলেন, সুইসাইড করেছে বর্ণনা। একরাশ ঘুমের ট্যাবলেটের খালি স্ট্রিপ তারই জলজ্যান্ত সাক্ষী, তার সঙ্গে কাগজের লেখাটা। কিন্তু মাথার পেছনে যে গভীর ক্ষত, তাই বা কেন তা একে-ওকে জিজ্ঞাসা করে সন্দেহ নিরসন করতে চাইল সে। মাঝবয়সী ভদ্রলোকই বললেন, সম্ভবত একটার পর একটা ঘুমের ট্যাবলেট খেতে খেতে বর্ণনা পায়চারি করছিল ঘরে, ঘুমে ঢুলে আসছিল তার চোখ, তারপর একসময় সটান পড়ে যায় মেঝের ওপর। পড়ার সময় নিশ্চয়ই সেন্টার-টেবিলের কোনা অথবা খাটের ধারে কোথাও সে সজোরে আঘাত পেয়েছিল মাথার পেছনদিকে।

গোটা মেঝেয় রক্তের ধারা দেখতে দেখতে খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল গার্গীর। তার মধ্যেই চোখে পড়ল ঘরের কোণে অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে থাকা দুটি ঘুঙুর। দুটো দুদিকে অবহেলায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে অভিভাবকহীন।

ঘরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কিছুক্ষণ দেখে গার্গী ধ্বস্ত, ক্লান্ত পায়ে ফিরে এল নিজেদের রুমে। সায়ন অনেকক্ষণ আগেই এসে বসে আছে, অন্যমনস্ক। চোখ ধূসর, মুখ বিবর্ণ। কেন, তাও গার্গী অনুমান করতে পারছে, ঐন্দ্রিলার কথা ভেবেই। এমনই এক পারলৌকিক ভোর তার কাছ থেকে ছিনিয়ে গিয়েছিল ঐন্দ্রিলাকে।

গার্গী বুঝে উঠতে পারছিল না বর্ণনা-সংক্রান্ত আলোচনা সায়নের সঙ্গে করবে কি না, করলে তার ভেতর-শরীরের শোক আরও উসকে দেওয়া হবে হয়তো। পরিবর্তে সে বলল, আজ ভুলভুলাইয়ার দিকে যাওয়ার কথা ছিল আমাদের। মগন সিং-এর গাড়ি এসে পড়বে এক্ষুনি। ফোন করে বারণ করে দিলে হত।

সায়ন ঠিক যেন সহজ হতে পারছিল না। সেই মুহূর্তে গার্গীর চোখে পড়ল, একটু দূরে সেন্টার-টেবিলের ওপর দু কাপ গাঢ় রঙের কফি জুড়োতে জুড়োতে আপাতত প্রায় হিমবাহ। আসলে গার্গী অতিকৌতূহলী হয়ে বর্ণনার রুমটির ধ্বংসস্তূপ পর্যবেক্ষণে এতই ব্যস্ত হয়েছিল যে, সকালে যে তারা কফি খায়ইনি তা মনেই ছিল না এতক্ষণ। এখন সম্বিত ফিরতে লজ্জিত হল অপরাধী-অপরাধী মুখে, তৎক্ষণাৎ ডায়াল ঘুরিয়ে কিচেনে পুনর্বার অর্ডার দিল কফির, সেই সঙ্গে সায়নের দিকে তাকিয়ে দুঃখিত ভঙ্গিতে বলে, সরি।

এখন, কেন যেন কফি খেতে ইচ্ছেও করছিল না তার।

একটু পরেই অবশ্য কফির ট্রে চলে এল ধূমায়মান চেহারায়। গার্গীর চোখে পড়ল সাদা ইউনিফর্ম-পরা হোটেলের ওয়েটার কেমন বিচিত্র চাউনিতে জরিপ করছে তাদের। ওয়েটার অবশ্য ভাবতেই পারে যে, সায়ন আর গার্গীও সিনেমুভির সদস্য, এই অদ্ভুত দুর্ঘটনার তারাও অন্যতম অংশীদার।

সায়ন অবশ্য এতসব ডিটেইলস ঠিক খেয়াল করে না, কফির চুমুক তার কাছে টনিকের

মতো, দু চারবার সিপ করতেই সে তার মেজাজ ফিরে পাচ্ছিল দ্রুত, এতক্ষণে সকালের ঝড়ঝঞ্ঝাট ডানা-ঝাপটে ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার মতোই বলে উঠল, ঘরে বসে থাকলে তো শুধু টেনশন, তার চেয়ে ঘুরে এলেই হত।

গার্গী ঘাড় নাড়ল, উঁহু, সেটা ভাল দেখাবে না।

থম হয়ে সায়ন বলল, ওদের টেনশনটা কীরকম আমাদের ভেতরও চারিয়ে গেছে, তাই না!

কফি খাওয়া তখনও শেষ হয়নি, একটু পরেই দু-দুটো খবর এসে পৌঁছল রিসেপশনে, দুটোই দুরকমভাবে টেনশন ফেনিয়ে তুলল গার্গী-সায়নের সঙ্গে সিনেমুভির প্রতিটি সদস্যের ভেতরও। প্রথমে ফোন এল, বর্ণনার অবস্থা খুবই ক্রিটিক্যাল, তার শরীরে প্রচুর রক্ত দিতে হচ্ছে। যারা নার্সিংহোমে গেছেন, তাদের রক্তে না-কুলোলে যারা হোটেলে অপেক্ষা করছে তাদেরও যেতে হবে রক্ত দিতে, সবাই যেন প্রস্তুত থাকে। টেলিফোনটা পেতেই ঋষভ মুখার্জি তড়িঘড়ি প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে গেলেন হোটেল থেকে। বিড়বিড় করতে করতেই, রক্ত লাগলে ওর জন্যে আগে আমিই দেব। আমিই তো ওকে নিয়ে এসেছিলাম এতদূরে—

ঋষভ মুখার্জির সঙ্গে সঙ্গে একই গাড়িতে উঠে বসল রোমিও।

দ্বিতীয় ফোনটির বিবরণে সিনেমুভির সঙ্গে জড়িয়ে গেল সায়ন আর গার্গীও। একটু আগেই কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে ফোন এসেছে লখনউ কোতোয়ালিতে, লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে পুলিশের একটা টিম রওনা দিয়েছে লখনউয়ের উদ্দেশে। ডঃ সুস্নাত তালুকদারের হত্যারহস্যের তদন্ত করতে আসা এই দলটি সিনেমুভির প্রতিটি সদস্যকেই জেরা করতে চায়। বিশেষ করে মহিলা সদস্যদেরই। তাঁরা একজনও যেন হোটেল ছেড়ে বাইরে কোথাও না যান।

রিসেপশনে ফোনটা আসার পরই একজন রিসেপশনিস্ট দ্রুত সংবাদটি চাউর করে দিল সিনেমুভির প্রতিটি রুমেই। একটু পরে কোঁকড়াচুলো রূপসীটি মুখ বাড়াল গার্গীদের রুমেও, সামান্য গম্ভীর হয়ে বলল, আপনারাও আজ কোথাও যাবেন না।

সায়নও গম্ভীর হয়ে বলল, আমরা সিনেমুভির কেউ না।

রিসেপশনিস্ট যুবতী হাসার চেষ্টা করল, আপনাদের নামও নাকি ওদের লিস্টে আছে।

সায়ন আর গার্গী একইসঙ্গে স্বর উচ্চগ্রামে তুলে চেঁচাল, আমাদের নাম!



লখনউয়ের যে-নার্সিহোমটিতে বর্ণনাকে ভোরবেলা ভর্তি করা হয়েছে, সেটির নাম গ্রিন ভিউ নার্সিংহোম। শহরের এমন একটি জায়গায় নার্সিংহোমটির অবস্থান, যার প্রায় চারপাশেই এক-



এক টুকরো সবুজ, তাই এ ধরনের সবুজ নামকরণ। এমন ঝকঝকে চেহারার নার্সিংহোমটিতে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই কিন্তু বর্ণনার শারীরিক অবস্থা দ্রুত অবনতির পথে। ডাক্তার বলেছেন, স্লিপিং পিল খাওয়ার ফলে পেশেন্টের যতটা ক্ষতি হয়েছে, তার চেয়েও বেশি ক্ষতি হয়েছে মাথার পেছনে আঘাত পাওয়ার ফলে। দু' বোতল রক্ত এর মধ্যেই শুষে নিয়েছে তার শরীর, তৃতীয় বোতলের প্রয়োজন হয়ে পড়ায় এবার বেডে শুয়ে পড়ল সাউন্ড রেকর্ডিস্ট দ্বিত্বম রায়।

বর্ণনার মাথায় আঘাত পাওয়ার ঘটনাটি কিন্তু খুবই আলোচিত হচ্ছে এর-ওর মুখে, অবশ্যই ফিসফিসিয়ে। হোটেলের ঘরের মেঝেয় কে যে তাকে প্রথম রক্তাপ্লুত অবস্থায় আবিষ্কার করেছে তা, কী আশ্চর্য, জানা যায়নি, তবে অন্তত ঘণ্টাদুয়েক যে এভাবে রক্তক্ষরণ হয়েছে তার সে-সম্পর্কে ডাক্তার নিশ্চিত। এ-তথ্যও আলোচিত হচ্ছে, বর্ণনার মাথার আঘাত খুব স্বাভাবিক নয়, শুধু পুলিশের ভয়েই চেপে যাওয়া হচ্ছে আসল ঘটনাটা।

ঋষভ মুখার্জি তখনও শূন্য চোখে তাকিয়ে আছেন। যে-কেবিনটির ভেতর সিনেমুভির সিরিয়ালটির একেবারে আনকোরা অভিনেত্রী বর্ণনা সেনগুপ্ত পাঞ্জা লড়ছে মৃত্যুর সঙ্গে, তার বন্ধ দরজাটার দিকে ভাসা-ভাসা চাউনি ছুড়ে একা-একা বিড়বিড় করছে ঋষভ, আমার রক্ত ওর শরীরে যাবে না! এ আবার কী নিয়ম!

ঋষভ মুখার্জিই প্রথমে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন রক্ত দেওয়ার জন্য, কিন্তু তাঁর রক্ত পরীক্ষা করে ডাক্তার অনেকক্ষণ আগেই রায় দিয়েছেন, ডাক্তারিশাস্ত্রের নিয়মে তাঁর রক্ত দেওয়া যাবে না বর্ণনার শরীরে। অতঃপর রানাজি সান্যাল আর রোমিও দত্তগুপ্ত এক-এক বোতল রক্ত দেওয়ার পর এবার দ্বিত্বমের পালা।

এরপর আরও অনেককেই হয়তো রক্ত দিতে হবে জেনে, কোতোয়ালির নির্দেশ অমান্য করে সিনেমুভির প্রায় সব কলাকুশলীই একে-একে এসে ভিড় করেছে গ্রিন ভিউ নার্সিংহোমের সামনে। কিন্তু বর্ণনার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে শোনার পর সবাই এতই উদ্বিগ্ন যে, কী কারণে বর্ণনা আত্মহত্যার চেষ্টা করল, তা নিয়ে একটু আগেও যে-কানাকানি, ফিসফিসানি, হিজবিজ্‌বিজ্‌ চলছিল আপাতত তাতেও নৈঃশব্দ্য। তবে এ-কথাটা তারা আলোচনা করতে পিছপা হয়নি, বিবস্বান বসু বা রুমেলা রায় কেন তাঁদের খোলস থেকে বেরিয়ে একবারের জন্যও এলেন না বর্ণনার এই সংকট মুহূর্তে!

একটু পরেই দ্বিত্বম বেরিয়ে এসে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইল নার্সিংহোমের ছোট্ট করিডোরে বেতের চেয়ারগুলির একটিতে। সে বোধহয় সামান্য সময়, পরক্ষণে কী এক অস্থিরতায় চেয়ার থেকে উঠে পায়ে-পায়ে গিয়ে দাঁড়াল যেখানে সজনীবাবু আর মাচানবাবু কথা বলছেন মৃদুস্বরে। মাচানবাবু সিনেমুভির মেক-আপ ম্যান, সিনেমা-লাইনের একজন অপরিহার্য মানুষ। কথা খুবই কম বলেন, আসলে কথা বলে তাঁর দু'খানি হাত আর চোখ। টালিগঞ্জের ফ্লোরে তাঁর এতই প্রসিদ্ধি যে, তাঁর মেক-আপের গুণে কুরূপাও হয়ে ওঠে প্যারাগন অব বিউটি, অন্ধও রূপান্তরিত হয় চক্ষুষ্মানে। আজ তিনি কিন্তু নিচুস্বরে কথা বলছিলেন সজনীবাবুর সঙ্গে বুঝলেন সজনীবাবু, ফিল্ম-লাইনে এমন একখানা মুখ পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। মেক-আপ করলে ও-মেয়ে অনেক বাঘা-বাঘা হিরোইনকেও নিশ্চিত মাটিতে শুইয়ে দিত একেবারে।

সজনী দত্ত সাধারণত গাঁক-গাঁক করে কথা বলেন, এখন কথা বললেন প্রায় কানে-না-যাওয়ার মতো করে, বাঘ নয়, বাঘিনী বলুন। মেয়েটার ক্যারেকটার যাই হোক, ক্যামেরার সামনে পড়লে কিন্তু ফাটিয়ে দিত তা হলফ করে বলা যায়।

দ্বিত্বম বুঝতে পারছে, বর্ণনা যে ক্রমশ স্রিংক করছে তা অনুমান করে এখনই পাস্টটেন্সে কথা বলা শুরু করে দিয়েছেন ওঁরা। সে-ও একটু আগে ভেতরে গিয়ে দেখে এসেছে, বর্ণনার কেবিনের বাইরে, দরজার ওপরে লাল বিপদসঙ্কেত জ্বলছে। অর্থাৎ পেশেন্টের অবস্থা ভীষণ ক্রিটিক্যাল। ঋষভ মুখার্জি সিগারেট হাতে নিয়ে ভারি অস্থির-অস্থির করছেন তখন থেকে, আর তাঁর মুদ্রাদোষ অনুযায়ী বিড় বিড় করে বকে যাচ্ছেন একা-একা। রানাজি স্যানাল একটা চেয়ারে তাঁর বৃহৎ শরীরটা ধপ করে ফেলে দিয়ে নিঃশব্দে বসে রইলেন বহুক্ষণ। হয়তো রক্ত দিয়ে ভারি ক্লান্ত, তাছাড়া টেনশনে ভুগছেনও খুব। ওদিকে রোমিও দারুণ বিষণ্ণ, বরফস্তব্ধ, দাঁড়িয়ে আছে মাথার রগ টিপে ধরে। হয়তো মাথাটা ধরে থাকবে তার। আর ভরদ্বাজ মুখার্জি কীরকম রক্তচক্ষু করে এর-ওর দিকে তাকাচ্ছে, ভাবখানা এমন যেন অন্যদের কৃতকর্মের জন্যই সুইসাইড করতে হল তাদের অন্যতম হিরোইন বর্ণনাকে।

দ্বিত্বমও কিছুক্ষণ ঝিম হয়ে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে এগোল রোমিওর দিকে, খুব নিচুস্বরে আন্তরিক হল, মাথা ধরেছে?

রোমিও ঘাড় ঝাঁকাল, কথা বলল না।

—মাথা-ধরার ট্যাবলেট খাবে?

রোমিও আবার ঘাড় ঝাঁকিয়ে জানাল, তার দরকার হবে না।

দ্বিত্বম খেয়াল করল, তার দু-চোখে ঝাঁঝ।

বেলা তখন দশটার মতো। অপর্যাপ্ত টেনশন তখন এমনই বিপুলভাবে চারিয়ে গিয়েছে গোটা নার্সিংহোম প্রাঙ্গণে যে স্বরই বেরোচ্ছে না কারও গলা দিয়ে। রানাজি সান্যাল গিয়ে দাঁড়ালেন বিষণ্ণতায় চুরচুর হয়ে থাকা ঋষভ মুখার্জির কাছে, আস্তে আস্তে বললেন, আপনি বরং হোটেলে ফিরে যান, ঋষভদা। আমরা তো এখানে আছি। আপনি আর এই বয়সে এত ধকল নেবেন না!

ঋষভ মুখার্জি সহসা ঝেঁকে উঠলেন, কেন, আমি থাকলে তোমাদের অসুবিধে হচ্ছে?

রানাজি সান্যাল বিব্রত হয়ে বললেন, না, তা নয়, তবে আপনার শরীরটা তো ভাল নেই।

ঋষভ মুখার্জি ততক্ষণে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন, কিন্তু তাতে টান না দিয়ে আঙুলের ফাঁকে তার ছাই ক্রমাগত দীর্ঘকায় হতে দিচ্ছেন অন্যমনস্ক হয়ে।

দ্বিত্বমের মাথার ভেতরটা তখনও ঝিমঝিম করছে, হয়তো নিট এক বোতল রক্ত দেওয়ার কারণেই, পরক্ষণে মনে হল অসম্ভব মানসিক চাপের ফলেও হতে পারে। সে যাই হোক, রক্ত দিয়ে বেড থেকে উঠে আসার পর থেকেই কিন্তু তার ভেতরে একটা অদ্ভুত, অলৌকিক পরিবর্তন অনুভব করছে। কলকাতা থাকলে রুপোলি জগতের এই দুরন্ত টানাপোড়েনের আওতা থেকে নিজেকে যতটা সম্ভব বিচ্ছিন্ন করে রাখত, লখনউ পৌঁছবার পরেও আয়াসসাধ্য চেষ্টা করে চলেছিল সেরকমই। যে-বর্ণনার সঙ্গে একটু হলেও সিনেমুভির এ-ও-সে রঙ্গরসিকতা কিংবা অন্য এট্সেটেরা করতে ছুঁকছুঁক করছিল, সিনেমুভির সহযাত্রী হয়েও দ্বিত্বম কিন্তু দিব্যি এড়িয়ে থাকতে পেরেছিল বর্ণনাকে। অথচ এখন, রক্ত দিয়ে আসার পর যে-মুহূর্তে সে অনুভব করছিল তারই শরীরের রক্ত এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে সেঁধিয়ে যাচ্ছে বর্ণনার শরীরে, তখনই বর্ণনার ওপর কেমন একটা টান, একটা গাঢ় মমত্ববোধ ঘনিয়ে উঠছিল তার ভিতর।

এখন মনে হচ্ছে, এ-সব অসুখ বোধহয় সংক্রামক, রক্তবাহিত। তারও যেন এখন ভালবাসতে ইচ্ছে হচ্ছিল বর্ণনাকে।

দ্বিতম এখনও জানে না, কোনও গূঢ়, অনিবার্য টানাপোড়েনে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিতে হল

ঋষভ মুখার্জির নতুন রিক্রুট এই তরুণীটিকে। কিছু অবশ্যম্ভাবী নাটক, যার এক-একটি দৃশ্যে সিনেমুভির সদস্যরা নায়ক হয়ে উঠছিলেন একের পর এক, সে-নাটকের এক নিস্পৃহ দর্শক ছিল দ্বিত্বম। সে নিজে কখনও নায়ক হয়ে উঠতে চায়নি, পার্শ্বচরিত্রও না, এমনকি দর্শক হতেও তার কোনও স্পৃহা ছিল না, তবু ঘরে টি.ভি অন করা থাকলে যেমন অনিচ্ছায়ও চোখ রাখতে হয় অনেক সময়, সেভাবেই দেখছিল অভূতপূর্ব কাণ্ডভাণ্ড সব। কিন্তু তার পরিণতি যে এতখানি মেলোড্রামার, সেই সঙ্গে বিয়োগান্তকও, তা তার ভাবনার অগম্য ছিল।

গ্রিনভিউ নার্সিংহোমের সামনে তখন সিনেমুভির সদস্যরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সার বেঁধে। প্রত্যেকেই যখন ভাবছে, এবার হয়তো তাদের কাউকে রক্ত দেওয়ার জন্য ডেকে নিয়ে যাবে ভেতরে, ঠিক তখনই অ্যাপ্রনে চোখ-মুখ-শরীর ঢাকা একজন মাঝবয়সী ডাক্তার কেবিনের দরজা খুলে মুখ বাড়ালেন এক রাশ বিষণ্ণতা ছুড়ে দিয়ে, স্যরি।

'দুঃখিত' শব্দটির যে ভয়ঙ্কর একটা অর্থও আছে তা প্রথম মুহূর্তে যেন কারও মগজেই সেঁধুল না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল কিছুক্ষণ, তারপর পিনপতন নিঃস্তব্ধতা কর্কশ, ভারী গলায় ভেঙে ঋষভ মুখার্জিই প্রথম বললেন, বর্ণনাকে যখন সিলেক্ট করেছিলাম, তখন ও কী বলেছিল জানো! বলেছিল, আঙ্কেল, আমি কি পারব। এত বড় রোল। তা শেষ দৃশ্যটাই প্রথমে অভিনয় করে দেখিয়ে দিয়ে গেল, ও পেরেছে।

বলে হা হা করে অদ্ভুতভাবে হাসলেন ঋষভ।

সজনী দত্ত একটু দূরে দাঁড়ানো মাচানবাবুকে ফিসফিস করে বললেন, ওঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে গাড়িতে তুলে দিচ্ছি, আপনি ওঁকে নিয়ে হোটেলে চলে যান। এদিকে এখন অনেক হ্যাপা। বাঘে ধরলে আঠারো ঘা, পুলিশে ধরলে ছত্রিশ। আমাদের এখন হাতে-পায় পুলিশ। ওদিকে কলকাতার পুলিশ, এদিকে লখনউয়ের। এখন পৈতৃক জান নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারব কি না সন্দেহ।

খুব আস্তেই বললেন সজনী দত্ত, তবু দ্বিত্বম শুনে ফেলল প্রতিটি শব্দ। সজনীবাবু খুবই প্র্যাকটিকাল লোক। এখন যেভাবে ফেঁসে গেছে সিনেমুভি টিম, তার কবল থেকে নিস্তার পাওয়া খুবই দুরূহ কর্ম নিঃসন্দেহে।

বর্ণনার মৃত্যুর খবর ততক্ষণে পৌঁছে গেছে কোতোয়ালিতে। কোতোয়ালির কয়েকজন পুলিশ সকালে উঠেই হোটেল ইনে পজিশন নিয়ে নিয়েছে, সিনেমুভির যে-কোনও সদস্যই হাজারো কৈফিয়ত দিয়ে তবে আসতে পারছে নার্সিংহোমের দিকে, তাও অনেকসময় দূর থেকে অনুসরণ করছে পুলিশ। এখন নার্সিংহোমেও এসে পৌঁছল একটা দল। প্রত্যেকেই ভীষণদর্শন, হঠাৎ কলকাতার এক সিনেমা-দলের মধ্যে 'ডালমে কুছ কালা হ্যায়' শুঁকে একেবারে অতিভীষণ হয়ে উঠল মুহূর্তে।

সেদিন প্রায় সন্ধে পর্যন্ত বর্ণনাকে কাটাতে হল মর্গে। তার যা চূড়ান্ত ভোগান্তি হল, দ্বিত্বমদেরও কম নয়। সারাদিন প্রায় সবাই অভুক্ত, টেনশনে টানাটান, চোখের পলকে দেউলে হয়ে যাওয়ার মতো একটা সাংঘাতিক শূন্যতা সবারই মনে। হঠাৎ ঋষভ মুখার্জির পাল্লায় পড়ে এতটা দূরে বেহিসেবীর মতো সিরিয়াল তুলতে এসে যে এতখানি দুর্ভোগ পোয়াতে হবে তা কারও অনুমানেই ছিল না। প্রোডাকশন ম্যানেজার রানাজি সান্যাল প্রথম থেকেই বলে আসছিলেন, এত খরচ করে ফিচারফিল্ম তোলা যদিও বা সম্ভব, সিরিয়াল কখনও নয়। কিন্তু ঋষভ মুখার্জি তো কারও কথাতেই কান দেন না কখনও।

রানাজি সান্যাল আর তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট সজনী দত্ত দুজনেই খুব তুখোড়, নইলে মর্গ থেকে

সন্ধের মধ্যেই লাশ ছাড়িয়ে আনা কখনই সম্ভব হত না এই বিভুঁই দেশে। কিন্তু তারপর যে অবধারিত প্রশ্ন অনেকক্ষণ ধরেই আনাগোনা করছিল এর-ওর মনে, তা হল বর্ণনার সদগতি কোথায় এবং কীভাবে হবে!

খুবই অনিবার্য ভাবনা, এ-ব্যাপারে ঋষভ মুখার্জিকে জিজ্ঞাসা করতেই হল, কেননা বর্ণনার বাবা-মা, নিকট-আত্মীয়দের তো খবরই দেওয়া হয়নি এখনও পর্যন্ত। সকাল থেকে উত্তেজনায়, সংকটে এতই জেরবার ছিল সবাই, খবর দেবেই বা কে!

ঋষভ সেই একইরকম উদ্‌ভ্রান্ত। নিজের মনে বিড়বিড় করলেন, আমি ওর সম্পর্কে কিছুই জানি না, রানাজি জানতে পারে।

রানাজিও এতক্ষণে খুব ভেঙে পড়েছেন এই অতর্কিত দুর্ঘটনায়। সারাদিনে বিধ্বস্ত রানাজি জিজ্ঞাসার উত্তরে যা জানালেন বর্ণনা সম্পর্কে, তা খুবই বিচিত্র। এর আগে ঋষভ শুধু জানিয়েছিলেন, বর্ণনা ডঃ সুস্নাত তালুকদারেরই পরিচিত, তিনিই বর্ণনার অভিনয় দেখিয়েছিলেন ঋষভকে। ঋষভের নির্মীয়মাণ 'সোনালি ঘুঙুর'-এর জন্য তাকে একটা সুযোগ দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে। এক্ষেত্রে অনুরোধ মানে প্রায় আদেশ, যেহেতু ডঃ তালুকদারই ছিলেন সিরিয়ালের প্রধান প্রযোজক। ঋষভের কথামতো অতএব রানাজি যোগাযোগ করেছিলেন বর্ণনার সঙ্গে। ডাঃ তালুকদারের দেওয়া ঠিকানা অনুযায়ী রানাজি খোঁজ করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন, বর্ণনা থাকে দক্ষিণ কলকাতার শহরতলির একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে, একাই। অভিনয়ই তার পেশা, বর্ণনা জানিয়েছিল তাঁকে। তবে রুপোলি পর্দার সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ ইতিপূর্বে ছিল না, সে অভিনয় করত বিভিন্ন অফিস-ক্লাবের নাটকে। অভিনয়টা ভালই করত নিশ্চয়, অন্তত অফিসক্লাবের পক্ষে চলনসই, নইলে সে ডাক এত পেতই বা কী করে, বা একা একজন তরুণী জীবনধারণই বা করত কীভাবে। তা ছাড়া স্বভাবে সে ছিল এতই মিশুকে, এমনই হুল্লোড়বাজ যে, তার সহজচারিতাই তাকে আরও গ্রহণীয় করে তুলেছিল অফিসপাড়ায়।

বর্ণনার জীবনযাপনের এহেন একাকীত্বের প্রেক্ষাপটে এ-প্রশ্নই ঘুরেফিরে এল সবার মনে, তাহলে তার বাবা-মা কিংবা নিকট-আত্মীয়ের খোঁজ করে ঝঞ্ঝাট বাড়ানোই বা কেন। তা ছাড়া কলকাতা পর্যন্ত ডেড-বডি নিয়ে যাওয়াটা তো অপরিসীম ধকল!

অতএব বর্ণনার সদ্‌গতি খুব সহজেই সম্পন্ন হয়ে গেল লখনউয়ের মতো দূরবর্তী বিভুঁয়ে।

সেদিন সন্ধের পর সিনেমুভির গোটা আবহ ভরে উঠছল শ্মশানের শান্তিতে। যে-তরুণী গত তিন-চার দিন প্রবল হুল্লোড়ে, উল্লাসে, রহস্যময়তায় ডুবিয়ে রেখেছিল সমস্ত টিমটাকেই, সে হঠাৎই আরও রহস্যে নিজেকে আবৃত করে ছুটি নিয়ে চলে গেল দূরে, বহুদূরে, যেখান থেকে আর কোনও দিন ফিরে আসা যায় না। কী কারণে তার এই ছুটি নেওয়া তা নিয়ে হয়তো জটিল গবেষণা চলবে অতঃপর, হয়তো দু-একদিন, কিংবা অনেকদিন, তারপর আত্মীয়-পরিজন বিবর্জিত এই রূপসী তরুণী একসময় চলে যাবে বিস্মৃতির পৃষ্ঠায়।

সদ্য ঘটে যাওয়া ঘটনাটা অবশ্য এখনও প্রবলভাবে স্তব্ধ, মুহ্যমান করে রেখেছে সিনেমুভিকে গোটা সন্ধে, গভীর রাত পর্যন্ত কেউ কারও সঙ্গে কথা বলল না। সব্বাই, প্রতিটি কলাকুশলী নিশ্চয়ই মর্গে কাটা-ছেঁড়া হওয়া বর্ণনাকে মনে-মনে পুনর্বার একযোগে কাটা-ছেঁড়া করে চলেছে, সে পোস্টমর্টেম যার-যার নিজস্ব ধারায়, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে।

কিন্তু বর্ণনার শোক পালনের জন্য খুব বেশি ফুরসত পাওয়া গেল না এজন্যেই যে, ততক্ষণে লখনউয়ের পুলিশ তার বৃহৎ থাবা উঁচু করে এসে দাঁড়িয়েছে হোটেল ইনের দরজায়। হঠাৎ

কী দুর্বোধ্য কারণে তাদের টিমের এক সুন্দরী নায়িকা আত্মহত্যা করে বসল, তার যথাযথ জবাবদিহি তো করতেই হবে তাদের। কলকাতার পুলিশ এলে একরকম, তাদের কথাবার্তার ভঙ্গি, ভাষা, জেরার রকম তবু চেনা। কিন্তু এই বিভুঁয়ের আইনরক্ষকরা ঠিক কীরকম তা ভাবতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সবাই।

লখনউয়ের পুলিশকে সামলাতে বসলেন রানাজি সান্যাল আর ভরদ্বাজ মুখার্জি। রানাজি তুখোড় বুদ্ধিমান, সাধারণত প্রোডাকশন ম্যানেজারদের যেমন ম্যানেজ-মাস্টার হতে হয় আর কি, সেই সঙ্গে ভরদ্বাজও যথেষ্ট ফড়ফড়ে হওয়ায়, দুজনে বহুক্ষণ বাঘবন্দি খেললেন পুলিশ-অফিসারদের সঙ্গে। তাতে নিশ্চয়ই একরাশ পাত্তি খেসারত চলে গেল সিনেমুভির, তবু আপাতত নিশ্চিন্তই হওয়া গেল সম্ভবত।

কিন্তু না, খুব একটা নিশ্চিন্তও হওয়া গেল না বোধহয়, কারণ ততক্ষণে রিসেপশনে খবর এসেছে কলকাতা পুলিশের টিমও পৌঁছে গেছে কোতোয়ালিতে। তারা হয়তো এই রাতেই এসে হানা দেবে হোটেল ইনে তাদের সবাইকে ইন্টারোগেট করতে।

হঠাৎ একই সঙ্গে বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়ের ধাক্কায় যেন কাঁপন ধরে যাচ্ছে দ্বিত্বমের শরীরে। একটু আগেই সজনী দত্ত সবাইকে জোরজার করে ডাইনিঙে নিয়ে গিয়ে রাতের খাবার খাইয়ে দিয়েছেন। অন্য সবাই ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়লেও সজনী দত্ত দিব্যি শক্ত আছেন, প্রায় একই ভঙ্গিতে ব্যাটিং করে চলেছেন ট্রেনে ওঠার সময় থেকেই। ডিনারের পর শরীরে একটু জোর পেলেও মনে জোর পাচ্ছে না দ্বিত্বম। নীচে লনে গিয়ে এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে তার চোখ পড়ল রোমিওর দিকে। রোমিও আজ পাথরমুখ হয়ে, কেমন অবিন্যস্তের মতো কাটিয়েছে সারাটা দিন। এখন তার মুখ নিভে যাওয়া শ্মশানের চুল্লির মতো। দ্বিত্বমের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হিসহিস করে বলল, বর্ণনাকে কেন চলে যেতে হল, তুমি জান!

দ্বিত্বম অবাক হয়ে বলল, আমি কী করে জানব!

রোমিও হেসে উঠল অস্বস্তিকরভাবে, মেয়েটা ভারি অদ্ভুত ছিল, তাই না!

দ্বিত্বম বুঝে উঠতে পারল না, রোমিও ঠিক কী বলতে চাইছে। রোমিওর চোখে চোখ রেখে বলল, অদ্ভুত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

রোমিওকে খুব অস্থির-অস্থির দেখাচ্ছিল, লনের চেয়ারে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল অনেকক্ষণ, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে করতে থমকে দাঁড়াল দ্বিত্বমের কাছে, কে একজন মাস্তান চেহারার লোক না কি কাল কলকাতা থেকে এসেছিল!

দ্বিত্বম ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

—সে নাকি বর্ণনার খোঁজ করছিল?

—হ্যাঁ। রিসেপশনে জিজ্ঞাসা করছিল, বর্ণনা সেনগুপ্ত এই হোটেলে উঠেছে কি না।

—কেন জিজ্ঞাসা করছিল!

—তা আমি কী করে জানব!

রোমিও তার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, কাল অনেক রাতে হোটেলের গেটে এরকম একজন লোককে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, তখন আমি বারান্দায়।

—তাই!

—হ্যাঁ। ভাবলাম নীচে গিয়ে ধরব লোকটাকে, কিন্তু নীচে নেমে গেটের কাছে যেতে যেতে দেখি সে নেই।

দ্বিতম অবাক হচ্ছিল, তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করছিল রোমিওর চোখ মুখ, হঠাৎ বলল, তুমি কিন্তু কাল অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় শুতে আসনি।

রোমিও ঘাড় নাড়ল, না।

দ্বিত্বম সহসা কিছুটা তীব্রস্বরে বলল,ও কোথায় ছিলে অত রাত পর্যন্ত!

রোমিও থমকালো একলহমা, তারপর কীরকম কর্কশ কণ্ঠে বলল, তা জেনে তোমার কী কাজ!

দ্বিত্বম কথা বাড়াল না। রোমিওকে ভারি অদ্ভুত, রহস্যময় লাগছিল তার। কেমন যেন নিঃস্বও মনে হচ্ছিল। দ্বিত্বমের শরীরেও তখন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ছিল ক্লান্তির পাহাড়। সারাদিনের টেনশনে, পরিশ্রমে বেশ ভারী হয়ে উঠেছে শরীরটা।

লন থেকে বেরিয়ে কিছুটা এগিয়েছে তার রুমের দিকে যাবে বলে, সেসময় রিসেপশনের কাছাকাছি দেখতে পেল রোগা, টিঙটিঙে মাচানবাবুর সঙ্গে। মাচানবাবুর শিরা-বেরুনো হাতের তালুতে একটা কাগজের পুঁটুলি, তাতে কী আছে জিজ্ঞাসা করতেই মাচানবাবু পুঁটুলিটা খুলে দেখালেন, তার ভিতর একটা ঝকঝকে সোনার চেন, তার লকেটে যিশুর মূর্তি। পুঁটুলিতে একটা সোনার আংটিও। আংটিটা মিনে করা, তার মধ্যে ইংরেজি 'আর' শব্দটি লেখা। দ্বিত্বম বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় পেলেন এগুলো!

—বর্ণনার শরীরে। মর্গে ঢোকানোর আগে তার আঙুল আর গলা থেকে খুলে নিয়েছিলাম।

বলতে বলতে মুচকি হাসলেন মাচানবাবু, ফিসফিস করে বললেন, লখনউ স্পেশ্যাল।

—মানে!

—লখনউয়ে আসার পর তার প্রেমিকদের কাছ থেকে গিফট্ হিসেবে পেয়েছে। বেশ শাহেন-শা মেয়ে তো।

দ্বিত্বমের গলার স্বর যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে ক্রমশ। ভরদ্বাজ মুখার্জির গলায় এ ধরনের একটা হার সবসময়েই পরা থাকে তা নজরে পড়েছে তার। কিন্তু আংটিটা কে দিল বর্ণনাকে! 'আর' মানে কি রানাজি। না কি রোমিও!



পুলিশের বিনা অনুমতিতে হোটেলের বাইরেই বেরুনো নিষেধ এমন একটি অদ্ভুত ফতোয়া জারি হতে খুবই ক্রুদ্ধ দেখাল সায়নকে। আজই তাদের লখনউ-বাসের শেষ রজনী। কাল অবশ্য দিনের বেলাটা থাকবে, রাতে রওনা হয়ে যাওয়ার কথা গহন হিমালয়ের উদ্দেশে।

সেরকমভাবেই টিকিট কাটা, হঠাৎ এই অনাবশ্যক পুলিশি-জুলুম রীতিমতো বিপর্যস্ত করে দিল তাদের ভ্রমণ-শিডিউল। কোথায় কে এক ডঃ সুস্নাত তালুকদার, তাঁর সঙ্গে সামান্যতম যোগসূত্রও নেই তাদের, অথচ তাঁরই হত্যার জের ধরে কলকাতা-পুলিশ সায়ন-গার্গীকে হোটেলে অন্তরিণ করে দিল, কোনও সভ্য জগতে এ ঘটনা ঘটতে পারে তা ভাবতেই পারে না সায়ন।

গার্গীও বিস্মিত হচ্ছিল কম নয়। সারাদিন গোটা সিনেমুভি টিমের ওপর দিয়ে যে-বিপুল ঝড়ঝঞ্ঝাট বয়ে গেল, সে-ঝড়ের খেসারত হল বর্ণনা সেনগুপ্তর অস্বাভাবিক মৃত্যু দিয়ে। অবশ্যই অভাবনীয় মৃত্যু, তার ধকল গার্গীদের ওপরও তো কম গেল না! বর্ণনার জন্য কেন কে জানে খুব কষ্টও হচ্ছিল গার্গীর। আরও মন খারাপ সিনেমুভির সিরিয়ালটির অকালমৃত্যুর কথা ভেবে।

সে যাই হোক, গার্গী তখন গভীরভাবে ভেবে চলেছিল আত্মহত্যার প্রেক্ষাপট। কিছু কিছু মেয়ে আছে যারা একইসঙ্গে বহুজনের সঙ্গে মেশামিশি করতে পারে, নিঃসঙ্কোচে, কোনও পূর্বাপর জটিলতার কথা-না ভেবেই। না-ভাবার কারণেই তারা অকারণে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে হাজারো জটিলতা, যার জের মেটাতে কখনও খুন হয় সেই বহু-অঙ্ক নাটকের কুশীলবদের কেউ, কখনও পরিণতি এ-ধরনের আত্মহত্যায়।

বর্ণনার আত্মহত্যার অন্তরালে কার বা কাদের অবদান, সে ময়নাতদন্তে এগোলে হয়তো প্রকাশিত হবে কোনও বিচিত্র কাহিনী, কোনও নতুনতর পটভূমিকা। তবে গার্গী কৌতূহলী এই কারণে যে, গত কয়েকদিনের আশ্চর্য ঘটনাবলির এক বড় অংশের চাক্ষুষ সাক্ষী সে নিজেই, তা ছাড়াও যে-কাহিনী সে জানে না, তারও কিছু অবশ্যম্ভাবী ঝাপট সুদুর কলকাতা থেকে এসে আছড়ে পড়েছে লখনউয়ের এই অভিজাত হোটেলটির আবহে। তার একটি হল, গতকাল প্রায় সারাদিনই নাকি একজন মাস্তান-চেহারার লোক বর্ণনা সেনগুপ্তের খোঁজে উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে হোটেল-চত্বরে। সেই মাস্তান লোকটির সঙ্গে বর্ণনার কী সম্পর্ক তা এখনও উদঘাটিত হয়নি, তবে আরও একটি খবর গার্গী লিংক করতে পারছে না এই ঘটনাটির সঙ্গে তা হল, গত ছয় সেপ্টেম্বরের বাংলা কাগজ পড়ে রোমিও জেনেছে, ডঃ সুস্নাত তালুকদারের দুই ভাইপো ইতিমধ্যেই অকৃতদার জ্যাঠার সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে লাঠালাঠি করেছে, তাতে একজন আপাতত জেল-হাজতে, অন্যজন উধাও। যে-ব্যক্তি উধাও সে নাকি ব্যবসায়ী ওরফে অ্যান্টিসোস্যাল, সে-ই কোনও কারণে নিজে এসে অথবা শাগরেদ পাঠিয়ে বর্ণনার খোঁজ করছে কি না সেটাই গার্গীর অন্যতম সন্দেহ।

কলকাতা থেকে আরও একটি যে-এলোঝড় এই মুহূর্তে লখনউয়ে উপস্থিত তা হল, লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে একটি টিম ডঃ তালুকদারের হত্যার রহস্যের কিনারা করতে সিনেমুভির সদস্যদের জেরা করবে, বিশেষ করে তার মহিলা-সদস্যদের।

বর্ণনার আত্মহত্যার কারণ ঠিক এই ঝড়ঝাপটের পরিপ্রেক্ষিতেই কি না তা অবশ্যই ভাবনার বিষয়। সায়নের সঙ্গে এ নিয়ে একটা চুলচেরা আলোচনা করবে এমনই ভাবছিল গার্গী, কিন্তু ঠিক ভরসা পেল না, তাদের হিমালয়-অভিযান আপাতত বেস-ক্যাম্পে পৌঁছেই ভণ্ডুল হতে বসেছে দেখে সায়ন দারুণ ফিউরিয়াস।

আলোচনা অতএব মুলতবি রেখে গার্গী বারান্দার রেলিঙে কনুই ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখছিল, রাত্রি গভীর হয়ে আসছে, তবু সিনেমুভির কলাকুশলীরা কেউ-কেউ বিভ্রান্তের মতো ঘোরাঘুরি করছে হোটেলের প্রশস্ত লনে। যেন সবাই এক আকস্মিক বাজপতনে স্তব্ধ, স্তম্ভিত, আপাতত কী তাদের ভবিতব্য, কোন সমস্যার জটাজালে জড়িয়ে পড়ছে বা.পড়তে পারে ভেবে

দিশেহারা। একটার পর একটা গ্রহ তাদের ছকে বক্রী হয়ে তছনছ করে দিচ্ছে রুপালি-পর্দার মায়াজাল।

রাত তখন প্রায় এগারোটা হবে, প্রায় জনবিরল হয়ে এসেছে লখনউয়ের প্রধান এলাকা, সেসময় রিসেপশন থেকে একজন সুপুরুষ যুবক দোতলায় এসে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গার্গীকে মৃদু গলায় বলল, ম্যাডাম, এ মেসেজ ফর ইউ ফ্রম পুলিশ।

—মেসেজ! গার্গী চমকে উঠল কেন যেন, পরক্ষণেই কাগজটা হাতে নিয়ে দু-লাইনের বার্তাটিতে নজর বুলোতেই শিউরে উঠল তার শরীর।

বার্তাটিতে যা লেখা তাতে কোতোয়ালিতে তলব হয়েছে গার্গী চৌধুরির। এখ্খুই।

বিস্ময়ে চোখের পলক পড়ছিল না গার্গীর। সায়ন এ-সব বিষয়ে একটু বেশিই নার্ভাস, হঠাৎ এত রাতে গার্গীর কেনই বা তলব হল পুলিশের কাছে, ভেবে নিশ্চয় মাথাটা পাগল-পাগল হয়ে যাবে তার। অতএব সায়নকে আপাতত কিছু না জানিয়ে রিসেপশনের ভদ্রলোককে বেশ মাথা ঠাণ্ডা করে বলল, দেখুন, এত রাতে একজন মহিলাকে বিনা অপরাধে থানায় ডেকে পাঠানোর কোনও এক্তিয়ার নেই পুলিশের। আপনি ফোন করে থানায় জানিয়ে দিন, আজ রাতে কোনও কথাই হবে না। যদি ওঁদের সত্যিই কোনও প্রয়োজন থাকে তো কাল সকালে হোটেলে এসে আমাকে যা জিজ্ঞাসা করার তা করবেন। ও, কে?

রিসেপশনিস্ট যুবকটিও বিভ্রান্ত। বিভ্রান্ত হতে বাধ্য কেননা তারাও তো একের পর এক দ্ব্যর্থক, রহস্যময় খবরাখবর পাচ্ছে পুলিশের তরফ থেকে। হোটেল-ম্যানেজমেন্টের কাছে সিনেমুভির সমস্ত বোর্ডাররাই আপাতত একটা বোঝা। রাখতেও চাইছে না, বার করে দিতেও পারছে না পুলিশের নির্দেশে। কলকাতায় একটি হত্যার ঘটনা অনুসরণ করে কলকাতা-পুলিশ লখনউ এসে পৌঁছেছে সিনেমুভির সদস্যদের জেরা করতে। তার আগেই একটি তরুণীর রহস্যজনক আত্মহত্যা। সব মিলিয়ে সিনেমুভির সব সদস্যই আপাতত হোটেল-ম্যানেজমেন্টের চোখে প্রায় খুনি। সিনেমুভির সঙ্গে একই ট্রেনে, একই বগিতে আসা, একই হোটেলে পাশাপাশি রুমে অবস্থান করা সায়ন-গার্গীকেও আর সন্দেহের বাইরে রাখছে না ওরা।

গার্গীর মেসেজ বুঝে নিয়ে যুবকটি যেভাবে দ্রুত পায়ে এসেছিল, তেমনই চটজলদি নেমে গেল নীচে।

রুমের ভেতর ফিরে গিয়ে গার্গী দেখল, সায়ন তখনও গভীরভাবে চিন্তিত। হঠাৎ পুলিশ কেন তাদের অন্তরিন করেছে তা ভেবে ভেবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার কপালের বলিরেখা। গার্গী অবশ্য তাকে বোঝাতে চাইল হোটেল-রিসেপশনিস্টের ভুলের জন্যই জট পাকিয়ে গেছে পুরো ব্যাপারটা। নীচে রিসেপশনে কাগজপত্র দেখে যা জেনে এসেছে, তাতে এই ভুল-বোঝাবুঝির পর্বটা পরিষ্কার হয়ে গেছে তার কাছে। কিন্তু পুলিশের কাছে এখনও সেটা ঠিকঠাক বোঝানো হয়নি। পুলিশকে সব খুলে বললেই তারা মুক্তি পাবে বেস-ক্যাম্প লখনউ থেকে।

সায়ন তখনও মুখ গোঁজ করে বসে, বলল, কিন্তু কাল সন্ধের পরই যে ট্রেনে চাপার কথা আমাদের।

গার্গী তা জানেও। সায়ন আসলে আরও বিরক্ত বোধ করছে, হোটেল ইনে ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক ঘটনাবলির জটাজালে অহেতুক জড়িয়ে পড়ায়। যদিও গার্গী তার মধ্যে গন্ধ পাচ্ছে কোনও একটা অদৃশ্য হাতের কারিকুরি যা মোটেই সন্দেহমুক্ত নয়।

তবু গার্গী তাকে আশ্বস্ত করে, কাল সকালে নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করা যাবে। তুমি নিশ্চিন্তে

ঘুমোতে যেতে পারো। আর যাওয়া যদি দু-একদিন পিছিয়েই যায়, তাহলে কী আর করা যাবে বলো!

একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়েই অতএব বিছানায় শরীর ঢেলে দেয় সায়ন। গার্গীও কম দুশ্চিন্তায় নেই যেহেতু প্রতিমুহূর্তেই তার মনে হচ্ছিল, লালবাজারের কোনও পুলিশ-অফিসার হঠাৎ এই গভীর রাতে উদিত হয়ে, নানান উল্টোপাল্টা জেরা করে সায়নের রাতের ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দেবে। কিন্তু থ্যাঙ্ক গড, সে-রাতে আইনরক্ষকদের বোধহয় অশেষ সুমতি হওয়ায় কেউই বিরক্ত করতে আসেনি তাদের!

গার্গী যদিও নিশ্চিন্ত ছিল, পুলিশ নিতান্তই ভুলক্রমে তাদের জেরা করতে চাইছে, হোটেলে এলেই, বা তাদের সঙ্গে কথা বললেই তারা ভ্রম-সংশোধন করে নেবে তৎক্ষণাৎ, তবু পুলিশি তদন্তের ব্যাপারে তার তেমন আস্থা নেই কোনও দিনই। হয়তো তাদের নামেও কোনও কেস রুজু করে দেবে, যেমন দিয়েছিল ঐন্দ্রিলাহত্যার কেসেও।

সে-রাতে কিছুটা ঘুম, কিছুটা ঘুমহীনতায় কেটে গেল গার্গীর, কিন্তু কী আশ্চর্য, যে-সায়ন শোওয়ার আগে নানান দুশ্চিন্তায় তোলপাড় হচ্ছিল, সে দিব্যি এত বড় রাতটা পার করে দিল কুম্ভকর্ণের ভূমিকায়।

সকালে ঘুম ভেঙে কফির পেয়ালায় নিজেদের উৎসর্গীকৃত করে সায়ন বলল, তিনতিনটে দিন বেঘোরে কেটে গেল, ভুলভুলাইয়াটাই দেখা হল না কিন্তু—

—আর ভুলভুলাইয়া। যা ঝামেলা যাচ্ছে, তাতে নিজেদের নামই তো ভুলতে বসেছি।

সায়ন ঠোঁট থেকে কফির কাপ নামায়, কেন, আর কোনও সমস্যা হয়েছে!

—হতে পারত। নেহাত কাল অত রাতে থানায় যেতে চাইনি বলেই রাতটা নিরুপদ্রবে ঘুমুতে পারলে।

—কেন, কেন! সায়ন উদ্বিগ্ন হয়।

গার্গী হাসতে হাসতে কাল রাতের পুলিশি-বার্তার কথা বিবৃত করতেই সায়নের মুখে ঘন আষাঢ়, সে কী! আমাকে তুমি বলোনি কেন কথাটা!

—প্রয়োজন মনে হয়নি বলেই বলিনি। আমরা এ-ঘটনার সাতে নেই পাঁচেও নেই, দুশ্চিন্তা করে রাতের ঘুম নষ্ট করতে যাব কোন দুঃখে।

—পুলিশকে তো তুমি ঠিকমতো চেনো না, গার্গী, সায়ন গম্ভীর হয়, এমন অদ্ভুত কায়দায় কেসটা সাজিয়ে দেবে, তাতে প্রমাণ করতে চাইবে ডঃ সুস্নাত তালুকদারকে আমরাই খুন করে ট্রেনে চেপেছি। হয়তো এমনও হতে পারে, পুলিশ ইতিমধ্যে আমাদের ফ্ল্যাট রেড করে দুটো পাইপগান আর ছ-রাউন্ড ছররা গুলি, কিংবা হয়তো দু'খানা ভোজালি, বা আস্ত একটা পিস্তলই উদ্ধার করে এনেছে।

গার্গী হাসছিল প্রবলভাবে। ঘরপোড়া গরুর মতো সায়নের এই পুলিশাতঙ্ক হওয়াটাই স্বাভাবিক যেহেতু টানা কয়েকমাস ঐন্দ্রিলাহত্যার ব্যাপারে তাকে হয়রান করে ছেড়েছে ওরা।

কফির পাট চুকে গেলে সায়ন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে ফোন করে খোঁজ করল মগন সিং-এর। মগন সিং গতকালও একবার এসে ঘুরে গেছে এই কলকাত্তাইয়া কাপ্‌ল্‌কে তার গাড়িতে চড়িয়ে গোটা লখনউ শহর ঘোরাবে বলে। কাল হোটেল ইন গোটা দিনই টেনশনে চুর চুর ছিল বর্ণনাকে নিয়ে, অথচ আজ বর্ণনা ইতিমধ্যেই স্মৃতি। তার কথা ভেবেই গার্গীর ইচ্ছে করছিল না বেরোতে। তা ছাড়া সে এও আশঙ্কা করছিল, পুলিশ তাদের লম্বা নাক বাড়িয়ে যে-

কোনও মুহূর্তেই গার্গীদের জেরা করতে চলে আসবে হোটেলে। সায়নকে অতএব নিষেধ করল এখনই মগন সিং-এর মুখে শায়ের শোনার জন্য পাগল না হয়ে উঠতে। আগে পুলিশ-এপিসোড তো শেষ হোক।

একটু পরেই নীচে নেমে, হোটেলের রিসেপশনে গিয়ে গার্গী খবর নিল, কাল রাতের পর কোতোয়ালির তরফ থেকে তাদের আর তত্ত্বতালাশ করেছিল কি না। করেনি শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হল, কিছুটা আবার হলও না এই ভেবে যে, তার এই অপার ঔদ্ধত্যে আবার গোঁসা হতে পারে পুলিশবাবুদের। খ্যাপা পুলিশ আবার দ্বিগুণ সাংঘাতিক।

পরক্ষণে লাউঞ্জের এক নিভৃত কোনে চোখ পড়তেই বেশ অবাক হল, কেননা সেখানে তখন ভারী নিচুস্বরে সংঘটিত হয়ে চলেছে সিনেমুভির কয়েকজন মাথা-মাথা সদস্যের গম্ভীর মিটিং। সবাইকে চেনে না গার্গী, অনেকের মধ্যে রানাজি সান্যাল, ভরদ্বাজ মুখার্জি আর রোমিও দত্তগুপ্ত খুব ঘন হয়ে বসে কোনও গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। হয়তো বর্ণনার এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর পোস্টমর্টেম চলছে, অথবা আরও যে গভীরতর সংকট ঘনিয়ে এসেছে লালবাজারের ডিটেকটিভদের আগমনে, তাদের মোকাবিলা কীভাবে করা হবে তারই ঘোর আলোচনা, কিংবা তাদের সিরিয়ালের ভবিষ্যৎ-ভাবনাও।

সে-দৃশ্যের দিকে কিছুক্ষণ তার এক্স-রে চোখ বুলিয়ে গার্গী দ্রুতপায়ে চলে এল রিসেপশনে। এবারে খবর নিয়ে জানতে পারল, কলকাতার পুলিশ সায়ন আর গার্গীকে রাতের মতো ছাড় দিলেও সিনেমুভির প্রতিটি সদস্যকেই কোতোয়ালিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে জেরা করেছে গভীর রাত পর্যন্ত। গার্গী যে ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে, সিনেমুভির কারও সে সাহস হয়নি যে উপেক্ষা করবে রাতের পুলিশি-আমন্ত্রণ। শুধু তাদের জেরা করেই রেহাই দিয়েছে তা নয়, শেষরাতে হোটেলে এসে তন্নতন্ন তল্লাশি করেছে বর্ণনার ঘরটি। কিছু জিনিসপত্র সিজও করেছে, জানালো রিসেপশন। আরও জানালো, রাতে গ্রেপ্তার হয়নি কেউ, তবে হোটেল ছেড়ে কারও বেরুবার অনুমতি দেয়নি এখনও।

গার্গীর একটু আফসোস হল এই ভেবে যে, তল্লাশিতে কী কী সিজ হল তা জানতে পারলে সুবিধে হত তার। তবে কেউ গ্রেপ্তার হয়নি শুনে স্বস্তি পেল যেন।

সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো খবরটা সায়নকে দিয়ে আপাতত শান্ত করবে ভেবে গার্গী সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছে, সহসা পেছনে কার যেন ডাক শুনল, ম্যাডাম।

গার্গী চমকে পেছনে ফিরতেই দেখে, খুবই এলোমেলো চুল-চোখ-মুখ নিয়ে তার পিছু পিছু আসছে রোমিও। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার, শুনলাম সারারাত পুলিশ জেরা করেছে আপনাদের।

—হ্যাঁ। রোমিওর চোখেমুখে কিছুটা স্বস্তি, তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু পায়নি পুলিশ। তবে ডাক্তারের এক ভাইপো নাকি লখনউ এসেছে বলে তাদের কাছে খবর, তাকেই খুঁজছে আপাতত।

—তাহলে তো আপনাদের পক্ষে ভাল খবর।

—আর ভাল খবর! রোমিও তার ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে একবার হাতের তালু বুলিয়ে নেয়, যে কাজ নিয়ে এসেছিলাম, তা তছনছ হয়ে গেল সব।

—তা বটে, গার্গী সহানুভূতির স্বর এনে ফেলল গলায়, আসলে পর-পর এমন সব বাধা এসে গেল আপনাদের প্রোজেক্টে।

রোমিও ঘাড় নাড়ল, তবু সব বাধাই তো কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম। কিন্তু কালকের

ইনসিডেন্ট আমাদের সবাইকার কাছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বাধা হয়ে দাঁড়াল। একটা ইম্পর্ট্যান্ট রোলই তো চলে গেল—

—খুব বড় রোল ছিল নাকি ওর!

—তা কম নয়। প্রথম অর্ধেকের সবটাই তো রেশমবাইয়ের। রুমেলা রায়ের রোল শুরু হবে অর্ধেকের পর থেকে। সেইজন্যেই তো খুব অসুবিধে হয়ে গেল।

—তাহলে এখন কি ফিরে যাচ্ছেন কলকাতায়?

—যাওয়াই তো উচিত, ম্যাডাম। দুই হিরোইনের একজন যদি না থাকে, শুটিং হবেই বা কী করে!

গার্গী অবাক হয়ে বলল, শুটিঙের কথা এখনও আপনারা ভাবছেন নাকি!

—ভাবা তো ছেড়েই দিয়েছিলাম কাল পর্যন্ত। কিন্তু, রোমিও কথা বলতে বলতে গার্গীকে নিয়ে গেল ডাইনিঙের ওপাশে ওপেন-এয়ার লাউঞ্জে, বলল, কিন্তু ঋষভদাকে নিয়ে ভীষণ মুশকিলে পড়ে গেছি।

—তাঁর আবার কী হল!

ভীষণ ভেঙে পড়েছেন ঋষভদা। বারবার পাগলের মতো বিড়বিড় করে বকছেন, সিরিয়াল তৈরি করতে চাওয়াটাই আমার কাল হল। লখনউ না এলে তো এই দুর্ঘটনাটা ঘটত না। সবাই মিলে আমার সিরিয়ালটা বানচাল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এর পর আমাকেও সুইসাইড করতে হবে।

—তাই!

—মনে হচ্ছে, শুটিং না করে ফিরে গেলে ঋষভদা একদম পাগল হয়ে যাবেন।

গার্গী হাসল, কিন্তু এই অবস্থায় কি শুটিং করা সম্ভব! মনের অবস্থা তো কারও ভাল নেই। একটা মেয়ে হঠাৎ এভাবে সুইসাইড করল, তারপর তো আর কাজ করা সম্ভবই নয় আপনাদের পক্ষে।

রোমিওর চোখদুটোকে হঠাৎ যেন জ্বলে উঠতে দেখল গার্গী, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির আড়ালে চিবুকটাও শক্ত, সেরকমই দাঁতে দাঁত চেপে বলল, না, বর্ণনার জন্য আমাদের কারও আর কোনও খেদ বা অনুতাপ নেই।

গার্গী স্তম্ভিত হল কথাটা শুনে। অন্তত রোমিওর মুখ থেকে এ-ধরনের একটা নির্মম, নিষ্ঠুর কথা শুনবে সে আশাই করেনি। বর্ণনার সঙ্গে তো বেশ ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছিল রোমিও। হয়তো তার আশায় কেউ জল ঢেলে দিয়েছিল বলেই—

—বর্ণনা সম্পর্কে খোদ পুলিশ-অফিসারের মুখ থেকে শুনলাম কাল রাতে, তারপর বর্ণনাকে যত শিগগির সম্ভব ভুলে যাওয়াই মঙ্গল, ম্যাডাম।

গার্গী আশ্চর্য হয়ে বলল, কেন!

—সেসব আর নাই বা শুনলেন। এখন বুঝতে পারছি, সিরিয়াল করতে নেমে ঋভদার সবচেয়ে বড় ভুল বর্ণনাকে সিলেক্ট করা। তাঁর একটা ব্লান্ডারের জন্য আজ আমরা সবাই ভুগছি।

গার্গী কয়েক লহমা চুপ করে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রোমিওর দপদপ করতে থাকা চোখে রেখে, রোমিওর দর্শনপ্রতিভা অবলোকন করে নেয় সহসা। এই মুহূর্তে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় যেহেতু রোমিওর ভিতর এখনও জ্বলছে ধিকিধিকি তুষের আগুন।

সেই মুহূর্তে রোমিও নিজেকে সামলে নিয়ে হঠাৎ এমন একটা প্রস্তাব রাখল গার্গীর কোর্টে

যা শুধু অসম্ভব নয়, অবিশ্বাস্য।

—ম্যাডাম, আপনার কাছে আমাদের একটা রিকোয়েস্ট আছে।

—অনুরোধ! আমার কাছে?

—হ্যাঁ। আপনি যদি রেশমবাইয়ের রোলটা করতে রাজি হন, তাহলে আজ থেকেই আমরা শুটিং শুরু করে দিতে পারি।

গার্গী কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না প্রস্তাবটির আকস্মিকতায়। অবাস্তবতার জন্যও বটে। তারপর হঠাৎ হেসে বলল, জোক করছেন নাকি!

—অ্যাবসলিউটলি নট। খুব সিরিয়াসলি বলছি। একটু আগেই আমরা আলোচনা করছিলাম বর্ণনার সাবস্টিটিউটের বিষয়ে। সজনীদা বলছিলেন, কলকাতায় টেলিফোন করে উনি আজ সন্ধের ট্রেনেই কাউকে রওনা করিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তার পৌঁছতে পৌঁছতে কাল সন্ধে। অর্থাৎ পুরো দুটো দিন আমাদের লস। তখন প্রস্তাব উঠেছিল, লখনউ থেকেই কোনও মেয়েকে পিক-আপ করা যায় কি না, যে নাটক-টাটক করে এখানে, অবাঙালি হলেও ক্ষতি নেই। সে সময় আমিই আপনার নাম প্রস্তাব করি।

—অ্যাবসার্ড। গার্গী আবার হেসে উঠল। আমরা আজ রাতেই হিমালয়-অভিযানে বেরিয়ে যাচ্ছি। টিকিট-ফিকিট সব কাটা। তা ছাড়া, আমি কোনও দিন অভিনয়-টভিনয়ও করিনি, স্টেজে কিংবা রিয়েল লাইফেও—

শেষ কথাটায় একটা রূপক আরোপ করে মজা করতে চাইল গার্গী।

রোমিও কিন্তু হাল ছাড়ল না, দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বলতে লাগল, অভিনয়টা কোনও সমস্যাই নয়, ম্যাডাম। এ-লাইনে আমার খুব বেশিদিন হয়নি যদিও, কিন্তু ক্যামেরায় চোখ রাখতে রাখতে এটুকু আইডিয়া হয়ে গেছে, কাকে দিয়ে কোন রোল হবে না হবে। আপনি কখনও অভিনয় না-করলেও আপনার বডি-ল্যাঙ্গোয়েজ অসাধারণ। আপনার চোখ, শরীর তো সারাক্ষণই কথা বলছে। তা ছাড়া আপনার যা চমৎকার ফটোফেস, তাতে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেই অর্ধেক অভিনয় হয়ে যাবে। বাকি অর্ধেক করিয়ে নেবেন ঋষভদা। আমিও হেল্প করতে পারি আপনাকে।

গার্গী পুনর্বার হেসে, 'ব্যাপারটা একেবারেই অসম্ভব, প্লিজ কিছু মনে করবেন না' বলে, গুডবাই করে দ্রুত চলে এল রুমে। রুমের সামনে এসে দেখল, ঘর লক-করা। সায়ন তার দেরি দেখেই বোধহয় খুবই ব্যস্ত হয়ে, ঘর বন্ধ করে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তার কানে এল, ভেতরে ফোন বাজছে। তার কাছে থাকা ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দ্রুত ঘরে ঢুকে ফোন ধরতেই এক অদ্ভুত চমক, মিসেস চৌধুরি, আমি দেবাদ্রি সান্যাল বলছি—

—দেবাদ্রি সান্যাল! গার্গীর হাত থেকে রিসিভার পড়ে যায় আর কি, কোত্থেকে বলছেন!

—লখনউ এসেছি কাল সন্ধেয়। তারপর সারারাত প্রবল ঝড় চলে গেছে আমাদের ওপর দিয়ে। আপনাকে তলব করা সত্ত্বেও তো আপনি এলেন না।

দেবাদ্রির হাসি শোনা গেল ওদিকের প্রান্তে, যে-তালিকা লখনউ কোতোয়ালি থেকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে তাতে অনেকের সঙ্গে আপনাদের নাম দেখে আমি একদম তাজ্জব। বুঝতেই পারছেন, আপনাকে আমরা জেরা করতেই পারি।

—আর কাউকে ধরতে না পেরে শেষপর্যন্ত আমাকেই!

—হ্যাঁ, কাউকে না কাউকে অ্যারেস্ট করে না নিয়ে গেলে তো চাকরি থাকবে না। মনে করে নিন, আপনিই আপাতত আমাদের প্রধান সাসপেক্ট। আপনি অপেক্ষা করুন, দশ মিনিটের মধ্যেই

আমি আপনার কাছে যাচ্ছি—

রিসিভার হাতে একটু থমকে গেল গার্গী। দেবাদ্রি সান্যাল কি তার সঙ্গে জোক করছে, না সিরিয়াসলি—!



দেবাদ্রি সান্যাল তাঁর খাকি উর্দি-পরা দীর্ঘকায় চেহারাটা নিয়ে যখন হোটেল ইনে প্রবেশ করলেন, আর সরাসরি ঢুকে পড়লেন গার্গীদের রুমেই, তখন রিসেপশনে দুই রূপসী তরুণীর বিস্ময়, কৌতূহল, ত্রাস যে কতটা উচ্চচাপ বহন করছে তা ভেবে গার্গীর অনুমানে কুলোচ্ছিল না যেন। দেবাদ্রির চোখে কালো চশমা, হাতে ভারী ব্রিফকেস। রিসেপশনিস্টরা নিশ্চয় ভেবে নিয়েছে, সিনেমুভির এত এত সদস্যদের কাল সারারাত জেরা করার পর তাদের কাউকেই টার্গেট না করে কলকাতার বাঘা পুলিশ অফিসার কি না আপাতত আসল কালপ্রিটের রুমেই অন্তরিণ!

ডাবল-বেডেড রুমটার সামনের দিকে যে ছোট্ট ড্রইং, তাতে যে-ঝকঝকে সোফাসেটটি অধিকাংশ সময়ই মাছি তাড়াচ্ছিল, এখন তারই একটিতে বেশ জাঁকিয়ে বসে দেবাদ্রি বললেন, আপনাদের দুজনের নাম সিনেমুভির তালিকায় দেখে আমি কিন্তু যাকে বলে অ্যাসটনিশড।

গার্গী সেন্টার-টেবিলের উল্টোদিকের সোফাটায় বসল, কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়েই। সায়ন তার খোঁজ করতে কোথায় যে উধাও হল তার পাত্তা করতে পারেনি, অগত্যা একাই মুখোমুখি হল দেবাদ্রির। কিচেনে একটা ফোনও করে দিয়েছে, কফি সেইসঙ্গে ওমলেট আর স্যান্ডউইচের অর্ডার দিয়ে। বেশ অনেকদিন পরে দেখা হল দেবাদ্রি সান্যালের সঙ্গে। দেবাদ্রি এখন বদলি হয়ে লালবাজারে। কলকাতায় সেই অতিলৌকিক টানাহ্যাঁচড়ার পর আবার অবিশ্বাস্যভাবে লখনউয়ের বিভুঁই পটভূমিকায়। হেসে বলল, এরই নাম দশচক্রে ভগবান ভূত। একই ট্রেনে একই ক্যুপেয় ট্রাভেল করে, আবার একই হোটেলে পাশাপাশি ঘরে থাকায় আমরাও রিসেপ্শনিস্টদের কল্যাণেই, আপাতত সিনেমুভির সদস্যদের সঙ্গে আসামির ভূমিকায়। এবার বলুন, অত রাতে তলব করেছিলেন কেন।

দেবাদ্রিকে একটু বিব্রতই দেখাল, বলল, আসলে তখনও পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারিনি আপনারা এদের সঙ্গে ভিড়ে গেলেন কী করে! তারপর ওদের টিমের সঙ্গে কথা বলে ভুল ভাঙল। ভেবেছিলাম, আপনারাও বোধ হয় অভিনয়ে নেমে পড়েছেন।

গার্গী হেসে উঠল শব্দ করে, নামিনি এখনও, তবে নামব কি না ভাবছি এবার।

—রিয়ালি! দেবাদ্রি বোধহয় বিশ্বাস করতে শুরু করেছে গার্গীর কথা। কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই গার্গী বলল, আসলে একটা সমস্যায় পড়েছে

সিনেমুভির কর্তাব্যক্তিরা। হঠাৎ ওঁদের মেইন রোলের একজন আর্টিস্ট শর্ট পড়েছে। সেই রোলে প্রক্সি দেওয়ার জন্য কাউকে না কাউকে তো ওদের দরকার। তাই এখন ইচ্ছে করলেই ওদের সিরিয়ালে নেমে পড়তে পারি—

দেবাদ্রি থমকে গিয়ে বললেন, শর্ট পড়েছে মানে! আপনি কি বর্ণনা সেনগুপ্তর কথা বলছেন!

গার্গী মাথা নাড়তেই দেবাদ্রি সান্যালের চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেল মুহূর্তে, ওহ্, মেয়েটা একটা সাংঘাতিক চরিত্র বটে।

গার্গী যেন একেবারেই কৌতূহলী নয়, এমন ভঙ্গিতে বলল, কীরকম!

—বলতে পারেন লেডি ম্যাকবেথ। ঠাণ্ডা মাথায় একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারকে ঘোর দুপুরবেলা খুন করে, সেদিন সন্ধেয়ই অমৃতসর মেলে চেপে লখনউ রওনা হয়েছে সিরিয়ালের নায়িকা হবে বলে।

প্রায় বাজপতনের শব্দে গার্গী এতই চমকে উঠল যে, বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত হোটেলের রুমটিতে পিনপতন নিস্তব্ধতা। গার্গী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল দেবাদ্রি সান্যালের ব্যক্তিত্বপূর্ণ, শক্তপোক্ত মুখখানা। দেবাদ্রির স্থিরপ্রত্যয় দেখে গার্গী খুবই আস্তে করে জিজ্ঞাসা করল, আর য়্যু সিওর, শি ওয়াজ দ্য মার্ডারার!

—অফ কোর্স, কোনও সন্দেহই নেই। এ-ব্যাপারে যেটুকু কিন্তু-কিন্তু ছিল, তা লখনউ আসার পর তার পোস্ট-সুইসাইড পর্ব শুনে, দেখে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আজ সকালে নিশ্চিত হয়েছি তার সম্পর্কে। শুধু আফসোস রয়ে গেল, মার্ডারারকে হাতে-নাতে ধরতে পারলাম না। আসলে ঠিক ভেবে উঠতে পারিনি পুলিশ আসার সংবাদ পেয়েই সুইসাইড করে বসবে মেয়েটা। আপনি যদি ওর সব কাহিনী শোনেন—

বর্ণনা সম্পর্কে ডিটেইলস অবহিত হওয়ার জন্যই তো লক্ষ কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছে গার্গী। মাত্র তিনদিনের ফুরসতে বাইশ-তেইশ বছরের একটা তরুণী কী তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করতে পারে কয়েকজন ভিন্ন স্বভাবের ভিন্ন স্তরের পুরুষের হৃদয়ে, তাতে কী অসম্ভব তোলপাড় হচ্ছিল ক'দিন—অমৃতসর মেল থেকে হোটেল ইনের ঐশ্বর্যময় আবহে, সৃষ্টি হচ্ছিল কী তুল্যমূল্য টানাপোড়েন গোটা সিনেমুভির টিমের ভেতর, তা অবশ্যই নজর কাড়ার মতো। এ মেয়ে অনায়াসে আর একটি ক্রিস্টিন কিলার হয়ে পতন ঘটাতে পারে কোনও নির্বাচিত সরকারের। মনে মনে হাসল গার্গী, তাহলে বর্ণনা কিলারই।

দেবাদ্রি সান্যালও বর্ণনার জীবনযাপন সম্পর্কে যে-কাহিনী শোনালেন, তাও কম রোমহর্ষক নয়। অল্পবয়সেই অনাথ বর্ণনা তার কোনও নিকট-আত্মীয়ের বাড়িতে থিতু হয়েছিল কৈশোর কাল পর্যন্ত। কৈশোরেই যথেষ্ট সুন্দরী বলে খ্যাতি ছড়িয়েছিল তার, সেই খ্যাতির অবশ্যম্ভাবী কারণে সতেরো বছর বয়সেই এক যুবকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল বলে খবর। কিন্তু কে সেই যুবক, আপাতত তার পরিণতি কী, তা আর জানা যায়নি কোনও ভাবে। শোনা যায়, যুবকটি কোনও গ্রুপ-থিয়েটারে অভিনয় করত, বর্ণনাও তার প্ররোচনায় অভিনয় করতে শুরু করেছিল সেখানে, কিন্তু স্বভাবে সে অস্থির, চরিত্রে বহুগামী, অতএব গত পাঁচ-ছ' বছরে ঘাটের পর ঘাট পেরিয়ে অবশেষে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল গড়িয়ার কাছে। অফিস-ক্লাবগুলিতে অভিনয় করতে শুরু করায় তার নামডাক হয়, তাতে তার রুজিরোজগার হচ্ছিল ভালই, কিন্তু তার বহুগামিতার রোগ সংক্রামিত করছিল অফিস-ক্লাবের নির্দেশক অভিনেতা ও অন্য কর্তাব্যাক্তিদেরও। ফলে অনেকেরই মানসিক বৈকল্য ঘটে, অনেকেরই পারিবারিক জীবনে দেখা

দিচ্ছিল নানান বিপর্যয়, সংঘাত, এমনকি বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনাও ঘটে গিয়েছিল বর্ণনাকে কেন্দ্র করে।

ঠিক এমনই মুহূর্তে বর্ণনাকে আবিষ্কার করেন দক্ষিণ কলকাতার এক প্রতিষ্ঠিত বয়স্ক ডাক্তার সুস্নাত তালুকদার। ডঃ তালুকদারের এলাকায় খুববই নামডাক, সকালে চেম্বার করেন, বিকেলে নার্সিংহোমের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড্. যাকে বলে রোরিং পশার। তার ওপর অকৃতদার, ফলে টাকার পাহাড় নিয়ে শেষ জীবনে দু' দুটি নেশায় অ্যাডিক্টেড। একটি দাবা, যার কবলে পড়ে তাঁর পশার ক্রমশ পড়তির দিকে। অন্যটি নারী, যার পাল্লায় পড়ে শেষপর্যন্ত অকালে আহুতি হল তাঁর মূল্যবান জীবন।

এক নাগাড়ে দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতার ঢঙে বর্ণনার জীবনকথা বিবৃত করে সহসা থামলেন দেবাদ্রি সান্যাল। তাঁর নাতিদীর্ঘ পুলিশি-জীবনে ইতিমধ্যে জমা হয়েছে এরকম অম্লমধুর অথচ ইন্টারেস্টিং নানান স্মৃতিকাহিনী, তারই শেষতমটি আপাতত নিঃশেষ করে গার্গীর দিকে তাকাতেই গার্গী জিজ্ঞাসা করল, সেই নারীই তাহলে বর্ণনা সেনগুপ্ত!

কফির কাপে তখনও শেষ চুমুক দিতে বোধহয় বাকি ছিল, কিন্তু কাপটির প্রতি তাঁর দীর্ঘক্ষণের অমনোযোগে তিনি ততক্ষণে জুড়িয়ে বরফ। অতএব গার্গী তৎক্ষণাৎ ফোন করে দ্বিতীয় কাপের অর্ডার দিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল দেবাদ্রির দিকে।

—বাট শি ওয়াজ নট দ্য ওনলি। আরও কিছু নারী তাঁর জীবনে, রাদার তিনিই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন তাদের সঙ্গে। অকৃতদার পুরুষরা অনেকেই শেষ জীবনে আর বশে রাখতে পারেন না নিজেদের চরিত্র, ফলে এ ধরনের পদস্খলন, তারই অবশ্যম্ভাবী কারণে, অসম্ভব সব জটিলতা, তারপর নানান সমস্যার আবির্ভাব। এক্ষেত্রেও আমার ধারণা একাধিক নারীর সমাগমে যে-জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল, তারই খেসারত দিতে হল ডঃ তালুকদারকে।

গার্গী তার মনঃসংযোগ তীক্ষ্ণ করল, কীরকম!

—প্রথমে বর্ণনা সেনগুপ্তর কথাই বলি। যে-কোনও ভাবেই হোক, বর্ণনা এসে নোঙর করে ডঃ তালুকদারের জীবনে। সফল, প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, প্রচুর অর্থ, বর্ণনার ধারণা হয় বয়স্ক মানুষটিকে সঙ্গ দিলে তাঁর যাবতীয় সঞ্চিত অর্থের সে-ই হবে একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। সেভাবেই চলছিল দিন, প্রায় রোজই একবার-না-একবার ডঃ তালুকদার যেতেন তার ফ্ল্যাটে। কখনও দুপুরে, যেদিন বর্ণনার নাটক-টাটক না থাকত সেদিন সন্ধের পর। বর্ণনা ও ঘনঘন আসত তাঁর বাড়ি। কিন্তু আশ্চর্য, ডঃ তালুকদারের কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুই তাঁর এই দ্বৈতজীবনের খবর ঠিকঠাক রাখতেন না। ডাক্তার রোজই বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন, দাবা খেলতেন, হইহুল্লোড় করতেন, কিন্তু তাঁর রমণীবিহারের বিষয়ে একেবারে বরফশীতল বরাবর। তাঁর বন্ধুরাও কখনও এ-নিয়ে জানতে চাননি কখনও, দরকারও হত না তাঁদের।

—বর্ণনা ছাড়া আর কোনও নারী কি তাঁর জীবনে ছিল!

—অন্তত একজন তো প্রেক্ষাপটে আছেই। তিনি ভাইপোর স্ত্রী। প্রায় মেয়ের বয়সী সেও, তার সঙ্গে ডাক্তারের সম্পর্ক কীরকম তা সঠিক উদ্ধার করা না গেলেও ডঃ তালুকদার যে নিয়মিত তাদের বাড়িতে যেতেন, তাঁর ভাইপো চেম্বারে কিংবা নার্সিংহোমে ব্যস্ত থাকার মুহূর্তে তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গ উপভোগ করতেন অনেক রাত পর্যন্ত, সে প্রমাণও মিলেছে। তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক যাই থাক, সেই ভাইপোর স্ত্রীও কিন্তু সঙ্গদান করার বিনিময়ে আশা করেছিলেন, ডঃ তালুকদারের বিপুল অর্থের মালিকানা তাদেরই হবে একদিন।

—তাহলে বেশ জটিল কেস!

—অফ কোর্স, এই দুই নারীই কিন্তু পরস্পরের অস্তিত্ব জানত, দুজন দুজনকেই মনে করত প্রতিদ্বন্দ্বী। অতএব ডঃ তালুকদারের প্রিয় পাত্রী কে হবে এই নিয়ে একটা ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়েছিল। তবে সে-লড়াই পরস্পরের বিরুদ্ধে নয়, কারণ কেউ কখনও কারও মুখোমুখি হয়নি, যেটুকু লড়াই চলছিল তা হল কে ডঃ তালুকদারের কত কাছের হতে পারে তাই নিয়েই। যাই হোক, তার পর কী কারণে যে ডঃ তালুকদারকে খুন হতে হল তা শুধু অনুমানসাপেক্ষ।

—তাহলে যে বললেন বর্ণনাই খুনি!

—হ্যাঁ। সম্ভবত সেদিন দুপুরবেলা, অর্থাৎ ডঃ তালুকদার যে-সময়টা বিশ্রাম করেন, বর্ণনা গিয়েছিল তাঁর বাড়িতে। হয়তো এরকম প্রায়ই যেত, আর জানতও কোথায় রিভলভারটা থাকে। সম্ভবত সম্পত্তির কারণেই তার সঙ্গে ডাক্তারের মতবিরোধ হয়। তারপরই—

—কী করে বোঝা গেল বর্ণনাই সেদিন দুপুরে ডঃ তালুকদারের বাড়িতে গিয়েছিল?

যেন গার্গীর সঙ্গে আলোচনা করে দেবাদ্রিও নিশ্চিত হতে চাইছেন তাঁর সিদ্ধান্তে, সেভাবেই বললেন, তার কয়েকটা প্রমাণ আমরা সেদিন পেয়েছি। প্রথমটি তাঁর একজন পেশেন্টের ফোন। সেদিন সকালেই পেশেন্টটি ডঃ তালুকদারকে দেখিয়েছিলেন। কোনও কারণে ওষুধ খাওয়ার সময়টা ঠিক মনে করতে পারছিলেন না বলে বেলা আড়াইটে-তিনটে নাগাদ একবার ফোন করেছিলেন ডাক্তারকে। কিন্তু রিসিভারের অন্যদিকে নারীকণ্ঠের আওয়াজ শুনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনি কে বলছেন, তাতে নাকি উত্তর পেয়েছিলেন, আমি বর্ণনা সেনগুপ্ত বলছি, আপনি একটু ধরুন, ডাক্তারবাবু বাথরুমে গেছেন, এখনই আসবেন।

—হুঁ, আর!

—ডঃ তালুকদারের বেডরুমে, যে-ঘরে তিনি খুন হয়েছিলেন, সেখানে দুটো ক্লু আমরা পেয়েছি। একটি লেডিজ হ্যান্ডব্যাগ, তার ভেতরে যেসব জিনিসপত্র ছিল সেগুলো বর্ণনারই, আর অন্যটি একটা চশমা। সোনালি ফ্রেমের বেশ বাহারি চশমা।

গার্গী একটু সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, তাতেই তো আর প্রমাণ হয় না বর্ণনাই খুন করেছিল!

দেবাদ্রি হাসল, না, তা হয় না। কিন্তু বর্ণনার ব্যাগ থেকে এমন একটি অমূল্য সম্পদ আমরা পেয়েছি, যা খুনের অকাট্য প্রমাণ হিসেবে কোর্টে এক্‌জিবিট করতে পারব।

—কী প্রমাণ, মিঃ সান্যাল!

—আসলে এই মার্ডারটাকে খুব নিখুঁতভাবে সাজিয়েছিল বর্ণনা, কিন্তু সম্ভবত তাড়াহুড়োয় তার ব্যাগটা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল সেদিন। আর সেইটেই তার সবচেয়ে বড় ব্লান্ডার। নইলে পুলিশ খুব সহজেই বিশ্বাস করে যেত, ডঃ সুস্নাত তালুকদার খুন হননি, সুইসাইড করেছেন।

গার্গী এবার রীতিমতো নড়েচড়ে বসল, হ্যাঁ, সেরকম একটা খবর প্রথমে আমাদের এখানে টেলিফোন-মারফত পৌঁছেছিল।

—সুইসাইড বলেই তো ভাবা হয়েছিল প্রথমে। ডঃ তালুকদারের ডেডবডি পড়ে আছে বিছানায়, হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে গুলি বেরিয়ে গেছে, চারপাশে রক্তস্রোত, আর মেঝেয় পড়ে আছে রিভলভারটা। তা ছাড়া ঘরের কোণে টেবিলের ওপর একটা কাগজ পেপারওয়েট দিয়ে চাপা, তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা : আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। বইতে যেভাবে আত্মহত্যার কথা লেখা থাকে সেভাবেই ছবির মতো করে সাজানো ঘটনা।

গার্গীর ভুরুতে বড় একটা কুঞ্চন, হুঁ, তারপর!

—কিন্তু খুনি তাড়াহুড়োয় সবচেয়ে বড় ভুলটা করে গেল তার লেডিজ হ্যান্ডব্যাগটা ফেলে গিয়ে। তার ভেতর কিছু মেয়েলি টুকিটাকির সঙ্গে পাওয়া গেল আরও দু-টুকরো কাগজ। দুটিতেই লেখা : আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

—হা ভগবান! গার্গী জিবে চুকচুক শব্দ করল, তাহলে তো বর্ণনার রক্ষা পাওয়ার আর কোনও উপায়ই ছিল না।

—না। তা ছাড়া লখনউ এসে আর একটি যে প্রমাণ নিজে হাতে লিখে রেখে গেছে, তা আরও অকাট্য।

—তাই! গার্গী দেবাদ্রির দিকে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকায়।

—হ্যাঁ। বর্ণনা তার হোটেলের রুমে যে-সুইসাইড নোটটি লিখে রেখে গেছে, সেটিও একই হাতের লেখার।

—ওহ্, তাহলে তো কেসটা একেবারেই সল্‌ভ্ করে ফেললেন, মিঃ সান্যাল। গার্গীও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, আপনার কাছে কি সুইসাইড নোট লেখা কাগজগুলো আছে এখন?

—অফ কোর্স। কলকাতা থেকে আসার সময় সেটা তো আনতেই হয়েছে বর্ণনাকে অ্যারেস্ট করব বলে, বলতে বলতে ভারী ব্রিফকেসটা পুট পুট শব্দ করে চকিতে খুলে ফেললেন দেবাদ্রি, তারপর নতুন ঝকঝকে একটা ফাইল থেকে বার করলেন দুটো কাগজ, তার মধ্যে যেটি জেরক্স, সেটি কলকাতা থেকে এনেছেন, তার অরিজিন্যালটা রাখা আছে লালবাজারে, আর একটি ডট দিয়ে লেখা, সেটা পাওয়া গেছে এখানে, রুম থেকে।

গার্গী দুটো কাগজই হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল, দুটো হস্তাক্ষরই এক। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় কাপ কফিও এসে গিয়েছিল, সেটিতে চুমুক দিয়ে দেবাদ্রি গর্বের হাসি হাসলেন, এ-কেসটা দ্রুত সল্‌ভ করার খুব দরকার ছিল। পর পর কয়েকদিন কাগজে লেখালেখি হওয়ায় বেশ ইম্পর্ট্যান্স পেয়ে গেছে ঘটনাটা। সামনেই আমার একটা প্রমোশন ডিউ হয়েছে, ঠিক এ-সময় ফাইনাল রিপোর্টটা দিতে পারলে—

গার্গীও কফিতে ঠোঁট ডুবিয়েছিল, হঠাৎ কাপ নামিয়ে বলল, কিন্তু এ খবরটা কি আপনি পেয়েছেন, কে একজন মাস্তান চেহারার লোক বর্ণনার সুইসাইডের আগের দিন সকালে এসে তার খোঁজ করেছিল রিসেপশনে! তারপর সারাদিন, গভীর রাত পর্যন্ত ঘুরঘুর করেছে হোটেলের কাছাকাছি—

সে খবরও কাল রাতে সিনেমুভির সদস্যদের কাছ থেকে নোট করেছেন দেবাদ্রি, বললেন, হ্যাঁ, ওর নাম অঙ্কন ওরফে বিটন তালুকদার। ডঃ তালুকদারের ব্যবসায়ী-ভাইপো, যে সেদিন তার ডাক্তার-দাদা রঙ্গন তালুকদারের সঙ্গে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে মারামারি করেছে। তখনও পর্যন্ত তার ধারণা ছিল, তাঁর দাদা-বৌদিই জ্যাঠার সমস্ত সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছে। পরে ভুল বুঝতে পেরে সোজা লখনউ পাড়ি দিয়েছে বর্ণনার কাছ থেকে সম্পত্তির হিসেব বুঝে নেবে বলে।

গার্গী এতটা অবশ্য ঠিক ভেবে উঠতে পারেনি। তাই তার বিস্ময় চাপা থাকল না, জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তারের সব সম্পত্তিও বর্ণনা সঙ্গে নিয়ে এসেছে নাকি।

—তাই তো মনে হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে। কারণ ডাক্তার যে-খাটে শুতেন, সেটি আসলে একটি ডিভান। তার ভেতর নাকি অন্তত সাত-আট লক্ষ টাকা ক্যাশ ছিল, সেগুলি উধাও।

—সে কী! গার্গী আঁতকে উঠল, সেই টাকা বর্ণনা সঙ্গে নিয়ে এসেছে!

—মনে হয় না। কাল গভীর রাতে ওর রুম সার্চ করা হয়েছে, তাতে কিছু পাওয়া যায়নি। ওর কলকাতার ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টেও তেমন কিছু নেই।

—তাহলে!

—টাকাটা যে ছিলই ডিভানের ভেতর তার কোনও প্রমাণ কিন্তু পাওয়া যায়নি। শুধু সেই ডাক্তার-ভাইপো রঙ্গন তালুকদার আর তাঁর স্ত্রীর স্টেটমেন্টের ওপর নির্ভর করেই আমাদের এগোতে হচ্ছে। রঙ্গন তালুকদারের স্ত্রী লাভ্‌লিই নাকি জানতেন টাকার খবরটা। আর জানত বর্ণনা। আর—

এতক্ষণে দেবাদ্রি তাঁর কণ্ঠস্বরে অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করলেন গার্গীর সঙ্গে, বললেন, যে জন্যে আপনার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে এলাম, মিসেস চৌধুরী। আপনি তো গত তিন-চার দিন বর্ণনাকে মোটামুটি কাছ থেকে দেখলেন, কোনও অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেছেন বর্ণনার মধ্যে!

গার্গী হেসে বলল, সবটাই অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল এ ক'দিন। কিন্তু আপনি বর্ণনার যা বর্ণাঢ্য পরিচয় দিলেন এই মুহূর্তে, তাতে মনে হল, এই অস্বাভাবিকতাই বোধহয় তার জীবনযাপনের স্বাভাবিক ছন্দ।

—কীরকম! দেবাদ্রি এবার আগ্রহী হলেন।

—ফ্লার্ট করাটাই বর্ণনার নেশা। পেশাও হয়তো।

—এক্‌জ্যাক্টলি। দেবাদ্রি এবার ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন, ওসব মেয়েদের শেষপর্যন্ত এরকম একটা পরিণতিই হয়ে থাকে। যাই হোক, এবার দেখি, সেই বিটন তালুকদারকে খুঁজে বার করা যায় কি না। হয়তো পরশু সে-ই টাকাটা ঝেপে দিয়েছে বর্ণনার কাছ থেকে।

দেবাদ্রি চলে যাওয়ার পর গার্গী যখন সবে ভাবছে সায়নের খোঁজে বেরুবে কি না, ঠিক তখনই বেশ খোসমেজাজে সায়নের আবির্ভাব। গার্গী উদ্বিগ্ন হয়ে সে কোথায় গিয়েছিল জানতে চাইতেই সায়ন বেশ ফুরফুরে হয়ে বলল, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ওপেন-এয়ার লাউঞ্জে বসে একটু গল্প করে এলাম।

গার্গী আশ্চর্য হয়ে বলল, কে ক্যাপ্টেন!

—ওই যে, যিনি রুমেলাকে সঙ্গ দিচ্ছেন।

গার্গী স্তম্ভিত হয়ে বলল, তার সঙ্গে তুমি গল্প করে এলে!

—হ্যাঁ। হি ইজ আ নাইস গাই। লখনউয়ে সেট্‌ল্ড হয়েছেন বেশ ক'বছর। এখানকার ওয়ান অফ দ্য রিচেস্ট বিজনেস ম্যাগনেট্‌।

—কিন্তু তাঁর সঙ্গে রুমেলার কী সম্পর্ক!

—সে সব আমি আর জিজ্ঞাসা করিনি। ওটা ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। বিজনেস নিয়েই অনেকক্ষণ আলোচনা হল। আমি সোপ-ম্যানুফ্যাকচারার শুনে বললেন, তাহলে তো ভালই হল। কানপুরেও আমার একটা বিজনেস আছে। লখনউ আর কানপুর দু-জায়গাতেই হোলসেল ডিসট্রিবিউটর হিসেবে আমি কাজ করতে পারি। শুনে ওঁর সঙ্গে আমি প্রোগ্রাম করে এলাম। আজ একবার কানপুরে যাচ্ছি ওঁর সঙ্গে। দরকার হলে হয়তো কালও যেতে হতে পারে। তারপর লখনউতে—

গার্গী বিস্মিত হয়ে বলল, আর তোমার হিমালয়-ভ্রমণ!

ইতস্তত করে সায়ন বলল, দু-তিনদিন না হয় পিছিয়ে দিই ট্যুরটা, বুঝলে। পুলিশ তো আপাতত নজরবন্দি করে রেখেছে আমাদের। এই ফুরসতে কোম্পানির ব্যবসা বাড়িয়ে নিই

কিছুটা। কানপুরে যাওয়াটায় পুলিশ নিশ্চয় আপত্তি করবে না।

দেবাদ্রি-এপিসোডটি আপাতত সায়নের কাছে খোলসা না-করে গার্গী হাসল মনে মনে কিছুক্ষণ সায়নের সরল, সৌম্য মুখটির দিকে তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। মাথায় বিজনেস ঢুকলে তার চোখেমুখে এমন একটা ঘোর ওতপ্রোত থাকে যে, অপরাপর বাহ্যিক জ্ঞান তখন প্রায় শূন্য ডিগ্রিতে। এখন গোটা হিমালয়কে বঙ্গোপসাগরে বিসর্জন দিয়ে সে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়বে তার প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ভবিষ্যৎ রঙিন করে তুলতে।

দ্রুত প্রস্তুত হয়ে নিতে সায়ন বাথরুমে অন্তর্হিত হতেই গার্গী নেমে এল নীচে। রিসেপশনের কাছাকাছি যেতেই একটা খবর এর-ওর মুখ থেকে শুনে বেশ আশ্চর্যই লাগল তার। খবর হল, অঙ্কন ওরফে বিটন তালুকদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার সঙ্গের অ্যাটাচি থেকে পাওয়া গেছে দু-দুটো চিরকুট, দুটোতেই লেখা, সেই একই হস্তাক্ষরে : আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

ঘটনাটা পুলিশের কাছে এতই অপ্রত্যাশিত যে, তাদের ধারণা, দুটো মৃত্যুরহস্যই এখন অন্যদিকে মোড় নিতে পারে।

গার্গীও ভাবিত হল কম নয়। সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর কোনও ঘোর রহস্য আছে ভাবতে ভাবতে দ্রুত ওপরে উঠে তাদের রুমে ঢুকে দেখল, সায়ন ততক্ষণে স্নান সেরে জামা-প্যান্টের তল্লাশ করছে ওয়ারড্রোবে। গার্গীকে দেখেই বলল, তুমিও রেডি হয়ে নাও। কুইক।

গার্গী হেসে বলল, কানপুরে তুমি একাই যাও। আমি বরং এই ফুরসতে সিনেমুভির কাজে একটু সাহায্য করে দি। যদি তোমার আপত্তি না থাকে অবশ্য।

সায়ন এখন তার বিজনেসের ঘোরে ঘোর নিমগ্ন। কিছু না-বুঝেই বলল, অ্যাজ য়্যু লাইক—

কেন যে গার্গী এহেন দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিল তা সে নিজেই বুঝতে পারল না। কখনও অভিনয় করেনি সে, ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর কোনও অভিজ্ঞতাও নেই তার। তবু মনে হল, সিনেমুভির অলীক রহস্য ভেদ করতে তাকে এখন ক'দিন বর্ণনার রোলেই অভিনয় করতে হবে, ঠিক যেরকমভাবে ঐন্দ্রিলার ফেলে-যাওয়া সংসারে প্রবেশ করেছিল একদা।

সামনে বরফের বিশাল ধস নেমে আসছে দেখেও গার্গী তখন একাই এগিয়ে চলেছে এভারেস্টের চূড়ার দিকে।



দোতলা কোঠিটির টানা লম্বা ব্যালকনিতে রোমিও চোখ রাখছিল তার ক্যামেরার ভিউ-ফাইন্ডারে। লেন্সটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে গিয়ে সহসা চমকে উঠে তার স্তম্ভিত চোখ আবিষ্কার

করল অবিকল বর্ণনার মুখ। একেবারেই অবিশ্বাস্য, তবু ভিউ-ফাইন্ডার থেকে চোখ তুলে সে সরাসরি কোঠির ব্যালকনিতে দৃষ্টি ফেলে মিলিয়ে নিতে চাইল, সত্যিই বর্ণনা তার হাসি-হাসি, দুষ্টু-দুষ্টু সুন্দর মুখখানা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কি না।

না নেই, থাকবার প্রশ্নই নেই, তবু কেন যে রোমিও তার ক্যামেরার চোখ দিয়ে হঠাৎ দেখে ফেলল বর্ণনাকে!

আসলে বর্ণনাকেই তো আজ তার দেখার কথা ছিল এ ভাবে। আটচল্লিশ ঘণ্টা আগের কাস্টিং অনুযায়ী বর্ণনারই তো রেশমবাই হয়ে এসে দাঁড়ানোর কথা সামনের ব্যালকনিতে। এখন তার পরিবর্তে সেখানে এসে কৌতূহলী চোখেমুখে দাঁড়াবে সিনেমুভির নির্মীয়মাণ সিরিয়ালটির নতুন অভিনেত্রী গার্গী চৌধুরি। গার্গীর এই প্রথম অ্যাপিয়ারেন্স ক্যামেরার সামনে, তাই কিছুটা নার্ভাস হয়ে সে বসে আছে মেক-আপ রুমে। রোমিওকে দেখতে পেয়েই শঙ্কিত মুখে বলছিল, কী জানি, শেষপর্যন্ত আপনাদের ডোবাব কি না—

গার্গী যেমন এই আকস্মিক ভূমিকাটি পেয়ে বিপুল টেনশনে ভুগছে, রোমিও-ও তার চেয়ে কম নয়, কেননা প্রধানত তারই সুপারিশে গার্গী চৌধুরি এই সিরিয়ালে অভিনেত্রী হিসেবে মনোনীত হয়েছে। বর্ণনার আত্মহত্যার পর 'সোনালি ঘুঙুর' যখন কোনও ক্রমেই শুরু হওয়ার নয়, সে সময় রোমিওই প্রস্তাব দিয়েছিল, তাদের সঙ্গে একই হোটেলে পাশাপাশি ঘরে থাকা গার্গী নামের এই স্মার্ট তরুণীটিকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায় কি না। বেশির ভাগ সদস্যই অবশ্য এক ফুত্‌কারে বাতাসে ভাসিয়ে দিয়েছিল তার অবাস্তব, ইমোশনাল ভাবনাটি। ঋষভ মুখার্জিকে কথাটা বলতে তিনি তো কিছুতেই স্মরণে আনতে পারলেন না, রোমিও আসলে কোন মেয়েটির কথা বলতে চাইছে। বলেছিলেন, কার আমদানি! সজনী দত্তর নাকি!

রোমিও পরিচালকের অজ্ঞতায় হেসে বলেছিল, নাহ্, ঋষভদা, আপনি সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছেন। নইলে পাশাপাশি ক্যুপেয় অমন ব্রাইট কাপ্‌ল এতদূর ট্রাভেল করে এল, আপনার রুমের কয়েকটা রুম পরেই ওরা ক'দিন ধরে বাস করছে, অনবরত দেখা হচ্ছে বারান্দায়, রিসেপশনে, লনে, লাউঞ্জে, সর্বত্রই, আর আপনার চোখেই পড়েনি মেয়েটার মুখ! যা ফটোজিনিক ফেস না—

ঋষভ মুখার্জি রোমিওর উপর্যুপরি সুপারিশে বাধ্য হয়ে বললেন, কই দেখি, কীরকম ফটো তুলেছ তার!

রোমিও তৎক্ষণাৎ তার ফটোর তহবিল থেকে বিভিন্ন পোজের, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে তোলা গার্গী চৌধুরির কয়েকখানা ফটো পর পর সাজিয়ে দিয়েছিল পরিচালকের সামনে। ঋষভ ফটোগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আপনমনেই বিড়বিড় করেছিলেন, মন্দ নয়।

'ভাল' না-বলে 'মন্দ নয়' বলায় রোমিও খুব যে একটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল তা নয়, কারণ বর্ণনা একটু অভিনব-ধরনের সুন্দরীই ছিল, তার চাউনির ভেতর এমন একটা মাদকতা মাখানো থাকত যা যে-কোনও পুরুষকেই প্রেমে পড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু গার্গী তো তত সুন্দরী নয়। গার্গীর দু-চোখ জুড়ে বরং একটা শিক্ষিত সৌন্দর্য, যা এ-লাইনের মেয়েদের চোখে খুব কমই দেখা যায়।

একটু আগেই রোমিও দেখে এসেছে, সেই গার্গী চৌধুরি মেক-আপ রুমে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে একরাশ অস্বস্তি মেখে। তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে, ভারি নিবিষ্ট হয়ে রঙের কারুকাজ করেছেন সিনেমুভির বিখ্যাত মেক-আপ ম্যান মাচানবাবু। খুব ধীরে, খুবই সতর্ক হয়ে রোগা মাচানবাবু ততক্ষণে গার্গী চৌধুরিকে ক্রমশ রূপান্তরিত করছেন সুন্দরী রেশমবাঈয়ে।

রোমিও এখনও বুঝতে পারছে না, রেশমবাঈয়ের মতো নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেওয়া রূপসীর ভূমিকায় গার্গীকে মানাবে কি না।

গার্গী সে-সময় এ-কথা সে-কথার পর এক ফুরসতে রোমিওকে বলল, আপনি কি শুনেছেন, পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল নাকি আমাদের শুটিং দেখতে আসছেন!

রোমিও একটু আগেই কার মুখে যেন শুনে ফেলেছে এই দুঃসংবাদটা। শোনার পর থেকেই তার মুখটা যেন তিত্‌কুটে, কুঁচকে রয়েছে প্রতিক্রিয়ায়। দেবাদ্রি সান্যাল নামের এই লম্বা-চওড়া, গম্ভীর মুখের পুলিশ ইন্সপেক্টরটির আপাতসৌম্য চোহারার ভেতর যেন ঘাপটি মেরে আছে একটা হিংস্র বুলডগ। কাল সারারাত সিনেমুভির প্রতিটি সদস্যকেই যখন একের পর এক তীব্র, দ্ব্যর্থক, ছুঁচলো প্রশ্নবাণে কাহিল করে ফেলছিলেন, একই প্রশ্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ছুড়ে দিয়ে বুঝতে চাইছিলেন কেউ কোনও তথ্য চেপে রাখছে কি না অথবা মিথ্যে বলে বিভ্রান্ত করতে চাইছে কি না তদন্তকারী অফিসারকে, তখন রোমিওকেও বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করছিলেন, বর্ণনাকে সে কতদিন ধরে চিনত, তার সঙ্গে অন্য একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কিংবা উঠতে চলেছিল কি না, অথবা তার সঙ্গে কোনও শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল কি না, হলে কতদিন যাবৎ। জেরায় জেরায় রোমিওর পেটের নাড়িভুড়ি পর্যন্ত টেনে বার করতে চাইছিলেন দুঁদে ইন্সপেক্টর। রোমিও বেশি কথা বলছিল না, সাধারণত মনোসিলেবিক উত্তর দিয়ে, 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' অথবা 'জানি না' ইত্যাদি সহযোগে প্রায় বোবা হয়ে থাকতেই চাইছিল। সে জানে, বেশি কথা বলা মানেই উল্টে আরও দ্বিগুণ প্রশ্ন আমন্ত্রণ করে আনা, জড়িয়ে পড়া অহেতুক বিপদের মধ্যে।

কিন্তু সে এড়িয়ে থাকতে চাইলেও, দেবাদ্রি সান্যালের প্রশ্নের ধরনে এটা বুঝতে পারছিল তার সহকর্মীরা অনেকেই এমন বেফাঁস, এত-এত আলগা মন্তব্য করে ফেলেছে জেরার জবাবে যে, সেগুলো তাদের নিজেদের ওপরও যেমন ব্যুমেরাং হয়ে আছড়ে পড়েছে, তেমনই তার জের পোহাতে হয়েছে রোমিওকেও। সেগুলো অনৃতভাষণ হয়তো নয়, কিন্তু পুলিশের কাছে সেগুলোই এক-একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লু, আর সিনেমুভির সদস্যের বিরুদ্ধে মারাত্মক সব এভিডেন্স। নইলে দেবাদ্রি সান্যাল কী করেই বা জানবেন বর্ণনার সঙ্গে ইতিমধ্যেই তার একটা অদ্ভুত, রহস্যময় সম্পর্ক গড়ে উঠতে চলেছিল। আর সে-সম্পর্ক বিছানা পর্যন্ত গড়িয়েছিল কি না সেটা জানার জন্যই তাঁর কী ঝুলোঝুলি, সেইসঙ্গে কী ভয়ঙ্কর আর অশ্লীল সব প্রশ্ন।

সেই দেবাদ্রি সান্যাল আবার সদলবলে ধাওয়া করে আসছেন শুটিং-স্পট পর্যন্ত, এ-সংবাদে বলাই বাহুল্য কেউই খুশি হতে পারেনি। শুটিঙের মধ্যে আবার কী ক্লু খুঁজতে শুরু করবেন, তা ঈশ্বরই জানেন, আর জানেন দেবাদ্রি নিজেই।

ঋষভদা অবশ্য বলেছেন, লেট দেম ডু দেয়ার জব। ডোন্ট বদার অ্যাবাউট দ্যাট।

দেবাদ্রি শুটিং দেখতে আসছেন কি না, গার্গীর এই প্রশ্ন শুনে রোমিও বলেছিল, শুটিং দেখতে আসছে, না কি আবারও জেরায় জেরায় ফ্ল্যাট করে দেবে বলেই—

গার্গী মেক-আপ নিতে নিতে হাসল, খুব জেরা করেছে বুঝি কাল রাতে!

—ওহ, সাংঘাতিক। সে-সব প্রশ্ন যত দ্রুত ভুলে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

সত্যিই বর্ণনা-প্রসঙ্গ এক অসম্ভব দ্রুততায় ভুলে যেতে চাইছিল শুধু রোমিওই নয়, সিনেমুভির প্রতিটি সদস্যই। কাল ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত যে ভয়ঙ্কর ঘটনাবলি পর পর ঘটে গেল, তা যদি কেউ ভিডিও ক্যাসেটের টেপে বন্দি করে রাখত, তবে নিশ্চয় সেই ছবিটার

নাম হত 'একটি দুঃস্বপ্নের কয়েক ঘণ্টা।' সেই কয়েক ঘণ্টা ভুলে যেতেই বোধহয় 'সোনালি ঘুঙুর'-এর পরিচালক থেকে স্পটবয় পর্যন্ত সব্বাই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে শুটিঙের কাজে।

গার্গী চৌধুরি একটু আগেই আরও একটা প্রশ্ন করেছিল রোমিওকে, কাল অত বড় একটা দুর্ঘটনা, তার ফলে সারা রাত জেরা, শেষ রাতে হেটেলের রুমে পুলিশি তল্লাশির পর কী করে আজ দুপুরেই যে আপনারা শুটিং শুরু করছেন তা আমার মগজে কুলোচ্ছে না—

রোমিও সামান্য গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছিল, আসলে কি জানেন, ফিল্মের লোকেরা ভীষণ প্রফেশনাল, তাদের প্রত্যেকটা মুহূর্তের দাম আছে। বিশেষ করে আউটডোরে এলে প্রোডাকশনের খরচ এমন হু-হু করে তাপমাত্রা ছড়াতে থাকে যে, তখন কারও এক সেকেন্ড সময় নষ্ট করার ফুরসত থাকে না। বাইরে বেরুলে নানারকম বিপত্তি ঘটবেই এটা ভেবে নিয়েই সবাই আউটডোর করতে আসে। হয়তো বর্ণনার আত্মহত্যার মতো বড় দুর্ঘটনা কখনও ঘটে না। কিন্তু নায়িকার আজ মুড নেই, কিংবা নায়কের মাথা ধরেছে, অতএব এ-বেলা শুটিং ক্যানসেল জাতীয় টিট্‌বিট্‌ সারাক্ষণই লেগে থাকে শুটিঙের সময়।

গার্গী তবুও যেন নাছোড়, কিন্তু দু-দুটো মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে যে-ভাবে সাঁড়াশির মতো আপনাদের চেপে ধরেছে পুলিশ, তার পরও—

রোমিওর চটপট জবাব, কিন্তু এর মধ্যে সিনেমুভির কেউই যে জড়িত নয়, তা তো কনফার্মড্‌ হয়েছে কাল। তা ছাড়া বর্ণনা-প্রসঙ্গ দ্রুত ভুলে যেতেই সবাই ব্যস্ত হতে চাইছে শুটিঙে। ফিল্ম লাইনে শুটিংই হল সবচেয়ে সুন্দর, কাঙ্ক্ষিত সময়। দেখছেন না, গত তিন-চারদিন মনমরা হয়ে থাকার পর আজই হঠাৎ কেমন ঝলমল করছে সবাইকার মুখচোখ!

গার্গী অবশ্য দেখতেই পাচ্ছে সেটা। চকবাজার এলাকাটা কিছুটা ঘিঞ্জি, কিছুটা বর্ণাঢ্যও বটে। এটা রেড লাইট এরিয়া নয়, তবু একটা নিষিদ্ধ গন্ধ এখানকার আবহে মিলমিশ হয়ে থাকে বলেই এ-গলির সবখানেই যেন একটা রং। শুটিং শুরু হয়েছে বিবস্বান বসুকে নিয়ে। চলচ্চিত্রের এই বিখ্যাত অভিনেতাটি কলকাতার পথে দাঁড়িয়ে এভাবে শুটিং করলে চারপাশে মস্ত ভিড় জমে যেত এতক্ষণে। কিন্তু এখানে কেউই চেনে না তাঁকে, তবু কিছু কৌতূহলী মুখ দাঁড়িয়ে আছে এপাশে-ওপাশে তা শুধু রোমিওর ক্যামেরার কারণেই। লখনউয়ের বাসিন্দরা ইতিমধ্যেই বুঝে ফেলেছে, কোনও একটা ফিল্মটিল্ম তোলা হচ্ছে এখানে, তাই কেউ-কেউ যাতায়াতের পথে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতে চাইছে মজাক্‌।

দোতলা কোঠিটিতে ঢোকার ঠিক পাশেই রঙিন পোস্টারে-ক্যালেন্ডারে ছয়লাপ সেই পান দোকানটি। দু-গালে চাপদাড়ি, মাথায় পাঁচপানওয়ালি টোপি পরা খানদানি-চোহারার পানদোকানি যুবকটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন বিবস্বান বসু, মানে 'সোনালি ঘুঙুর'-এর সেই সাংবাদিক পুলক চৌধুরি, যিনি লখনউয়ের বাঈজি-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে সন্ধান করে চলেছেন বাঈজিদের পেডিগ্রি, জীবন-যাপন, অতীত-ইতিহাস। কাল রাতে এই দোতলা কোঠিটির ভেতর থেকেই ভেসে আসতে শুনেছিলেন গৌড়মল্লার রাগের একটা খেয়ালগান। তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে পানদোকানি সসম্ভ্রমে জানিয়েছিল, যে-গায়িকার এমন মধু-ঝরানো কণ্ঠ, তাঁর নাম রেশমবাই। এ তল্লাটের সবচেয়ে রূপসী, খানদানি বাইজি।

কে রেশমবাঈ তা পুলক চৌধুরি জানেন না, কয়েক দিন ধরে বাইজিদের মহল্লায় ঘুরে তিনি অক্লান্তভাবে আহরণ করে চলেছেন এই সম্ভ্রান্ত পুরনো শহরটিতে, নানান বিধিনিষেধ সত্ত্বেও, আজও যেসব বাঈজি টিকে আছেন তাঁদের পেশায়, তাঁদের সম্পর্কে যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য।

আজ তার অভীষ্ট রেশমবাই। সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী বাইজিটির দর্শনপ্রার্থী হয়েই পুলক চৌধুরি কোঠির বাইরে বসা একজন খালিগায়ের কিশোরকে দিয়ে খবর পাঠালেন, একটি বিশেষ প্রয়োজনে তিনি সাক্ষাৎকার চান রেশমবাঈয়ের।

কিশোরটি একবার ভাল করে নিরীক্ষণ করল পুলক চৌধুরির মুখচোখ, চেহারা। এই মহল্লার দর্শনার্থী পুরুষদের আদবকায়দা, চাউনি, হাবভাব সম্পর্কে সে নিশ্চয়ই পরিচিত, তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে প্রায় হরিণ-গতিতে মিলিয়ে গেল সিঁড়ি বেয়ে ওপরের ঘরে, কিন্তু ফিরে এল তারও চেয়েও দ্রুত, হাঁপাতে হাঁপাতে জানাল, আভি নেহি। সামকো আইয়ে—

পুলকে চৌধুরি তাতে সন্তুষ্ট হলেন না, বললেন, তাঁর প্রয়োজনটা সন্ধের পর নয়, এখন। রেশমবাইয়ের সঙ্গে এখনই দেখা করতে চান, এই সকালবেলায় যখন তাঁর কোঠিতে ভিড় থাকবে না।

কিশোরটি তাঁর প্রয়োজন জেনে নিয়ে আগের মতো আবারও সেঁধিয়ে গেল ওপরে, ফিরে এল সেই একই উত্তর নিয়ে, আভি নেহি। সামকো। মুজরো তো রাতমে হোনা হ্যায়।

পুলক চৌধুরী ভালই জানেন বাইজি-মহল্লার আসল আকর্ষণ সন্ধের পর, যখন লখনউয়ের রাত আস্তে আস্তে তার রহস্যের ডানা বিস্তার করে, একটা অন্য আবহ সৃষ্টি করে চকবাজারে। তখন বাইজিদের মুজরো শুরু হয়। তাদের সুরেলা কণ্ঠের আকর্ষণে, নাচের ভঙ্গিমায়, হিল্লোল বয়ে যাওয়া তাদের শরীরের টানেটানে, চোখের মাদক আমন্ত্রণে এসে ভিড় করতে থাকে মধুলোভী পুরুষ। কিন্তু পুলক চৌধুরি তো মধুপান করতে সেই কলকাতা থেকে লখনউ আসেননি, তাঁর প্রয়োজন অন্য। একেবারেই ভিন্ন রকমের।

দু-দুবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরও পুলক চৌধুরী কিন্তু হাল ছাড়লেন না। গত কয়েকদিন লখনউয়ের এই বিখ্যাত মহল্লাটিতে ঘোরাঘুরি করার পর এই সারসত্যটি অবহিত হয়েছেন যে, বাইজিদের অবসরের মুহূর্তে, বিশেষ এই সকালবেলায় তাদের সঙ্গে দেখা করাটা খুবই দুরূহ। তবু এভাবে লেগে থেকেই তো এর আগে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করেছেন, নোট নিয়েছেন তাদের জীবন-কাহিনীর, আজও সেভাবেই দেখা করবেন রেশমবাইয়ের সঙ্গে।

তাঁকে অমন নাছোড় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, পানদোকানি যুবকটিও ঠোঁটে অহঙ্কারীর হাসি মাখিয়ে বলল, রেশমবাই কোই সস্তা চিজ নেহি, বাবুজি। আভি উসকো সাথ মোলাকাত নেহি হোগা।

পুলক চৌধুরী বিস্মিত হলেন তা নয়। কাল রাতে গৌড়মল্লার রাগের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতটির কিছুটা শুনেই অনুমান করে নিয়েছেন রেশমবাইয়ের ওজন এমন ওজনদার বাইজির ঠাটঠেকার একটু যে বেশিই হবে সেটা সঙ্গত। কিন্তু তিনিও একজন পোড়খাওয়া সিনিয়র সাংবাদিক, বাইজি যত মূল্যবানই হোন না কেন, তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়াটাও পুলক চৌধুরির পক্ষে কোনওক্রমে অসম্ভব নয়।

দোতলা, সুনসান কোঠিটির দিকে তাকিয়ে পুলক সিদ্ধান্ত নিলেন, তা হলে সন্ধের পর রেশমবাইয়ের মুজরোর আসরেই আসবেন, তার ক্লাসিক্যাল মিউজিক শুনবেন। অন্যান্য নাগরদের মতো মাথা দুলিয়ে, আঙুলের ভঙ্গি করে তারিফ করবেন তার গানের, তার পর ফুরসতমতো তারিখ ও সময় নেবেন রেশমবাঈয়ের একটি একান্ত সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করে।

ঠিক সেই মুহূর্তে পান-দোকানের সামনের পথের ওপর একটি অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হল, যা কলকাতার সাংবাদিক পুলক চৌধুরির কাছে কিছুটা অতিরিক্ত বিস্ময়ের। দুজন অদ্ভুত

চেহারার মোরগবাজ, একজনের পরনে আংরাখার সঙ্গে ঢিলে পাঁয়চার পাজামা, মাথায় দুপলড়ি টুপি, অন্যজনের সবুজ চেক-কাটা লুঙ্গির ওপর সাধারণ ঢিলে শার্ট, মাথায় ইরানি পাগড়ি, দুজনেরই হাতে দুটো মুর্গা। হঠাৎ পটভূমিতে ভোজবাজির মতো আবির্ভূত হয়ে, মুখে হা-লা-লা-ল্লা রব তুলে সামিল হল মোরগ-লড়াইয়ে।

মোরগ-লড়াই লখনউয়ের এক বিশেষ ঐতিহ্য, ইদানীং দেখাই যায় না তেমন। হঠাৎ দুটি স্বাস্থ্যবান মোরগের ডানার ঝটপটানিতে, কোঁকর-কোঁ ধরনের অদ্ভুত গররর শব্দে, আর মোরগবাজদের কণ্ঠে বিজাতীয় চিল্লানিতে বেশ একদঙ্গল লোক জুটে গেল রাস্তার ওপর। আর এ-মহল্লার লোক বলতে বাইজিদের পেশার সঙ্গে যুক্ত তাদের সহচর-সহচরীরা, বাড়িউলি মাসি থেকে শুরু করে পানদোকানি, ঠুনঠুন শব্দ তোলা রিকশাঅলা, ফলওয়ালি সবাই এসে ঘিরে ধরল মোরগ-লড়াইয়ের জায়গাটা।

ততক্ষণে দুই যুযুধান মোরগের শরীর শক্ত হয়ে উঠেছে। একটি কালোর ওপর সাদা ছিট-ছিট, অন্যটির ছাই-ছাই রঙের ঢাউস পালক ফুলে ফেঁপে একশা, সেইসঙ্গে তাদের দুজনের কুঁড়ি-কুঁড়ি চোখদুটোয় জমা হচ্ছে এক অসম্ভব ক্রূরতা। মোরগ দুটো 'পালি'তে অর্থাৎ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেই মুহূর্তে একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ পরিবেশ। দুটি মোরগেরই লাল টকটকে ঝুঁটি ছুরি দিয়ে চেঁচেচুঁচে তীক্ষ্ণ করে তোলা হয়েছে, সেইসঙ্গে ঠোঁটদুটোও চেঁচে এমন সরু ও ধারালো করে তোলা হয়েছে যা শত্রুশরীরে একবার ছুঁয়ে দিতে পারলেই রক্তপাত অনিবার্য। মোরগদুটো লড়াই শুরু করতেই দুই মোরগবাজ মুখে অদ্ভুত শব্দ করে 'হ্যাঁ, বেটা, ঠিক হ্যায়, ফির ওহিসে,' ইত্যাদি বলে চেঁচিয়ে, উসকে দিয়ে, ক্রমশ উত্তেজিত করে তুলতে লাগল যার যার মোরগকে। কিছুক্ষণ মোরগদুটো ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে, অথবা লাথি মেরে, অথচ ছুঁচলো ঝুঁটি দিয়ে গুঁতিয়ে রক্তাক্ত করে তুলতে চাইল একে অপরকে। একটু-আধটু সফলও হল দুজনেই। বেশি আহত হওয়ার আগেই অবশ্য 'পানি, পানি' বলে দুই মোরগবাজ তাদের যোদ্ধাদের তুলে নিল রণক্ষেত্র থেকে। পানি অর্থে সাময়িক বিশ্রাম, সেইসঙ্গে শুশ্রূষা। কিছুক্ষণ পর আবার রণং দেহি বলে দুটিতে যুদ্ধে অবতীর্ণ।

এই বিপুল হই-হল্লার শব্দ শুনে রাস্তার ধারের এ-কোঠি ও-কোঠি থেকে রূপসী বাইজিরাও তাদের ওজন ভুলে কৌতূহলী হয়ে এসে দাঁড়াল যার-যার কোঠির ব্যালকনিতে। আর হ্যাঁ, একটু পরেই রেশমবাইও।

পুলক চৌধুরি তখন আর মোরগবাজদের চিল্লাচিল্লি, উত্তেজক অবস্থার দিকে চোখ রাখতে পারছেন না। তাঁর কৌতূহলী নজর গিয়ে সহসা আছড়ে পড়ল রেশমবাইয়ের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে দম বন্ধ হয়ে এল তাঁর। এ ক'দিনে লখনউয়ের বাইজি-মহল্লায় এতজন বাইজি দেখে এলেন, তাদের কত নখ্‌রা, ঠারঠমক, কিন্তু এত রূপসী একটিও চোখে পড়েনি তাঁর। তবে তিনি যা খুঁজছিলেন, তা যেন পেলেন না। রেশমবাই নেহাতই তরুণী, তেইশ-চব্বিশের মধ্যে তার বয়স। শুধু একটাই তাঁর বিস্ময়, এক অল্পবয়সে কীভাবে কণ্ঠে এতখানি দক্ষতা অর্জন করল রেশমবাই। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সিদ্ধি তো এত কম বয়সে হয় না! তা ছাড়া যে-গানটি কাল রাতে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন রেশমবাইয়ের গলায়, সে-গানই বা সে কার কাছ থেকে পেল!

রেশমবাই যে খুবই মহার্ঘ বাইজি-তার চকিতে এসে দাঁড়ানো ব্যালকনিতে, কয়েক পলক

কৌতূহলী দৃষ্টি ন্যস্ত করা মোরগ-লড়াইয়ের জায়গাটায়, পরক্ষণেই ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ কোঠির মধ্যে, এই কয়েকটি মুহূর্তেই ফুটে উঠল তার আচরণে।

কিন্তু কোঠির ভেতর সে সেঁধিয়ে যাওয়ার আগেই সেই খালি-গায়ের কিশোরটি আঙুল দিয়ে ইশারা করে রেশমবাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করল পুলক চৌধুরির দিকে। যে-পুলক ততক্ষণে মোরগ-লড়াইয়ের মতো প্রবল টেনশনের ক্ষেত্র ছেড়ে অপলক তাকিয়ে দেখছেন রেশমবাইয়ের মুখ। পুলক চৌধুরির মতো একজন সুপুরুষ, রূপবান মেহমানকে অমন মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রেশমবাইও বিস্মিত, কৌতূহলী।

পুলক চৌধুরিকে নিয়ে পর পর কয়েকটা দৃশ্য ক্যামেরায় ধরে রাখার পর, এখন রোমিও প্রস্তুত হচ্ছে রেশমবাইয়ের দোতলা কোঠির ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ানোর দৃশ্যটি ক্যামেরাবন্দি করতে। না, ক্যামেরাবন্দি নয়, ক্যামেরা মারফত ক্যাসেটবন্দি।

ভি.ডি.ও টেপরেকর্ডারে ক্যাসেট নিয়ে পাশেই অপেক্ষা আছে শব্দযন্ত্রী দ্বিত্বম রায়। তার মিঠুন-চুল বেয়ে দু-কানে নেমে এসেছে, বাহারি একটি হেডফোন, তাতে কান লাগিয়ে সে অপেক্ষা করছে ঋষভ মুখার্জির 'স্টার্ট' শব্দটি উচ্চারণের জন্য।

একটু আগেই মোরগ-লড়াইয়ের দৃশ্য পর-পর ক্যাসেটবন্দি করে দ্বিত্বমও একটু ক্লান্ত, কিন্তু বিশ্রাম নেওয়ার একবিন্দু ফুরসতও দিচ্ছেন না ঋষভ মুখার্জি। পর পর তিন-তিনটে দিন বেঘোরে নষ্ট হওয়ার পর এখন রকেটের গতিতে ছুটতে হবে বাকি দিনগুলোয়, এরকমই নির্দেশ দিয়ে পরিচালক টানটান করে রেখেছেন গোটা টিমটাকে।

যেমন কড়া পরিচালক, তেমনি খুঁতখুঁতেও। যে মোরগদুটো দিয়ে একটু আগের লড়াই-দৃশ্য ক্যাসেটবন্দি করা হল, সেগুলো হায়দরাবাদি মোরগ। লখনউ পৌঁছেই যে মুহূর্তে খোঁজখবর নিয়ে ঋষভ জানতে পেরেছিলেন, লখনউয়ের মোরগ তত লড়াকু নয়, হায়দরাবাদি মোরগ তার চেয়ে ঢের বেশি হিংস্র, তখনই শাম্ব সামন্তকে পরের ট্রেনেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন হায়দারাবাদি মোরগ আনতে। তাতে যে প্রোডাকশনের খরচ হু হু করে লাফ দিয়ে বেড়ে চলেছে সে-দিকে হুঁশজ্ঞান নেই পরিচালকের। মাথায় যখন ঢুকেছে হায়দরাবাদি মোরগ দিয়ে লড়াই করাবেন তো সেই মোরগই ভূ-ভারত টুঁড়ে খুঁজে আনতে হবে শুটিঙের সময়। শাম্ব সামন্ত দু'দিন মোরগ খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে অবশেষে আজই ভোরে এসে পৌঁছেছেন লখনউ। তার মধ্যে যে গোটা একটা মহাভারত ঘটে গেল সিনেমুভির প্রেক্ষাপটে, তা শুনে কিছুক্ষণ আর রা কাড়তে পারেননি শাম্ব।

মোরগা-লড়াইয়ের দৃশ্য অফ করে এবার রেশমবাইকে ক্যামেরার ফ্রেমে ধরবে রোমিও। সমস্ত টিম উদ্‌গ্রীব অপেক্ষায় টানটান হয়ে আছে কখন গার্গী চৌধুরি তার মেকআপ শেষ করে এসে বন্দি হবে ক্যামেরার ফ্রেমে। ঠিক সেইমুহূর্তে গোটা পটভূমি দু-দুটো জিপের তীব্র হর্নে সচকিত করে অবতীর্ণ হলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল অ্যান্ড হিজ কোং।

আজ সকালেই ডঃ তালুকদারের ভাইপো বিটন তালুকদার গ্রেপ্তার হতেই তার কাছ থেকে পাওয়া দুটি চিরকুট নাকি ডঃ তালুকদারের হত্যারহস্য একদম ঘুরিয়ে দিয়েছে অন্য দিকে। সেই কারণেই পুলিশ ইন্সপেক্টর আবার নতুনভাবে, ভিন্ন অ্যাঙ্গেলে জেরা করবেন সিনেমুভির সব সদস্যকেই।

মহিষ-মহিষ চেহারার জিপদুটো গর্জন করে থামতেই আতঙ্কের একটা ঠাণ্ডা স্রোত কুলকুল করে বয়ে গেল প্রেক্ষাপটে। দেবাদ্রি সান্যাল যেন ভীষণ, ভীষণ গম্ভীর।



শীর্ণকায় মাচানবাবু যখন তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে মেক-আপ করছিলেন নিবিষ্ট হয়ে, গার্গীর মনে হচ্ছিল, যেন একজন বিখ্যাত প্রতিমা-শিল্পী তাঁর নির্মীয়মাণ প্রতিমার শরীরে তুলির আঁচড় বোলাচ্ছেন সূক্ষ্ম হাতে, একটু-একটু করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করছেন মৃন্ময় মূর্তিটির। বরাবর এমনই তন্ময়তা মাচানবাবুর। প্রথম-প্রথম বেশ একটু অস্বস্তি যে হচ্ছিল না গার্গীর তা নয়, কিন্তু মেক-আপ শেষ হতেই গার্গী যখন বেরিয়ে এল, চারপাশে কৌতূহলী, জোড়া-জোড়া চোখের দৃষ্টি পরখ করে সে উপলব্ধি করল, বেশ সুন্দরীই দেখাচ্ছে তাকে।

এমনকি বাইরে দাঁড়ানো খাকি-উর্দিতে ভীষণরকম স্মার্ট দেবাদ্রি সান্যাল পর্যন্ত অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, যেন তাঁর বিশ্বাসই হচ্ছিল না এই গার্গী সেই গার্গী, তারপর স্বগতোক্তির মতোই বললেন, বিউটিফুল।

একজন অভিজ্ঞ পুলিশ-অফিসারের এহেন কমপ্লিমেন্ট বেশ ভালই লাগল গার্গীর। সে নিজেও মেকআপ শেষ হতে আয়নায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজেকে দেখে অবাকই হয়েছিল খুব। বস্তুত আশৈশব কখনও সেভাবে রূপচর্চা করেনি, সাজগোজ করে পটের বিবিটি হয়ে বসে থাকা তার কখনও অভীষ্ট ছিল না। জীবনে কিছু একটা করবে, করে দেখাবে যে গার্গী অবলা নারী নয়, একজন বিশেষ, স্বতন্ত্র কেউ—এ রকমই অ্যাম্বিশন ছিল তার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের দিনগুলিতে। ফিচার লিখে, সাংবাদিকতা করেই তার সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষার হাতেখড়ি, তারপর তার জীবন এক-এক আবর্তে পড়ে, এ-ঘাটের ও-ঘাটের জল খেয়ে এগিয়ে চলেছে তরতরিয়ে। জানে না, কোথায় তার গন্তব্য, ভবিতব্যই বা কী। আজ সকালে উঠেও কি জানত, মুখে রং মেখে তাকে এভাবে রেশমবাই হয়ে দাঁড়াতে হবে ক্যামেরার সামনে।

দেবাদ্রি সান্যাল অবশ্য খুব যে একটা স্বস্তিতে নেই, তা তাঁর ডঃ সুস্নাত তালুকদারের হত্যারহস্য সংক্রান্ত সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ ও বক্তৃতা শুনে কিছুটা বুঝতে পেরেছিল সে, নিশ্চিত হল বিটন তালুকদার গ্রেপ্তার হওয়ায় ও তার পকেট থেকে দুটি চিরকুট আবিষ্কৃত হওয়ায়। এখন দেবাদ্রি সান্যালকে সামনে পেয়ে ভাবছিল, তার মনে পর পর উদিত হওয়া প্রশ্নবাণ দিয়ে তুখোড় পুলিশ-অফিসারটিকে কিছুটা হতভম্ব করে দেবে কি না।

ডঃ তালুকদারের হত্যাকারী হিসেবে বর্ণনা সেনগুপ্তকেই চিহ্নিত করে যে-ভাবে নিখুঁত যুক্তিজাল বিস্তার করেছিলেন দেবাদ্রি, তাতে যে অনেক ফাঁকফোকর, গোঁজামিল থেকে যাচ্ছিল, তা গার্গী সেই মুহূর্তে অনুমান করেও তখন প্রকাশ করেনি। ভাবছিল আর একটু সময় বয়ে যাক গোমতীর ওপর দিয়ে, প্রকৃত সত্য নিশ্চয়ই একদিন উন্মোচিত হবে ক্রাইমের নিয়ম-অনুযায়ী।

এখন বিটন তালুকদার-এপিসোড সম্পর্কে দেবাদ্রির ব্যাখ্যা কী, তা শুনতেই ভারি কৌতূহল হচ্ছিল তার।

দেবাদ্রি ভারি শক্তপোক্ত অফিসার, কিন্তু গার্গীর মুখোমুখি হলেই কেন কে জানে একটু ঢিলেঢালা হয়ে যান। আজও, কয়েক মিনিট একান্ত হতেই গার্গীকে বললেন, বিটনকে কয়েকটা ঘা দিতেই কী বলল জানেন! বলল চিরকুটগুলো সে কুড়িয়ে পেয়েছিল ডঃ তালুকদারের ঘরে, যেখানে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল।

গার্গী হেসে বলল, তা হতেও তো পারে।

কিন্তু একটা কূট প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে তা হল, বর্ণনা এতগুলো চিরকুটে সুইসাইড নোট লিখেছিলই বা কেন! একটা চিরকুট ডঃ তালুকদারের ঘরে পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দিয়ে রাখল, দুটো তার হ্যান্ডব্যাগে পাওয়া গেল, দুটো ছড়িয়ে রাখল ডঃ তালুকদারের ঘরে, আরও একটা পাওয়া গেল তার নিজের ডেডবডির পাশে। খুব আবসার্ড লাগছে না!

গার্গী আবার হাসল, সেটা একটা প্রশ্ন বটে।—আর এ একটা প্রশ্ন হল, বিটন তালুকদার কলকাতা থেকে লখনউ পর্যন্ত ছুটে এল কেন। তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলেছে, পুরো টাকাটাই এখন বর্ণনার হেপাজতে এরকম অনুমান করেই সে ধাওয়া করেছিল বর্ণনাকে খুঁজতে। ক্যাশ টাকাটা তো নেইই, এমনকি ডঃ তালুকদারের চেকবই-পাশবই পর্যন্ত তাঁর আলমারি থেকে উধাও।

—তাই! গার্গী অবাক হল, বর্ণনাই যদি সব টাকা আত্মসাৎ করবে তা হলে সে সুইসাইড করতে যাবে কেন!

—সে প্রশ্নে পরে আসছি। সেই জন্যেই তো যারা-যারা বর্ণনার ঘনিষ্ঠ ছিল, সিনেমুভির সেই সদস্যদের আরও একবার জেরা করতে চাই। প্রথমে রানাজি সান্যালকে—

—কেন!

—রানাজি সান্যালই ঋষভ মুখার্জির হয়ে বর্ণনার ফ্ল্যাটে কয়েকদিন ধরে যাতায়াত শুরু করেছিলেন। কলকাতায় বর্ণনার শেষ কয়েকদিনের হোয়ারঅ্যাবাউটস হয়তো তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব।

—ঠিক আছে, আপাতত সেটাই করুন, আমি আপাতত অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হই। সবাই অপেক্ষা করছেন আমার জন্য।

—ও, কে, বেস্ট অব লাক, মিসেস চৌধুরি, দেবাদ্রি হাসতে হাসতে বললেন, উঁহু, মিসেস চৌধুরি নয়, রেশমবাই। যা ফ্যান্টাস্টিক দেখাচ্ছে না আপনাকে এই ড্রেসে!

রেশমবাইয়ের পরনে তখন সকালের ঢিলেঢালা শালোয়ার-কামিজ, তার ওপর পাতলা ওড়না, চুলে সহজ বেণী, তবু তার মধ্যেই একটা আশ্চর্য সৌন্দর্য উপচে পড়ছে বাইজির শরীর থেকে। তার প্রধান কৃতিত্ব অবশ্য মেক-আপম্যান মাচানবাবুর।

দেবাদ্রি তখন রানাজির খোঁজ করছেন দেখে রোমিও হাতছানি দিয়ে ডাকল গার্গীকে, এদিকে আসুন ম্যাডাম। ক্যামেরার চোখ দিয়ে আপনাকে একবার দেখেনিই কীরকম ছবি আসছে আপনার।

গার্গী তাকিয়ে দেখল, রোমিওর ক্যামেরা তখন তাক করছে তার মুখের দিকে। রোমিওর ও-পাশেই কানে হেডফোন লাগিয়ে দ্বিত্বম রায় বসে আছে সাউন্ড রেকর্ডারটির সামনে। সাউন্ড রেকর্ডারের সামনে মনিটরে এক মুহূর্তে ফুটে উঠল গার্গীর শরীরের ছবি।

গার্গী নিজেও দেখতে পেল মনিটরের স্ক্রিনে ফুটে ওঠা তার মুখ, শরীর। আর কী আশ্চর্য,

আয়নায় তাকে যতটা সুন্দরী হচ্ছিল, এখন স্ক্রিনে তার ডবল সুন্দরী মনে হচ্ছে যেন। রোমিও ঠিকই বলেছিল তা হলে, তার মুখ ভারি ফটোজিনিক।

সেলুলয়েডে তোলা ফিচার-ফিল্মের সঙ্গে ভিডিও-ক্যাসেটে তোলা টিভি-সিরিয়ালের ছবির পার্থক্যটা তাকে বুঝিয়েছিল রোমিও। ফিচার-ফিল্ম তোলা হয় সেলুলয়েডের ফিল্মে, তাতে ছবি তোলার পর যতক্ষণ না তার নেগেটিভ ওয়াশ হয়ে ফিরে আসছে, পরিচালক বা কারও বোঝার সাধ্য নেই, ঠিক কীরকম টেক হয়েছে পর-পর তোলা দৃশ্যগুলো। কিন্তু টিভি-সিরিয়াল তোলা হয় ভিডিও-ক্যাসেটে, ফলে শুটিং চলাকালীন প্রতিটি মুহূর্তই দৃশ্যমান হয় মনিটরের স্ক্রিনে।

গার্গী তখন সত্যিই অগ্নিপরীক্ষায়। ক্যামেরার সামনে কী ভাবে দাঁড়ালে, কোন অ্যাঙ্গেলে দাঁড়ালে তার মুখভঙ্গিমা সবচেয়ে সুন্দর দেখাবে তা নিয়ে রোমিও সিরিয়াসভাবে ব্যতিব্যস্ত। কোঠির ঘর থেকে ব্যালকনিতে এসে তার দাঁড়ানো, একবার মোরগ লড়াইয়ের দৃশ্যের দিকে দৃকপাত করা, পরক্ষণেই কোঠির ভেতরে চলে যাওয়ার উদ্যোগ, হঠাৎ সেই খালি-গায়ের কিশোরটির ইশারা অনুসরণ করে বিবস্বান বসু অর্থাৎ পুলক চৌধুরির দিকে তাকানো, এটুকু দৃশ্য তুলতে পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড লাগবে। তার জন্য ঋষভ মুখার্জি তাকে বার তিনেক রিহার্সাল দেওয়ার পর একবারেই শট ও.কে হতে সিনেমুভির সবাই তাকে কনগ্রাট্স জানাল।

কিন্তু পরের দৃশ্যটাই তো দীর্ঘ। রেশমবাইয়ের সম্মতি পেতে সাংবাদিক পুলক চৌধুরি এসে প্রবেশ করবেন তার কোঠিতে।

পুলক চৌধুরি অর্থাৎ বিবস্বান বসু, বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম বিখ্যাত নায়ক, যাকে এর আগে গার্গী মাত্র কয়েকবার দেখেছে সেলুলয়েডের পর্দায়। এখন তাঁরই মুখোমুখি হতে হবে, অভিনয় করতে হবে তাঁর সঙ্গে, পর-পর দৃশ্যে প্রায় মিনিট পনেরোর অভিনয়, এত সব ভাবতেই গায়ে প্রায় জ্বর এসে গেল গার্গীর। অথচ বাস্তব-জীবনে সাংবাদিক হিসেবে নায়ক বিবস্বান বসুর মুখোমুখি হলে হয়তো এতটা নার্ভাস হত না গার্গী, কিন্তু তাঁর বিপরীতে কখনও অভিনয় করতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি কখনও।

স্থান : রেশমবাইয়ের ড্রইংরুম, যে-প্রশস্ত ঘরটায় সে প্রতি সন্ধ্যা মুজরো করে, তারই সংলগ্ন ছোট্ট ঘর, সেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরই অনেকক্ষণ ধরে সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রস্তুত করে ফেলেছেন শুটিঙের জন্য। সিনেমুভির যিনি আর্ট ডিরেক্টর, বিশেষ কারণে তিনি কলকাতা ছেড়ে লখনউ আসতে পারেননি বলেই ঋষভ মুখার্জি নির্দেশ দিয়েছেন, শাম্ব সামন্তকেই আর্ট ডিরেক্টরের কাজটা চালিয়ে দেওয়ার জন্য।

রেশমবাইয়ের ড্রইং হিসেবে বারো বাই ষোলো সাইজের একটি পরিষ্কার, তকতকে ঘরকে সাজানো হয়েছে বাইজিদের আদবকায়দা অনুযায়ী। ঘরের লম্বা দেওয়াল ঘেঁষে একটা প্রমাণ সাইজের নেওয়ারের পালঙ্ক, তার ওপর একটা রঙিন দরী (সতরঞ্চি), দরীর ওপর ফর্সা ধবধবে, কোঁচবিহীন চাঁদনি, চাঁদনির চারপাশে কুঁচি-দেওয়া বাহারি ঝালর নিখুঁতভাবে ঝুলে আছে একেবারে মেঝে পর্যন্ত। রেশমি রঙিন সুতো দিয়ে চাঁদনির চারকোণ পালঙ্কের চার পায়ার সঙ্গে বাঁধা, যাতে বিছানাটা কুঁচকে না যায়। পালঙ্কের মাথার দিকে লাল টুল কাপড় দিয়ে তৈরি চারকোনা পাতলা, নরম কয়েকটা তাকিয়া, সেগুলো পাতলা নয়নসুখ কাপড়ের সাদা খোল দিয়ে ঢাকা।

পালঙ্কের সামনে মেঝের ওপর একটা ঝকঝকে সবুজ রঙের গালিচা, তার ওপরও পাতা কয়েকটা তাকিয়া, সেগুলো একটু বড় সাইজের। দিনের অন্য সময় কোনও মেহমান এলে এই গালিচার ওপরই বসতে হয় তাঁকে।

রেশমবাইয়ের অনুমতি নিয়ে ড্রইঙে ঢুকে পুলক চৌধুরি কিছুক্ষণ নির্নিমেষে তাকিয়ে দেখলেন লখনউয়ের এক ওজনদার বাইজির পরিপাটি রুচি। চার দেওয়ালে মোটা সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো প্রমাণ-সাইজের চারখানা রঙিন তস্‌বির, তাতে ঘরের শোভায় যুক্ত হয়েছে একটা অন্য মাত্রা। একপাশে একটা দামি কাঠের কারুকাজ-করা আলমারি, তার ভেতরটা কালো কাপড় দিয়ে বাঁধানো সোনার জলে নাম লেখা বইয়ে ঠাসা। পুলক একনজর উঁকি দিয়ে দেখলেন, তাতে সাহিত্যের বইয়ের সঙ্গে ইতিহাস, শিল্প, শাস্ত্রীয় সংগীতের বইয়ের সহাবস্থান। ঘরের এককোণে একটা বিশাল তানপুরা পূর্ণ গরিমায় বিরাজিত। তানপুরাটা যেন এই কোঠির ধ্রুপদী ঐতিহ্যের মূর্ত প্রতীক। এক লহমা গৌড়মল্লার রাগটি পুলক চৌধুরির কানে বেজে উঠে তাঁকে অন্যমনস্ক করে তুলল সহসা।

একটু পরেই গালিচার ওপর গোলাপি শালোয়ারে ঢাকা পা দুটো ভাঁজ করে, যেন কোনও ভৈরোঁ কিংবা বিভাস রাগে গেয়ে উঠবে ধ্রুপদী সংগীত এমন ভঙ্গিতে, পুলকের সামনে এসে বসল রেশমবাই। রেশমবাইয়ের ভাবভঙ্গিতে সামান্যতম জড়তাও নেই। এমন বহু খানদানি পুরুষ তার মুজরোয় নিত্যসঙ্গী, তার গানের সমজদার, তার রূপের গুণগ্রাহী। শুধু পুলক সেই সুদূর কলকাতা থেকে তার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন শুনে রেশমবাইয়ের পাতলা, সুন্দর ঠোঁটে লেগে আছে সামান্য স্মিত হাসি। পুলক লক্ষ করলেন, রেশমবাই শুধু অসাধারণ সুন্দরীই নয়, তার চোখের খর দৃষ্টি 'মরমে পশিয়া' যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ঘরের পরিবেশ অনুধাবন করেই বোঝা যাচ্ছে, রেশমবাই যেমন গানেও পারদর্শিনী তেমনই তার পাঠনপাঠনও যথেষ্ট।

রেশমবাই গালিচায় বসেই অবশ্য তার উর্দু-ঘেঁষা হিন্দিতে সরাসরি প্রশ্নই ছুড়ে দিল পুলক চৌধুরিকে, তুম কওন পত্রকার হ্যায়? কলকাত্তাইয়া!

পুলক চৌধুরি কোনও ভনিতা না করে সরাসরি তাঁর প্রসঙ্গে চলে এলেন, জানালেন তিনি লখনউয়ের বাইজি-মহল্লা নিয়ে একটা গবেষণাপত্র রচনা করছেন, আজ ক'দিন ধরে সে-কারণেই তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন এ-কোঠি সে-কোঠিতে। বাইজিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে নোট নিচ্ছেন প্রয়োজনীয়, অভিনব সব খুঁটিনাটি।

রেশমবাই তৎক্ষণাৎ তার পরবর্তী সংলাপও ছুড়ে দিল তীক্ষ্ণ একটা প্রশ্নের আকারেই, ও! বাইজিদের নিয়ে রিসার্চ করছ! কেন, হঠাৎ বাইজিদের নিয়ে পড়লে কেন, বাবুজি। বাঈজিদের নিয়ে রকমারকম কেচ্ছা লিখলে তা লোকে খুব খায় বুঝি!

রেশমবাইয়ের কথার ইঙ্গিতটি অনুধাবন করে একটু যেন চমকে উঠলেন পুলক। রেশমবাইয়ের তুমি বলাটা তেমন গায়ে মাখেননি, যেহেতু বাইজিরা পৃথিবীর সব পুরুষকেই তাদের নাগর বলে ধরে নেয়, আর প্রেমিক পুরুষকে তুমি বলাটাই তো সঙ্গত। কিন্তু পুলকের মতো একজন সিনিয়র সাংবাদিককে যেভাবে খোঁচা দিয়ে কথা বলছে রেশমবাই, তা একটু অবাকই করল তাঁকে।

পুলক অবশ্য রেশমবাইয়ের হুলটি সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে বোঝাতে চাইলেন, কয়েকশো বছর আগে সারা হিন্দুস্থানে লখনউয়ের খ্যাতি প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তার সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য, শিল্প সংস্কৃতির উৎকর্ষে। মুসলিম শাসকরা যখন এদেশে এসেছিলেন, তাঁদের পিছু পিছু এসেছিল ইরাকি, ইরানি, আরবি, তুর্কিরা। সেই সঙ্গে তাদের নিজস্ব সঙ্গীত। এদেশি ও ওদেশি সঙ্গীত ভারতবর্ষের বড় বড় ওস্তাদদের গলায় মিলমিশ হয়ে সৃষ্টি করেছিল এক স্বতন্ত্র ঘরানার। লখনউ ছিল তারই একটি প্রধান কেন্দ্র। এমনকি ইরানি কাওয়ালদের অনেক গানও অল্পবিস্তর প্রভাবিত

করেছে হিন্দুস্থানি সংগীতকে। তাদের অনেক রাগ শামিল হয়েছে ভারতীয় সঙ্গীতে। লখনউয়ের নবাবদের অনেকেই সঙ্গীতপ্রেমী হওয়ায় এখানকার অযোধ্যা ও বেনারসের পুরনো ঘরানার সঙ্গে যুক্ত হয় দিল্লির বড়-বড় গাইয়ে, ইয়াসিন খাঁর ঘরানা ইত্যাদি। সেই গান কালক্রমে রয়ে গেল লখনউয়ের বাইজি-মহল্লায়। এখানকার বিখ্যাত বাইজিরাই তো বহুদিন ধরে মার্গসঙ্গীতের ধারক ও বাহক। এখন সেই সঙ্গীতের হাল কী, যাঁরা এখনও লখনউয়ে বাইজি-মহল্লায় টিকিয়ে রেখেছেন নিজেদের অস্তিত্ব, তাঁদের পূর্বাপর কাহিনী, অতীত-ইতিহাস, জীবনযাপন অবগত হওয়াই তো কলকাতার এই সাংবাদিকের ঈঙ্গিত।

রেশমবাইয়ের ঠোঁটের ধারালো হাসি, তার কণ্ঠের শ্লেষ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল কলকাতা থেকে আসা 'পড়ালিখা' জানা সাংবাদিকটির ইতিহাসচারিতায়। এতক্ষণে বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বলো, কী জানতে চাও, বাবুজি?

পুলক চৌধুরিও কিছুটা থিতু হলেন রেশমবাইকে প্রভাবিত করতে পেরে। প্রভাবিত করতে পারবেন, সে-বিষয়েও নিশ্চিত ছিলেন, কেননা তাঁর শৈশব-কৈশোর, প্রথম যৌবন কেটেছে মার্গসঙ্গীতের একনিষ্ঠ আবহাওয়ায়। তাঁর পিতাও তো ছিলেন কলকাতার একজন নামকরা গাইয়ে, অতঅব পুলকের রক্তেও সেই ধ্রুপদী শিহরন আজও অন্যমনস্ক রাখে তাঁর অবসরের হাতে-গোনা মুহূর্তগুলি। অতএব রেশমবাইয়ের মতো সুকণ্ঠীকে তিনি শুধু গানের প্রসঙ্গেই যে অভিভূত করে রাখতে পারবেন তাতে আর সন্দেহ কী।

গান নিয়েই অতএব প্রশ্ন শুরু করলেন পুলক চৌধুরি। তিনি জানেন, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রসঙ্গ ধরেই তিনি উপনীত হতে পারবেন রেশমবাঈয়ের জীবনযাপনের ইতিহাসে।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কথা উঠতেই অবশ্য রেশমবাইকে ভারি উৎসাহিত দেখাল, বলল, বরং সন্ধের পর তুমি আমার মুজরো শুনতে এসো, বাবুজি।

পুলক চৌধুরি তৎক্ষণাৎ বললেন, গান তো অবশ্যই শুনতে চাই। কিন্তু একটা শর্তে। আমি সেদিন একাই হব তোমার গানের শ্রোতা।

—কেন, একা কেন। রেশমাবাইয়ের কণ্ঠে সামান্য বিস্ময়।

—কারণ তুমি যখন মুজরো করবে, তখন গান শুনতে শুনতে আমার প্রশ্ন করার কোনও ফুরসত হবে না, আরও কত লোকই তো থাকবে সেখানে।

রেশমবাই ঘাড় নাড়ল, কিন্তু একা শোনার তো রেওয়াজ নেই, বাবুজি। তা ছাড়া, অন্য মেহমানরা শুনবেই বা না কেন?

পুলক চৌধুরি নাছোড় হয়ে বললেন, মুজরোয় তুমি যা পাও তা যদি আমি দিয়ে দি?

রেশমবাই অবাক হয়ে তাকাল প্রায় মধ্যবয়সী পুলক চৌধুরির দিকে। তার মেহমানদের মধ্যে অনেক প্রৌঢ়, বৃদ্ধও থাকেন। তাদের নানান অস্বাভাবিক, অদ্ভুত আবদারের ঝামেলা তাকে পোহাতে হয় প্রায়শ। কিন্তু তার কোঠিতে এসে একা মুজরো শোনার আবদার সচরাচর ধরে না কেউ। বায়না করে, নিজের বাড়িতে অবশ্য নিয়ে যান কেউ-কেউ। কৌতুকের ঢঙে বলল, আমার মুজরোর রেট কত তা জানো, বাবুজি!

পুলক চৌধুরি তখন নিস্পলক তাকিয়ে আছেন রেশমবাইয়ের হাসি-হাসি মুখের দিকে। হয়তো আন্দাজ করছেন মনে মনে, কত অঙ্কের সংখ্যা বলে উঠবে লখনউয়ের সবচেয়ে ওজনদার বাইজি।

পরক্ষণে হেসে উঠে রেশমবাই বলল, ঠিক আছে, বাবুজি, তুমি আজই সন্ধের পর এসো।

তুমি পত্রকার। বাইজিদের নিয়ে লিখবে। কোনও দাম নিয়ে তোমাকে গান শোনানো যাবে না।

পুলক চৌধুরি হতবাক হয়ে গেলেন রেশমবাইয়ের কথা শুনে।

—কাট! পর পর অনেকগুলো দৃশ্য ভিডিও ক্যাসেটে বন্দি করার পর ঋষভ মুখার্জি যেন ভারি তৃপ্ত হয়েছেন এমন মুখভঙ্গি করে একটা সিগারেট ধরালেন এবার।

গার্গী তখনও রেশমবাইয়ের ঘোর থেকে পুরোপুরি বেরোতে পারেনি। তার দু-চোখ যেন ঝাপসা, ক্যামেরার সামনে থেকে উঠে এসে কাউকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না, শুধু একবার শুনল কাছেই দাঁড়ানো রোমিওর কণ্ঠস্বর, একসেলেন্ট, সুপার্ব। ভাবাই যাচ্ছে না এটা আপনার প্রথম অ্যাপিয়ারেন্স।

ঋষভ মুখার্জি সিগারেটে টান দিতে দিতে তখন মনিটরের স্ক্রিনে দেখে নিচ্ছেন দৃশ্যগুলো। সেখানে দাঁড়াতেই গার্গীরও চোখে পড়ল, স্ক্রিনে কী চমৎকার, সাবলীলভাবে সে ডায়ালগগুলো বলে চলেছে বিবস্বান বসুর সঙ্গে। দেখতে দেখতে তার মনে হল স্ক্রিনের গার্গী যেন সে নয়, অন্য কেউ। তাকে দেখে ঋষভ মুখার্জিও যেন অন্যমনস্কভাবেই বললেন, ফাইন।

গার্গী এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বলতে পারল, থ্যাঙ্ক য়্যু। বলতে বলতে তার নজরে পড়ল, মনিটরের সামনে পর-পর দুটো সিগারেট মনুমেন্টের মতো দাঁড়িয়ে। একটা নেভা মুণ্ড, অন্যটি অগ্নিমুণ্ড। পরেরটি সবে ধরিয়েছেন কি না ঋষভ। কিছুক্ষণ পর এটাও নিভে যাবে আস্তে আস্তে।

ওদিকে দেবাদ্রি সান্যালের জেরায় বিপর্যস্ত হয়ে ফিরে এসেছেন রানাজি সান্যাল। তাঁর মুখচোখ শুকনো, কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারাটা। ফিরে এসে কারও সঙ্গে কথাই বলছেন না আর।

ঋষভ মুখার্জি সেদিকে তাকিয়ে কালক্ষেপ না করে আবার নজর রাখলেন চিত্রনাট্যের পৃষ্ঠায়। দোতলা কোঠির দেওয়ালে চিত্রনাট্যটা টাঙিয়ে রেখেছেন বেশ কায়দা করে। অন্তত দু ফুট দূরে দাঁড়িয়ে দিব্যি পড়ে নিচ্ছেন পরের এপিসোডটি। গার্গী তারিফ করছিল, এই বয়সেও ঋষভ মুখার্জির দৃষ্টিশক্তি কী প্রখর এই ভেবে।

চিত্রনাট্যের পৃষ্ঠায় চোখ রেখে, পরক্ষণেই গার্গী আর বিবস্বান বসুকে পরবর্তী দৃশ্যের সংলাপ বুঝিয়ে দিয়ে, শব্দযন্ত্রী দ্বিত্বম রায়ের উদ্দেশে বললেন, ভি.টি.আর।

অর্থাৎ ভিডিও টেপরেকর্ডারের সুইচ অন করে দাও।

দ্বিত্বম সাউন্ড-রেকর্ডিং যন্ত্রটির সুইচ টেপাটেপি করে ক্যাসেটটি চালিয়ে দিয়ে বলল, ভি.টি.আর রোলিং—

ঋষভ সেই মুহূর্তে মনিটরের পর্দায় রেশমবাই আর পুলক চৌধুরির পজিশন দেখে নিয়ে চেঁচিয়ে বলতে যাবেন, অ্যাকশন—

সেই মুহূর্তে দেবাদ্রি সান্যাল এসে বাদ সাধলেন শুটিঙে, বললেন, রোমিও দত্তগুপ্ত, নেক্সট আপনাকে ইন্টারোগেট করব।

রোমিওর মুখটা কালো হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। কিন্তু তার শুটিং স্পট ছেড়ে চলে যাওয়া মানে ক্যামেরাও বন্ধ। ঋষভ এতক্ষণ পুলিশবাহিনীর দিকে তেমন নজর দেননি, তন্ময় হয়ে ছিলেন শুটিঙে, এখন হঠাৎ রোমিও চলে যাবে শুনে খেপে উঠলেন, রোমিওকে নিয়ে গেলে শুটিং হবে কী করে।

দেবাদ্রি গম্ভীর হয়ে বললেন, শুটিং কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখুন। মার্ডার কেসের ইনভেস্টিগেশনের প্রায়োরিটি অনেক বেশি।

ঋষভ চোখ গনগনে করে বললেন, আপনারা কি রানাজি, রোমিও, এদেরও ডাক্তারের মার্ডারার ঠাওরালেন নাকি। এখন রোমিও যাবে না, আপনি অন্য কাউকে ততক্ষণ ইন্টারোগেট করুন।

দেবাদ্রি এবার তার সৌম্য মুখোশটি খুলে ফেলে একেবারে বাঘের ক্ষিপ্রতায় ঋষভের সামনে এসে দাঁড়ালেন, শুধু ডাক্তার-হত্যার জন্যই নয়, বর্ণনা-হত্যার জন্যও আপনাদের সবাইকেই ইন্টারোগেট করব এখন।

ঋষভ মুখার্জি অবাক হয়ে বললেন, বর্ণনা-হত্যা!

—ইয়েস। বর্ণনা আত্মহত্যা করেননি, খুন হয়েছেন।



বর্ণনা যে আত্মহত্যা করেনি, তাকে সুপরিকল্পিতভাবে খুনই করা হয়েছে পরশু, সাতই সেপ্টেম্বর গভীর রাতে, সেটা কাল সকালেই বুঝে গিয়েছিল গার্গী। হেটেলের রুমে যেভাবে রক্তাপ্লুত অবস্থায় সংজ্ঞাহীন বর্ণনাকে পড়ে থাকতে দেখেছিল, তখন থেকেই সন্দেহটা খচখচ করছিল। তবু সেন্টার-টেবিলের ওপর স্লিপিং ট্যাবলেটের ছেঁড়া স্ট্রিপ, তার পাশে সুইসাইড নোট ইত্যাদি দেখে সিনেমুভির বাকি সবাই যখন বিশ্বাস করেছিল অথবা বিশ্বাস করার ভান দেখিয়েছিল, গার্গীও সেরকম ভেবে নিয়েছিল, কোনও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির চাপেই হয়তো আত্মহত্যা করতে হয়েছে বর্ণনাকে। তারই মধ্যে সিনেমুভির দু-একজন সদস্য যেভাবে নিজেদের ভেতর চোখাচোখি করে, ঠারেঠোরে কথা বলছিলেন, গার্গীর মনে হয়েছিল, সম্ভবত কোনও গোপন বিষয় চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন তাঁরা। গার্গীর একটা তৃতীয় নয়ন আছে, সেই বিশেষ চোখটি দিয়ে সে যে-কোনও ঘটনা বা পরিস্থিতির ভেতর দেখতে পায় এক ভিন্ন টানাপোড়েন। কাল সকালে সেরকমভাবেই তার মগজে ঘা দিচ্ছিল কয়েকটা শব্দ, এত রক্ত কেন।

তা ছাড়া, যে ভাবে বর্ণনার মৃতদেহ দ্রুত পোস্টমর্টেম করিয়ে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল পৃথিবীর বুক থেকে, সেটা অবশ্যই সন্দেহের।

কিন্তু সিনেমুভির সদস্যরা এটা বোঝেন, বা অনুমানও করেনি, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এমন অনেক তথ্য উন্মোচিত করে, যা সাদা চোখে বোঝা যায় না। যে-রাতে খুন হয়েছিল বর্ণনা, সে রাতে তার রুমে কে বা কারা ঢুকেছিল, কেনই বা, তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানা না গেলেও, ময়না তদন্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে এটা বোঝা যায়, সে-রাতে কী কী ঘটেছিল তার রুমে, তার চূড়ান্ত ফলাফলই বা কী।

রোমিওকে নিয়ে দেবাদ্রি সান্যাল কোঠিরই একটা ছোট্ট ঘরে অন্তরিণ হওয়ার আগে, গার্গী

সহসা তাকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেয়েছেন নাকি, মিঃ সান্যাল?

—হ্যাঁ, এই তো কিছুক্ষণ হল।

—যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে কি একটু বলবেন, পোস্টমর্টেম রিপোর্টে এমন কী ক্লু পেলেন, যা থেকে আপনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, বর্ণনাকে খুন করা হয়েছে!

দেবাদ্রি সান্যালের হাতে কালো রোদচশমাটা তখন পেন্ডুলামের মতো দুলছে। হাসতে হাসতে বললেন, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এতটাই পরিষ্কার, সেইসঙ্গে এত জটিলও যে, আমার মগজে কিছুতেই সেঁধুচ্ছে না সে-রাতে বর্ণনার ঘরে ঠিক কী ঘটেছিল।

—ইজ ইট!

—হ্যাঁ, অনেকগুলো সূত্র পর পর বেরিয়ে আসছে রিপোর্টটা থেকে, যেগুলো শুনলে আপনার মনে হবে, 'কী আশ্চর্য, তাই নাকি'!

গার্গী ভীষণ কৌতূহলী হয়ে সেভাবেই বলল, তাই নাকি! যেমন—!

—প্রথম চমকপ্রদ তথ্য হল, বর্ণনার ঘরে সেদিন স্লিপিং পিলের যে ছেড়া স্ট্রিপগুলো সেন্টার টেবিলের ওপর বা মেঝেয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছে, সেগুলো গুনে গেঁথে আমরা হিসেব করেছিলাম, অন্তত তিরিশটা স্লিপিং পিল সে-রাতে খাওয়ার কথা বর্ণনার। কিন্তু অবাক করার মতো ঘটনা হল, হসপিটালে তার পেট ওয়াশ করতে গিয়ে যে-তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন ডাক্তার, পোস্টমর্টেম রিপোর্টেও সেই একই কথা লেখা আছে, সে-রাতে বর্ণনা বড়জোর একটা স্লিপিং পিল খেয়েছিল।

—সত্যিই স্ট্রেঞ্জ, গার্গী একটু যেন অবাক হল, তারপর!

—বরং তার পেটে যা পাওয়া গেছে, তা হল অ্যালকোহল।

—অ্যালকোহল! গার্গী আবারও বিস্মিত, বর্ণনা সে, রাতে ড্রিঙ্ক করেছিল নাকি!

—রিপোর্টে তো তাই বলছে।

—হুঁ, আর!

—বর্ণনা সে-রাতে কারও শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিল।

—মাই গড। কিন্তু বর্ণনা তা হলে মারা গেল কী করে?

—মাথায় কোনও ভারি কিছুর আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে। হসপিটালের ডাক্তার এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্ট করোবরেট করছে এ-ব্যাপারে।

গার্গী থম হয়ে দেবাদ্রির দেওয়া চারটে তথ্য নিয়েই ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর তার রঙ-মাখা মুখে হাসল, তা হলে ঘটনাটা বেশ জটিল হয়ে গেল, বলুন।

—কিছুটা হল নিশ্চয়ই। ডঃ সুস্নাত তালুকদারের হত্যারহস্য সবে সমাধান করে, একটু হাঁপ ছেড়ে যখন বিশ্রাম নেব ভাবছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে জানা গেল, বর্ণনার মৃত্যু আত্মহত্যাজনিত নয়, সে খুনই হয়েছে, ফলে একটু ধন্দে পড়েছি নিঃসন্দেহে। তবে বর্ণনার হত্যাকারী কে, সে-ব্যাপারে এই মুহূর্তে কিন্তু আমি নিঃসন্দ।

গার্গী যেন বুঝে উঠতে পারল না দেবাদ্রির কথা, তার মানে, আপনি জানেন কে বর্ণনাকে হত্যা করেছে?

দেবাদ্রি অদ্ভুতভাবে হাসল, কিন্তু কিছু বলল না। যেন একটা গভীর রহস্যের চাদরে পলকে মুড়ে ফেলল নিজেকে। গার্গীর সঙ্গে কথায়-কথায় অনেকটা দেরি হয়ে গেল খেয়াল হতেই সচকিত হয়ে বলল, আপনি বরং শুটিং করুন, ততক্ষণে আমি ফ্রেঞ্চকাট লোকটাকে ইন্টারোগেট

করে ফেলি বলতে বলতে সিনেমুভির ক্যামেরাম্যানকে বগলদাবা করে দেবাদ্রি সান্যাল তার লম্বা চওড়া চেহারাটা নিয়ে গটগট করে উধাও হল কোঠিরই একটি ঘরে। পরক্ষণে কোঠির দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে।

গার্গী দূর থেকে লক্ষ করল, যে-রোমিও একটু আগেই আলো-আলো মুখে ক্যামেরায় চোখ রেখে ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখছিল গার্গীর রেশমবাই হয়ে ওঠা মুখখানা, দেবাদ্রির শক্ত পাঞ্জাটা তার হাত ধরতেই দপ করে নিভে গেল সেই বুদ্ধিদীপ্ত আলোটা। যেন জমজমাটি শুটিঙের মুহূর্তে একখণ্ড কালো মেঘ এসে লোডশেডিং করে দিল গোটা শুটিং-স্পট।

ক্যামেরাম্যান আপাতত পুলিশের বগলবন্দি। অতএব শুটিঙেরও কিছুক্ষণ বিরতি ঘোষণা করলেন পরিচালক ঋষভ মুখার্জি। বেশ রাগত কণ্ঠস্বরেই বললেন, পর পর এত উটকো ঝামেলা হলে কি আর ছবি তোলা যায়, না মুড থাকে!

কথাগুলো কাকে উদ্দেশ করে ছুড়ে দিলেন ক্রুদ্ধ পরিচালক, তা বোঝা গেল না। কাছাকাছি এই মুহূর্তে গার্গীই দাঁড়িয়ে, একটু দূরে দ্বিত্বম রায়। দ্বিত্বমকে আজ অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে খুবই। হয়তো এর পর তাকেও ইন্টারোগেট করা হবে সে-কথা ভেবেই সে চিন্তিত, বিরক্ত। দ্বিত্বম সাধারণত কোনও ঝামেলায় থাকতে চায় না। এ পর্যন্ত গার্গীর দিকে দু-চারবার তাকিয়েছে বটে, কিন্তু আলাপ করেনি, বা কথা বলার কোনও চেষ্টাও নেই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, খুবই সাদাসিধে, ইনট্রোভার্ট।

ইনট্রোভার্ট মানুষগুলো ভারি ইন্টারেস্টিং হয়, এই ভেবে গার্গী ঠিক করছিল দ্বিত্বমকে একটু নেড়েচেড়ে, বাজিয়ে দেখবে, সে পরশু রাতের কোনও অভিজ্ঞতা বলে কি না তার কাছে। হোটেলের রুমগুলোর অবস্থান অনুযায়ী বর্ণনার পাশের ঘরেই থাকে দ্বিত্বম আর রোমিও। বরং গার্গীরাই থাকে একটু দূরে। সায়ন আর গার্গী থাকে এল্-সেপ্ড বারান্দা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেই কোণের ঘরটায়। এল্-এর রাস্তার দিকে যে বারান্দাটা তাতে পাশাপাশি গোটা ছয়েক রুম। গার্গীদের পাশেই প্রথমে বিবস্বান বসু, তার পরের ঘরটা রুমেলা রায়ের, তারপর বর্ণনা, তার পরেরটা রোমিও আর দ্বিত্বম, তারপর একেবারে কোণের ঘর ঋষভ মুখার্জির। অন্যদিকে, এল-শেপের অপর বাহুতে, গার্গীদের ঘর ছাড়িয়ে ডাইনে বাঁক নিতেই যে-ঘরটা সেটিতে থাকেন রানাজি সান্যাল আর ভরদ্বাজ মুখার্জি। সিনেমুভির বাকি সব সদস্যই, উঠেছেন মুনলাইট লজে। মুনলাইট লজটি দামে একটু সস্তা, তা ছাড়া হোটেল ইনের খুব কাছেই।

দ্বিতম রায়ের সঙ্গে গার্গী আলাপ জমানোর আগেই অবশ্য হাঁকডাক শুরু করে দিলেন ঋষভ মুখার্জি। শাম্ব সামন্তকে ডেকে বললেন, ক্যামেরার কাজ ততক্ষণে আমিই চালিয়ে নিই। তুমি পরের সিন রেডি করে ফেলো। পুলিশ-অফিসারদের কোনও অ্যাস্থেটিক সেন্স নেই। হচ্ছে শুটিং, ওঁরা এখন সেখানে এলেন মার্ডার-কেসের তদন্ত করতে। এই জন্যেই তো পুলিশদের বলা হয় ফুলিশ।

গার্গী অবাক হচ্ছিল পরিচালক ঋষভ মুখার্জির তৎপরতায়। সকাল থেকেই অবশ্য তাঁর নিখুঁত পরিচালনার ধরনে বিস্মিত হচ্ছিল বারবার। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি, সিচুয়েশন বুঝিয়ে দেওয়ার টেকনিক, কোথায় ক্যামেরা বসাতে হবে, কীভাবে ক্যামেরা প্যান করে নিয়ে গেলে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রোফাইল সবচেয়ে নিখুঁত অ্যাঙ্গেলে ধরা যাবে, এমনকি গার্গী একেবারেই নতুন বলে তাকে নিজে অভিনয় করে দেখিয়ে দেওয়া, সবই তাঁর চরম পেশাদারিত্বের পরিচয়।

পরবর্তী দৃশ্যের সিচুয়েশন বুঝিয়ে দেওয়ার আগে তিনি কোঠির দেওয়ালে টাঙানো চিত্রনাট্যের পৃষ্ঠা উল্টে উল্টে পড়ে নিচ্ছিলেন গভীর মনোযোগে। এবার পৃষ্ঠা ওল্টাতে গিয়েই পিন দিয়ে সাঁটা চিত্রনাট্যের সব ক'টা কাগজই খুলে মেঝের ওপর পড়ে গেল ঝপ করে।

বিরক্তিতে চোখমুখ কুঁচকে, কণ্ঠ যথাসম্ভব কর্কশ করে হাঁক দিলেন, সজনী, সজনী—

সজনী দত্তকে সেই মুহূর্তে কাছাকাছি না দেখে, নিজেই চিত্রনাট্যের গোছা তুলে পুনর্বার সেটাকে সাঁটার চেষ্টা করলেন পিন দিয়ে, ব্যর্থ হয়ে আবার চিৎকার করলেন, সজনী, সজনী কোথায় গেল!

সজনী দত্তের কাছে কেউ সংবাদটি পৌঁছে দিতেই তিনি ফুটবলের মতো দ্রুত গড়াতে গড়াতে চলে এলেন কোঠির সামনে। তাকে দেখেই ঋষভ হুঙ্কার দিলেন, হাতুড়িটা কোথায় গেল?

—হাতুড়ি! সজনী দত্ত কিছুটা বিপন্ন বোধ করলেন, হাতুড়িটাই তো খুঁজে পাচ্ছি না পরশু থেকে।

—খুঁজে পাচ্ছ না। কই, তোমার প্যান্ডোরার ঝুলিটা নিয়ে এসো দেখি!

সজনী দত্তর কাঁধে একটা পেটমোটা সাইড ব্যাগ থাকে শুটিং চলাকালীন। গার্গী একটু আগেই শুনেছে, ব্যাগটার ভেতর উপছে পড়ে দুনিয়ার যাবতীয় প্রয়োজনীয় টুকিটাকি। সজনী দত্তর ভাষায়, 'আলপিন টু এলিফ্যান্ট। যা চাইবেন, ম্যাডাম, সব ম্যাজিকের মতো বেরিয়ে আসবে নিমেষে।' গার্গী মুখে কৌতুক ফুটিয়ে বলেছিল, 'তাই নাকি। এলিফ্যান্টও!' পাশেই রোমিও ছিল, সে মজা করে ফুট কাটল, 'হাতিটা বোধহয় ওঁর পাঞ্জাবির নীচে থাকে। তাহলে সজনীদা, আপনার ওটা ভুঁড়ি নয়, হাতি, কী বলেন!' সজনী দত্ত অবশ্য একটুও না-ঘাবড়ে চটপট জবাব দিলেন, 'না, হাতিটাও আমার ঝোলায় থাকে, এই দেখুন,' বলে বার করেছিলেন একটা ছোট্ট প্লাস্টিকের হাতি, যেটা আসলে একটা পেন্সিল-কাটার।

তা এমন মুশকিল-আসান সজনী দত্ত সেই মুহূর্তে হাতুড়ি জোগাড় করে দিতে না পারলেও, তাঁর প্যান্ডোরার ঝোলা থেকে একটা রঙিন পেপার ওয়েট বার করে, মুহূর্তে কোঠির দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিলেন চিত্রনাট্যের পৃষ্ঠাগুলো।

মাচানবাবু ততক্ষণে আরও একবার ফিনিশিং টাচ দিয়ে দিচ্ছেন গার্গীর মুখের কারুকাজে। একটানা অনেকক্ষণ শুটিং করার ফলে যা ঘেমে নেয়ে উঠেছে তার মুখ, তাতে মেক-আপ কিছুক্ষণ পর পরই ধেবড়ে যায়। মাচানবাবু অবশ্য প্রস্তুত হয়েই থাকেন, প্রথমে বিবস্বান বসুকে, পরমুহূর্তে গার্গীকে মেক-আপের চেয়ারে বসিয়ে আরও একবার টাচ দিয়ে দিলেন তাঁর স্বভাবসুলভ শৈল্পিক মমতায়।

গার্গী তখন নিবিষ্ট হয়ে চোখ রাখছে তার হাতের পৃষ্ঠা-ক'টিতে। শুটিং-স্পটে এসেই অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর শাম্ব সামন্ত যে-পৃষ্ঠাগুলো তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'ম্যাডাম, ওতে আপনার ডায়ালগগুলো আছে, একটু পর-পর চোখ বুলিয়ে নেবেন। সময় থাকলে আমি নিজেই মুখস্ত করিয়ে দিতাম আপনাকে। কিন্তু আমাকে আবার আর্ট ডিরেকশনের কাজটাও দেখতে হচ্ছে কি না।

রোমিও ক্যামেরায় নেই বলে দ্বিত্বম রায়ও একটু ঢিলেঢালা হয়ে বসেছিল সামনের মনিটর আর সাউন্ড-রেকর্ডারটিতে কনুই রেখে। নেহাত ঋষভ মুখার্জি জোর করছেন বলেই শুটিং শুরু করতে হচ্ছে, নইলে রোমিওকে কোঠির ঘরের দরজা বন্ধ করে যেরকম চেঁচামেচি করছেন দেবাদ্রি সান্যাল, তাতে কারওরই মন ভাল নেই। রানাজি সান্যালকে জেরা করার সময় বাইরে থেকে কোনও কথাবার্তাই শোনা যায়নি, কেন যে রোমিওর সঙ্গে ওভাবে—

গার্গী তখন মগ্ন হচ্ছে তার চিত্রনাট্যের সংলাপে। পুলক চৌধুরি পরের দিন গোটা সন্ধে গান শুনবেন রেশমবাইয়ের কণ্ঠে। কখনও খেয়াল, কখনও ধ্রুপদ, কখনও ঠুমরি, যখন যেরকম ইচ্ছে পুলক চৌধুরি ফরমায়েস করে যাবেন রইস মেহমানের মতো। আর রেশমবাই একটার পর একটা গান শুনিয়ে যাবেন কলকাত্তাইয়া পত্রকারটিকে।

লখনউয়ের গান সম্পর্কে পুলক চৌধুরি যা জানেন তা হল, একটা সময়ে এখানকার বাইজিপাড়ায় খেয়াল, ধ্রুপদের চল উঠে গিয়ে চালু হয়েছিল গজল, ঠুমরির। তাও এমন সব রাগিণীর আবির্ভাব হয়েছিল যেগুলি শুনতে চটুল, মজাদার, যা শুনলে মেহমানরা সহজেই খুশি হতে পারেন, হাতের আঙুলে মুদ্রা করে খুশি হতে পারেন, 'অউফ্, ক্যা গানা!' রেশমবাই কিন্তু লখনউয়ের বাইজিপাড়ার এহেন অস্তমিত আমলেও সবরকম গানেই রীতিমতো পারদর্শী। গান শুনতে শুনতে রেশমবাইয়ের দিনযাপন, তার গান শেখার ইতিহাস ইত্যাদি নানান খুঁটিনাটি বিষয়ে একটু-একটু করে পুছতাছ করছিলেন পুলক চৌধুরি। যখন গানের ভেতর বুঁদ হয়ে থাকে রেশমবাই, তখন তার চোখেমুখে একটা অন্য ঘোর, যেন একটা অপার্থিব পৃথিবীতে আস্তে আস্তে লীন হয়ে যাচ্ছে তার সমস্ত সত্তা। গান শেষ হলেও সেই তন্দ্রা ভেঙে নিজের অস্তিত্বে ফিরতে কিছুক্ষণ সময় নেয় সে, তারপর হাসি-হাসি মুখে উত্তর দেয় পুলক চৌধুরির অজস্র প্রশ্নের।

পুলকও অবাক হচ্ছিলেন, কী ভীষণ নিষ্ঠায় নিজেকে এভাবে তৈরি করেছে রেশমবাই। ভোর চারটেয় উঠে সে প্রতিদিন চার ঘণ্টা রেওয়াজ করে, তারপর স্নান সেরে পবিত্র হয়ে নাশতা। তারপর আবার নটা থেকে বারোটা তালিম নেওয়া গুরুজির কাছে। অতঃপর দুপুরের খাওয়া, বিশ্রাম, যাতে সন্ধের মধ্যেই আবার প্রস্তুত হতে পারে তার মুজরোর আসরের জন্য।

হাতের ডায়েরিতে নোট করতে করতে হঠাৎ পুলক ফরমায়েস করলেন, তিনি এবার ভৈরবী শুনবেন রেশমবাইয়ের কণ্ঠে। রেশমবাই অবাক হয়ে বলল, ভৈঁরো তো সকালে গাওয়াই নিয়ম, বাবুজি।

পুলক কিন্তু প্রায় জেদ ধরলেন এখনই তিনি রেশমবাইয়ের গলায় ভৈরবী শুনতে চান। লখনউয়ের ভৈরবী এতই বিখ্যাত যে, কলকাতায় তিনি বহুবার শুনেছেন সারা হিন্দুস্থানেও নাকি এমন চমৎকার ভৈরবী গাওয়া হয় না।

রেশমবাই অবশ্য মেহমানদের এমন অনেক আবদারই হাসিমুখে মেটায় বরাবর। পুলক চৌধুরির সৌম্য মুখের দিকে কিছুক্ষণ অপলক নজর রেখে অতঃপর চোখ বুজে শুরু করল বিলম্বিত একতালে 'বালমুবা মোরে সৈঁইয়া সদা রঙ্গীলে রে'। আলাপ শুনতে শুনতে পুলক চৌধুরি হঠাৎ কী যেন স্মরণে আসতেই কেঁপে উঠলেন একলহমা। যেন এই গান এভাবেই অন্য কোনও কণ্ঠে তিনি শুনেছেন কোথাও। বহু দূরের অতীত থেকে একটি বিস্মৃতপ্রায় মুখ যেন তাঁর স্মৃতিতে ঘা দিয়ে গেল সহসা। কুড়ি বাইশ বছর আগের কয়েকটা লণ্ডভণ্ড দিন তাঁকে আবর্তিত করল এক ঘোর অন্যমনস্কতায়। তাঁর সামনে তখন চোখ বুজে একটার পর একটা স্বর পেরিয়ে রাগ বিস্তার করছে যে তরুণী, সে-যেন তার বয়সটা এই কুড়ি বাইশ বছর ধরে একই জায়গায় থামিয়ে রেখেছে, যখন পুলকের বয়সও ছিল প্রায় এরকমই। রেশমবাই তখন স্থায়ী থেকে অন্তরায় চলে গেছে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছে, 'হুঁ তো তুমি বিন তরস গইলি দরস বেগি বতাবো লৈহোঁ বলেয়ুঁ।'

কতক্ষণ তা খেয়াল করতে পারেন না পুলক, রেশমবাই তার গান শেষ করলেও তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন অপলক। যেন রেশমকে দেখে দেখে মন আর ভরছে না তাঁর। রেশমবাই

অবশ্য পুরুষের এই মুগ্ধ চাউনি দেখে অভ্যস্ত। পুলকের সম্বিত ভাঙিয়ে জিজ্ঞাসা করল, গান শুনে তিনি খুশি হয়েছেন কি না।

পুলক তখনও সেই আবেশের মধ্যে লীন, আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, এ গান তুমি কার কাছে শিখেছ, রেশম?

রেশমবাই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, গুরুজির কাছে, বাবুজি।

পুলক তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইছেন, কোন গুরুর কাছে গাণ্ডা বেঁধেছে রেশম, কোন কোন ওস্তাদের কাছে এ পর্যন্ত তালিম পেয়েছে—

রেশম কিন্তু অতসব খুঁটিনাটিতে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে না, হেসে বলে, ও সব জেনে কী হবে, বাবুজি, কারও না কারও কাছে গান তো শিখতেই হবে আমাদের।

পুলক কিন্তু নাছোড়বান্দা, রেশমবাইকে একের পর এক জিজ্ঞাসা করে চলেছে, তাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না লখনউয়ের এই কোঠিতে থাকাই তার ভবিতব্য। তার বা তার পিতৃপুরুষের আদি নিবাস কোথায় ছিল, কীভাবেই বা সে এসে পৌঁছল লখনউয়ের এই বাইজিপাড়ায়!

রেশমবাই হঠাৎ থম হয়ে গেল, কেন কে জানে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, কী হবে এসব জেনে, বাবুজি!

পুলক তৎক্ষণাৎ বললেন, তুমি তো জানই রেশম, আমি বাইজিদের জীবনযাপন, পেডিগ্রি নোট করছি ঘুরে ঘুরে।

—পেডিগ্রি! রেশমবাই যেন খুবই অবাক হল, তারপর হঠাৎ, 'তবায়েফেদের পেডিগ্রি সংগ্রহ করছ, বাবুজি। তবায়েফদের পেডিগ্রি।' বলতে বলতে সারা কোঠি কাঁপিয়ে এমন ভয়ঙ্করভাবে হেসে উঠল, হাসতেই থাকল রেশমবাই যে, পুলক একেবারেই অপ্রস্তুত। প্রবলভাবে হাস্যরত রেশমবাইয়ের মুখেচোখে সেই মুহূর্তে আবিষ্কার করলেন একই সঙ্গে হাসি, কান্না, শোক, যন্ত্রণা, শ্লেষ, বিদ্রূপ—সবই!

সিচুয়েশন বুঝিয়ে দিতে গিয়ে ঋষভ বারবার বলছিলেন গার্গীকে, এই অদ্ভুত হাসিটা দুতিনবার নিজে নিজে রিহার্সাল দিয়ে নাও তো। দীর্ঘ দমকের এই হাসির মুহূর্তটিকে গোটা দর্শক মহল যেন চিনে নিতে পারে রেশমবাইয়ের তবায়েফ হওয়ার যন্ত্রণা।

গার্গী দৃশ্যটা গভীরভাবে উপলব্ধি করছিল নিজের ভেতর। কিন্তু এভাবে দীর্ঘ একটা হাসির মহড়া কীভবে সবার সামনে দেবে তা ভাবতে গিয়ে একটু অস্বস্তি যে বোধ করছিল না তা নয়। তা ছাড়া এইমুহূর্তে ঠিক হাসতেও পারছিল না যেন, কেননা পাশেই কোঠির অন্য একটা ঘরে তখন দেবাদ্রি সান্যালের উচ্চকিত কণ্ঠস্বর বেশ চমকে দিচ্ছিল সিনেমুভির সবাইকে। রোমিওকে একটু বেশিই ধমকাচ্ছেন যেন দেবাদ্রি সান্যাল। হঠাৎ রোমিওকেই এভাবে ধমকে, চিল্লামিল্লি করে চাপ দিচ্ছেন কেন, বুঝে উঠতে পারছিল না গার্গীও। জেরার সময় পুলিশ-অফিসাররা যে খুবই নির্মম, নির্দয় হয়ে ওঠে, অনেক সময় নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচারও করে, আর তার ফল কত বিষময় হয়ে ওঠে তা তো সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় প্রায়শ। তবে কি দেবাদ্রি রোমিওকেই কোনও ভাবে সন্দেহ করছেন!

ঋষভ মুখার্জি শুটিং করবেন বলেও এখন ঠিক আরম্ভ করতে পারছেন না তাঁর সহযোগীদের কথা ভেবে। সাউন্ড রেকর্ডিস্ট দ্বিত্বম রায় স্তব্ধ হয়ে বসে আছে তার শব্দযন্ত্রটির সামনে। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার। হয়তো অনুমান করছে এরপর তাকে জেরা করার সময় কীভাবে চাপ সৃষ্টি করবেন দেবাদ্রি সান্যাল।

গার্গী একবুক অস্বস্তি নিয়ে হঠাৎ সজনী দত্তকে ডাকল একান্তে, ফস করে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, সজনীবাবু, সিনেমুভির টিমে কে কে ড্রিঙ্ক করেন?

গার্গীর বোকা-বোকা কথা শুনে সজনী দত্তর বোধহয় হাসি পেয়ে গেল, হাসি চেপে কোনও ক্রমে বললেন, সে তো তা হলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে, ম্যাডাম। কে খায় না বললেই বোধহয় আমাকে দুদণ্ড ভাবতে বসতে হবে।

—তাই! গার্গী পরক্ষণেই বেশ চালাক-চালাক প্রশ্ন করল, আপনি তো সিনেমুভির আলপিন টু এলিফ্যান্ট সাপ্লায়ার। বলুন তো, গত দুতিন দিনের মধ্যে কার কার ঘরে আপনি ড্রিঙ্কসের বোতল সাপ্লাই করেছেন?

সজনী দত্তের হাসি-হাসি মুখখানা পাংশু হয়ে গেল হঠাৎ, এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, সেসব আর জেনে কী হবে ম্যাডাম! আকাশের দিকে থুতু ছুড়লে সে আবার নিজের গায়েই ফিরে আসবে। ছেড়ে দিন ও-প্রসঙ্গ—

গার্গী হাসল, আমাকে না-বললেও দেবাদ্রি সান্যালকে কিন্তু বলতেই হবে আপনাকে।

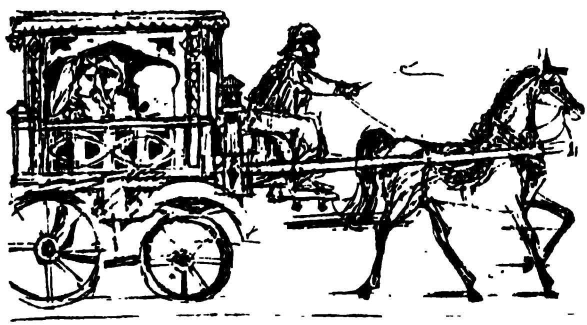
দেবাদ্রির নাম করতেই সজনী দত্তর ফুলো-ফুলো মুখখানা চিমসে মেরে গেল। আমতা-আমতা করে গলা নামালেন, সবাই তো এসে ইস্তক ছুঁকছুঁক করছে। কিন্তু ডিরেক্টরের কড়া হুকুম, আউটিঙে এসে মদ খেয়ে কেউ যদি বেলেল্লাপনা করে, অমনি তাকে পরের ট্রেনেই কলকাতা পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তবু—

—তবু? গার্গী উৎসাহিত হল।

—তবু দুটো বোতল আনাতেই হল। দুই নামী আর্টিস্টের ঘরে পাঠিয়ে তবে আমার চাকরি বজায় রাখি। একটা বি. বি.-র ঘরে, অন্যটা রুমেলাকে—

গার্গীর ভুরুতে মস্ত কোঁচ পড়ল। রুমেলা রায়ের ব্যাপারটা সবাই জানে। মোচঅলা ক্যাপ্টেন বন্ধুর সঙ্গে লনে বসে তিনি যে স্বাস্থ্য পান করছিলেন তাতে কোনও ঢাক ঢাক গুড় গুড় ছিল না। কিন্তু অন্যটা তা হলে বিবস্বান বসুকে!

আরও কিছু ভাবার আগেই গার্গী শুনল, কোঠির ঘরে তখন প্রবল শব্দে চিৎকার করছেন দেবাদ্রি সান্যাল। যেন বাঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে পাশের ঘরে। হঠাৎ রোমিওর ওপর এত খেপে গেলেন কেন দেবাদ্রি!



দেবাদ্রি সান্যাল তখন মুখ রক্তবর্ণ করে, প্রায় বাঘের মতোই ঘোরাফেরা করছেন কোঠির ছোট্ট ঘরটায়। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, ফর্সা দোহারা চেহারার ক্যামেরাম্যানটিকে পারলে ছিঁড়ে

খান এমন মুখভঙ্গিতে চিৎকার করে চাপ সৃষ্টি করছিলেন যাতে তাঁর তীক্ষ্ণ জেরার মুখে ভেঙে পড়ে ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের যুবকটি। কিন্তু রোমিও দত্তগুপ্ত যে এমন ঘোরতর শক্ত বাদাম তা একটু আগেও অনুমান করতে পারেননি। এখন বুঝতে পারছেন, যুবকটির আপাত-শান্ত চেহারার ভেতর কোথাও লুকিয়ে আছে কিছু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

মেঝেয় দাপিয়ে পায়চারি করতে করতে আবার হুঙ্কার দিলেন, দেখো রোমিও, আমার কথার জবাব যদি ঠিকঠাক না দাও, তাহলে বর্ণনা সেনগুপ্তর খুনের দায়ভাগ ঘুরেফিরে তোমার কাঁধেই বর্তাবে। এখনও পর্যন্ত যেসব ক্লু পাওয়া গেছে তার অনেকগুলোই—

রোমিও কড়া নজরে তাকাচ্ছিল লম্ফঝম্ফ করতে থাকা দাপুটে পুলিশ অফিসারটির দিকে। মুখের হাসিতে কিছুটা বিদ্রূপ মাখিয়ে বলল, যদি আপনার মনে হয়, আমিই বর্ণনাকে খুন করেছি, তাহলে আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারেন, মিঃ সান্যাল।

দেবাদ্রি দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বললেন, দরকার হলে তাই করতে হবে, বৎস। থানা-হাজতে থার্ড ডিগ্রি বলে একটা মেথড আছে, সেই চেম্বারে একবার গিয়ে ঢুকলে তখন তোমার এই কুলুপ-এঁটে-রাখা মুখ দিয়ে হুড় হুড় করে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের মতো কথা বেরুতে শুরু করবে।

রোমিওর মুখটা সামান্য ফ্যাকাসে দেখাল এবার, হয়তো থার্ড ডিগ্রির কথা ভেবেই। চোখ দুটো সহসা জ্বলে উঠল, হয়তো সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ে গেল, আড়াই দশকেরও আগে তার দাদা টোকিওকে কীভাবে পুলিশের গুলি ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। সে নিজে তখন নেহাত শিশুই, তার চেয়ে পনেরো বছরের বড় সেই দাদা তার স্মৃতিতে এখন একটি ফটোগ্রাফ ছাড়া আর কিছু নয়, তবু বাবা আর মায়ের কাছে থেকে লক্ষবার তার দাদার মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা শুনে শুনে গোটা পুলিশমহলের ওপর তার রক্তে জমে আছে একটা ভয়ঙ্কর জাতক্রোধ। দেবাদ্রির সঙ্গে সেজন্যই অবহেলাভরে, বিদ্রূপ করে কথা বলে চলেছে সেই প্রথম থেকে, যাতে দেবাদ্রি বিরক্ত হয়, ক্রুদ্ধ হয়, ছটফট করে নিজের ভেতর। অন্তত একজন পুলিশ অফিসারকে উত্ত্যক্ত করে রোমিও তার দু-আড়াই দশকের জমে-থাকা ক্রোধের কিছুটা উপশম করতে চাইছিল যেন। সেভাবেই আবার বলল, আপনাদের পুলিশ-অফিসারদের এলেম তো আমার জানা আছে। যখন মার্ডারারকে ধরতে পারেন না, তখন রাম-শ্যাম-যদু-মধু যে-কোনও একজনকে আসামি সাজিয়ে হাজির করেন কোর্টে, নিজেদের চাকরি বাঁচাতে।

সত্যিই তখন নিজের ভেতর টগবগ করে ফুটছেন দেবাদ্রি। এতক্ষণ ধমক দিয়ে, হুঙ্কার করে, থার্ডডিগ্রির ভয় দেখিয়েও সিনেমুভির ক্যামেরাম্যানকে বশে আনতে পারেননি দেখে এবার একটা সিগারেট ধরালেন ফস করে। দু-তিনবার টান দিতেই যেন একটু শান্ত হল তাঁর মগজ। মনে হল, থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করেও হয়তো কথা বার করা যাবে না দুর্বিনীত, অবাধ্য যুবকটির পেট থেকে। অতএব জেরার ধরনটা বদলানো যাক।

সিগারেটে টান দিয়ে, এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে হঠাৎ রুক্ষ, কঠোর মুখখানায় একরাশ হাসি ছড়িয়ে বললেন, তা হলে তুমি কী চাও। প্রকৃত দোষী ধরা পড়ুক, না কি একজন নিরপরাধ ব্যক্তি জেলের ঘানি টানুক বছরের পর বছর।

রোমিও কিছুটা বিস্মিত হল দেবাদ্রির এই আকস্মিক পরিবর্তনে। বুঝতে চেষ্টা করছিল কী করতে চান দেবাদ্রি।

দেবাদ্রি আরও নরম হয়ে, মুখ হাসি-হাসি করে রোমিওর কাছাকাছি হলেন, তার পিঠে হাত রেখে বললেন, আমি কিন্তু জেনেছি, তুমি বর্ণনাকে ভালবাসতে।

রোমিও এবারও কোনও উত্তর দিল না।

—তুমি নিশ্চয়ই চাও যে, বর্ণনাকে যে খুন করেছে সে ধরা পড়ুক। বর্ণনাকে যদি সত্যিই ভালবেসে থাকো, তাহলে তার খুনিকে ধরতে সহায্য করাই হবে তোমার একমাত্র কর্তব্য। ঠিক কি না?

রোমিও তখনও তীক্ষ্নদৃষ্টিতে জরিপ করে চলেছে ডাকসাইটে পুলিশ অফিসারের প্রতিটি মুভমেন্ট। হঠাৎ বলল, আপনাদের নিজেদের ক্ষমতা নেই খুনিকে ধরার?

দেবাদ্রি হা হা করে হেসে উঠলেন, পুলিশ তখনই খুনিকে শনাক্ত করতে পারে যদি খুনি খুন করার পর যথেষ্ট ক্লু রেখে যায়। সেইসঙ্গে তার আশেপাশে যারা ছড়িয়েছিটিয়ে থাকে, তারা যদি পুলিশকে সাহায্য করে খুনের মোটিভ খুঁজে বার করতে, কিংবা কোনও প্রমাণ পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এক্ষেত্রে বর্ণনা খুন হয়েছে রাতের গভীরে, তার নিজের রুমের ভেতর, এবং যথেষ্ট সুপরিকল্পিতভাবে। কিছু ক্লু ইতিমধ্যেই আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। কিছু মোটিভও আমরা খুঁজে পেয়েছি সিনেমুভির সদস্যদের জবানবন্দি থেকে। হোটেলের কর্মীরাও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করছেন নানান তথ্য সরবরাহ করে। সেইসঙ্গে আরও কিছু প্রমাণ আমাদের দরকার।

বলতে বলতে একলহমা থামলেন দেবাদ্রি, তারপর গলাটি বেশ নরম করে বললেন, আমরা জানতে পেরেছি, তুমি সেদিন অনেক রাত অবধি ঘোরাঘুরি করেছিলে হোটেলের বারান্দায়, কখনও কখনও বর্ণনার রুমের সামনেও। সেসময় কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা তোমার চোখে পড়েছিল কি!

রোমিও তৎক্ষণাৎ উল্টে প্রশ্ন করল, আপনি কার কাছ থেকে শুনেছেন ওসব!

—সে যার কাছ থেকেই শুনে থাকি, ঘটনাটা সত্যি। তার প্রমাণও আমাদের হাতে আছে। তুমি শুধু এই প্রশ্নের জবাব দাও, সে রাতে আর কেউ হোটেলের লনে, কিংবা বারান্দায় পায়চারি করছিলেন কি না, বা কোনও অস্বাভাবিক দৃশ্য চোখে পড়েছিল কি না তোমার।

রোমিও এতক্ষণে শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, আমি হোটেলের গেটে একজন গুণ্ডা-চেহারার লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম।

দেবাদ্রির সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হলেন, ঝুঁকে পড়ে বললেন, দ্যাটস রাইট। তার নাম বিটন তালুকদার। হুঁ, তখন তুমি কোথায় দাঁড়িয়েছিলে?

—হোটেলের বারান্দায়। আমাদের রুমের সামনে।

—তার মানে দোতলায়। হুঁ, তারপর?

—লোকটিকে দেখে আমার কিরকম সন্দেহ হয়েছিল। তৎক্ষণাৎ আমি ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি বেয়ে নীচে গেলাম। গেটের কাছে যাওয়ার আগেই দেখি লোকটা উধাও।

দেবাদ্রি উত্তেজিত হয়ে বললেন, কোনদিকে উধাও হল লোকটা? রাস্তার দিকে বেরিয়ে গেল, না ঢুকে পড়েছিল লনের দিকে?

রোমিও ঘাড় নাড়ল, তা আমি দেখতে পাইনি।

—লনে ঢুকে পড়লে নিশ্চয়ই তোমার চোখে পড়ত?

—হ্যাঁ, পড়ত।

—কিন্তু লোকটা হয়তো হোটেলের পেছনদিকে গিয়েছিল—

—না, পেছনে যায়নি। আমি পেছনেও খুঁজতে গিয়েছিলাম।

—তখন রাত কত ছিল মনে করতে পার?

রোমিও কিছুক্ষণ চেষ্টা করে বলল, ঠিক খেয়াল নেই, হয়তো রাত বারোটার মতো হবে।

—হুঁ, দেবাদ্রি এবার তীক্ষ্ণচোখে তাকালেন রোমিওর দিকে। সে সময় আর কেউ জেগে ছিল হোটেলে?

রোমিও ইতস্তত করল, আমি ঠিক খেয়াল করিনি। হোটেলে রুমের ভেতর কেউ না কেউ জেগে থাকতেও পারে।

—অর্থাৎ বাইরে কেউ জেগে ছিল না।

রোমিও বাধা দিয়ে বলল, নীচে রিসেপশনে ছিল। তা ছাড়া, গেটের ডানপাশে যে গার্ডহাউস থাকে, সেখানে গার্ডরাও নিশ্চয়ই—

দেবাদ্রি তৎক্ষণাৎ রোমিওর ওপর যেন আছড়ে ফেললেন প্রশ্নটা, কিন্তু দোতলার। বারান্দায় আর কেউ ছিল না নিশ্চয়ই।

রোমিও আবার ইতস্তত করে বলল, না।

—তাহলে তুমি অত রাতে হোটেলের বারান্দায় জেগে দাঁড়িয়েছিলে কেন!

রোমিও একটা ঝাঁকুনি খেল নিজের ভেতর, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, এমনিই। ঘুম আসছিল না।

—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলে এভাবে?

—ঠিক মনে নেই। ঘড়ি দেখিনি।

দেবাদ্রি আরও নরম হয়ে বললেন, ঘুম আসছিল না, না কি কারও সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল?

রোমিও শক্ত গলায় বলল, সবটাই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর সঙ্গে বর্ণনার খুনের কোন সম্পর্ক নেই।

—আলবত আছে, দেবাদ্রি আগের মতো সহসা চেঁচিয়ে উঠলেন, হোটেলের আরও কেউ কেউ দেখেছে, তুমি মধ্যরাত্রি পেরিয়ে যাওয়ার পরও ঘোরাঘুরি করছিলে বারান্দায়, ছটফট করছিলে—

রোমিওর চোয়ালও শক্ত হল তৎক্ষণাৎ, তাতে কিছু প্রমাণ হল না। ঘুম না এলে ছটফট করতেই পারে কেউ।

দেবাদ্রি আবার গলা খাদে নামালেন, বর্ণনার ঘর তখন ভেতর থেকে বন্ধ ছিল?

রোমিও শক্ত চোখে তাকাল দেবাদ্রির দিকে, হুঁ।

দেবাদ্রি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়তে চাইলেন, ভেতরে কেউ ছিল?

—জানি না।

—ভেতরে কোনও শব্দ হচ্ছিল?

—হুঁ, ঘুঙুরের শব্দ।

—ও। দেবাদ্রি তৎক্ষণাৎ পরবর্তী প্রশ্নে ঝাঁপালেন, বর্ণনাও জেগে ছিল তাহলে!

রোমিও ধন্দে পড়ল, হতে পারে।

—আর কেউ ভেতরে ছিল তখন?

—জানি না।

—কখন থামল ঘুঙুরের শব্দ।

—আমি গেটের কাছে ওই লোকটাকে দেখতে পেয়ে তাড়াহুড়ো করে নীচে নেমে যাই। এদিকে-ওদিকে খোঁজাখুঁজি করে যখন ওপরে উঠে আসি, ততক্ষণে ঘুঙুরের শব্দ থেমে গেছে।

—তখন রাত কত হবে?

—মনে নেই। সাড়ে বারোটাও হতে পারে। রাত্রি একটাও—

—অতক্ষণ নীচে খোঁজাখুঁজি করেছিলে!

রোমিও চুপ করে থাকে।

দেবাদ্রিও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, তখনও কি বর্ণনার ঘর ভেতর থেকে বন্ধ ছিল?

রোমিও নিঃস্তব্ধ হয়ে গেল সহসা, তারপর বলল, হ্যাঁ।

দেবাদ্রি পরক্ষণেই হুঙ্কার দিলেন, আমি যদি বলি, তুমি সে-রাতে বর্ণনার ঘরে ঢুকেছিলে?

—আপনার মনে হলে আমি কী করতে পারি?

দেবাদ্রি হঠাৎ হেসে ফেললেন কেন যেন, তারপর খুবই একান্ত হওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, তুমি ড্রিঙ্ক করো?

রোমিও থমকে গেল একমুহূর্ত, তারপর আস্তে আস্তে বলল, অকেশনালি।

—হুঁ, সেদিন রাতে ড্রিঙ্ক করেছিলে?

রোমিও শক্ত হল পুনর্বার, না।

হুঁ। দেবাদ্রি সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রশ্নে চলে গেলেন, আচ্ছা, রানাজি সান্যালের সঙ্গে বর্ণনার সম্পর্ক কী ছিল, জানো?

রোমিওর চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে উঠল দপ করে, চোয়াল আবার শক্ত হল, কিন্তু কণ্ঠস্বর সংযত রেখে বলল, জানি না।

—যেদিন তোমরা লখনউ যাওয়ার জন্য হাওড়া স্টেশনে জমায়েত হয়েছিলে, সেদিন স্টেশনে বর্ণনা কি একাই এসেছিল, না রানাজি সান্যাল সঙ্গে ছিলেন?

রোমিও ভুরুতে কোঁচ ফেলে বলল, বর্ণনা একাই এসেছিল।

—বর্ণনার ব্যবহারে কি কোনও অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করেছিলে?

—না।

—ও! দেবাদ্রি আবার কী ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, ভরদ্বাজ মুখার্জি ছেলেটা কীরকম?

রোমিও শক্ত হল পুনর্বার. জানি না।

—আচ্ছা, বর্ণনার ডেডবডি একটু বেশি দ্রুততায় ডিজপোজ অফ করা হয়েছে। বলা যায়, চুপিসাড়েই। কেন?

—আমার এ-ব্যাপারে কিছু জানা নেই।

দেবাদ্রি আবার প্রসঙ্গ বদলালেন, আচ্ছা, ঋষভ মুখার্জি এতদিন পর আবার ছবি তৈরি করতে আগ্রহী হলেন কেন, জানো?

রোমিও ইতস্তত করে বলল, যতদূর শুনেছি, ওঁর বন্ধু ডঃ সুস্নাত তালুকদারের আগ্রহেই। তিনিই ফিন্যান্স করবেন বলেছিলেন সিরিয়ালটার।

দেবাদ্রি কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলেন ব্যাপারটা, তারপর হঠাৎ পকেট থেকে একটা ছোট আংটি বার করলেন। সোনার আংটি, মীনে করা, তাতে 'আর' অক্ষর খোদাই করা। সেটা

রোমিওর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এ আংটিটা তোমার?

রোমিও বিস্মিত হয়ে বলল, নাহ্!

—না! কিন্তু আংটিতে 'আর' শব্দটা কিন্তু তোমার নামেরই আদ্যাক্ষর।

রোমিও প্রতিবাদ করে বলল, 'আর' তো সিনেমুভির অনেকেরই নামের আদ্যাক্ষর। রানাজি, রুমেলা, ঋষভ—সবার নামই তো 'আর' দিয়ে শুরু। এতজন থাকতে হঠাৎ আংটিটা আমার ভাবলেন কেন?

দেবাদ্রি রোমিওর চাউনি জরিপ করতে করতে বললেন, এটা বর্ণনার আঙুলে পাওয়া গেছে।

রোমিও বিস্মিত হয়ে বলল, কিন্তু বর্ণনার আঙুলে তো এ আংটি ছিল না।

—ছিল।

—তাহলে এটা রানাজি দিয়ে থাকতে পারেন ওকে।

—রানাজি! এবার কোঠি কাঁপিয়ে সহসা হা হা করে হেসে উঠলেন দেবাদ্রি, বেশ বলেছ তো। একটু আগেই রানাজি ঠিক একইভাবে বললেন আংটিটা নিশ্চয়ই রোমিওই প্রেজেন্ট করেছিল বর্ণনাকে।

রোমিওর গাল দুটো শক্ত হয়ে গেল, রানাজি এই কথা বলেছেন। তা তো বলবেনই। চুপিচুপি বর্ণনার শরীরটা কত তাড়াতাড়ি শ্মাশানের চুল্লিতে ঢুকিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, এবং তাতে তিনি সক্ষমও হন, তিনি ছাড়া কে-ই বা সব দায় আমার ঘাড়ে চাপাবেন!

—তাহলে বলছ, রানাজি মিথ্যে করে তোমাকে জড়াতে চেয়েছেন?

—অবশ্যই।

—হুঁ। দেবাদ্রির চোখেমুখে একটা অদ্ভুত হাসি সহসা ঝিলিক দিয়ে উঠল। পরক্ষণে তাঁর অ্যাটাচি ব্যাগটা খুলে তার ভেতর থেকে বার করলেন ব্রাউনরঙের একটা বড়সড় খাম। খামটা একটু ভারীই। তার ভেতর থেকে হঠাৎ বার করলেন ছেঁড়া, দগ্ধ কয়েকটা ফটোগ্রাফের টুকরো। সেগুলো রোমিওর চোখের সামনে ফেলে দিয়ে বললেন, এ ফটো কার চিনতে পারো?

ঘটনাটা এতই আকস্মিক, এমনই তাপবহনকারী যে, রোমিও একলহমায় শক্ খাওয়ার মতোই চমকে উঠল প্রবলভাবে। গলা ফ্যাঁসফ্যাঁস করে বলল, এগুলো আপনি কোথায় পেলেন?

দেবাদ্রি বিশ্বজয়ের হাসি দু ঠোঁটের কোণে ফুটিয়ে বললেন, হোটেলের পেছনদিকে একটা ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে পোড়ানো হয়েছিল এগুলো। ফটোগুলি সবই তোমার তোলা। কিন্তু এবার বলো দেখি, হঠাৎ ফটোগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে পোড়াতে হল কেন?

রোমিও চোয়াল শক্ত করে বলল, সে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—কিন্তু রোমিও, ব্যাপারটা তো আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকছে না, কারণ ছেঁড়া টুকরোগুলো কিছু কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে বর্ণানার রুম থেকেও।

রোমিও আবারও স্তব্ধ হয়ে গেল।

—অর্থাৎ এ-সবই সেদিন রাতের ঘটনা, যে-রাতে বর্ণনা তার রুমে খুন হয়েছিল।

রোমিও কিছুক্ষণ পর ফ্যাঁসফেসে গলায় বলল, তাতে কিছু প্রমাণ হয় না।

—হ্যাঁ, প্রমাণ হয়। দেবাদ্রি চোখ রক্তবর্ণ করে হাওয়ায় ঘুঁষি ছুড়লেন একটা। বললেন, প্রমাণ হয় যে, সে-রাতে তুমি বর্ণনার ঘরে ঢুকেছিলে।

রোমিওর গলা ঘড়ঘড় করতে থাকে, তাতে কিছু প্রমাণ হয় না।

—হ্যাঁ, এটাও প্রমাণ হয় যে, সে-রাতে বর্ণনার সঙ্গে তুমি ড্রিঙ্ক করেছিলে।

রোমিও প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করল, আমি ড্রিঙ্ক করিনি।

—শোনো রোমিও, পুলিশ-অফিসারদের কাছে কোনও কথা বেশিক্ষণ গোপন করা যায় না। বর্ণনার ঘর থেকেই মদের একটি খালি বোতল পাওয়া গেছে। সেইসঙ্গে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে, বর্ণনার পেটেও সে-রাতে অ্যালকোহল ছিল, অতএব—

রোমিও জোর গলায় বলল, বর্ণনা ড্রিঙ্ক করে থাকলেও আমি করিনি।

—বাহ্। দেবাদ্রি পুনর্বার অট্টহাস্য করে উঠলেন, দুই চাতক-চাতকী এক ঘরে বসে গভীর রাত পর্যন্ত কাটাল, তার মধ্যে একজন ড্রিঙ্ক করল, অন্যজন হাঁ করে তাকিয়ে থাকল তার পানরত সুন্দর মুখের দিকে, এ কথা শুনলে তো লখনউয়ের টাঙার ঘোড়াগুলোও হাসব, মশয়!

রোমিও স্তব্ধ হয়ে তাকিয়েছিল দেবাদ্রির মুখের দিকে। একটু একটু করে কীভাবে কথা টেনে বার করতে পারেন দুঁদে পুলিশ অফিসারটি, সে কথা ভেবে আশ্চর্য হচ্ছিল খুবই। একটু পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বিশ্বাস করুন, সে রাতে আমি ড্রিঙ্ক করিনি।

দেবাদ্রি হাসতে হাসতে বললেন, এত মিথ্যে কথা বলে কী লাভ, বৎস! প্রেমিকার সঙ্গে গভীর রাত পর্যন্ত একঘরে থাকা হল, শোয়া হল, আর শোয়ার আগে একজন ড্রিঙ্ক করল, অন্যজন করল না, এটা কোনও পাগলেও বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এবার বলো দেখি, ফটোগুলোর এই পরিণতি হল কেন?

দেবাদ্রির কথা শুনতে শুনতে রোমিওর নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তাহলে এরপর নিশ্চয় বলবেন, সে-রাতে এত কাণ্ড যখন করেছি, তখন বর্ণনাকে আমিই মার্ডার করেছি ওভাবে!

দেবাদ্রি তীব্রদৃষ্টিতে রোমিওকে পরখ করতে করতে বললেন, ভাবতে বাধা কোথায়? যে-যুবক একের পর এক মিথ্যে কথা বলে চলেছে, তাকে তো সন্দেহ করতেই পারি।

রোমিও হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, আমি মোটেই মিথ্যে বলিনি!

—বলোনি! দেবাদ্রি মুখ হিংস্র করে হঠাৎ রোমিওর একটা হাত টেনে নিলেন, মধ্যমা আঙুলটি তুলে ধরে বললেন, এই তো আংটির দাগ। কোথায় গেল আংটিটা!

রোমিও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার আংটিবিহীন আঙুলটার দিকে।

ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যালের সাঁড়াশি-জেরার কবল থেকে মুক্তি পেয়ে যখন বেরুতে পারল রোমিও, তার মুখ ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য, থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর। গার্গী তার অভিব্যক্তি লক্ষ করছিল তীক্ষ্ণ নজরে, এক্ষেত্রে দোবাদ্রির জেরার ধরন সে জানে না, কিন্তু অনুভব করতে

পারছিল, রোমিওর কোনও গোপন দুর্বলতায় সজোরে আঘাত দিয়েছেন জাঁদরেল পুলিশ-অফিসার। এও বুঝতে পারছিল, দেবাদ্রি এই হত্যাকাণ্ডটির জটিলতায় যতই বিভ্রান্ত হবেন, ততই আরও নির্মম হয়ে উঠতে চাইবেন সন্দেহভাজনদের ওপর।

ঋষভ মুখার্জি তাঁর পকেট থেকে ডিজিটাল ডায়েরির ভাঁজ খুলে, তার কি-বোর্ডের বোতাম টেপাটিপি করে হয়তো নোট করছেন কত অবধি শুটিং হল, পরের দৃশ্যই বা কখন শুরু করবেন।

গার্গী অতএব আরও একবার তার মেক-আপ চড়িয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে, যদি ঋষভ মুখার্জি শুরু করে দেন শুটিঙের পরবর্তী পর্ব। রোমিও বাইরে বেরুতেই পরিচালক তৎক্ষণাৎ তাকে ডাকলেন ক্যামেরা ধরতে, কিন্তু টালমাটাল পায়ে এগুতে এগুতে ধূসর চোখে মাথা ঝাঁকাল সে তার পক্ষে এই বীভৎস জেরার পর আর কিছুতেই সম্ভব নয় ক্যামেরার চোখে চোখ রেখে দাঁড়ানো। ঋষভ মুখার্জি তার ঝড়গ্রস্ত চেহারা, তার চোখের ভাসা-ভাসা চাউনি দেখে এমন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন যে, শুটিং শুরু করব-করব করেও শেষে বিরক্তিতে, ক্ষোভে দাঁড়িয়ে রইলেন চোয়াল শক্ত করে।

দেবাদ্রি ততক্ষণে কোঠির বাইরে দাঁড়িয়ে সিনেমুভির অন্য সব ক'টি চরিত্রের দিকে নজর ফেলে ফেলে হয়তো ভেবে চলেছেন, এর পর তাঁর টার্গেট কে হতে পারে, এতগুলি রুপোলি জগতের মানুষের মধ্যে কার পক্ষে এহেন হত্যাকাণ্ডটি ঘটানো সম্ভব! গার্গী কী ভাবছিল কে জানে, দেবাদ্রিকে অমন ঠায় দাঁড়িয়ে দোদুল্যমান দেখে সে তার রং-মাখা রেশমবাই মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে এগিয়ে গেল, হাসিটি সামান্য বিস্তৃত করে গলা খাদে নামিয়ে বলল, তা হলে কি রোমিওকেই সন্দেহ করছেন, মিঃ সান্যাল!

দেবাদ্রি ঠিক নিশ্চিত না হতে পেরে বলল, ইয়েস, ওয়ান অব দ্য সাসপেক্টস্।

—কিন্তু বিটন তালুকদার!

—হ্যাঁ, বিটনকেও আমরা সন্দেহের তালিকায় রেখেছি।

গার্গী দেবাদ্রির চোখে চোখ রাখল, বলল, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, বিটন তালুকদারের পক্ষেই খুনি হওয়া অধিকতর সম্ভব। একটি নয়, দুটি খুনের পেছনেই তার মোটিভ সবচেয়ে প্রবল।

দেবাদ্রি তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে চাইল, কী আশ্চর্য, আপনারও তাই মনে হচ্ছে! আমি এখনও সেরকমই ভাবছি। তবু—

—ধরুন, ডাক্তার সুস্নাত তালুকদারের নেক্সট কিন হিসেবে তাঁর দুই ভাইপোই দাবি করতে পারে তাদের পিতৃব্যের সম্পত্তি। বড় ভাইপো রঙ্গন তালুকদার সঙ্গে তার স্ত্রী লাভলি তালুকদারের সম্পত্তি ভাগ পাওয়ার হিসেবটা একরকম, আর ছোট ভাইপো অঙ্কন ওরফে বিটন তালুকদারের হিসেবটা আর এক রকম। লাভলি তালুকদার চেয়েছিল, ডক্টর সুস্নাত তালুকদারকে সঙ্গ দিয়ে সুকৌশলে তাঁর কাছ থেকে আদায় করে নেবে মোটা অঙ্কের সম্পত্তি। বিটন তালুকদার ভেবেছিল তাকে গায়ের জোরেই নিতে হবে সেটা। কিন্তু তাদের দুজনের অঙ্কই গোলমাল হয়ে গেল পটভূমিতে বর্ণনার আবির্ভাবে। যখন ভাইপোরা দেখল, ডঃ সুস্নাত তালুকদার বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরার কারণে যদি সব সম্পত্তি বর্ণনাকে দিয়ে যান, কিংবা তাকে অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সব টাকা উড়িয়ে দেন সিরিয়াল তৈরির কাজে, তা হলে তাদের বাড়া ভাতে ছাই। এই প্রেক্ষাপটে ডাক্তার-ভাইপো বা তার সুন্দরী স্ত্রীর পক্ষে ডঃ সুস্নাত তালুকদারকে খুন করে সম্পত্তি লাভ করার ঘটনাটা ততটা সম্ভব নয়, যতটা সম্ভব বিটন তালুকদারের পক্ষে। এক্ষেত্রে কাকার সঙ্গে বিটনের কথা-কাটাকাটি সম্ভব, তার জেরে শেষ পর্যন্ত খুনও। কিন্তু কাকাকে

খুন করার পর সে হয়তো বুঝতে পারল, বর্ণনা আগেই ডঃ সুস্নাত তালুকদারের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দিয়েছে অমৃতসর মেলে চড়ে। অতএব সেও বর্ণনার পিছু পিছু তাড়া করে এসে পৌঁছল লখনউ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাকা আদায় করতে না পেরে আবার খুন করে ফেলল বর্ণনাকে।

দেবাদ্রি হেসে বলল, তার মানে আপনি বলতে চাইছেন বিটনই দুটো খুন করেছে! সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, তা হলে বর্ণনার ব্যাগে দুটো সুইসাইড নোট পাওয়া গেল কেন!

গার্গী সেদিকটাও যে ভাবেনি তা নয়। বলল, হয়তো বর্ণনাকে এভাবে ফাঁসাতে চেয়েছিল বিটন তালুকদার। বর্ণনা খুন না হয়ে গেলে আপনি সেরকমই তো ভাবছিলেন, মিঃ সান্যাল!

দেবাদ্রি কিন্তু কলকাতায় থাকতে যে-ভাবনাটা ভেবেছিল সেটাই পুনরুক্তি করল, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, বর্ণনাই ডঃ সুস্নাত তালুকদারকে প্রথমে খুন করে। তারপর তার ব্যাগের ভেতর আগে থেকে লিখে আনা সুইসাইড-নোটের একটি চিরকুট ডঃ তালুকদারের ডেডবডির পাশে চাপা দিয়ে রেখে প্রমাণ করতে চেয়েছিল ডাক্তার আসলে আত্মহত্যাই করেছেন। অতঃপর বিটন তার পিছু ধাওয়া করে এসে টাকা না পেয়ে খুন করল বর্ণনাকে।

—সেটাও একেবারে অসম্ভব তাও বলছি না। আসলে খুন এক্ষেত্রে একটি নয়, দুটি। দুটি খুন একই সূত্রে গাঁথা। দুটি খুনের মোটিভ ভিন্ন কি না, সেটাই আগে খুঁজে বার করতে হবে, মিঃ সান্যাল। দুজন খুনি হওয়াটাও বিচিত্র নয়।

দেবাদ্রি আবার হাসলেন, আমি তাই আমার প্রাথমিক ভাবনাতেই স্টিক করে থাকছি। প্রথম খুনটা যদি টাকার জন্যে হয়ে থাকে, তবে দ্বিতীয় খুনটা হতে পারে প্রেমের কারণেও। বিটনকে দ্বিতীয় খুনের জন্যে সন্দেহের তালিকায় রেখেও আমরা রোমিওর কথা ভাবতে পারি। রোমিওকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণও পাচ্ছি। সেই কারণেই রোমিওর রুমমেট দ্বিত্বম রায়কেই আমি এবার জেরা করতে চাই। রোমিও সেদিন কতক্ষণ বাইরে ছিল, কখন ফিরেছিল ঘরে, সে সময় ড্রাঙ্ক ছিল কি না—

গার্গী অদ্ভুতভাবে হেসে বলল, তা হলে তাই করুন—

দেবাদ্রি তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা পরিচালক ঋষভ মুখার্জির দিকে এগিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, মিঃ মুখার্জি, আমি এবার আপনার টিমের সাউন্ড রেকর্ডিস্ট দ্বিত্বম রায়কে ইন্টাররোগেট করতে চাই।

—দ্বিত্বম! ঋষভ মুখার্জি চোখ গোল্লা গোল্লা করে দেবাদ্রি সান্যালকে যেন ভস্ম করে দিতে চাইলেন। তাঁর ডাকনাম ঋষি আর পদবি মুখার্জি হওয়া সত্ত্বেও সেই পুরাণ-কথিত মাহাত্ম্য-টাহাত্ম্যগুলো আর এ যুগে নেই বলে প্রাণে বেঁচে গেলেন কলকাতার পুলিশ ইন্সপেক্টর। কিন্তু কণ্ঠস্বরে আগুন ঝরিয়ে বললেন, এখন ওকে ছাড়া যাবে না। এতক্ষণ আমার ক্যামেরাকে আটকে রাখলেন, এখন সাউন্ড নিয়ে চলে গেলে শুটিং হবেই বা কী করে!

—শুটিং কাল করবেন বরং।

—কাল! ঋষভ মুখার্জি আরও ফিউরিয়াস হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন দেবাদ্রি সান্যালের ওপর, আপনি জানেন, এত বড় একটা টিম নিয়ে লনউতে একদিন ওভারস্টে করা মানে কতটা বেড়ে যাচ্ছে প্রোডাকশনের খরচ! তার চেয়ে বরং আপনি আমাকে অ্যারেস্ট করুন, অ্যান্ড পুট মি বিহাইন্ড দ্য বার। তা হলে আপনারও শান্তি, আমারও আর এই বয়সে সিরিয়াল তৈরি করার ঝামেলা হয় না।

ঋষভ মুখার্জির হুঙ্কার শুনে দেবাদ্রির মতো পুলিশ-অফিসারও রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়লেন। রাগে ঋষভ তখন কাঁপছেন, প্রায় হিস্টিরিয়া পেশেন্টের মতো অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ছিলেন হয়তো তাঁর কাজে বারবার বাধা পড়ছে বলেই। দেবাদ্রি অবশ্য এটাও বুঝতে পারেন, এই সব শিল্পীটিল্পী গোছের মানুষ এরকম একটু খ্যাপাটে ধরনেরই হয়ে থাকে প্রায়শ। বাধ্য হয়ে বললেন, ঠিক আছে, আপনি শুটিং করুন, কিন্তু আমাকেও তো কলকাতা থেকে এত বড় টিম নিয়ে এসে ইনভেস্টিগেট করতে হচ্ছে এরকম একটা জটিল কেসের। আমিও তো দিনের পর দিন চুপচাপ বসে থাকতে পারি না আপনার শুটিঙের জন্য! তা হলে কাকে স্পেয়ার করতে পারেন, বলুন, তাকেই ইন্টারোগেট করব।

ঋষভ তখনও জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে, হঠাৎ এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বললেন, তা হলে ভরদ্বাজকে নিয়ে যান। লখনউয়ে এসে শুধু ফোর টুয়েন্টিগিরি করে বেড়াচ্ছে। কোনও কাজকর্ম করছে না। ওকেই—

দেবাদ্রি ইতস্তত করে বললেন, কুই, কোথায় তিনি?

—এই তো একটু আগেই ছিল তো। ঋষভ বললেন বটে, কিন্তু চারপাশে খোঁজ করে দেখা গেল, শুটিং-স্পটের ত্রিসীমানায় ভরদ্বাজ মুখার্জির চিহ্নমাত্র নেই। অবাক হয়ে বললেন, তা হলে পুলিশ-ফুলিশ দেখে নির্ঘাৎ ডুব দিয়েছে কোথাও। আপনি এক কাজ করুন, বলতে বলতে ঋষভের চোখ পড়ে গেল কোল্ডড্রিঙ্কসের ভরভরন্ত বোতল নিয়ে আসতে থাকা সজনী দত্তের দিকে, তৎক্ষণাৎ বললেন, আপনি তা হলে সজনী দত্তকে নিয়ে যান—

সজনী দত্ত তাঁর মাথা-গরম পরিচালকের মাথা ঠাণ্ডা করতে সবে গড়াতে গড়াতে আসছেন শুটিং-স্পটে, হঠাৎ পরিচালক তাঁকে পুলিশের হাতে সঁপে দিচ্ছেন দেখে মুখখানা বাংলার পাঁচ-এর মতো করে ফেললেন এক মুহূর্তে। বলতে যাচ্ছিলেন, 'না, স্যার, না স্যার, আমি তো এসবের মধ্যে একেবারেই নেই,' কিন্তু বলা হল না, তার আগেই দেবাদ্রি সান্যাল মুখ চোখ শক্ত করে 'দ্যাট'স রাইট, হি নোজ আ লট', বলে খপ করে সজনী দত্তের হাতখানা চেপে ধরতেই ভদ্রলোক কেঁদে ফেলেন আর কি! কোনও ক্রমে পরিচালকের হাতে নরম পানীয়ের বোতলটা ধরিয়ে দিয়ে কাঁদো-কাঁদো মুখে গিয়ে ঢুকলেন কোঠির সেই ছোট্ট ঘরখানায়।

গার্গী এতক্ষণ ভারি কৌতুকের দৃষ্টিতে সমস্ত ঘটনাটা উপভোগ করছিল একমনে। সজনী দত্তের গোল শরীরটা কোঠির ঘরে অন্তরিণ হতেই নিজের মনেই হেসে ফেলল হঠাৎ। আহা, পরিচালক-অন্ত প্রাণ বেচারি সজনী দত্তকেই কি না বাঘের মুখে ঠেলে দিলেন ঋষভ মুখার্জি!

কোঠির ভেতর তখন দেবাদ্রি সান্যাল প্রায় বাঘের মতোই টুঁটি চেপে ধরতে চাইছেন সজনী দত্তর, দাঁতে দাঁতে চেপে বললেন, আপনিই কিন্তু এত সব কাণ্ডের পালের গোদা, সজনীবাবু।

সজনী দত্ত চোখ ছানাবড়া করে বললেন, বিশ্বাস করুন, স্যার, আমি জাস্ট একজন সাপ্লায়ার। দুটো পয়সার জন্যে সবার ফাইফরমাস খাটি। খুনটুনের মধ্যে আমি একদম নেই। রক্তটক্ত দেখলে আমার মাথা ঘোরে—

দেবাদ্রি সান্যাল হা হা করে দমক দিয়ে হেসে উঠলেন, কিন্তু এবার বলুন তো সজনীবাবু, 'মন আমুর' নামে যে বিখ্যাত বারটি আছে হজরতগঞ্জে, সেখান থেকে পরশু বিকেলে আপনি তিনটি ড্রিঙ্কসের বোতল কিনেছিলেন—

সজনী দত্ত তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে দিলেন, তিনটে না, স্যার, দুটো।

দেবাদ্রি সান্যাল হঠাৎ রেগে গিয়ে একটা প্রবল ধমক দিয়ে বললেন, দেখুন সজনীবাবু, পুলিশের কাছে মিথ্যে বলে কেউ পার পায় না। কলকাতা থেকে যে-টিমটা আমাদের এসেছে, তারা কাল রাত থেকেই সারা লখনউ ইতিমধ্যে চুঁড়ে ফেলেছে। 'হোটেল ইন'-এ যে যে-ক্লু পাওয়া গেছে তারই সূত্র ধরে খোঁজ করতে করতে 'মন আমুর' নামের বারে খোঁজ করতে গিয়ে আমাদের হাতে এসেছে আপনার ক্যাশমেমোটির জেরক্স কপি। তাতে লেখা আছে পরশু সকালে, সাতই সেপ্টেম্বর আপনি তিনটে 'এমপারার'স চয়েস' কিনেছেন। ক্যাশমেমোতে যদিও আপনার নাম লেখা নেই, কিন্তু যেহেতু 'এমপারার'স চয়েস' খুব দামি ড্রিঙ্কস, এর খদ্দেরের সংখ্যা খুবই কম, ফলে বারের সেলস্ম্যানদের কাছ থেকে 'এগুলো এক সিনেমা কোম্পানির লোক এসে নিয়ে গেছে, স্যার' শুনে, তারপর আপনার বিখ্যাত চেহারার বিবরণ শোনার পর আমাদের আর বুঝতে বাকি নেই, আপনিই কিনেছেন ওগুলো। এখন বলুন, কার কার ঘরে বোতল তিনটে সাপ্লাই করেছিলেন?

সজনী দত্ত হঠাৎ ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন, স্যার, তিনটে নয়, দুটো বোতলই কিনেছিলাম 'মন আমুর' থেকে। সত্যি কথাটা তবে বলি স্যার, পাঁচ-ছ'শো টাকার হিসেব মিলছিল না। তাই দুটো কিনে তিনটের ভাউচার করে নিয়েছিলাম, স্যার।

দেবাদ্রি সান্যাল আবার ধমক দিয়ে উঠলেন, ফের মিথ্যে কথা।

—না, স্যার, দিনের আলোর মতো সত্যি বলছি, স্যার। একটা বি. বি. র ঘরে, অন্যটা রুমেল রায়ের ঘরে পাঠিয়েছিলাম।

—সে দুটো বোতলের সন্ধান তো পেয়েছি। কিন্তু তা হলে বর্ণনার ঘরে একটা আধ-খাওয়া 'এমপারার'স চয়েস' এল কী করে, সজনীবাবু?

—সত্যি বলছি স্যার, বর্ণনাকে আমার একদম পছন্দ হয়নি। মেয়েটা বড্ড গোলমেলে ছিল ও চাইলেও ওর ঘরে ড্রিঙ্কসের বোতল পাঠাতাম না। না খেয়েই যা বেলেল্লাপনা করছিল, খেলে না জানি কী করবে এই ভেবেই—

দেবাদ্রি সান্যাল সামান্য হেসে ফেলে বললেন, আপনি না জোগালেও নিশ্চয়ই কেউ না কেউ সাপ্লাই করেছে, সজনীবাবু। মদ যদি কেউ খেতে চায় তা হলে মদ তার সামনে ডানা মেলে এসে উড়ে বসবে, বুঝলেন! কিন্তু তা হলে প্রশ্ন, কে সেদিন বর্ণনার ঘরে 'এমপারার'স চয়েস' সাপ্লাই করেছিল!

শেষ কথাটা দেবাদ্রি বেশ জোর দিয়ে বলায় সজনী দত্ত ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, হয়তো ভরদ্বাজ মুখুজ্জে নিয়ে যেতে পারে, স্যার।

—ভরদ্বাজ মুখার্জি! দেবাদ্রি সান্যাল থমকে গেলেন একলহমা, কী যেন চিন্তা করে বললেন আমাদের কাছে অবশ্য রিপোর্ট ওই দিন মুখে দাড়ি আছে এমন একজন যুবকও 'এমপারার'স চয়েস' কিনেছিল 'মন আমুর' থেকে। সেলসম্যান অবশ্য বলতে পারেনি সে সিনেমাদলের লোক কি না, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে ভরদ্বাজ মুখার্জি হলেও হতে পারে।

সজনী দত্ত তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়লেন, হতে পারে, স্যার।

—না কি, রোমিও দত্তগুপ্ত! দেবাদ্রি আবারও দোদুল্যমান হলেন, তারও মুখে কিন্তু দাড়ি আছে, তবে ফ্রেঞ্চকাট।

সজনী দত্তকে হঠাৎ বিভ্রান্ত দেখাল।

—যেই কিনে থাকুক, সেদিন রাতে সে-ই বর্ণনার সঙ্গে তার রুমে বসে ড্রিঙ্ক করেছিল

তারপর—, বলে দেবাদ্রি হঠাৎ আবার থামলেন, কিন্তু আপনাকেও সন্দেহের বাইরে রাখা যাচ্ছে না, সজনীবাবু। একটু আগেই আপনি বললেন, বর্ণনাকে আপনি একদম পছন্দ করতেন না, তাই তো?

সজনী দত্ত চমকে উঠলেন, না স্যার, সে তো মেয়েছেলেটার চরিত্র খারাপ ছিল বলে। নইলে অমন সুন্দরপানা মুখ—

দেবাদ্রি সান্যাল এবার শক্ত মুখে ঝুঁকে পড়লেন, আপনার সঙ্গে সবসময় একটা পেটমোটা ব্যাগ থাকে, তার মধ্যে একটা হাতুড়িও ছিল, সেটা একবার আমাকে দেখান তো, সজনীবাবু।

—হাতুড়ি, স্যার? সেটা তো স্যার, এখন আমার কাছে নেই।

—নেই কেন! কোথায় রেখেছিলেন সেটাকে?

—কোথাও রাখিনি, স্যার। কে যেন সেদিন হঠাৎ চেয়ে নিল।

—কে চেয়েছিল? দেবাদ্রি ধমকের সুরে কথা বলে একেবারে ঘাড়ের ওপর চেপে বসতে চাইলেন সজনী দত্তর।

—তা তো, স্যার, একদম মনে করতে পারছি না। কেন স্যার?

—আজ ভোরে হোটেলের পেছনের বাগান থেকে একটা হাতুড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। আমাদের ধারণা, সেই হাতুড়িটা দিয়ে সজোরে আঘাত করা হয়েছিল বর্ণনার মাথার পেছনে। সেই আঘাতের ফলেই তার মৃত্যু হয়েছে।

সজনী দত্তর মুখ ফ্যাকাসে, পাণ্ডুর হয়ে গেল। কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল তাঁর গলার স্বর, সে কি বলছেন স্যার?

—তা হলে এবার যদি আমরা বলি আপনিই সে-রাতে বর্ণনার মাথায় হাতুড়ি দিয়ে মেরে খুন করেছেন তাকে।

সজনী দত্তর মাথাটা বাঁই করে ঘুরে গেল হঠাৎ, কোনও ক্রমে টাল সামলে চোখ বড় বড় করে তাকালেন দেবাদ্রি সান্যালের দিকে, পরক্ষণেই মাটিতে উবু হয়ে বসে একেবারে হাউমাউ করে জড়িয়ে ধরলেন দেবাদ্রির একটা পা, বিশ্বাস করুন, স্যার, এ ব্যাপারে আমি বিন্দুবিসর্গও জানিনে। সেদিন সকালেই কেউ যেন চেয়ে নিয়েছিল হাতুড়িটা—

—কে চেয়ে নিয়েছিল, ভাল করে মনে করুন। কুইক। দেবাদ্রি ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন আবার।

—একদম মনে পড়ছে না, স্যার। বিশ্বাস করুন—

—বলুন কে চেয়ে নিয়েছিল? রোমিও? রানাজি? না কি ভারদ্বাজ? এরা তিনজনেই তো বর্ণনার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল তাই না?

সজনী হতভম্ভ চোখমুখ করে তাকিয়ে রইলেন দেবাদ্রির দিকে।

—না কি, আপনিই? দেবাদ্রি ধমকে উঠলেন প্রবলভাবে, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট, সজনীবাবু।

সজনীবাবু হঠাৎ পাগলের মতো কোঠির দরজা খুলে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলেন বাইরে। চিৎকার করতে করতে এসে আছড়ে পড়লেন ঋষভ মুখার্জির সামনে, বিশ্বাস করুন, স্যার, আমি বর্ণনাকে খুন করিনি, বিশ্বাস করুন, বলতে বলতে প্রায় হিস্টিরিয়া রোগীর মতো হাত-পা শক্ত হয়ে গেল সজনী দত্তর।

ঋষভ মুখার্জি তখন সবে দু-একবার রিহার্সাল দেওয়াচ্ছিলেন গার্গীকে। পুলক চৌধুরি

আরও জটিল হয়ে গেছে, কিছুতে মেলাতে পারছে না।

সায়ন হঠাৎ কী ভেবে জিজ্ঞাসা করল, তুমিও অঙ্কটা মেলাতে চাইছ নাকি!

গার্গী খুবই রহস্যময়ভাবে হেসে বলল, চেষ্টা করছি। এখন সমস্যাটা হচ্ছে, সেদিন সজনী দত্তর কাছ থেকে হাতুড়িটা কে চেয়ে নিয়েছিল!



সজনী দত্তকে দেবাদ্রি সান্যাল গ্রেপ্তার করতে পারে এ-সংবাদ শুনে গার্গী যেভাবে দমকে দমকে হেসে উঠেছিল, আর তার জলপ্রপাতীয় হাসির ধরনে বিব্রত হয়েছিল সায়ন, শুটিং-স্পটে সেভাবেই গার্গীকে আরও একবার হাসতে হল রেশমবাইয়ের ভূমিকায়।

কলকাতার পোড়-খাওয়া সাংবাদিক পুলক চৌধুরি রেশমবাইয়ের মতো এক ওজনদার রূপসী বাইজির পেডিগ্রি জানতে চাইছেন শুনে রেশমবাইয়ের হাসি যেন আর থামতেই চায় না, 'বাবুজি, তুমি তবায়েফদের পেডিগ্রি জানতে লখনউ এসেছ, হি হি হি হি...,' খিল খিল করে সেই শ্লেষাত্মক হাসি বেশ বিব্রত করল পুলক চৌধুরিকেও। পুলক প্রথমে একটু থতমত খেয়ে, অতঃপর নিজেকে সামলে বললেন, হাসছ কেন, রেশম? এ শহরের আর পাঁচটা মানুষের জন্মবৃত্তান্ত মানব-জীবনের সাধারণ নিয়মের অনুবর্তী। যদিও কোনও একজন মানুষের শিকড় আদতে কোন দেশে ছিল, তার ঠিকুজি খুঁজে বার করা খুবই কঠিন, কখনও হয়তো সম্ভবই হয় না তাদের পূর্বপুরুষের আদি-পরিচয় আবিষ্কার করা, তবু মানুষের জন্মের ইতিহাস সাধারণভাবে মেনে চলে একটা সামাজিক অনুশাসন। কিন্তু বাইজিদের জন্মবৃত্তান্ত প্রায়শই রহস্যজনক। হয়তো সবটাই দুর্ভাগ্য, তবু তারই মধ্যে যে বিচিত্র ইতিহাস লুকিয়ে আছে, সেই জগৎটাকেই আবিষ্কার করা আমার কৌতূহলের বিষয়।

রেশমবাই একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ওসব কথা এখন থাক, বাবুজি, বলো, আর কী গান শুনবে!

পুলক চৌধুরি লক্ষ করলেন রেশমবাইয়ের দীর্ঘশ্বাস ফেলার ধরন, বুঝলেন রেশমবাই সে-কথা প্রকাশ করতে চাইছে না, অন্তত এই মুহূর্তে। অতএব তা নিয়ে আর চাপাচাপি না করাই ভাল এখন, পরে কোনও এক নিভৃত মুহূর্তে জানতে হবে। সে জন্য আরও বহু সময়, বহু দিন অপেক্ষা করতেও রাজি পুলক। মুখে-বললেন, গানই যদি শোনাতে চাও তো আমার একটা প্রস্তাব আছে।

রেশমবাই যেন জানতই কোনও নাগর-পুরুষ একজন তবায়েফকে কী প্রস্তাব দেয়, দিতে

পারে। হাসি-হাসি মুখে, নিঃশব্দে কী এক প্রত্যাশায় তাকিয়ে রইল পুলকের দিকে।

—গোমতী নদীর ধারে একটা চমৎকার বাংলো বাড়ি পেয়েছি কয়েকদিনের জন্যে। বাড়িটার দোতলায় একটা গোল আকারের বিশাল বারান্দা আছে যার সামনেই নদী, বারান্দায় বসে থাকলে মনে হবে বসে আছি নদী-মধ্যবর্তী কোনও লঞ্চের ডেকে। সেখানে রাত্রির তৃতীয় প্রহরে মালকোষ শুনতে চাই তোমার গলায়।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে ওরকম একটি অভিনব পটভূমিকায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশন করতে হবে, এমন প্রায়-অবাস্তব প্রস্তাব শুনেও কিন্তু একরত্তি চমকাল না রেশম। সে যেন অবধারিতভাবেই জানত, এমন একটি প্রস্তাব কোনও এক সময় আসবেই কলকাত্তাইয়া সাংবাদিকটির কাছ থেকে। হয়তো মনে মনে প্রস্তুতও হচ্ছিল সেভাবেই। প্রস্তাব শুনে সুদর্শন, দীর্ঘদেহী সাংবাদিকটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখলও যেন নতুনভাবে। তারপর অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলল, যেমন তুমি বলবে, বাবুজি।

—কাট। কাট। দৃশ্যটি চমৎকারভাবে রোমিও তার ক্যামেরায় ধরতেই ঋষভ মুখার্জি বেশ প্রসন্ন মুখে এতক্ষণে একটা সিগারেট ধরালেন ফস্ করে লাইটার জ্বেলে। লাইটারটা সম্ভবত বিদেশি, তার নীচের দিকে একটা বোতাম পুশ করতেই ওপরে একটা বাঘের মুখ, তার মুখটা হাঁ হয়ে যায়, হাঁ-মুখের ভেতর আগুন জ্বলতে থাকে, সিগারেটটা হাঁ-মুখে ঢুকিয়ে বড় করে শ্বাস টানতেই মুহূর্তে অগ্নিমুণ্ড। এভাবে পরিচালককে সিগারেটমুখী হতে দেখে গার্গী বেশ পুলকিতই হল। তবে অবাক হল এই জেনে যে, লাইটারটা নাকি পরিচালককে সদ্য প্রেজেন্ট করেছেন রুমেলার বন্ধু ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেনের পরিচয় কাল রাতে গার্গী একটু-একটু পেয়েছে সায়নের কাছে। দুজনে কাল একই গাড়িতে কানপুর গিয়েছিল, সারাদিন বেশ কয়েকটা মিটিং করেছে ওখানকার বিজনেসম্যানদের সঙ্গে, তাতে বেশ ভালই সাড়া পেয়েছে সায়ন। আজ সকালে উঠেই আবার তাই তড়িঘড়ি প্রস্তুত হয়ে কানপুর বেরিয়ে গেছে, ফিরতে রাত হবে।

সায়নের মুখেই শুনল, ক্যাপ্টেন লোকটা কিন্তু একদিকে ভারি মজাদার মানুষ। খুব হুল্লোড় করতে পারেন, অন্যদিকে যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে, বেশ খোঁজখবর রাখেন আন্তর্জাতিক বিজনেস ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে। সময়ে সময়ে উইট-হিউমার দিয়ে জমিয়েও রাখতে পারেন যে-কোনও পার্টি। আবার প্রচণ্ড ড্রিঙ্ক করতে পারেন, কিন্তু একটুও পা টলে না। মাতাল অবস্থায়ও আশি-নব্বই কিলোমিটার স্পিডে গাড়ি চালাতে পারেন অনায়াসে। পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যেই একাধিক-বার ঘোরা হয়ে গেছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশগুলি।

ক্যাপ্টেন নামক রহস্যময় মানুষটা ইতিমধ্যে সায়নকেও চার্মড করে ফেলেছেন দেখে গার্গী কিছুটা হতভম্ব। রুমেলা রায়ের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক কিছুই বোঝার উপায় নেই, সায়নকেও তিনি কিছুই বলেননি এ-ব্যাপারে, সায়নও কিছু জিজ্ঞাসা করেনি, জিজ্ঞাসা করা যায়ও না অবশ্য। গার্গী হলে হয়তো কায়দা করে উত্থাপন করত এহেন একটা কূট প্রসঙ্গ, একটু বাজিয়ে দেখত নিশ্চয়ই। আর ঘটনাক্রম অনুযায়ী বাজিয়ে দেখতেও ইচ্ছে করছে গার্গীর, কেননা বর্ণনা-হত্যার ঠিক আগের দিনই ক্যাপ্টেন হঠাৎ হোটেল ইন-এর পটভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে খুবই রাজকীয় ভঙ্গিতে পানভোজন করেছেন রুমেলার সঙ্গে, একই রুমে থেকেছেন রুমেলার পার্টনার হয়ে, সে রুমটা আবার বর্ণনার ঠিক পাশের রুম।

অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল, দু-একদিনের মধ্যেই ক্যাপ্টেনের সঙ্গে

অবশ্যই আলাপ করে নিতে হবে গার্গীকে, সায়ন্ একটু ফ্রি হলে তার মাধ্যমেই।

আপাতত সম্বিত ভেঙে সে একটু সন্ত্রস্ত হল পরিচালক ঋষভ মুখার্জিকে পকেট থেকে তাঁর ডিজিটাল ডায়েরিটা বার করতে দেখে। অর্থাৎ শুটিঙের পরবর্তী দৃশ্য এখনই আবার টেক করা হবে, তারই ইঙ্গিত। শুটিঙের সময় ঋষভ এতটাই ডিসিপ্লিন্‌ড্, এত সময়ানুবর্তী যে, পর পর দৃশ্যগুলি কখন কোন সময় শুরু হল, কখন শেষ হচ্ছে পরবর্তী দৃশ্য কখন কোনটা শুরু করবেন, তা নোট করে রাখেন পুঙ্খানুপুঙ্খ নিষ্ঠায়। এবারও পরবর্তী দৃশ্য শুরু হবে মন হচ্ছে, গোটা টিমও প্রস্তুত, ঠিক সে সময় প্রেক্ষাপটে কালান্তকের মতোই একরাশ তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যালের আবির্ভাব।

দেবাদ্রিকে দেখে ঋষভ মুখার্জির মুখটা ক্রোধে, বিরক্তিতে এতটাই বেঁকে গেল যে, নিজেকে সামলাতে না পেরে বলেই ফেললেন, আপনি আজ আবার ডিসটার্ব করতে এসেছেন! কাল রাতে আমাকে তিন ঘণ্টা জেরা করেও আপনার কৌতূহল মেটেনি!

দেবাদ্রি অবশ্য যথাসম্ভব গম্ভীর থেকে বললেন, আপনাকে ডিসটার্ব করার আমার আদৌ ইচ্ছে নেই, কিন্তু আপনার প্রিয় ভাইপোটিকে আমার খুব দরকার। তাঁকে কাল থেকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

—খুঁজে না পাওয়া গেলে আমি কী করতে পারি। তাকে তো আমি পকেটে করে ঘুরে বেড়াচ্ছি না। আপনি এখানে ঘুরেঘারে দেখুন কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে কি না, পেলে নিয়ে যান, গারদে পুরে দিন লখনউতে ফিল্ম তুলতে এসেছে এই অপরাধে, না পেলে বিদায় হোন। আমাদের ঠাণ্ডা মাথায় কাজটা করতে দিন।

দেবাদ্রি ঋষভের হুলগুলো হজম করে বললেন, এখানে তো নেই দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে তো আপনাদের হোটেলের চারপাশে, শুটিং-স্পটের কাছাকাছি ওয়াচ রাখতেই হবে।

—কেন, তার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পেলেন নাকি! ঋষভের চোখমুখ কুঁচকে প্রশ্ন।

—নিশ্চয়ই। একাধিক প্রমাণ পাওয়া গেছে বলেই তো তিনি হঠাৎই কাল ডুব দিয়েছেন।

—ও! ঋষভ একমুহূর্ত থমকে গেলেন, তা হলে তার নামে একটা হুলিয়া বার করে দিন। কোথায় আর যাবে, নিশ্চয়ই পুলিশের ভয়ে লখনউ শহরের কোনও গলিঘুঁজিতে ঘাপটি মেরে আছে। ফোরটুয়েন্টিটা এখনও স্টেশনে গিয়ে কলকাতার ট্রেনে চেপে বসতে পারেনি বলেই আমার ধারণা, বলেই হঠাৎ এদিক-ওদিক তাকালেন, রানাজি—

রানাজি সান্যাল কাছাকাছি কোথাও ছিলেন, হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসতেই ঋষভ বললেন, ভরদ্বাজ কোথায়?

বেশ মিনমিন করেই বললেন রানাজি, কী জানি। কাল রাতে হোটেলেও ফেরেনি।

ফেরেনি। বাহ, বাহ, তোমরা বেশ নিশ্চিন্তে বসে আছ! নিশ্চয়ই বাইজিদের নিয়ে গল্প তুলতে এসে কোনও বাইজির ঘরে গিয়ে বসে আছে মজা মারতে! খোঁজ করো, দ্যাখো, পেলে পুলিশের হাতে তুলে দাও। নইলে আজও আমাদের শুটিং করতে দেবে না।

রানাজি পরিচালকের এমন কড়া ফরমান পেয়ে কিছুটা হতভম্ভ, কিছুটা বিব্রত, কী করবেন ভেবে না পেয়ে একই রকম মিনমিন করে বললেন, পুলিশ কাল সারা লখনউ চুঁড়েও পায়নি, আমি তাকে কোত্থেকে খুঁজে পাব!

দেবাদ্রি ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, খুঁজে ঠিকই বার করব তাকে। কতক্ষণ আর চোখে

ধুলো দিয়ে পালিয়ে থাকবে। তবে—, ঋষভের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, তবে আপনি যে সাজেশানটা দিলেন, সে ব্যাপারটা আমার মাথায় আসেনি। ঠিক আছে, লখনউয়ের সমস্ত ব্রথেলগুলো আমরা একবার খুঁজে দেখছি।

—হ্যাঁ, তাই দেখুন গে যান, এখানে সময় নষ্ট না করে ওই জায়গাযগুলো খুঁজলেই সবচেয়ে আরাম পাবেন। যান এখন, আমাদের কাজ করতে দিন।

ঋষভের খবরদারির কণ্ঠস্বর শুনে দেবাদ্রির চোয়ালটা হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। বললেন, আই অ্যাম নট ডিসটার্বিং ইউ। আপনার কাজ শুরু করে দিন না—

—আপনি তা হলে এখানে দাঁড়িয়েই থাকবেন! ঋষভ হঠাৎ খেপে উঠলেন প্রবলভাবে, তা হলে এখানে আমরা শুটিং করবই না। রানাজি, প্যাক আপ, প্যাক আপ। ইমিডিয়েট, বলতে বলতে হাতের ডিজিটাল ডায়োরিটা বন্ধ করে চোখমুখে বিরক্তি ফুটিয়ে আবার তীব্র স্বরে হাঁক দিলেন, সজনী, সজনী, কোথায় একটা টাঙা ঠিক করে এসেছিলে, এক্ষুনি সেটাকে টেনে নিয়ে এসো হিড় হিড় করে। ইমিডিয়েট।

ঋষভ মুখার্জি আর একমুহূর্তও দেরি না করে, হন হন করে কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে বসলেন কাছেই দাঁড়-করানো একটা সবুজ অ্যাম্বাসাডারে, যেটায় করে সকালে শুটিং করতে এসেছিলেন হোটেল থেকে।

ঘটনাটা এতই আকস্মিক, এমন ঝাঁকুনি দিয়ে গেল শুটিং-স্পটে উপস্থিত প্রত্যেকেরই শরীরে যে-গার্গীও বেশ হতভম্ব। ঋষভ এভাবেই চট করে মাথা গরম করে ফেলেন, তাতে সিনেমুভির সবারই এখন না যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। সকাল থেকে বহু ঝঞ্ঝাট করে, ক্যামেরা থেকে শুরু করে ট্রলি, রিফ্লেক্টার ইত্যাদি নানান সরঞ্জাম এত দূর বয়ে এনে সবে সাজানো হয়েছে সেট, একটা কি দুটো দৃশ্য টেক হয়েছে কি হয়নি, হঠাৎ পরিচালক দুম করে কিনা হুকুম জারি করলেন, প্যাক আপ!

দেবাদ্রিও ততক্ষণে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ভুরুতে ভাঁজ ফেলে তাকিয়ে আছেন খেয়ালি, হট-হেডেড পরিচালকের দিকে। কাল রাতে তাঁকে জেরা করার সময় যথেষ্ট জ্বালিয়েছেন তাদের। কিছু জিজ্ঞাসা করলেই বলেছেন, 'ইফ ইউ আর নট স্যাটিসফায়েড উইথ মাই রিপ্লাই পুট মি বিহাউন্ড দ্য বার। যে কোনও একজন আসামি খাড়া করতে পারলে আপনার যদি প্রোমোশন হয় তো আমিই ন্য হয় কাঠগড়ায় দাঁড়াই।' আজও গাড়িতে বসে, দেবাদ্রিকে প্রায় শুনিয়েই, হন্তদন্ত হয়ে তাঁকে ঠাণ্ডা-করতে-আসা রানাজি সান্যালকে ঘাড় ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, বুঝলে, যখন প্রথম গোঁফ উঠেছিল, তখন বাবা একদিন একান্তে ডেকে কতকগুলো উপদেশ দিয়েছিলেন। তার একটা হল, তিন পি থেকে সর্বদা দূরে থাকবে, পলিটিশিয়ান, পুলিশ অ্যান্ড দি প্রসটিটিউট্স।

শুনে দেবাদ্রি চকবাজারের বাইজিপাড়ায় আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না। পাগলা পরিচালকের দিকে একবার তাঁর বিখ্যাত ব্যাঘ্রদৃষ্টিটি নিক্ষেপ করে উঠে বসলেন তাঁর অ্যালসেশিয়নের মতো চেহারার কালো জিপটিতে।

দেবাদ্রি চলে যাওয়ার পরও কিন্তু ঋষভ আর চকবাজারে শুটিং করতে রাজি হলেন না। ঘাড় ঝুঁকিয়ে বললেন, পরের দিনটা টাঙায় নেব। চকবাজার থেকে ক্লকটাওয়ার, সেখান থেকে গোমতীর ধারে সেই বাংলোটা পর্যন্ত পুলক চৌধুরি আর রেশমবাই যাবে। অ্যারেঞ্জ ইমিডিয়েট।

পরিচালক 'ইমিডিয়েট' বলা মানেই সেটাই চূড়ান্ত আদেশ। তৎক্ষণাৎ গোটা টিম ব্যস্ত

হয়ে পড়ল চকবাজারে এত কষ্ট করে এত হাঙ্গামা করে তৈরি করা সেট ভেঙে 'প্যাক আপ' করতে।

সজনী দত্ত ততক্ষণে আর একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে টাঙা নিয়ে আসতে। রোমিও, দ্বিত্বম, রানাজি, শাম্ব সামন্ত সবাই-ই মুখ অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে। সবে সকালের প্রশান্ত মুহূর্তে কাজ শুরু হতে না হতে প্রথমে পুলিশি-উপস্থিতি, পরক্ষণে পরিচালকীয় হুকুমে গোটা দিনের স্কিমটাই লণ্ডভণ্ড। ঋষভ মুখার্জির প্রবল ইচ্ছাশক্তি, আর কাজের অদম্য স্পৃহার জন্যই অবশ্য চারপাশের তীব্র বাধানিষেধ সত্ত্বেও শুটিং হতে পারছে এখনও। অন্য যে-কেউ হলে টিম নিয়ে কলকাতা প্রস্থান করত এতদিনে।

বিবস্বান বসু কোঠির ভেতরে সেই ঘরটায় বসে একা একা সিগারেট খেয়েই চলেছেন নিঃশব্দে। তাঁকে যত দেখছে গার্গী, ততই অবাক হচ্ছে। কেননা এত বড় একজন অভিনেতা, তিনি চারপাশের এই ঝড়ঝঞ্ঝাটে যেন ভীষণ নিস্পৃহ। বর্ণনার মৃত্যুতে গোটা টিম যখন স্তব্ধ, শোকাহত, গার্গী খেয়াল করে দেখেছে বিবস্বান বসু তাঁর রুমে একা-একা, হয় কোনও বই বা ম্যাগাজিন মুখে দিয়ে, অথবা কোনও বিদেশি গানের ক্যাসেট চালিয়ে দিয়ে ড্রিঙ্ক করেই চলেছেন নিঃশব্দে। খুবই আশ্চর্য লেগেছিল গার্গীর এহেন একজন নির্বিকার নায়ককে চোখের সামনে দেখে। বর্ণনার সঙ্গে দু-তিন রাত্রি তাঁর যেরকম ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তারপরও তার নৃশংস হত্যা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি!

দেবাদ্রি পটভূমি থেকে প্রস্থান করতেই টিমের সবাই যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে একটু। পুলিশের চোখে এই টিমের সবাই যখন সন্দেহভাজন, সম্ভাব্য আসামি, তখন একেবারে ঘাড়ের ওপর দেবাদ্রি সান্যালের মতো একজন জাঁদরেল পুলিশ-ইনস্পেক্টর নিয়ে শুটিং করা যেন সার্কাসের সেই ত্রিফলা বর্শার খেলাটার মতোই। আপাতত বর্শাটা সরে যেতে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল নতুন দৃশ্যগ্রহণে।

গার্গী অবশ্য দেবাদ্রির এমন ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলতে থাকার কারণ উপলব্ধি করতে পারছে। এতজন পুলিশ-অফিসার নিয়ে লখনউয়ে হত্যাকারী ধরতে এসে তাঁরও তো শুয়ে-বসে থাকার সময় নেই, বিশেষ করে ভরদ্বাজ সম্পর্কে হঠাৎই তাঁর এই অতিরিক্ত সন্দিহান হয়ে ওঠার যখন কয়েকটা কারণ ঘটে গেছে। যার প্রথমটা হল, গতকাল শুটিং-স্পটে হঠাৎ পুলিশ আবির্ভাব ঘটতেই ভরদ্বাজ মুখার্জির আকস্মিক হাওয়া হয়ে যাওয়া। ভরদ্বাজের নিশ্চয়ই কোনও ঘোর দুর্বলতা আছে, নচেৎ পুলিশ দেখে আত্মগোপন করার আর কোনও কারণ থাকতে পারে না। কাল গভীর রাতে ভরদ্বাজের 'হোটেল ইন'-এর রুমে হানা দিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু রাতেও সে ফেরেনি হোটেলে এই খবর শুনে দ্বিগুণ সন্দেহপরায়ণ হয়ে পড়েছে পুলিশ। আর তা এই সংকটময় পরিস্থিতিতে কিছু অবাস্তবও নয়। ভরদ্বাজ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠার আরও একটা নিশ্চিত কারণ, বর্ণনার ডেডবডি পোস্টমর্টেমে পাঠানোর সময় যে-দুটি অলঙ্কার তার শরীর থেকে উদ্ধার করেছিলেন মাখনবাবু, তার একটি হল লকেটে যিশুর মূর্তিসহ একটা সোনার চেন, যা ভরদ্বাজের গলায়ও সবসময়ে শোভা পায়। চেনটা কিন্তু লখনউ পৌঁছনোর পরও কেউ দেখেনি বর্ণনার গলায়, অতএব সে-রাতেই নিশ্চয় ভরদ্বাজই—

তা ছাড়া 'মন আমুর' নামের সেই বারটিতে পুলিশ আরও একবার জেরা করে যে-চিত্র বহন করে নিয়ে এসেছে, তাতে 'এম্‌পারার'স চয়েস'-এর তৃতীয় বোতলটির ক্রেতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ভরদ্বাজই, রোমিও নয়। পুলিশ-অফিসার বারবার বারের সেল্‌সম্যানকে জিজ্ঞাসা

করেছেন, বলুন তো, লোকটির গালে চাপদাড়ি, না ফ্রেঞ্চকাট? তাতে অনেক ধস্তাধস্তির পর চাপদাড়িতেই থিতু হতে চেয়েছে সেল্‌সম্যান।

সন্দেহটা যখন ভরদ্বাজের ওপর ন্যস্ত হচ্ছে, তখন হঠাৎ অকুস্থল থেকে তার আকস্মিক পলায়ন, এটাই পুলিশকে বাধ্য করেছে তাকে যে-কোনও উপায়ে খুঁজে বার করার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করতে। লখনউয়ের মতো একটি ভিনদেশি শহর থেকে পুলিশ তা পারবেও গার্গী জানে।

সজনী দত্ত ততক্ষণে একটা চমৎকার বাহারি টাঙা জোগাড় করে নিয়ে এসেছেন, যে-টাঙাটি লখনউয়ের রাস্তায় দেখা আর পাঁচটা সাধারণ টাঙা থেকে অবশ্যই ভিন্ন। টাঙাটা প্রায় নতুন ঝকঝকে চেহারার, তার বসার সিটগুলো যেমন রংচঙে, নরম গদিঅলা, তেমনই সিটের ওপর সবুজ ভেলভেটের ছাউনি। তবে শুধু টাঙার চেহারাই এমন প্রখর জমকালো তা নয়, যে- ঘোড়াটা লাগাম মুখে নিয়ে, লেজ উঁচিয়ে, দৌড়তে দৌড়তে, টুংটুং শব্দ তুলতে তুলতে এসে পৌঁছল চকবাজারের গলিতে, তার চেহারাটাও একেবারে রেসের ঘোড়ার মতো তেল চুকচুকে। আর তার মালিক, টাঙাঅলার পরনের ঝলমলে পোশাক, মাথার পাগড়ি, হাতের ছড়িও যেন লখনউয়ের রাজকীয়তা বহন করছে।

টাঙাটা কোঠির কাছে এসে থামতেই টাঙাঅলা উধমলাল তার ছড়ি উঁচিয়ে বেশ অহঙ্কার করে ঘোষণা করল, ইয়ে হ্যায় স্পিশেল টাঙা, বাবু, বিলকুল সিনেমাকে লিয়ে। ইয়ে মেরা প্রিন্স হ্যায়।

প্রিন্স অর্থাৎ সেই তেল-চুঁয়ানো তাগড়াই গড়নের ঘোড়াটা তার মালিকের অহঙ্কার বজায় রাখতেই একবার 'চি-হি-হি' করে এমন আওয়াজ তুলল যে, চকবাজারের বাইজিপাড়ায় সেটাই হয়ে দাঁড়াল এক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

স্পেশ্যাল টাঙাটা দেখে গার্গীও চমৎকৃত হল, কিন্তু তার শরীরটা এবার একটু শিরশির করছে এই কারণে যে, পরের দৃশ্যেই তাকে চড়তে হবে এই টাঙাটিতে, বিবস্বান বসুর গা ঘেঁষে বসে দুজনকে যেতে হবে লখনউয়ের বিখ্যাত ক্লক টাওয়ার পার হয়ে, গোমতী নদীর ধার ঘেঁষে সেই চমৎকার বাংলো বাড়িটিতে।

টাঙা দেখে ঋষভ তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলেন গাড়ির ভেতর থেকে। বেরিয়েই তাঁর বরাবরের অভ্যাসমতো হাতের সিগারেটটা মনুমেন্টের মতো বসিয়ে দিলেন সবুজ অ্যাম্বাসাডারটির বনেটের ওপর, তারপর বিবস্বান আর গার্গীকে ডেকে বোঝাতে বসলেন পরবর্তী সিকোয়েন্স।

তবে যে-দৃশ্যটি চকবাজারে টেক করার কথা ছিল এরপর, দেবাদ্রির জ্বালাতনে করতে পারলেন না ঋষভ, সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রেশমবাই পুলকের প্রস্তাবে গোমতীর তীরে রাতের তৃতীয় প্রহরে গান গাইতে রাজি হতেই পুলক বেরিয়ে এলেন কোঠি থেকে। চকবাজারের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন হনহন করে, হঠাৎ প্রথমদিনকার খালি গায়ের সেই কিশোর রেশমবাইয়ের কোঠির কাছ থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পথরোধ করে দাঁড়াল পুলকের। পুলক বিস্মিত হয়ে দেখলেন, কিশোরটির হাতে একটা ছোট্ট চিরকুট, তাতে গোটা গোটা অক্ষরে হিন্দিতে লেখা, 'আপনার কাছে অনুরোধ, রেশমকে নিয়ে বাইরে কোথাও যাবেন না।' লেখাটার নীচে কোনও সইসাবুদ নেই দেখে আরও বিস্মিত হলেন পুলক। একবার মনে হল, আবার ফিরে যাবেন রেশমবাইয়ের কাছে। চিরকুটটা কে লিখেছে, কেন লিখেছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবেন। পরক্ষণেই মনে হল, থাক, রেশমবাইয়ের কাছ থেকে পরে যথাসময়ে জেনে নেওয়া যাবে চিরকুটের রহস্য।

তবু কৌতূহলটা রয়েই গেল পুলক চৌধুরির মনে। পরদিনই একটা বাহারি টাঙা নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হলেন চকবাজারে রেশমবাইকে নিতে। টাঙা নামের এই বাহনটি পুলকের ভারি পছন্দের, বিশেষ করে লখনউয়ের পটভূমিকায় টাঙায় চড়ে এই ঐতিহাসিক শহরটিতে ভ্রমণের একটা আলাদা রোমাঞ্চ আছে। আর রেশমবাইয়ের মতো একজন ওজনদার, গুণী গাইয়ের পাশে বসে কখনও ঘিঞ্জি সড়ক, কখনও ঝকমকে প্রধান রাজপথের দু' পাশের দৃশ্যপট দেখতে দেখতে যাওয়ার মধ্যে একটা অন্য মাত্রা খুঁজে পেলেন পুলক।

রেশমবাইয়ের কোঠিতে এসে খবর দিতেই খুবই অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে সে বেরিয়ে এল বাইরে। পুলককে দেখেই অদ্ভুতভাবে হাসল, বলল, এভাবে কোঠির বাইরে ম্যাহ্‌ফিল করতে অনেকদিন কারও বাড়ি যাইনি, বাবুজি। ভারি আশ্চর্য লাগছে, কেন তোমার সঙ্গে যেতে রাজি হলাম এই ভেবে।

পুলক খুব অবাক হলেন না, তবু জিজ্ঞাসা করলেন, তাই! কেন রাজি হলে?

—কী জানি, হঠাৎ তোমাকে দেখে এত ভাল লেগে গেল!

রেশমবাইয়ের পরনের ভারী জরির পোশাক তখন ঝলমল করছে ছোট্ট গলিটার পটভূমিতে। বাইরে অপেক্ষারত বাহারি টাঙাটিতে দুজন উঠে বসতেই টাঙাঅলা উধমলাল তার ছড়ি উঁচিয়ে, লাগামে টান দিয়ে ইঙ্গিত করতেই শাহীচেহারার প্রিন্স অমনি ছুটতে শুরু করল টগবক্স টগবগ শব্দ তুলে। চকবাজারের গলি থেকে প্রধান সড়কে উঠে টাঙার গতি আরও একটু বাড়িয়ে দিল প্রিন্স। আশপাশে আরও বহু টাঙার পাশে উধমলালের টাঙা নিঃসন্দেহে বহন করছে এক অন্য রাজকীয়তা। পুলক তাই ভারি উপভোগ করছিলেন প্রতিটি মুহূর্ত। রেশমবাইয়ের মাথায় একটা সূক্ষ্ম দোপাট্টা, সেটা টেনে নামিয়ে দিয়েছে তার ঠোঁট পর্যন্ত, তাতে রেশমবাইয়ের অভিব্যক্তিতে একটা অদ্ভুত রহস্য ওতপ্রোত হয়ে আছে যা মুগ্ধ করেছিল পুলককে।

টাঙা তখন আসিয়ারবাগ হয়ে ছুটে চলেছে গোমতীর দিকে। টাঙা থেকে নদী দেখা যায় না, তবু নদীর একটা অস্তিত্ব অনুভব করা যায় তার তীরবর্তী দৃশ্যপট দেখে। ক্রমে লখনউ রেসিডেন্সি বাঁদিকে ফেলে এগিয়ে চলেছে উধমলাল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাবে তৈরি এই প্রাচীন অট্টালিকার সমস্ত শরীরে এখনও সিপাহি বিদ্রোহের সময়কার গোলাগুলির দাগ বর্তমান, যা টাঙাঅলারা দেখিয়ে থাকে ট্যুরিস্টদের। রেসিডেন্সির সামনে সবুজ ঘাসে উমসুম হয়ে থাকা মাঠটি ভারি পছন্দ হল পুলকের। পরে কোনও একসময় দু'দণ্ড এসে বসে থাকবেন এখানে এমন ভাবতে ভাবতে দেখলেন বাঁয়ে লখনউয়ের বিখ্যাত বড়া ইমামবাড়া। ইমামবাড়া আসতেই কৌতূহলী চোখে সেদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ অস্ফুট কণ্ঠে রেশমবাই বলল, তুমি ভুলভুলাইয়া দেখেছ, বাবুজি?

পুলক চৌধুরি ঘাড় ঝাঁকালেন, না। একদিন ইচ্ছে আছে দেখার। যদি তুমি আমার সঙ্গে যাও তবেই—

রেশমবাই ভারি খুশি হল পুলকের কথায়। তেমনই অস্পষ্টকণ্ঠে বলল, কতদিন হল ভুলভুলাইয়ায় আসা হয়নি আর।

টাঙা ততক্ষণে পেরিয়ে যাচ্ছে রুমি দরওয়াজা, ছোট ইমামবাড়া। সবই লখনউয়ের ট্যুরিস্টদের প্রিয় দর্শনীয় বস্তু। পুলকের ইচ্ছে, একদিন টাঙা নিয়ে বেরিয়ে একে-একে দেখবেন এতসব ঐতিহাসিক আবরণে মোড়া বিখ্যাত স্থাপত্যের নিদর্শনগুলো।

ক্লক-টাওয়ার পেরিয়ে টাঙা ততক্ষণে গোমতীর তীরে সেই ছবির মতো বাংলোবাড়িটার

সামনে এসে পৌঁছেছে। টাঙা থেকে নামতে নামতে রেশমবাইয়ের বুকটা কেন কে জানে হঠাৎ কেঁপে উঠল. হয়তো সারারাত একজন অচেনা কলকাত্তাইয়া সাংবাদিকের সঙ্গে থাকতে হবে বলে। বসাতে হবে ম্যহ্‌ফিল, তাইই—

দৃশ্যগুলো একের পর এক ক্যামেরায় ধরে যখন ভারি প্রশান্ত দেখাচ্ছে ঋষভ মুখার্জিকে, সেইমুহূর্তে তাদের টিমের একজন স্পটবয় ভনা ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, পুলিশ গ্রেফতার করেছে ভরদ্বাজ মুখার্জিকে। ঋষভের কথামতো সত্যিই তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে চকবাজারেরই এক বাইজিবাড়িতে, বেহুঁশ অবস্থায়।



কলকাতার পুলিশ গোটা লখনউয়ের নিষিদ্ধ এলাকা তন্ন তন্ন ঢুঁড়ে, শেষপর্যন্ত গোলাপবাই নামের এক সুন্দরী বাইজির কোঠি থেকে যেভাবে প্রায় বেহুঁশ ভরদ্বাজ মুখার্জিকে ধরে এনেছে কোতোয়ালিতে, তারপর ঋষভ-কথিত 'ফোর টোয়েন্টি'টাকে ছোটখাটো ডোজ দিয়ে সুস্থ করে যে, গল্প শুনেছেন দেবাদ্রি, তা সত্যিই রোমাঞ্চকর। পরিচালক ঋষভ মুখার্জি নাকি কাল বিকেলে ভরদ্বাজকে হুকুম করেছিলেন, লখনউয়ের কোনও ওজনদার, রুচিমান বাইজির কোঠিতে গিয়ে তাদের সাজপোশাক, রূপটান, কেশসজ্জার কিছু ডিটেইল্‌স নোট করে নিয়ে আসতে। সহকারী পরিচালক হিসেবে টিমের সঙ্গে আসা ভরদ্বাজের তো আগেই করার কথা ছিল কাজটা, কিন্তু নানান ফস্টিনস্টিতে সে সময় করে উঠতে না পারায় কাল রীতিমতো ধমক দিয়ে ঋষভ তাকে পাঠিয়েছিলেন একঘণ্টার মধ্যে সব লিখে আনার দায়িত্ব দিয়ে, যাতে সিরিয়ালের নতুন অভিনেত্রী গার্গী চৌধুরি ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর আগে কোনও খুঁত না থাকে তার সাজসজ্জায়। কিন্তু ভরদ্বাজ এ-কোঠি সে-কোঠি খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ গোলাপবাই নামের এক তরুণীর ঘরে গিয়ে আটকে গিয়েছিল আচমকা। শুনেছিল, তার নাচঘরে কাওয়ালির এক জমজমাটি আসর বসবে সন্ধের পর। সেখানে লখনউয়ের সেরা কাওয়ালি-গায়কের সঙ্গে তুল্যমূল্য লড়াই হবে আগ্রা থেকে আসা আর এক বিখ্যাত কাওয়ালি-গায়কের।

শুনেই ভরদ্বাজের মনে হয়েছিল, এমন চমৎকার সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। সারা রাত কাওয়ালির আসরে উপস্থিত থাকতে পারলে সে বাইজিবাড়ির অনেক কিছু খুঁটিনাটি নোট করে নিয়ে যেতে পারবে তার পরিচালক আঙ্কেলের জন্যে। অতএব ঋষভ মুখার্জির জারি করা ফরমান 'এক ঘণ্টার মধ্যে'? যাবতীয় বিধিনিষেধ ভুলে সে বেমালুম গোলাপবাইয়ের কোঠিতে কাওয়ালি শুনেছে সারা রাত। শুধু শুনেইছে তা নয়, সেইসঙ্গে কোঠিতে উপস্থিত অন্যান্য রইস

আদমির সঙ্গে কাওয়ালির লড়াই তারিফ করতে করতে কিছু পানীয়ের স্বাদও নিতে শুরু করে সন্ধে থেকে গোটা রাত। সে পানীয় নাকি এতই সুস্বাদু যে, তাতে দিমাগ একেবারে দিওয়ানা হয়ে যায়। অতএব পান করতে করতে, পান করতে করতে ভোরের দিকে সে একদম আউট। তারপর কীভাবে যে সে এসে হাজির হয়েছে কোতোয়ালির কড়া পুলিশ-প্রহরায়, তার কিচ্ছুটি মনে করতে পারল না। হুঁশ ফিরল পুলিশের পিটুনিতে। দেবাদ্রির ধমক খেয়ে, দু-একবার রুলের গুঁতো খাওয়ার পর সে তার লাল টকটকে চোখ কোনওমতে খুলে, জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে পারল, বিশ্বাস করুন স্যার, আমি সাতেও নেই পাঁচেও নেই, এ সব শালা ওই—

দেবাদ্রি তার পেটে আর একবার রুলের গুঁতো দিতেই ভরদ্বাজের রক্তবর্ণ চোখ টানটান হয়ে খুলে গেল, ভয়ার্ত মুখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কী যেন খুঁজতে লাগল আকুল হয়ে। দেবাদ্রি তৎক্ষণাৎ তার ঘাড়ের কাছে কলারটা খামচে ধরে রুল উঁচিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, কোন শালা, হুঁ?

ভরদ্বাজ উঁচোনো রুল দেখে আরও ভয় পেয়ে গেল, হাউমাউ করে বলল, মারবেন না স্যার, সব বলছি—

—হুঁ, এবার বলো চাঁদু, সে রাতে বর্ণনার ঘরে কখন ঢুকেছিলে? কী করতে ঢুকেছিলে? ক'পেগ চড়িয়েছিলে বর্ণনার সঙ্গে?

ভরদ্বাজের গোল মুখখানা তখন আরও কোলাফোলা দেখাচ্ছে, মুখের চাপদাড়ি আরও চকচক করছে কোতোয়ালির মস্ত ঘরখানার টিউব লাইটের ঝকঝকে আলোয়, দেবাদ্রির প্রশ্নবাণ তার মগজে ঠিকঠাক ঠোকর দিতেই চোখ বিস্ফোরিত করে বলল, বিশ্বাস করুন, স্যার, আমি বর্ণনার সঙ্গে একটুও ড্রিঙ্ক করিনি।

—তাই! হা হা করে কোতোয়ালির ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন দেবাদ্রি, একটুও খাওনি, চাঁদু। তাহলে বর্ণনার ঘরের অমন দামি পানীয়ের বোতলটি একেবারে ধূ ধূ ফাঁকা, সাহারা মরুভূমি হয়ে গেল কী করে!

ভরদ্বাজ চোখ বড় বড় করে বলল, আপনি আমাকে চাঁদু বলে ডাকছেন, স্যার! বর্ণনাও আমাকে চাঁদু বলে ডাকত। বাজে ছেলে ভেবে আমাকে পাত্তাই দিতে চাইছিল না একদম, আমার সঙ্গে ও মদ খাবে কি!

দেবাদ্রি সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়লেন ভরদ্বাজের মুখের ওপর, তার চোখে কড়া চোখ ন্যস্ত করে বললেন, তাহলে 'মন আমুর' থেকে 'এমপারার'স চয়েস' বোতলটি কে কিনেছিল, চাঁদু!

—আমি না, স্যার। সেন্ট পার্সেন্ট সত্যি কথা বলছি, ভরদ্বাজ প্রবলভবে মাথা ঝাঁকাতে শুরু করতেই দেবাদ্রি আবার রুলের ডগাটা চেপে ধরলেন তার পেটে, তা হলে কি বারের সেল্সম্যান মিথ্যে কথা বলল যে, দাড়িঅলা একটা ছেলে এসে কিনে নিয়ে গিয়েছে 'এমপারার'স চয়েস'-এর বোতলটা।

—দাড়িঅলা ছেলে! ভরদ্বাজ কিছুক্ষণ ভোম্বল হয়ে ভাবল বোধহয় ব্যাপারটা, পরক্ষণে বলল, তাহলে নিশ্চয়ই রোমিওই কিনে এনেছে। ওরই একটু ইন্টুবিন্টু ছিল বর্ণনার সঙ্গে।

—তাই! হা হা করে দেবাদ্রি আবারও হেসে উঠলেন, বেশ জমিয়েছ তো তোমরা ব্যাপারটা! রোমিও বলছে, তুমি কিনেছ, আবার তুমি বলছ, রোমিও কিনেছে—। বাহ—

—আপনি স্যার রোমিওকে চেনেন না। ও বাইরে থেকে দেখতে গুডি-গুডি বয়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ডেঞ্জারাস। ওর দাদাকে পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলেছিল, তা জানেন?

—তাই!

—হ্যাঁ স্যার, যে, দিন রাতে বর্ণনা মার্ডার হয়, সে, দিন সকালেই আমাকে রোমিও কী বলেছিল-জানেন!

—কী!

—বলেছিল, বি কেয়ারফুল, ভরদ্বাজ. বর্ণনার কাছে বেশি ঘেঁষার চেষ্টা কোরো না, ওর দিক থেকে হাত উঠিয়ে নাও। না হলে—

—না হলে! দেবাদ্রি নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঝুঁকে পড়লেন ভরদ্বাজের মুখের ওপর।

—তখন কিছু আর বলেনি রোমিও। কিন্তু ওর চোখদুটো যে-ভাবে জ্বলছিল তখন, দেখে মনে হয়েছিল, মার্ডার করাটাও ওর কাছে কিচ্ছু না।

—হুঁ। দেবাদ্রি কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভেবে নিলেন হঠাৎ, পরক্ষণে বললেন, তা হলে তুমি কেন সে-রাতে বর্ণনার ঘরে গিয়েছিলে!

—কেন গিয়েছিলাম, স্যার! ভরদ্বাজ জিভ দিয়ে তার শুকনো, আমসি হয়ে যাওয়া ঠোঁট চাটতে শুরু করল, আসলে বর্ণনাকে একটা লিপস্টিক কিনে দিয়েছিলাম। খুব দামি লিপস্টিক, ফরাসি না জার্মান কী যেন। তাই জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলাম, লিপস্টিকটা কেমন হয়েছে?

—শুধু এই জন্যে? দেবাদ্রি বেশ কৌতুক-কৌতুক মুখে জুলজুল করে তাকালেন ভরদ্বাজের দিকে, তখন রাত কতটা ছিল, চাঁদু?

—রাত! ভরদ্বাজ ভাবার চেষ্টা করল, তার মাথার ঝাঁকড়া চুলে বারদুয়েক আঙুল ঢুকিয়ে অবিন্যস্ত চুল আরও এলোমেলো করতে করতে বলল, ঠিক মনে নেই, স্যার। দশটা সাড়ে দশটা হতে পারে।

—দশটা সাড়ে দশটা! অত রাতে তুমি তোমাদের টিমের একজন অভিনেত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলে লিপস্টিকের কথা! দেবাদ্রি সহসা তার হাঁটুতে একটা রুলের গুঁতো দিয়ে বললেন, তারপর কী দেখলে সেখানে!

—দরজাটা ভেজানো ছিল। ঠেলতেই খুলে গেল তখুনি। কিন্তু ভেতরে গিয়ে দেখি, বর্ণনা ঘরে নেই।

—ঘরে নেই! দেবাদ্রি চমকে উঠলেন হঠাৎ, ঘরে নেই তো কোথায় গেল!

—তা জানিনে, স্যার, তবে ঘরের ভেতর একটা মিউজিক অন করা ছিল।

—মিউজিক।

—হ্যাঁ, ঘুঙুরের শব্দ হচ্ছিল, নাচের মহড়ার মতো মনে হয়েছিল আমার।

—স্ট্রেঞ্জ! দেবাদ্রিকে হঠাৎ ভারি চিন্তিত মনে হয়, তখন কোথায় গিয়েছিল বর্ণনা!

—তা বলতে পারব না। হয়তো পরিচালক ডেকেছিলেন, কিংবা—

—কিংবা?

—বি. বি-র ঘরেও যেতে পারে, স্যার, সেই ট্রেনে ওঠার পর থেকেই বি. বি-র সঙ্গে যা মাখামাখি করেছিল মেয়েটা!

—বি. বি!

—বিবস্বান বসু। ফিল্মলাইনের সবাই তো ওই নামেই ডাকে ওনাকে। নিশ্চয়ই ওনার ঘরেই গিয়েছিল বর্ণনা।

—আর য়্যু সিওর?

ভরদ্বাজ হঠাৎ থমকে গেল দেবাদ্রি সান্যালের হাতে মোটা রুলটার দিকে তাকিয়ে, ঘাবড়ে গিয়ে বলল, তা বলতে পারব না, স্যার। রোজই তো সন্ধে হলেই বর্ণনা ওনার ঘরে গিয়ে খিল দিত। তাই জন্যেই তো রুমেলা রায় এত রেগে রয়েছেন।

দেবাদ্রি সান্যাল কিছুক্ষণ থম হয়ে ভাবলেন সিরিয়ালের সুদর্শন নায়কটির কথা। এখনও তাঁকে ভাল করে ইন্টারোগেটই করা হয়ে ওঠেনি দেবাদ্রির। হয়তো বিবস্বান বসুর সোস্যাল স্ট্যাটাসের কথা ভেবেই। তবু তাঁকেও এখন আর সন্দেহের বাইরে রাখা যাচ্ছে না সম্ভবত। পরক্ষণে দেবাদ্রি এও ভাবলেন, বিবস্বান বসুর পক্ষে এ-ধরনের একটা নৃশংস কাজ করা সম্ভবপরই নয়।

ভরদ্বাজ মুখার্জির কথা শুনে এবার তার দিকে চোখ সরু করে তাকালেন দেবাদ্রি, হ্যাঁ, রুমেলা রায়ের কথা কী যেন বলছিলে?

—বলছিলাম বি. বি-র কথা, স্যার। আপনি তো ওঁর পাস্ট হিস্ট্রি সব জানেন না। দশ বছর ধরে রুমেলা রায়ের সঙ্গে ওনার কী মাখামাখি! ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই সে কথা জানে। রুমেলা রায়ের জন্যেই তো. বি. বি-র স্ত্রী একবার সুইসাইড করতে গিয়েছিল!

—তাই নাকি! দেবাদ্রি সান্যাল সহসা কিসের যেন গন্ধ পেয়ে সতর্ক হলেন, কী রকম?

—গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরাতে গিয়েছিল ওনার ওয়াইফ, তাই নিয়ে কত কানাকানি, ফিসফিসানি। লোকে বলে, উনিই নাকি—

—আর য়্যু সিওর? দেবাদ্রি আবার ঝুঁকে পড়লেন ভরদ্বাজের মুখের ওপর।

ভরদ্বাজ এবার বেশ ফাঁপরে পড়ল। কারণ এ সব গল্প ফিল্ম-ইন্ডাস্ট্রিতে কানাকানি হয়, লোকে একটু রাখঢাক করে বলতেই চায় এ ধরনের স্ক্যান্ডাল। কী যে হয়েছিল সঠিক তা অনেকেই জানে না, ভরদ্বাজও নয়। ভরদ্বাজ চুপ হয়ে যেতে দেবাদ্রি এবার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে তার ওপর অন্য দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করতে চাইলেন, তুমি কি জান, তোমার কাকা, মানে ঋষভ মুখার্জিই আজ তোমাকে ধরিয়ে দিয়েছেন পুলিশের কাছে!

ভরদ্বাজের নেশা তখনও ভাল করে কাটেনি, লাল চোখ বড় বড় করে বলল, যাঃ, তা হতেই পারে না।

—ইয়েস। দেবাদ্রি মুচকি হেসে ব্যঙ্গের সুর ফোটাতে চাইলেন কণ্ঠস্বরে, আমিও তো প্রথমে বিশ্বাস করতে চাইনি। কিন্তু উনি বেশ কনফিডেন্টলি বললেন, নিশ্চয়ই কোনও বাইজির ঘরে মাল খেয়ে পড়ে আছে। তা শুনেই আমার অফিসাররা খুঁজতে খুঁজতে ঠিক জোগাড় করে ফেলেছে আসামি!

—আসামি! ভরদ্বাজের বুজে আসা চোখ আবার খুলে গেল হঠাৎ, কী বলছেন, স্যার!

—হ্যাঁ, ইউ আর দ্য রিয়্যাল কালপ্রিট, নইলে নিজের কাকা এ-ভাবে ধরিয়ে দেয় ভাইপোকে! আচ্ছা, এবার বলো তো চাঁদু, এই আংটিটা কার!

'আর' খোদাই করা আংটিটা দেবাদ্রি সহসা বার করলেন পকেট থেকে, সেটা কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ভরদ্বাজ ভুরু কুঁচকে বলল, এটা স্যার রোমিওর, এ রকমই একটা আংটি বর্ণনা আমাকে দেখিয়েছিল সে-দিন।

—আর এই যিশুর লকেট ঝোলানো সোনার চেনটা?

ভরদ্বাজের চোখ বড় বড় হয়ে গেল পরক্ষণে, ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে রইল দেবাদ্রির দিকে। দেবাদ্রি তৎক্ষণাৎ পেটে একটা গুঁতো দিতেই ভরদ্বাজ হড়হড় করে বলে ফেলল, এটা আমার

স্যার। বর্ণনা সে-দিন আমার সঙ্গে টাঙায় যেতে যেতে নিজেই আমার গলা থেকে খুলে নিয়ে পরেছিল। আমার কাছে অবশ্য আরও একটা ছিল।

—ইজ ইট! বাহ্, বাহ্, মেয়েটা বেশ ইন্টারেস্টিং ছিল তো! একজনের গলা থেকে সোনার চেন খুলে নিয়ে পরল, আর একজনের আঙুল থেকে সোনার আংটি! তা হলে বর্ণনার সঙ্গে তোমারও খুব ইন্টিমেসি ছিল, কী বলো!

—না, স্যার, ও ভীষণ চালাক মেয়ে, কার কাছ থেকে কী বাগিয়ে নেওয়া যায়, সেটা ভাল বুঝত, আমার সঙ্গে কোনও লাভ-অ্যাফেয়ার ছিল না।

—তা হলে কার সঙ্গে ছিল! রোমিওর!

—হ্যাঁ, স্যার।

—আর রানাজির সঙ্গে? রানাজির সঙ্গে কলকাতা থাকতেই নাকি একটা সম্পর্ক ছিল বর্ণনার!

ভরদ্বাজ এক মুহূর্ত থমকে চুপ করে যেতেই দেবাদ্রি আবার ধমক দিলেন, যা জানো, ভাল ছেলের মতো গড়গড় করে বলে ফেলো। নইলে তোমার কপালেই যাবজ্জীবন কারাবাস কিংবা ফাঁসির দড়ি নাচছে, চাঁদু।

ভরদ্বাজ বিস্ফারিত চোখে তাকাল দেবাদ্রির দিকে, স্যার, রানাজি লোকটা খুব গোলমেলে। ওনার পাস্ট হিস্ট্রিও একদম ভাল না। ফিল্ম-লাইনে ঘোরাঘুরি করে শুধু নতুন-নতুন মেয়েদের নিয়ে ইন্টুবিন্টু করবে বলেই—

—তাই! দেবাদ্রি চোখ সরু করলেন, তাহলে এবার বলো তো চাঁদু, বর্ণনার সঙ্গে রানাজির সম্পর্ক কীরকম ছিল!

—ঠিক বলতে পারব না, স্যার। তবে সারাক্ষণ বর্ণনার কাছে ছুঁকছুঁক করে বেড়াচ্ছিলেন ক'দিন ধরে। লখনউ আসার আগে আঙ্কেল যেই ওনাকে বলল, বর্ণনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে, পরদিন থেকেই বর্ণনার ফ্ল্যাটে একেবারে আঠার মতো সেঁটে গিয়েছিলেন।

—বাহ্, বেশ তালেবর লোক তো।

—হ্যাঁ স্যার, কোন একটা মার্কেন্টাইল অফিসে বেশ ঘ্যামা পোস্টে চাকরি করতেন। সেখান থেকে কয়েক লক্ষ টাকা ঝেড়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন ফিল্ম-লাইনে এসেছেন এইসব করবেন বলে।

—হুঁ, তারপর? দেবাদ্রি কড়া নজরে পরখ করছেন ভরদ্বাজকে। হাতের রুল উঁচানো।

—ডাক্তার খুন হয়েছে শুনে আঙ্কেল তো সিরিয়াল বন্ধ করে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। কলকাতায় ফিনান্সিয়ার পটল তুললে সিরিয়াল আর হবেই বা কী করে! তখন রানাজিই তো আঙ্কেলকে বললেন আপাতত উনিই টাকার ব্যবস্থা করবেন। সে-দিন কলকাতায় এস. টি. ডি করে কাকে যেন টাকা তুলতেও বলেছেন।

দেবাদ্রি রুদ্ধশ্বাস হয়ে বললেন, কাকে টাকা তুলতে বললেন?

—তা বলতে পারব না, স্যার। রানাজিই বলতে পারবেন সে-কথা।

—হুঁ, দেবাদ্রি একরাশ দুশ্চিন্তায় রোল খেতে খেতে রানাজি-এপিসোডটি একবার ঝালিয়ে নিলেন মগজের ভেতর, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, বর্ণনা যে-দিন খুন হয়েছিল, সে-দিন রাতে, বেশ অনেকটাই রাতে তোমার সঙ্গে রানাজির কথা কাটাকাটি হয়েছিল কেন!

ভরদ্বাজ প্রায় আকাশ থেকে পড়ে চোখ বড়-বড় করল, কথা-কাটাকাটি! রানাজির সঙ্গে? কখন?

—হোটেলের বাইরে, লনের এককোণে, অন্ধকারে, বেশ কাটাকাটা ভঙ্গিতে দেবাদ্রি কথাগুলো বললেন।

—কে বলল আপনাকে!

—রোমিও দেখেছে দোতলা থেকে।

—রোমিও! ভরদ্বাজের চোখদুটো হঠাৎ ক্রূর হয়ে উঠল, রোমিওর কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না। আপনাকে আগেই বলেছি, হি ইজ ডেঞ্জারাস। নিজে ফেঁসে গেছে বলে এখন অন্যদের ঝোলাতে চাইছে।

দেবাদ্রি আচম্বিতে ভরদ্বাজের হাঁটুতে রুল দিয়ে একটা গোঁত্তা মেরে বললেন, ঠিক করে বলো চাঁদু, কেন কথা কাটাকাটি হয়েছিল?

বেশ জোরেই লেগেছে ভরদ্বাজের, 'উফ্' বলে লাফিয়ে উঠে কিছুক্ষণ ককালো, পরক্ষণে দেবাদ্রির হাতে উঁচনো-রুলটা দেখেই তড়িঘড়ি বলে উঠল, বলছি, বলছি, উফ্, যা লেগেছে না। আপনারা, মানে এই পুলিশরা মাইরি—

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ভরদ্বাজ, দেবাদ্রির চোখমুখ দেখে থেমে গিয়ে বলল, বলছি, বলছি। আসলে অত রাতে বর্ণনার ঘরে ঢুকেছিলাম সেটা রানাজি দেখে ফেলেছিলেন। লনে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, ইউ আর গোয়িং টু ফার, ভরদ্বাজ। যদি বর্ণনাকে ফারদার টিজ করতে চেষ্টা করো তো ঋষভ মুখার্জির কানে কথাটা চলে যাবে, মাইন্ড ইট।

—অর্থাৎ, তোমাকে থ্রেট করল!

—হ্যাঁ। ভরদ্বাজ জোরে জোরে ঘাড় ঝাঁকাল।

—অর্থাৎ তুমি যে বর্ণনার ওপর ইন্টারেস্ট দেখিয়েছিলে, সেটা উনি সহ্য করতে পারছিলেন না, তাই তো।

—ঠিক ধরেছেন, স্যার।

—আচ্ছা, এবার বলো তো, রানাজির সঙ্গে সুস্নাত তালুকদারের সম্পর্ক কীরকম ছিল?

সহসা এ হেন প্রসঙ্গ পরিবর্তনে একটু থমকে গেল ভরদ্বাজ। একটু ভেবে নিয়ে বলল, ঠিক বলতে পারব না, স্যার, তবে রানাজি নাকি ইদানীং অগ্নিশিখার কাছে যাতায়াত করছিলেন শুনে ডাক্তার খুব রেগে গিয়েছিল।

দেবাদ্রি ভুরু কুঁচকে বললেন, অগ্নিশিখা আবার কে?

—ওই যে, ডাক্তারের এক ভাইপো আছে কী যেন নাম, রঙ্গন তালুকদার, তাঁর স্ত্রী।

—তাঁর নাম অগ্নিশিখা না কি!

—না, অন্য একটা কী নাম আছে, লাভ্‌লি না কী যেন। অগ্নিশিখা নামটা আমিই দিয়েছি।

দেবাদ্রি সান্যাল আশ্চর্য হয়ে বলছেন, কেন।

—সে স্যার এমন মেয়েছেলে, কাছে এলে ছ্যাঁকা লাগে।

—তাই! দেবাদ্রির ভারী ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে সেই অগ্নিশিখার কাছেও রানাজির যাতায়াত ছিল!

—সেই নিয়েই তো ডাক্তার তালুকদার খুব রেগে গিয়েছিলেন রানাজির ওপর। আঙ্কেলকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন, রানাজি যেন আর রঙ্গন তালুকদারের বাড়ি না যায়। আঙ্কেল তাই একদিন রানাজিকে ডেকে খুব বকাবকি করেছিলেন।

দেবাদ্রি হঠাৎ এ ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখালেন, তা হলে অগ্নিশিখা বেশ খুবসুরত মহিলা নিশ্চয়ই।

—দারুণ, স্যার। তবে বেশি কাছাকাছি যাওয়া যায় না। খুবসুরত, আবার খতরনাক্‌ও।

—তাই!

—হ্যাঁ, স্যার। একদম যাকে বলে আগুন, হাত বাড়ালে নির্ঘাত পুড়ে যাবে।

দেবাদ্রি হঠাৎ থমকে গিয়ে বললেন, সে-কথা তুমি কী করে জানলে! হাত বাড়াতে গিয়েছিলে নাকি কখনও?

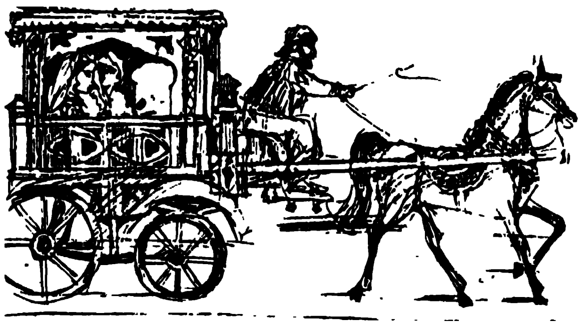
ভরদ্বাজ থতমত খেয়ে গেল এক মুহূর্ত, পরক্ষণে সামলে নিয়ে বলল, না স্যার, ডাক্তার তালুকদারের কথা ভেবেই কথাটা মনে হল আমার।

—সত্যি নাকি। কেন মনে হল কথাটা!

—মানে, এমনিই মনে হল। ডাক্তার তালুকদার এই বুড়ো বয়সে তার কাছে রোজ সন্ধের পর যেতেন আগুনের তাপ নিতে। তারপর তো পুড়ে খাক হয়ে গেলেন জন্মের মতো।

দেবাদ্রি এতক্ষণে বাঘের ক্ষিপ্রতায় ভরদ্বাজের কলার খামচে ধরে রুলটা সপাটে উঁচিয়ে ধরলেন, তুমি এ-ব্যাপারে অনেক কিছুই জান মনে হচ্ছে। স্রেফ চেপে যাচ্ছ সব। ব্যাপারটা খুলে বলো তো চাঁদু, না হলে—

রুলটা সবেগে নেমে আসার আগেই ব্যথায় ককিয়ে উঠে ভরদ্বাজ বলে ফেলল, বলছি, সব বলছি, স্যার—



দেবাদ্রি সান্যালের উঁচিয়ে রাখা রুলের আতঙ্কে ভরদ্বাজ মুখার্জি গড়গড় করে অতঃপর যে-কাহিনী শোনাল, তা এই জোড়া হত্যারহস্যের জট ছাড়াবার পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন ক্লু। বস্তুত ডঃ সুস্নাত তালুকদারের খুন হওয়ার পেছনে প্রধানত বর্ণনা সেনগুপ্তেরই ভূমিকা ছিল—এই ধারণার বশবর্তী হয়েই দেবাদ্রি কলকাতার বাকি কুশীলবদের তেমন ইন্টারোগেট না করে, বর্ণনাকে গ্রেফতার করতে লখনউ চলে আসার পর এখন মনে হচ্ছে, পটভূমিতে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ নারীর উপস্থিতিকে উপেক্ষা করা মোটেই উচিত হয়নি। সে-নারী লাভলি তালুকদার, যার সম্পর্কে ভরদ্বাজ মুখার্জির অভিমত, এই 'খতরনাক' মহিলাই ডাক্তারের হত্যারহস্যের অন্তরালে অন্যতম 'নাটের গুরু'। সিনেমুভি টিম যেদিন কলকাতা থেকে লখনউয়ের ট্রেন ধরেছিল, ঠিক তার আগের দিন সন্ধেবেলা কী কারণে যেন রানাজি সান্যাল গিয়েছিলেন লাভলি তালুকদারের কাছে। ভরদ্বাজ রানাজির খোঁজ করতে করতে, এখানে-ওখানে ঠেক খেয়ে হঠাৎ গিয়ে পৌঁছায়

লাভলির বাড়িতে। সেখানে যে-দৃশ্য তার চোখে পড়েছিল, তাতে মনে হয়েছিল দু-একদিনের মধ্যে কিছু একটা গোলমাল অবশ্যই পাকাবে ডঃ সুস্নাত তালুকদারকে ঘিরে।

দেবাদ্রি সান্যাল পুনর্বার রুল উঁচিয়ে ধরতেই ভরদ্বাজ আতঙ্কিত চোখে বলল, জানেন স্যার গিয়ে দেখি সেই অগ্নিশিখার চোখে তখন জ্বলজ্বল করছে তুষের আগুন, মুখটা লাল, নাকের পাটা ফুলছে প্রবল রাগে, রানাজিকে হিসহিস করে বলছে, এই বয়সে ঘাড়ে রোঁয়া উঠেছে বুড়োর। কী করে রোঁয়া ছেঁটে ফেলতে হয় তা লাভলি তালুকদার জানে। আমাকে এতদিন টোপ দিয়ে রেখে এখন কথার খেলাপ করলে গোটা ঘাড়টাই ছেঁটে দেব বুড়োর।

—মাই গড, দেবাদ্রি বিস্মিত হলেন, তারপর?

—রানাজি সান্যালকে খুবই হতভম্ব দেখাচ্ছিল সে সময়। আমি গিয়ে তাঁকে উদ্ধার না করলে রানাজির মুণ্ডুটাই হয়তো ছেঁটে নিত খতরনাক মেয়েছেলেটা।

—হুঁ, তারপর?

—বুঝতেই পারছেন, স্যার, খুবই ডেসপারেট। শুনেছি ও না-পারে হেন কাজ নেই।

—তাই না কি! দেবাদ্রি সান্যাল গুম হয়ে কয়েক লহমা কী যেন ভাবলেন একমনে, তুমি বলছ লাভলি তালুকদারের পক্ষে ওই মার্ডারটা করা সম্ভব?

—করলে কি আর একা করেছে! নিশ্চয়ই সাবুকে দিয়ে করিয়েছে।

দেবাদ্রি অবাক হয়ে বললেন, সাবু! সাবু আবার কে?

—সাবুকে চেনেন না, স্যার! সাবুই তো এই কেসের হিরো। সে-ই তো ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে। জল নয়, মধুই বলতে পারেন। মক্ষিরানির সঙ্গে সারাক্ষণ সেঁটে থাকে যখন—

দেবাদ্রির কাছে সমস্ত ব্যাপারটা একদম ধোঁয়াটে হয়ে গেল একমুহূর্তে। কলকাতা থেকে লখনউ পর্যন্ত ছুটে এসেছেন বর্ণনা সেনগুপ্তকে হত্যাকারী ভেবে, এখন কি না ভরদ্বাজ মুখার্জি বলছে আসল কালপ্রিট কলকাতায় পড়ে আছে! কিন্তু কে সাবু, তার নাম কেন কলকাতা থাকতে একবারও তদন্ত করার সময় পেলেন না ভেবে খুবই আশ্চর্য লাগছিল তাঁর। ভরদ্বাজ নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলে তাঁকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে এই ভেবে ঘোর উত্তেজনায় হঠাৎ একটা রুলের গুঁতো দিলেন তার পাঁজরে, সাবুটা কে তাই বল, শালা?

ভরদ্বাজের শরীরটা একটু বাঁকা হয়ে গেল ব্যথায়। ককিয়ে উঠে বলল, সবই তো বলছি, আপনি মাইরি শুধু শুধু—

দেবাদ্রি দাঁত কিড়মিড় করছেন দেখে ভরদ্বাজ পরক্ষণেই বলল, সাবুর ভাল নাম কী আমি জানিনে, স্যার। রানাজি ওই নামটাই আমাকে বলেছিলেন সেদিন। একদম সাবুর মতো ফর্সা, লালটুস চেহারা। কখনও টকটকে লালরঙের গোলগলা গেঞ্জি, কখনও ডিপ নীল বা হলুরদঙের গেঞ্জি, সেই সঙ্গে জিনসের টাইট প্যান্ট পরে, একদম হিরো সেজে সারাক্ষণ অগ্নিশিখার মাথা চিবোচ্ছে। অগ্নিশিখার স্বামী ওদিকে রাতদিন ডাক্তারি করছে, এদিকে তার খুবসুরত বউ মক্ষিরানি সেজে এইসব ইন্টুবিন্টু করে বেড়াচ্ছে। রানাজি বলছিলেন ছেলেটা বেকার, মস্তানি করে বেড়ায়, কিছু টাকাপয়সা পেলে নির্ঘাত মক্ষিরানিকে নিয়ে পালাবে।

—ইজ ইট! দেবাদ্রি ভারি চিন্তিত হয়ে উঠলেন অতঃপর। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা এপিসোড কীভাবে তাঁর নজর এড়িয়ে গেল কলকাতায়, তা কিছুতেই পরিষ্কার হল না তাঁর কাছে। রুলের গুঁতোয় ককাতে থাকা ভরদ্বাজ একদম মিথ্যে বলছে তাও আর তাঁর মনে হচ্ছে না এখন।

তৎক্ষণাৎ ভরদ্বাজকে জেরা থেকে অব্যাহতি দিয়ে কোতোয়ালির ওয়ারলেস মারফত

লালবাজারে একটা খবর পাঠালেন, অ্যারেস্ট সাবু অ্যান্ড লাভলি তালুকদার ইমিডিয়েটলি।

মেসেজটা পাঠিয়ে একটু যেন নিশ্চিন্ত হলেন দেবাদ্রি, তবু ভরদ্বাজকে কাস্টডিতে রেখে দিলেন। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটের কোনাটা কামড়ে ধরে তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি ছুড়ে দিয়ে বললেন, যদি এর একটা কথাও মিথ্যে হয়, তাহলে আজ রাতে তোমার হাড়মাস আলাদা করে দেব, বুঝলে?

কোতোয়ালিতে জেরা করার সময় প্রচুর পিটুনি খেয়েছে ভরদ্বাজ, তার হাঁটু দেবাদ্রির রুলের গুঁতোয় ফুলে গেছে, তারপরও তাকে ছেড়ে না দিয়ে হাজতে আটকে রেখেছে পুলিশ-কর্তৃপক্ষ, এ-সংবাদ পরিচালক ঋষভ মুখার্জির কানে পৌঁছতে থমথমে হয়ে উঠল তাঁর মুখ। পুলিশকে আরও একটা বাজে গালাগাল দিয়ে আবার মনঃসংযোগ করলেন তাঁর শুটিঙে।

তাঁর টিমের অন্য সদস্যদের কারও যেন আর মন বসছে না কাজে। নেহাত ঋষভ মুখার্জি একেবারে নাছোড়, লখনউয়ের শুটিং শেষ না করে কলকাতা ফিরবেনই না, বোধ হয় এমন পণ করায় চোখ লাল করে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর শাম্ব সামন্তকে বললেন, সেট রেডি করো। কুইক।

ভরদ্বাজ পুলিশের হাতে মার খেয়েছে শুনে খুবই বিপর্যস্ত বোধ করছিল গার্গীও। ঘটনাক্রম যা ঘটছে, সবই প্রতিমুহূর্তে তার কানে পৌঁছচ্ছে বলেই ব্যাপারটা আপাতত তারও শিরঃপীড়ার কারণ। সিনেমুভির সঙ্গে এত দিন তার একটা দূরত্ব ছিল, ঘটনার পরম্পরা সে লক্ষ করছিল দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে, কিন্তু গত দুদিন ধরে শুটিং শুরু হতে সেও আপাতত সিনেমুভিরই একজন, অনেকের সঙ্গেই তার টুকটাক কথা হচ্ছে, জানতে পারছে তাদের মনের কথা, অনেকেই পুলিশি আতঙ্কে এখন ত্রস্ত, বিশেষ করে ভরদ্বাজের ওপর এহেন বিশ্রী অত্যাচার তাদের অনেককেই চমকিত করেছে, আতঙ্কে কুঁকড়েও গেছে কেউ কেউ। কিন্তু ঘটনাটা নিয়ে তারা যে নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করে নেবে তারও ফুরসত পেল না, যেহেতু পরিচালক তখন শাম্ব সামন্তকে সেট সাজাতে বলে রিহার্সাল শুরু করলেন বিবস্বান বসু আর গার্গী চৌধুরিকে নিয়ে।

লখনউ শহরের মাঝখান দিয়ে কুলকুল করে বয়ে যাওয়া ছোট্ট নদী গোমতীর কিনারে যে চমৎকার দোতলা বাংলোবাড়িটিতে পুলক চৌধুরি এনে তুললেন নামী বাইজি রেশমবাইকে, তার দোতলার বারান্দাটি একেবারে গোমতীর মুখোমুখি। বারান্দাটা অর্ধবৃত্তাকার, তাতে পরিসর খুব বেশি না হলেও লাল ভেলভেটের মস্ত সুজনিটা ভরে আছে টায়েটায়ে। তাতে চমৎকার একটা পরিবেশ।

রেশমবাই একুশ-বাইশ বছরের তরুণী হলেও সে লখনউ বা তার আশপাশ শহরের অনেক রইস আদমিকেই ভাল করে চেনে। কখনও ভিনরাজ্যের খানদানি মানুষও তার গান শুনতে উজিয়ে আসে বহু পথ। তাদের মধ্যে রকমারি মানুষ দেখতে দেখতে, চিনতে চিনতে এই বয়সেই সে তুখোড় বুদ্ধিসম্পন্ন। কিন্তু পুলক চৌধুরি নামের এই কলকাত্তাইয়া পত্রকারটিকে দেখে সে এখনও বুঝতে পারছে না এই সুদর্শন, পোড়-খাওয়া সাংবাদিকটি আসলে কীরকম মানুষ। এর আগেও যে-সব রইস আদমি তার গান শুনতে তাকে নিয়ে গেছে অন্যত্র, তাদের চাউনি, কথাবার্তা, ইচ্ছে-অনিচ্ছের ব্যাপারটা সে বুঝে যেত পলকে। কিন্তু এই পত্রকার যেন ইচ্ছে করেই কিছুটা রহস্যে মুড়ে রেখেছেন নিজেকে।

দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে রেশমবাই অবশ্য কিছুটা বিস্মিত হল এই দেখে যে, বাংলোবাড়িতে ইতিমধ্যেই গানের আসরের একটা আবহ আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছেন পুলক চৌধুরি। দোতলার বারান্দায় পেতে রাখা লাল সুজনিতে যথাযথভাবে রাখা আছে

তানপুরা, সারেঙ্গি, তবলা, হারমোনিয়াম। যারা রেশমবাইয়ের সঙ্গে সঙ্গত করবেন তাঁরাও বাহারি পোশাক পরে উপস্থিত। রেশমবাই তাঁদের কাউকে কাউকে চেনেও।

প্রাথমিক আলাপচারিতা ও বিশ্রামের পর তখনও রাত্রির তৃতীয় প্রহরের দেরি আছে দেখে প্রথমে বাগেশ্রী শোনাল রেশমবাই। রাত্রি যত ঢলে পড়তে থাকে মধ্যরাতের দিকে, যতই স্তব্ধ হয়ে আসতে থাকে বিশ্বপ্রকৃতি, গানের বিস্তার যেন ততই পৌঁছে যায় অন্য এক আবেশ ছড়িয়ে। চারপাশ ক্রমশ আরও নিশুতি হয়ে আসছে তখন, গোমতীর জলের ছলছল শব্দও তখন শোনা যায় তানপুরার ধ্বনির ভেতর। কখনও নৈঃশব্দ্যের ভেতর নূপুরের ঝমর ঝমর শব্দ।

পুলক চৌধুরি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন রেশমবাইয়ের গান, আর কী যেন মনে করার চেষ্টা করছিলেন। যেন কোনও বিস্মৃত অতীত তিনি ফিরিয়ে আনতে চাইছেন চোখের পর্দার সামনে, কেন চাইছেন সে-সম্পর্কে বোধহয় নিজেই অবহিত নন। ক্রমশ রাত গাঢ় হয়ে আসতে থাকে, লখনউ শহর ক্রমে ডুবে যেতে থাকে গভীর ঘুমের অন্তরালে, বাগেশ্রী শেষ হতে সেই নিঃস্তব্ধতা তখন যেন আরও বাঙ্ময়, অর্থময়।

আবারও কিছু বিশ্রাম নিয়ে রেশমবাই শুরু করল তার নতুন মেহমানের ফরমায়েস করা যা তার নিজেরও প্রিয় সেই মালকোষ। ভৈরবীঠাটের এই খেয়ালটি গাওয়ার আগে রেশম নিজেও তাই তন্ময় হয়ে ক্রমশ সেঁধুতে লাগল নিজের গভীরে। গলায় সুর ভাঁজতে ভাঁজতে একলহমা তাকালও পুলক চৌধুরির দিকে। একচিলতে হাসিও ঢেউ খেলে গেল তার নরম পাতলা ঠোঁটদুটিতে। তারপর ধীরে, খুব ধীরে তার আরোহণের পালা, স্থায়ীতে শুরু করল, 'পগ লাগন দে মহারাজকুঁবার'।

চকিতে পুলক চৌধুরির হৃদয়ের গভীরে কোথাও একটা ধাক্কা লাগল যেন। এই মালকোষ গাওয়ার ঢং যেন তাঁর খুব পরিচিত, ঠিক এই গায়কিতে বহু বার বহু রাত তিনি শুনেছেন গানটি। কৈশোরের শেষপর্যায়ে যখন মার্গসঙ্গীতের অন্দরমহল তাঁর ভাল করে চেনা হয়নি, জানেন না এই বিশাল সাম্রাজ্যটি কতখানি বিস্তৃত, জানেন না এত এত রাগ, তার গায়কি, লয়, সুর, তাল, ঘরানার রকমফের কোন স্বর্গীয় পটভূমিতে উন্নীত করে তুলেছে শাস্ত্রীয়সঙ্গীতকে, সে সময় বহু বার, বার বার এই গানের গভীরে তাঁকে বিচরণ করতে হয়েছে রাত্রির তৃতীয় প্রহরে। হয়তো তিনি তাঁর বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছেন তখন, রাত গভীর হয়ে চরাচরে বিরাজ করছে এক অসীম, অনন্ত শূন্যতা, সে সময় হঠাৎই ঘুম ভেঙে শুনতে পেয়েছেন পাশের ঘরে তাঁর বাবা রেওয়াজে বসেছেন, ভেসে আসছে তানপুরার একটানা সম্মোহনী সুর, সেইসঙ্গে সুরের বিস্তার। সে-সুর পুলককে নিয়ে যেত সম্পূর্ণ এক ভিন্ন অনুভূতির গভীরে, সেই অনুভূতির সঙ্গে গানের হয়তো কোনও যোগাযোগ নেই, সমস্ত ভাবনাটাই তাঁর একান্ত নিজস্ব, কৈশোর শেষ হয়ে যৌবনে পা দেওয়ার আগে সব অপাপবিদ্ধ কিশোরেরই যেমন একটা পাপ-পরিবৃত পরিমণ্ডল তৈরি হয়ে যায় মনের ভেতর, তেমনই একটা আশ্চর্য, অদ্ভুত বিজাতীয় অনুভূতি তাঁর রক্তের ভেতর খেলা করে যেত গানটির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে।

কিশোর পুলক তখন তার একলা-বিছানায় ক্রমশ সম্মোহিত হচ্ছে মায়াবী সুরের গভীরে। রাত্রির তৃতীয় যামে তখন নিশুতি আরও শূন্যতায় অন্তরিণ, কেউ কোথাও নেই, সেই অপাপবিদ্ধ কিশোর তখন একা-একা হেঁটে চলেছে গহন গভীর কোনও জঙ্গলের ভেতর। চারপাশে অজস্র আনকা গাছপালা, নিশুতিতে সেই অজস্র গাছগাছালি, পাতালতার ভেতর শূন্যতা ছাড়া আর কিচ্ছুটি নেই, শুধু একটা খাঁড়িনদী সেঁধিয়ে গেছে জঙ্গলের নিঃসাড় গভীরে, সেই খাঁড়িনদী

ভেঙে তখন জল নামছে একটানা, খাঁড়ি থেকে জল ভাঙার একটা আশ্চর্য শব্দ ভেসে আসছে। অসীম শূন্যতায় দাঁড়িয়ে সেই জলের শব্দ কেমন যেন উদাসীন করে ফেলে যে-কোনও একা-হয়ে-যাওয়া মানুষকে, সেই শব্দের ভেতর লীন হয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সুরের দমক বদলে গেল গায়কের কণ্ঠে, আর সেই কিশোর তখনই দেখতে পায় বন্য পাতালতার দুরূহ জাল থেকে ছোট্ট শিং বাঁচাতে বাঁচাতে সেই খাঁড়িনদীর কিনারে এসে দাঁড়াল একটা নিরীহ, নিষ্পাপ হরিণ। তার কচি ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কী যেন নিঃসাড়ে দেখল এ দিক-ও দিক, তারপর খাঁড়ির জলের দিকে মুখ নামিয়ে নিজের মুখচ্ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ ডেকে উঠল, টু-উ-উ টু-উ-উ—

অমনি সমস্ত জঙ্গলের নৈঃশব্দ্য ভেদ করে কী এক চমৎকার উল্লাসধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল চরাচরে, বিশ্বপ্রকৃতিতে, দিক থেকে অন্য দিগন্তরে। কেঁপে উঠল এতক্ষণ মূক হয়ে থাকা গাছে গাছে অজস্র পাতার সম্ভার। বন্য লতারা যেন আরও নিবিড় আকুতিতে জড়িয়ে ধরল ডাঁটো বৃক্ষটির কাণ্ডের পৌরুষ। সে-কিশোর তখন বিস্ময়ে হাঁ করে দেখছে ছোট্ট হরিণটির ছটফটে নড়াচড়া, এ-দিক ও-দিক দেখে সে একবার 'টু-উ-উ টু-উ-উ' শব্দে উল্লাস প্রকাশ করে, পরক্ষণেই খাঁড়ির জলে মুখ ডুবিয়ে তার কয়েক লহমা জলপান, তারপর আবার টু-উ-উ—

খাঁড়ির জলের একটানা ঝরে পড়ার শব্দ, একটা রাতচরা পাখির সহসা নৈঃশব্দ্য ভেঙে চিৎকার, সেই সঙ্গে হরিণের মুগ্ধ হয়ে ডেকে ওঠা, পরক্ষণেই তার জলপানের অদ্ভুত আওয়াজ, সব মিলিয়ে যেন একটা ধীর লয়ের সুরধ্বনি ক্রমশ গভীর থেকে গভীরে সেঁধিয়ে যাচ্ছিল সেই কিশোরের সমস্ত চেতনা, অস্তিত্ব, অনুভূতির প্রতিটি স্তরের ভেতর।

এমন কতক্ষণ সেই অনুভূতির বিস্তারের মধ্যে সে-কিশোর বাস করছিল তা মনে নেই, ততক্ষণে অন্তরায় প্রবেশ করেছে সে গান, 'সদারঁগীলী পীত মুনে পাবন দে', বিলম্বিত থেকে দ্রুত লয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে সুর, তৎক্ষণাৎ সেই নিশুত জঙ্গলের পটভূমিকায় আবির্ভূত হল আর এক প্রাণের অস্তিত্ব, তার কালো ডোরাকাটা হলুদ শরীর তখন অস্থির হয়ে টুঁড়ে ফেলছে অসাড় জঙ্গল। সে এক কামুক বাঘিনী, তখন বন্য লতাপাতার ঘন আবরণ সরাতে সরাতে খুঁড়ে বেড়াচ্ছে তার দোসর একটি বাঘ। তার পায়ের দাপানিতে তখন থেঁতলে যাচ্ছে নিরীহ ঘাস, ছোট্ট ঝোপঝাড়, হলকলমির ঝোপ, নধর বাঁশঝাড়ও দু' পাশে গা এলিয়ে জায়গা করে দিচ্ছে উন্মত্ত বাঘিনীকে। দ্রুত লয়ের সুর তখন সেই বাঘিনীর শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঢেউ তুলছে রাজকীয় ভঙ্গিতে, বাঘিনী তখন প্রবল অস্থিরতায় ছুটতে শুরু করেছে একটু একটু করে, তার পায়ের শব্দে দ্রুত সরে যাচ্ছে বনমোরগ, বেজি ও গোসাপ, ঝটপট শব্দে উড়ে যাচ্ছে ডাহুক, কোকিল আর ছাতারে, একটা বন্যাশুয়োরও পথ ছেড়ে দিল তার। কিন্তু যতই সময় যাচ্ছে, ততই আরও ঘোর উন্মত্ত হয়ে উঠছে সেই বিশাল চেহারার বাঘিনী, যেন ক্যামেরায় তোলা স্লো স্পিডে তার ছন্দোময় ছুটে চলার ভঙ্গি তখন একটা আশ্চর্য সুরে আছড়ে পড়ছে সে-কিশোরের রক্তের ভেতর, সে অবাক হয়ে দেখছে, দেখেই চলেছে অসম্ভব ছন্দ তুলে বড় বড় লাফে এগিয়ে যেতে থাকা সেই রাজকীয় ভঙ্গিটি। সুরের গমকে এক-একটা ঢেউ তখন চলকে উঠছে তার দীর্ঘ শরীরে, সে-ঢেউ আবার ছন্দ হয়ে পিছলে যাচ্ছে কালো-হলুদ লোমশ শরীর থেকে, সেই ছন্দ পরক্ষণে ঘুরেফিরে ছড়িয়ে যাচ্ছে চরাচরে, চারপাশের দিগন্ত-ছোঁয়া আশ্চর্য পৃথিবীতে।

কিশোর পুলক তখন সেই ছন্দের জাদুতে ওতপ্রোত হয়ে চরাচরে ঘটতে দেখছে এক নীল স্বপ্নের বিস্তারভঙ্গি, সুরের মায়াজালে চাপুড়চুপুড় হয়ে উপলব্ধি করছে বোধহয় এই মুহূর্তে কিছু একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে যাবে প্রেক্ষাপটে।

ভাবতে না ভাবতে উন্মত্ত বাঘিনী এসে আবির্ভূত হল সেই খাঁড়িনদীর পটভূমিকায়, যেখানে নিরীহ, শান্ত হরিণ তখন শিস দিয়ে ডাকতে ডাকতে জলপানে একান্ত বিভোর। আশেপাশে কী ঘটে চলেছে, কিংবা কীই বা ঘটতে চলেছে তা যেন একটুও তার অনুভূতিতে নেই, খাঁড়িনদীর জল-ভাঙা শুনতে শুনতে সে কেবলই মিটিয়ে নিচ্ছে তার আকণ্ঠ তৃষ্ণা।

তৃষ্ণা তো সমস্ত শরীর জুড়ে সেই বাঘিনীরও, সারারাত জঙ্গল ঢুঁড়ে সে খুঁজে পায়নি তার দোসর—দামাল চেহারার তার বাঘটিকে কত দীর্ঘ জঙ্গুলে-পথ সে এতক্ষণ পাড়ি দিয়ে এসেছে তার সঙ্গীর খোঁজে, সঙ্গীর অদর্শনে ক্রমাগত উসিয়ে উঠছে তার কাম-পিপাসিত দীর্ঘ শরীর। সেইমুহূর্তে বাঘিনীর সামনে দৃশ্যমান হল অবোধ হরিণের সম্বিতবিহীন কচি পেলব শরীর, খাঁড়িনদীর জলে মুখ ডুবিয়ে সে চুকচুক চুকচুক শব্দে একমনে পান করে চলছে বহমান স্বচ্ছ স্রোতোধারা, সেই জল আকণ্ঠ পান করে যে-মুহূর্তে সে অন্তঃসলিলা উল্লাসে ঘাড় উঁচু করে আর একবার চরাচরে ছড়িয়ে দিতে যাবে তার তীব্র উল্লাসধ্বনি, হঠাৎই অনুভব করল তার পেছনে অনুসরণ করে আসছে কোনও ভয়াল বিজাতীয় শব্দ। কিন্তু সে আর ঘাড় ঘোরানোর কোনও সময়ই পেল না, পরক্ষণেই দুরন্ত নিশুতির ভেতর মট করে তার কচি ঘাড় ভাঙার একটা ছোট্ট শব্দ, পরক্ষণে—

খাঁড়িনদীর স্রোতোধারা একলহমায় লালে লাল, তীব্র রক্তধারা তখন ভরে যাচ্ছে নদীর দ্রুত গতিসম্পন্ন বহমান স্রোতে, রক্তবর্ণ চুঁয়োনো রেখা ভাসতে ভাসতে, ভাসতে ভাসতে কত দূর যে বয়ে গেল, বয়ে যেতে যেতে এক সময় মিলিয়েও গেল অগভীর জলের তলায়, তা আর দেখতেই পেল না সে-কিশোর।

ততক্ষণে গান শেষ করে এক অদ্ভুত আবেশে চুপ করে আছে রূপসী রেশমবাই, তার গলায় তখন আর সুরের রেশ নেই, সে-রেশ তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে বাংলোবাড়ির আবহে। পেছনে সারেঙ্গিও একসময় থেমে গেছে, তবলার শব্দও আর নেই, গান থেমে যাওয়ার পরের কয়েক মুহূর্ত যেমন বিরাজ করে শুধু সম্মোহন, গোটা পরিবেশটাই তেমনই কী এক ঐন্দ্রজালিক উচাটনে থরথর।

সেই আবিষ্ট ভঙ্গিতে তখন রেশমবাই তাকিয়ে আছে তার সামনেই উপবিষ্ট তার গানের একমাত্র শ্রোতা পুলক চৌধুরির দিকে, বোধহয় অপেক্ষা করছে শ্রোতার তরফ থেকে বাহবা ধ্বনি, যেমন সে প্রতি রাতেই তার মুজরোর শেষে পেয়ে থাকে রইস আদমিদের কাছ থেকে। কিন্তু পুলক তখনও আনমনে কী যেন ভাবছেন, ভেবেই চলেছেন ভুরুতে ভাঁজ ফেলে। সত্যিই আশ্চর্য লাগছে রেশমবাইয়ের। এই কলকাত্তাইয়া পত্রকারটিকে সে যত দেখছে, ততই অবাক হচ্ছে, কেন না গোমতী-তীরবর্তী এই বাংলোবাড়িতে প্রবেশ করার পূর্ব মুহূর্তেও তার ধারণা ছিল, হয়তো তাকে আজ একাই, শুধু তানপুরা বাজিয়ে গান শোনাতে হবে এহেন খানদানি মেহমানকে, কিন্তু উপস্থিত হয়ে বুঝেছিল, পুলক চৌধুরি আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছেন যথাযথ বাদ্যযন্ত্র। গানের যে-দুটি প্রধান অঙ্গ, সুর আর লয়, তার জন্য সারেঙ্গি ও তবলার আয়োজন করতেও ভোলেননি। দেখে ভারি খুশি হয়েছিল রেশম।

গান শেষ হতেই ততক্ষণে তার বাজনদারেরা একে-একে বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন বাইরে। টাঙাওয়ালাদের বোধহয় আগে থেকেই হুকুম দেওয়া ছিল সেই মতো। তখনও কিন্তু রাত্রি শেষ হয়নি, অন্ধকার তখনও তার পাখনা ছড়িয়ে বিছিয়ে বসে আছে সমস্ত চরাচর জুড়ে, সেহেন আঁধার মুহূর্তে সহসা যেন উপলব্ধি করল রেশম, বাংলোবাড়িটিতে এখন সে আর পুলক

চৌধুরি ছাড়া আর কেউই নেই। তুখোড় বুদ্ধিমতী, বহু পুরুষকে সঙ্গ-দেওয়া লখনউয়ের ওজনদার বাইজি রেশম জানে, কলকাতার পত্রকার এ বার তার কাছে কী চাইবে।

এক বুক কাঁপ নিয়ে হঠাৎ কেন যেন থরথর করে কাঁপতে লাগল রেশমবাই, আর অপেক্ষা করতে লাগল এক অজানা শিহরন তার শরীরে মেখে।



বাংলো-বাড়িটার লাল সুজনিতে ঢাকা দোতলার বারান্দায় দুই ভিন রাজ্যের প্রতিনিধি তখন মুখোমুখি, মাত্র কয়েকদিন পরিচয় হয়েছে দু'জনের, তাতে অপরিচয়ের ব্যবধান তখনও সম্পূর্ণ কাটেনি, চারপাশের গাঢ় নিশুতিতে ডুবে থাকা পৃথিবীতে এহেন শেষ রাতে দু'জনেই তাই দোদুল্যমান। একবুক কাঁপ নিয়ে রেশমবাই তখনও অপলক তাকিয়ে আছে কলকাতার সুদর্শন পত্রকার পুলক চৌধুরির দিকে। মাথার ওপরে একটা ছোট্ট জিরো-পাওয়ারের নীল আলো, তাতে গোটা বারান্দায় একটা স্বপ্ন-স্বপ্ন পরিবেশ।

পুলক চৌধুরির চোখ দুটো তখন আবিষ্ট। রেশমবাইয়ের সুরের মায়াজাল বোধহয় আচ্ছন্ন করে রেখেছে তখনও, কিছুক্ষণ পর সম্বিত ভেঙে বললেন, এ গান তুমি কার কাছে শিখেছ, রেশম!

রেশমবাই অবাক হচ্ছিল, তবু হাসি-হাসি মুখে বলল, এ-প্রশ্ন তুমি আমাকে আরও একবার জিজ্ঞাসা করেছিলে, বাবুজি। প্রত্যেক ক্ল্যাসিকাল-গাইয়ে এক বা একাধিক গুরুর কাছ থেকেই গান শেখে। সেভাবেই আমারও গান শেখা—

পুলক তাতে সন্তুষ্ট হলেন না, আরও জিজ্ঞাসা করলেন, কী নাম তোমার গুরুর?

রেশমবাই হেসে আগের দিনেরই মতো উত্তর দিল, সে কথা জেনে তোমার কী লাভ, বাবুজি। কিন্তু আমার গান কেমন লাগল তা কিন্তু এখনও বলোনি!

পুলক চৌধুরি সামান্য হাসলেন, যে-জন্যে তোমাকে এই বাংলো-বাড়িতে নিয়ে এলাম, তোমার গান একা, এই নিভৃতে উপভোগ করব বলে, আমার সেই অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে। এই গান আমার অল্প বয়সে বহুবার শোনা, তোমার গলায় সেই একই ঘরানার গান শুনতে-বার বার ফিরে আসছিল আমার কৈশোরের সেই অনুভূতির টুকরোগুলো।

রেশমবাই ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, কলকাতার সাংবাদিক ঠিক কী বলতে চায়। পুলক আবারও বললেন, সেই বয়সেই বাবার গলায় শোনা মালকোষ আমাকে প্রায় সম্মোহিত করে ফেলল। বেশ কয়েকদিন মধ্যরাতের মালকোষ শুনতে শুনতে একদিন হঠাৎ বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ গানের মানে কী! কেনই বা গভীর রাতে এ গান প্রায়ই আপনি গেয়ে

থাকেন!' গান শেখার ব্যাপারে আমার সে-বয়সে প্রথমদিকে খুবই অনীহা থাকায় বাবা কিছুটা বিরক্ত ছিলেন আমার ওপর। তাঁর অনেক ছাত্রছাত্রী ছিল যারা নিয়মিত গান শিখতে আসত তাঁর কাছে। তাদের নিয়েই দিনের অনেকখানি সময় কাটত তাঁর। আমার অনীহা থাকায় সেভাবে আমাকে গান শেখানোর চেষ্টা করেননি কখনও। আমার কথা শুনে বললেন, 'এ গান আমি প্রতি রাতে ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করি। মধ্যরাতে ঈশ্বর জেগে থাকেন, একটু বেশিই জেগে থাকেন বোধহয়, সেসময় এই গানের ভেতর ডুবে থেকে আমি ঈশ্বরের কাছাকাছি পৌঁছবার চেষ্টা করি। গানের বিস্তার যত এগোতে থাকে, মনে হয় ঈশ্বর ধীরপায়ে নেমে এসে অপলক তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমি যেন প্রতি মুহূর্তেই সান্নিধ্য অনুভব করছি সেই মহান শক্তির। বাবার ব্যাখ্যা শুনে আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম। কয়েকদিন পর তাঁর এক ছাত্রকেও এ গান শেখানো শুরু করেছিলেন। আমার কাছাকাছি বয়সের সেই ছাত্রকেও একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'মালকোষ গাইবার সময় তোমার মনে কী অনুভূতি হয়?' সে কিন্তু আর একটু অন্যরকম উত্তর দিল। বলল, 'শেষ রাতে টাইগার হিল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল ক'বছর আগে। এ গান গাওয়ার সময় প্রতি মুহূর্তে সেই অভিজ্ঞতার রেশ যেন ঘুরেফিরে আসে আমার ভেতর। সে এক অদ্ভুত ইথারিয়েল অনুভূতি।' তার কথা শুনেও ভারি অবাক লাগল আমার। মনে হল, আমার কল্পনার জগৎটা কি তাহলে একেবারেই অন্যরকম!

রেশমবাই খুবই কৌতূহলী হচ্ছিল পুলক চৌধুরির এহেন গানের বিশ্লেষণে। পুলক থামতেই এবার আস্তে আস্তে বলল, আর এত দিন পর আমার গান শুনে তোমার মনে কী অনুভূতি হল, বাবুজি?

পুলক নিজের ভেতরেই ডুবে ছিলেন। সম্মোহন ভেঙে বললেন, মনে হল, এক বিস্মৃত অতীত যেন হুড়মুড় করে ফিরে এল চোখের সামনে। একটা কালো পর্দা ফুঁড়ে বহুবছর আগের দৃশ্যপট সিনেমার রিলের মতো পার হয়ে গেল একটু একটু করে। দু-দশকেরও বেশি আগে সেই গান আবারও শুনেছিলাম বাবার এক ছাত্রীর গলায়। তখন তোমারই মতো বয়স ছিল তার। সেও আর এক আশ্চর্য অনুভূতি। তোমার গলায় গান শুনতে শুনতে প্রথম থেকেই আমার মনে হয়েছিল, তুমি নিশ্চয়ই বাঙালি, নইলে সেই একই ঘরানার গান কীভাবে বর্তালো তোমার গলায়!

—বংগালি। রেশমবাই আশ্চর্য হয়ে বলল, বংগলি হোনে সে কেয়া ফায়দা, বাবুজি?

পুলক অন্যমনস্কের মতো ঘাড় নাড়তে লাগলেন সামনের গোমতী নদীর দিকে তাকিয়ে। তিনি এর উত্তর জানেন না।

ততক্ষণে রাতের আঁধার কেটে গিয়ে আস্তে আস্তে ফর্সা হয়ে আসছে চারপাশের পৃথিবী। এতক্ষণে গোমতীর জলের ছলছল শব্দটাই শুধু শোনা যাচ্ছিল ঘন অন্ধকারের ভেতর, এখন তার উচ্ছ্বসিত, বয়ে যাওয়া শরীরটাও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ। মনে হচ্ছে কালো জলের রেখাগুলো হেসে ঢলে পড়তে চাইছে একে অপরের গায়ে।

রোমিওর ক্যামেরা কিছুক্ষণ পুলক আর রেশমবাইয়ের মুখোমুখি তাকিয়ে থাকার দৃশ্যটি ফ্রিজ করে ধরে রাখার পর ঋষভ মুখার্জি স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললেন, কাট্।

স্বস্তি অনুভব করছিল গার্গীও, কেননা যে-কটি দৃশ্যে এর আগে সে অভিনয় করেছে, তার মধ্যে আজকের দৃশ্যটিই সম্ভবত কঠিনতম। দৃশ্যটি ক্ল্যাসিকাল গানের, সেটাও সাজানো হয়েছিল চমৎকার পেশাদারিত্বে, কিন্তু গার্গী মার্গসংগীত জানে না যে, টেপ-রেকর্ডারে চালানো ক্যাসেটের চমৎকার মালকোষটির সঙ্গে লিপ মেলাবে! তেমন পাকা অভিনেত্রীও সে নয় যে ম্যানেজ করবে

হাবেভাবে। তবে ঋষভের দক্ষ নির্দেশনা, সেইসঙ্গে রোমিওর ক্যামেরার কারুকাজে অনেকখানি চলনসই হয়েছে তার গানের দৃশ্য। ঋষভ অবশ্য বললেন, দরকার হলে গার্গীকে ভাল করে রিহার্সাল দিইয়ে কিছু ক্লোজ-শট নেবেন কলকাতার স্টুডিওতে। শুটিংঙে কিছুক্ষণ ফুরসত পেতেই গার্গী বারান্দা থেকে চলে এল ঘরের ভেতর।

পরবর্তী দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত হতে হতে ঋষভ তখন রানাজিকে জিজ্ঞাসা করছেন খুবই বিরক্ত ভঙ্গিতে, ভরদ্বাজকে ছেড়েছে কোতোয়ালি থেকে?

রানাজি চিন্তিত মুখে ঘাড় নাড়তেই আরও বিরক্ত হয়ে ঋষভ বললেন, ভরদ্বাজকে ছাড়তে বলো, নইলে কলকাতায় সিপি-কে ফোন করব। পুলিশ কমিশনারকে দিয়ে ধাতানি না দিলে ইনস্পেক্টরটার কাণ্ডজ্ঞান হবে না মনে হচ্ছে।

বোঝাই যাচ্ছে, খুবই টেন্স্ হয়ে আছেন ঋষভ মুখার্জি। আজ একটু আগেই কাকে যেন বলছিলেন, 'মাথাটা ঝিমঝিম করছে।' তাতে অবশ্য সিগারেট খাওয়ার বিরাম নেই, একের পর এক সিগারেট ধরিয়েই যাচ্ছেন, কিন্তু কোন সিগারেটই শেষ টান পর্যন্ত নিজের প্রাণ দান করার সুযোগ পায় না। কখনও দু-তিন টান, কখনও চার-পাঁচ টান পর্যন্ত দিয়ে সেটি সামনে কোথাও মনুমেন্টের মতো দাঁড় করিয়ে রাখেন, অগ্নিমুণ্ডটি ছাদের দিকে তাকিয়ে জ্বলতে জ্বলতে একসময় তার মালিকের মনোযোগের অভাবে নিভে যায়। ততক্ষণে ঋষভ হয়তো দেওয়ালে টাঙানো স্ক্রিপ্টের পৃষ্ঠা উল্টে উল্টে পরবর্তী দৃশ্যের পটভূমি কিংবা সংলাপ পড়ছেন, বিড়বিড় করতে করতে ভাসা-ভাসা চাউনি মেলে ভাবছেন কীভাবে সাজাবেন পরবর্তী সেট, ক্যামেরাটাই বা বসাবেন কোথায়, কোথায় দাঁড়াতে বা বসতে বলবেন কুশীলবদের। এত সব ভাবতে ভাবতে তাঁর সিগারেটগুলি তখন অগ্ন্যুৎপাত শেষ করে ছাইমুণ্ড হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একা, হতভম্ব। এর মধ্যেই গোটা পাঁচেক এহেন মনুমেন্ট।

বারান্দা-সংলগ্ন ঘরটিতে তখন ঋষভ ছাড়াও তাঁর পাশে মনিটরের সামনে দ্বিত্বম রায় চুপচাপ বসে। মনিটরে তখন আগের দৃশ্যটা অভিনীত হয়ে চলেছে, সেদিকে কিছুক্ষণ চোখ রাখল গার্গী। স্ক্রিনে নিজের ছবি দেখতে দেখতে হাসল মনে মনে। একবার তাকালও ভাবলেশহীন দ্বিত্বমের দিকে। এই সাউন্ড-রেকর্ডিস্ট যুবকটি খুবই ইন্ট্রোভার্ট। সিনেমুভির প্রায় সবার সঙ্গে গার্গী টুকটাক পরিচয় করে নিয়েছে ইতিমধ্যে। সবার সঙ্গেই যে অন্তরঙ্গ হতে পারছে তাও নয়, কিন্তু দ্বিতম রায় একবারেই তার কাছে ঘেঁষছে না, তার সঙ্গে দু-একবার চোখাচোখি হয়েছে এইমাত্র। তাকে কোনও সুযোগে ভাল করে বাজিয়ে দেখতে হবে এমন ভাবতে ভাবতে সে-ঘর থেকে পাশের আর একটা ঘরে গিয়ে দেখল, রোমিও কখন যেন ক্যামেরা ছেড়ে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে জানলার সামনে। খুবই অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে তাকে, একটা চিন্তার ভাঁজও তার সমস্ত মুখমণ্ডলে। তাকে একটু সহজ করে তোলার জন্যই গার্গী হাসতে চাইল, গানের সেটটা কিন্তু ভালই এসেছে ক্যামেরায়।

রোমিও তার সম্বিত ভেঙে একটু হাসল, কিছু বলল না।

গার্গী ভাল করে পরখ করল রোমিওর মুখ, পরক্ষণে বলল, খুব টেনশনে আছেন মনে হচ্ছে?

রোমিও বিষণ্ণ চোখমুখ করে এবার বলল, আপনি কিছু শুনেছেন, পুলিশ নাকি আমাকে অ্যারেস্ট করবে বলেছে?

গার্গী হেসে হালকা করতে চাইল, এত ভয় পাচ্ছেন কেন তাতে? আপনি যদি খুন না করে থাকেন—

রোমিও অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করতে থাকে, আসলে ভরদ্বাজকে নাকি খুব মেরেছে, তাইই—

গার্গী রোমিওকে আরও একটু স্টাডি করতে চাইল, আচ্ছা, আপনি কি জানেন, সজনীবাবুর সে-হাতুড়িটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, পরে পুলিশ উদ্ধার করেছে হোটেল ইনের পেছনের দিককার লনে ঘাসের ভেতর থেকে, সেটা আসলে কে নিয়েছিল সজনীবাবুর কাছ থেকে?

রোমিও চমকে উঠে বলল, আমি নিইনি—

—হাতুড়িটা নাকি পাঠানো হয়েছে ফরেনসিকে। হাতুড়িতে কার হাতের ছাপ আছে সেটা জানা গেলে হয়তো জানা যাবে বর্ণনাকে কে খুন করেছিল।

রোমিওর মুখটা সাদা হয়ে গেল, তাই নাকি?

—হ্যাঁ, সেটা হয়তো কাল সকালের মধ্যেই জানা যাবে। দেবাদ্রি সান্যাল সেরকমই বলছিলেন আমাকে।

রোমিও হঠাৎ ভীষণ ভয় পেয়ে বলল, বিশ্বাস করুন, আমি একবার হাতুড়িটা নিয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু আমি বর্ণনাকে খুন করিনি।

—নিয়েছিলেন! গার্গী রোমিওর চোখের ভেতর চোখ চালালো, তা এতক্ষণ তো বলেননি সেটা।

—কিন্তু আমি পরক্ষণে ফেরত দিয়ে দিয়েছিলাম সজনীবাবুকে।

—কেন নিয়েছিলেন হাতুড়িটা!

রোমিও ইতস্তত করে বলল, ক্যামেরার স্ট্যান্ডটা হঠাৎ আমার হাত লেগে উল্টে পড়ে গিয়েছিল, তাতে ক্যামেরা-লাগানোর জায়গাটা সামান্য বেঁকে যায়। সেটা মেরামত করার জন্যই—

গার্গী হঠাৎ খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল, তাহলে তো খুব ঝামেলায় ফেললেন। এদিকে আপনার আংটি পাওয়া গেল বর্ণনার আঙুলে, আবার বর্ণনা যে-রাতে খুন হয় সে-রাতে কেউ কেউ আপনাকে অনেক রাত পর্যন্ত হোটেলের বারান্দায়, বর্ণনার ঘরের সামনেও ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে। এখন আবার বলছেন, হাতুড়িটা আপনিই নিয়েছিলেন সেদিন!

রোমিও খুব উদাসীন হয়ে বলল, বর্ণনার কাছে যে-আংটিটা পাওয়া গেছে, সেটা আমার নয়।

গার্গী ভুরু কুঁচকে বলল, তাহলে ওটা কার আংটি। আপনার আংটিটাই বা কোথায় গেল!

রোমিও গার্গীর প্রশ্নের ধরনে হকচকিয়ে গিয়ে বলল, আপনিও কি আমাকে সন্দেহ করছেন!

সেইমুহূর্তে ঘরের মধ্যে হঠাৎ সজনী দত্তের প্রবেশ, তাঁর হাতের ঝুড়িতে একরাশ খাবারের প্যাকেট, হাঁস-ফাঁস করতে করতে তারই দুটো প্যাকেট রোমিও আর গার্গীর হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে হাসলেন, এ-ঘরে দু'জন, ও-ঘরে একজন, বারান্দায় দুজন, নীচে তিনজন। ঘুরে-ঘুরে খাবার দিতে দিতে জান কয়লা হয়ে গেল।

রোমিও সে-সব কথায় কান না দিয়ে আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা সজনীদা, সেদিন ক্যামেরা ঠিক করে আপনাকে হাতুড়িটা ফেরত দিয়েছিলাম না?

—হাতুড়ি! সজনী দত্ত মুখ ব্যাজার করে বললেন, কী জানি বাপু, কে কখন কী চেয়ে নিচ্ছে, কখন ফেরত দিচ্ছে তা তো কড়াক্রান্তি মনে রাখা যায় না। এবার একটা ডায়েরি জোগাড় করে তাতে টাইম দিয়ে দিয়ে লিখে রাখব। নইলে শেষে আমার হাতেই হাতকড়া পড়বে দেখছি।

সজনী দত্ত বেরিয়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল রোমিও। তাকে আশ্বস্ত করতেই গার্গী হেসে বলল, ইফ ইউ আর নট দ্য মার্ডারার, তাহলে অত ঘাবড়াবার কিছু নেই। ট্রুথ উইল কাম আউট ইন ডিউ কোর্স। তাছাড়া, দু-একদিনের মধ্যে আরও অনেক কিছুই ঘটবে বলে আমার ধারণা।...

বিস্মিত রোমিও গার্গীর দিকে তাকাতে তাকাতে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কেননা ওদিকে পরবর্তী দৃশ্যের শুটিং হয়তো শুরু হবে একটু পরেই। সবাইকে চোখের সামনে দেখতে না পেলে আবার ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়বেন ঋষভ মুখার্জি। গার্গীও বাইরে এসে দেখল, ভেতরে একটা ঘরে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন অস্থিরমতি পরিচালক, দেখে একটু অবাকই হল, কারণ ঋষভের বিশ্রাম নেওয়াটা একেবারেই ধাতে নেই।

রানাজি অবশ্য গার্গীকে আস্তে আস্তে বললেন, প্রেশারটা বোধহয় বেড়েছে ওঁর। ডাক্তার বলেছেন আধঘণ্টা বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

অর্থাৎ আরও আধঘণ্টা ফুরসত এই সুযোগে মিলে গেল সিনেমুভির সদস্যদের। ততক্ষণে সবারই হাতে-হাতে প্যাকেট। ফলে একটু রিল্যাক্সড মেজাজই প্যাকেটের বিরিয়ানি ওড়াচ্ছে সবাই। বিরিয়ানির চমৎকার ঘ্রাণ তখন বাতাসে সুবাস ছড়িয়ে এতক্ষণের টেনস, দমবন্ধ আবহ একটু সহজ করে দিতে চাইছে। একেই তো পুলিশ-আতঙ্ক, তার ওপর পরিচালকের কড়া শাসন, তাঁর ব্যস্ততা, একনাগাড়ে শুটিং, সব মিলিয়ে সিনেমুভির প্রাণান্ত অবস্থা।

গার্গী ঘুরে-ঘুরে গোটা বাড়িটার ব্যস্ততা দেখে বুঝতে চাইছে, দেবাদ্রি সান্যালের জেরা কতটা আতঙ্কিত করে রেখেছে সিনেমুভি টিমটাকে। দোতলার বারান্দায় শাম্ব সামন্ত কিছুটা অদলবদল করছেন সেটটিতে। সজনী দত্ত একের পর এক খাবারের প্যাকেট সার্ভ করে চলেছেন, তার মধ্যেই দ্বিত্বম রায় এসে তাঁর কাছে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার চাইল, লাইটবয় ভনা এসে বলল কয়েকটা জেম্‌সক্লিপ চাইছেন পরিচালক। সজনী দত্ত তাঁর কাঁধের পেটমোটা ব্যাগ থেকে সব অনায়াসে জুগিয়ে যাচ্ছেন বিরক্তি প্রকাশ না করেই। সে সময় মাচানবাবু বিবস্বান বসুর মেক-আপ ঠিক করছিলেন একটা কোণের ঘরে, ঘরটা বেশ বড়ই, গার্গীকে কাছাকাছি দেখেই বললেন, এ দিকে আসুন তো, আপনার মেক-আপটা ধেবড়ে গেছে, ঠিক করে দি—

বারবার মেক-আপ ঠিক করে দেওয়াটা মাচানবাবুর বোধহয় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রতিটি দৃশ্য টেক হওয়ার পর-পরই একবার করে মুখে রঙের প্রলেপ না বুলিয়ে দিলে বোধহয় তাঁর স্বস্তি হয় না। গার্গী আবার মোটেই সাজে না, তার পক্ষে এতবার আয়নার সামনে বসে রং মাখা ভারি অস্বস্তিকর। কিন্তু সে তো শুটিং করেনি কখনও, রুপোলি জগৎটার এত খুঁটিনাটি জানবেই বা কী করে!

মেক-আপের চেয়ার থেকে তখন বিবস্বান বসু উঠে গিয়ে ঘরের এক কোণে রাখা একটা দামি সোফায় শরীর ন্যস্ত করলেন, পরক্ষণেই মাচানবাবুকে বললেন, লোচ্চাকে ডেকে দিন তো—

মাচানবাবু সামান্য বিব্রত হয়ে বাইরে গিয়ে ক্যাবলাকান্ত চেহারার যে হাফপ্যান্ট-পরা ছেলেটো প্রায়শ ঘুরঘুর করে শুটিং-স্পটের কাছাকাছি তাকে ডেকে আনলেন। ছেলেটার বয়স পনেরো-ষোলোর মতো, চোখেমুখে বিভ্রান্তির ছাপ, কথা বলতেও শোনা যায় না কখনও। ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব কি না কে জানে! তার হাতে একটা বড় সাইজের অ্যাটাচিবাক্স, মাচানবাবু তাকে নিয়ে দাঁড়াল বিবস্বান বসুর সামনে। ছেলেটার নাম লোচ্চা শুনে গার্গীর ভুরুতে সামান্য কোঁচ। কিন্তু সে কোঁচ

দীর্ঘায়িত হওয়ার আগেই তার মুখমণ্ডল মাচানবাবুর কবলে। টুকটুক করে, যেন একটা আঁকা ছবিতে ফিনিশিং টাচ দিচ্ছেন এমন ভঙ্গিতে ধেবড়ে যাওয়া মেক-আপে প্রাণসঞ্চার করছেন পুনর্বার।

মেক-আপের চেয়ারে বসে গার্গীর চোখ তখন আয়নার দিকে। না, আয়নার কাচে সে তার নিজের মুখ দেখতে ব্যস্ত নয়, তার চোখ আছড়ে পড়ছে তার পেছনে সোফায় বসা সুদর্শন বিবস্বান বসুর দিকে। বিবস্বান বসু তখন লোচ্চা নামের ক্যাবলাকান্ত ছেলেটির হাত থেকে অ্যাটাচিবাক্সটা টেনে নিয়ে সেটা খুললেন সেন্টার-টেবিলের ওপর। তার ভেতর এটা-ওটা টুকিটাকির আড়ালে দুটো ড্রিঙ্কসের বোতল, তারই একটা বার করে কায়দা করে খুললেন ছিপিটা। বাক্স থেকে একটা গেলাস নিয়ে তাতে ঢাললেন সোনালি রঙের পানীয়। তারপর সেন্টারটেবিলের ওপর থেকে জলের জায়গাটা নিয়ে গেলাসে মেশালেন বেশ যত্ন করে।

গার্গীর একটু অস্বস্তিই হচ্ছিল, কেননা একটু পরেই তাকে বিবস্বান বসুর মুখোমুখি বসতে হবে শুটিঙে। তার আগে বিবস্বান বসু ড্রিঙ্ক করছেন, এ-দৃশ্যটা যেন ঠিক মন থেকে মেনে নিতে পারল না। তবে সিনেমার নায়কদের হয়তো এরকমই অভ্যেস—এই ভেবে নজর ফিরিয়ে নিতে চাইল। এক বার নিজের মুখখানাও দেখল আয়নায়, দেশে মুগ্ধই হল তাকে যথেষ্ট সুন্দরী দেখাচ্ছে বলে। মাচানবাবুর রোগা, শীর্ণ আঙুলে এমন একটা আশ্চর্য জাদু মাখানো যে, তার মতো সাদামাঠা চেহারার মুখকেও সুন্দরী রেশমবাই করে তুলছেন প্রতিমুহূর্তে। পরক্ষণেই তার চোখ আবার চলে গেল বিবস্বান বসুর দিকে। আর সেই মুহূর্তে চমকেই উঠল বেশ।

অ্যাটাচির ভেতর যে-দু'টি বোতল জ্বল জ্বল করছে, দু'টিই সেই 'এমপারার'স চয়েস', যে বোতল নিয়ে দেবাদ্রি সান্যাল অজস্র প্রশ্ন করে চলেছেন সিনেমুভির সদস্যদের। সজনী দত্ত সে দিন 'মন আমুর' থেকে তিনটি বোতল কিনেছেন না দু'টি সেটাও যেমন একটা রহস্য, তেমনই বর্ণনার ঘরে কার দৌলতে সে রাতে 'এমপারার'স চয়েস' পৌঁছেছিল সেটাও একটা ধাঁধা। বারের সেল্‌স্‌ম্যান বলেছিল, তৃতীয় বোতলটির ক্রেতা নাকি ছিল একজন দাড়িঅলা যুবক, তার ফলে সিনেমুভির দুই দাড়ি-শোভিত সদস্য রোমিও দত্তগুপ্ত আর ভরদ্বাজ মুখার্জিকে যথেষ্ট হেনস্তা করেছেন দেবাদ্রি সান্যাল। আর কী আশ্চর্য, দু'জনেই পুলিশের কাছে বলেছে তারা কেউই 'মন আমুর' থেকে ড্রিঙ্কসের বোতল কেনেনি, কিংবা বর্ণনার ঘরে বসে তার সঙ্গে ড্রিঙ্কও করেনি। তৃতীয় বোতলটির রহস্য সে-ক্ষেত্রে এখনও অন্ধকারে। আজ হঠাৎ সেই একই ব্র্যান্ডের দু'দুটি বোতল বিবস্বান বসুর অ্যাটাচিতে আবিষ্কার করে বেশ আশ্চর্যই হচ্ছিল গার্গী।

কৌতূহলটা তার ভেতর এতটাই চারিয়ে গেল যে, মাচানবাবুর কবল থেকে মুক্তি পেতেই সে বাইরে বেরিয়ে খোঁজাখুঁজি করে বার করল সজনী দত্তকে। সজনী দত্ত পেছনের দিকে একটা ঘরে চেয়ারে জুতজাত হয়ে বসে, গোটা দুয়েক প্যাকেট খুলে ধীরেসুস্থে খাচ্ছিলেন তখন। গার্গীকে দেখেই চমকে উঠে একটা প্যাকেট সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করলেন, তাতে বাধা দিয়ে গার্গী হেসে বলল, লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই সজনীবাবু। আপনার যা চেহারা, তাতে দু'টো প্যাকেট ছাড়া চলবে না। শরীরটা তো রাখতে হবে আপনাকে।

সজনী দত্ত একরাশ বিরিয়ানি চিবোতে চিবোতে জড়ানো গলায় বললেন, বলুন ম্যাডাম, কী চান?

গার্গী কোনও ভনিতা না করে বলল, বলুন তো সজনীবাবু, আপনাদের বি. বি-কে-ক'টা 'এমপারার'স চয়েস' সাপ্লাই করেছেন এ ক'দিনে?

'এমপারার'স চয়েস'-এর নাম শুনেই ভরভরন্ত মুখে বিষম খাওয়ার উপক্রম হল সজনীবাবুর, সামলে নিয়ে বললেন, সেই একটাই, ম্যাডাম।

— মাত্র একটা! তাহলে ওঁর অ্যাটাচিতে দু'দুটো বোতল কোত্থেকে এল আজ!

—দু'টো! সজনী দত্ত কোনওক্রমে বিরিয়ানি সামলে গলা খাদে নামালেন, সত্যি বলছি ম্যাডাম, বর্ণনার বর্ণনার পর আমাদের পরিচালক স্যারের কড়া হুকুম, কারও জন্য ড্রিঙ্কস আনা চলবে না। তা ছাড়া কোম্পানির টাকাপয়সায় এখন ঘোর টানাটানি, এ সময় কোনও বাজে খরচ একদম নিষিদ্ধ। সে কথা বি. বি.-কে বলেও দিয়েছেন রানাজি। কিন্তু ওঁদের তো বোতল ছাড়া এক মুহূর্তও চলে না। তাই বি. বি. তাঁর অ্যাটেন্ডেন্টকে দিয়ে রোজই আনিয়ে নিচ্ছেন শুনছি।

—অ্যাটেন্ডেন্ট! সে আবার কে?

—ওই যে, বারমুডা পরে ঘুরছে, দেখেননি। লোচ্চা—

—ও। গার্গী পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করল, ওর নাম লোচ্চা নাকি।

—ওর আসল নাম কী তা কেউ জানে না, তবে বি. বি. ওকে লোচ্চা বলেই ডাকেন।

—কেন, এরকম একটা বিশ্রী নামে ডাকেন কেন?

সজনী দত্ত কেমন একটা মুখ করে হাসলেন, আসলে ও থাকে অমন ঘাপটি মেরে, কিন্তু আচার-আচরণে একেবারে লোচ্চা বলেই—

গার্গীর তবুও কৌতূহল থেকে যায়, কীরকম আচার-আচরণ!

সজনী দত্ত একটু থমকে গেলেন, ইতস্তত করে বললেন, আসলে কোথায় যেন আউটিঙে গিয়ে রুমেলা রায় বাথরুমে চান করতে ঢুকেছিলেন। সে সময় ও নাকি পাইপ বেয়ে উঠে জানলার খড়খড়ি খুলে ভেতরে উঁকি মেরে দেখছিল—

—ইস, গার্গী মুখ বিকৃত করে বলল, তা এরকম একটা বিশ্রীস্বভাবের ছেলেকে তার পরও উনি রেখে দিয়েছেন!

—আর বলবেন না, রুমেলা রায়ের তারপর কী চিৎকার-চেঁচামেচি! বি. বি.-র সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি হয় আর কি। কিন্তু বি. বি.-র নাকি ওকে ছাড়া চলে না একমুহূর্তও।

—হুঁ, গার্গী ভুরুতে কোঁচ ফেলে, প্রবল ভাবনার রেশ নিয়ে চলে এল সজনী দত্তকে মন দিয়ে খাওয়ার সুযোগ করে দিয়ে। তখনও আস্ত একটা প্যাকেট পড়ে রয়েছে তাঁর সামনে। কিন্তু আপাতত বিবস্বান বসু লোকটিকে ক্রমশ ভারি গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে গার্গীর। বর্ণনার মৃত্যুর পর তাঁকে এতটাই নিস্পৃহ দেখেছে, এতটাই উদাসীন যে, আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। অথচ তার ঠিক আগের চার-চারটে রাত্রিই বোধহয় বর্ণনার সান্নিধ্য কিংবা তার অতিরিক্তও কিছু লাভ করেছেন নির্লজ্জের মতো। রুমেলা রায়ের সঙ্গে তাঁর দশ বছরের একটা সম্পর্ক, অবৈধ সম্পর্ক যদিও, তাও এক নিমেষে ধুলোয় লুটিয়ে একটা নতুন-লাইনে-আসা মেয়েকে নিয়ে যেভাবে—

সে যাই হোক, 'এমপারার'স চয়েস' নিয়ে ভাবনাটা গার্গীকে যথেষ্ট ভাবিত করল। কারণ এ বার তার মনে হচ্ছে, বর্ণনার ঘরে যে বোতলটা পাওয়া গেছে তা সম্ভবত বিবস্বান বসুরই অবদান।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে কোতোয়ালি থানা থেকে যে-সংবাদটি শুটিং-স্পটে এসে পৌঁছল, তাতে ডঃ সুস্নাত তালুকদারের হত্যারহস্য একটা অন্য বাঁক নিতে পারে হয়তো। কলকাতা থেকে যে ফিরতি টেলিফোনটি পেয়েছেন দেবাদ্রি সান্যাল, তাতে জানা গেল, বোথ লাভলি তালুকদার অ্যান্ড সার্বিক সমাজদার আর মিসিং ফ্রম ক্যালকাটা। হয়তো দু'জনে পালিয়েই গেছে কোথাও।



গোমতী নদীর তীরবর্তী নির্জন বাংলো বাড়িটির দোতলার এ-ঘর ও-ঘর ঘুরতে ঘুরতে গার্গী অবাক হয়ে লক্ষ করছিল, সিনেমুভির লোকজন কী অপরিসীম নিষ্ঠায় 'সোনালি ঘুঙুর'-এর পরবর্তী দৃশ্যের শুটিঙের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে! নিশ্চয়ই সবার ভেতরেই একটা ঘোর পুলিশি আতঙ্ক কম-বেশি বয়ে চলছে অন্তঃসলিলা হয়ে, কিন্তু হঠাৎ তাদের ওপর চোখ রাখলে বোঝাই যাবে না দু-দুটি খুনের সন্দেহভাজন হিসেবে সিনেমুভির এক বা একাধিক সদস্যের নাম তালিকাভুক্ত করেছে কলকাতার পুলিশ, জেরায় জেরায় জেরবার করে দিচ্ছে, কাউকে কাউকে হুমকিও দিচ্ছে গ্রেফতার করবে বলে। পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল কোনও একসময় গার্গীকে একান্তে জিজ্ঞাসাও করেছিলেন, আচ্ছা মিসেস চৌধুরী, আপনি তো দিব্যি ওঁদের সঙ্গে সারাক্ষণ মিশছেন, অভিনয় করছেন এদের সিরিয়ালে, কিছু বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা! কারও হাবভাবে প্রকাশ পাচ্ছে না দুর্বলতা? পুলিশের খাঁড়া মাথার ওপর সারাক্ষণ ঝুলতে থাকলে অনেক সময় খুনি লড়াই করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কোনও অসতর্ক মুহূর্তে প্রকাশ করে ফেলে নিজের অপরাধ।

দেবাদ্রির কথাগুলো গার্গী নিজের ভেতর নাড়াচাড়া করছে বারবার, আর কড়া নজর রেখে পর্যালোচনা করছে প্রতিটি কলাকুশলী কুশীলবের চলাফেরা, চাউনি, আচার-আচরণ। এর মধ্যে অনেকেরই চালচলন রহস্যময় ঠেকলেও গোটা ব্যাপারটাই যেন এখনও গভীর অন্ধকারে। আর খুন তো একটি নয়, দুটি। তার একটি ঘটে গেছে সুদূর কলকাতায়, যেদিন সন্ধেয় তারা কলকাতা থেকে অমৃতসর মেলে চেপেছিল সেই চৌঠা সেপ্টেম্বর দুপুরবেলায়, আর দ্বিতীয় খুনটি হয়তো প্রথম খুনের পরিপূরক (তা নাও হতে পারে অবশ্য), সেটি ঘটে গেছে লখনউয়ে তাদের আসার তৃতীয় দিন রাতে, অর্থাৎ সাতই সেপ্টেম্বর শেষ রাতের দিকে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, দুটি খুনই এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যাতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে দুটিই আত্মহত্যার ঘটনা. দুটি ক্ষেত্রেই সুইসাইড নোট রাখা হয়েছিল ডেডবডির পাশে। কিন্তু খুনির চেষ্টা সফল হয়নি, পুলিশ তদন্ত করতে গিয়ে প্রথম চোটেই আবিষ্কার করে ফেলেছে প্রকৃত ঘটনা, তাতে অবশ্য এটাই প্রমাণিত হয় যে, খুনি পেশাদার নয়, নিতান্তই নভিস। তা সত্ত্বেও দুটি ক্ষেত্রেই খুনি কে তা এখনও পর্যন্ত ধরে উঠতে পারেনি পুলিশ। সর্বশেষ যে ঘটনাটি কলকাতা থেকে টেলিফোন মারফত জানা গেছে, তাতে একেবারেই অন্য মাত্রা পেয়েছে ডঃ সুস্নাত তালুকদারের খুনের প্রেক্ষাপট। রহস্যও ঘনীভূত হয়েছে যেহেতু নিহত ডাক্তারের অন্যতম প্রিয়পাত্রী, তাঁরই ভাইপোর স্ত্রী লাভলি তালুকদার তার এক প্রেমিক সাবু অর্থাৎ সার্বিক সমাজদারকে নিয়ে সহসা

কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে কোথাও। কোথায় গেছে সে তথ্য এখনও অজ্ঞাত, কিন্তু জেরায় যে-বিচিত্র তথ্যটি পুলিশ জানতে পেরেছে, তাতে হিরো-হিরো চেহারার সার্বিক সমাজদার তার সুন্দরী প্রেমিকা লাভলি তালুকদারকে নিয়ে পালানোর একটা পরিকল্পনা করেছিল, যদি কিছু টাকার সংস্থান হয়ে যায় তবেই। লাভলি তালুকদার তার সঙ্গে চলে যাওয়ায় এখন অনুমান করা যায়, হয়তো টাকাটা কোনওভাবে জোগাড় করে ফেলেছে তারা। সে টাকাটা ডঃ সুন্নাত তালুকদারকে খুন করে জোগাড় করেছে কি না সেটা এখন তদন্তসাপেক্ষ।

এখন যে-সমস্যাটা গার্গীকেও ভাবাচ্ছে তা হল, খুনের ঘটনা দুটি হওয়ায় হত্যাকারী একজন, না দুজন, না কি একাধিক ব্যক্তি জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে! মোটিভই বা কী! পুলিশ প্রথমে সন্দেহ করেছিল বর্ণনা সেনগুপ্তকে, সেইসঙ্গে ডঃ তালুকদারের দুই ভাইপো রঙ্গন আর অঙ্কন ওরফে বিটনকেও। এখন পটভূমিতে রঙ্গনের স্ত্রী লাভলি তালুকদারের সঙ্গে লাভলির প্রেমিক সার্বিক সমাজদারও জুটে যাওয়ায় বেশ জট পাকিয়ে গেল সমস্যাটা।

তবে দ্বিতীয় খুনটি সম্ভবত আরও জটিল, যেহেতু অর্থসংক্রান্ত মোটিভের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রেম, সে প্রেম ত্রিভুজ, কিংবা চতুর্ভুজ অথবা পঞ্চভুজ তাও এখনও পরিষ্কার নয়।

গার্গী চুপচাপ দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে, রেলিঙে কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ে এমন সহস্র খুঁটিনাটি নিজের ভেতর ঢালা-উপুড় করছে, সে সময় হঠাৎ সম্বিত ভেঙে চমকে উঠতেই দেখল, সামনে দাঁড়িয়ে লোচ্চা।

লোচ্চাকে দেখে তার অতীত কীর্তিকলাপের সামান্য আভাস গার্গীর চোখের সামনে ভেসে উঠল। তৎক্ষণাৎ কী এক বিবমিষায় ভরে গেল তার শরীর, ভুরুতে একটুকরো ভাঁজ এসে জমা হল তার অজান্তে। কিন্তু চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না, কারণ লোচ্চা বরাবরের মতোই ডেফ-অ্যান্ড-ডাম্ব ভঙ্গিতে হাতছানি দিয়ে কেন যেন ডাকছে তাকে। বিস্মিত গার্গী কী করবে বুঝে ওঠার আগেই ছেলেটি আরও একবার হাতছানি দিয়ে তক্ষুনি অনুসরণ করতে বলল তাকে। লোচ্চাকে দেখে স্বাভাবিক ইনটিউশনে প্রথমে তার বুকে শাড়ির আঁচল টানতে চাইছেল, কিন্তু তার পরনে গতরাতে ছিল বাইজির পোশাক, এখন, এই মুহূর্তে রাতের ম্যাহফিলের সেই বাইজির পোশাকটিও নেই, ইতিমধ্যে বেশ বদল হয়ে পরদিন সকালের ঢিলেঢালা লখনউ ধাঁচের পোশাক। গায়ে ঘন নীল রঙের একটা ঢিলে কুর্তা, পরনে সরু মুহুরির টানাটান পায়জামা, সেই সঙ্গে নীল মসলিনের পাতলা ওড়নায় কিছুটা আব্রু রক্ষা প্রয়াস। অতএব সেই ওড়নাই শরীরের ওপর টেনেটুনে গার্গীকে যেতে হল লোচ্চার পিছু পিছু। এ-ঘর ও-ঘর পেরিয়ে গিয়ে পৌঁছুল সেই কোণের ঘরটায় যেখানে বিবস্বান বসু একটু আগেই পান করছিলেন বেশ খোসমেজাজে।

ঘরের ভেতর অবশ্য আপাতত ছবির নায়ক একাই। মাচানবাবু তাঁর মেক-আপের কাজ শেষ করে হয়তো বিশ্রাম নিচ্ছেন অন্য কোথাও। গার্গী সে ঘরে ঢুকতেই তাকে বিস্মিত করে লোচ্চা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিল দরজাটা।

নায়ক বিবস্বান বসু সোফায় গা এলিয়ে চোখ বুলোচ্ছিলেন চিত্রনাট্যের পৃষ্ঠাগুলোয়। তাঁর সামনে পানীয়ের গেলাসটি ততক্ষণে শূন্য, ঘরের ভেতর একটা অদ্ভুত ঝাঁঝ-ঝাঁঝ মিষ্টি গন্ধ, সেটা যে সেই 'এমপারার'স চয়েস' নামক উষ্ণ পানীয়েরই তা গার্গীর বুঝতে অসুবিধে হল না। তবে গন্ধটাকে খুশবু বলবে, না বদবু, তা ভেবে দ্বিধান্বিত হল কিছুক্ষণ।

গার্গী ঘরে ঢুকতেই বিবস্বান চোখ তুলে তাকালেন একমুহূর্ত, পানীয়ের প্রভাবে সে-চোখ

সামান্য লালচে, একটু স্বপ্নালুও মনে হল, মৃদু হেসে বললেন, কী খুকি, ঘুরে বেড়ালে চলবে! এসো, একটু রিহার্সাল দিয়ে নি—

বিবস্বান প্রথম থেকেই গার্গীকে তুমি সম্বোধনে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন, এখন 'খুকি' বলে ঘনিষ্ঠ হতে চাইছেন আরও। হয়তো ফিল্ম-লাইনে জুনিয়রদের এভাবেই অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে ডেকে থাকেন সিনিয়ররা, অন্যান্য আরও প্রফেশনের মতোই। গার্গীও মেনে নিচ্ছে অতএব। তবে এখন আশ্চর্য হল এই কারণে যে, সাধারণত পরিচালকই কুশীলবদের রিহার্সালের প্রাথমিক পর্বে সাহায্য করেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে কখনও কখনও শাম্ব সামন্ত, কিন্তু এখন বিবস্বান নিজেই তাকে ডেকে পাঠিয়ে রিহার্সাল দিতে চাইছেন। সম্ভবত পরিচালকের সাময়িক অসুস্থতার জন্যই এই উদ্যোগ।

গার্গী উল্টোদিকের সোফায় বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু বিবস্বান হাত নেড়ে অপেক্ষাকৃত বড় যে-সোফাটায় তিনি বসেছিলেন, সেখানেই তাঁর পাশে বসতে বললেন গার্গীকে। বিবস্বান বেশ ছড়িয়ে বসেছিলেন, ফলে খুব সামান্য জায়গাই অবশিষ্ট ছিল গার্গীর বসার জন্য। একটু আড়ষ্ট হয়ে সেই স্বল্পপরিসরে কোনও রকমে বসতেই বিবস্বান এবার নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন, অতঃপর গার্গীর পেছন দিক দিয়ে হাত প্রসারিত করে আঙুলগুলো ন্যস্ত করলেন তার কাঁধে। তাতে গার্গী বিস্মিত, বেশ বিব্রতও বোধ করতে বিবস্বান কাঁধের কাছে সামান্য খামচে ধরে হেসে বললেন, ফিল্ম লাইনে এসেছ, এত আড়ষ্ট হলে কি চলে। এখানে কতরকম ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করতে হয়। কত অন্তরঙ্গ হতে হয় নায়কের সঙ্গে! সে সময় আড়ষ্ট হলে কি অভিনয়ে স্বতঃস্ফূর্ততা আসে, না দর্শক তা গ্রহণ করবে।

গার্গী তখনও বুঝে উঠতে পারছিল না, ফিল্মের এই নামী নায়ক কী বলতে চান তাঁকে। সহজ হওয়ার চেষ্টা করে হাসল একটু, কেন, আমার অভিনয় কি ঠিক হচ্ছে না!

—নো, নো, ইট'স অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ঋষভদা তো খুব প্লিজড তোমার অভিনয়ে। বলছিলেন একদম আনকোরা মেয়ে, অথচ কী সাবলীল অ্যাক্টিং!

গার্গী তখনও দ্বিধান্বিত, বিবস্বান হঠাৎ তাকে ডেকে আনলেন শুধু কি রিহার্সালের জন্যই, না কি—

একবার আড়চোখে তার ডান কাঁধে চেপে বসা বিবস্বান বসুর আঙুলগুলো দেখলও সে। খুবই ফর্সা রং বিবস্বানের, বেশ শক্তপোক্ত গড়নের আঙুলগুলো দেখতেও চমৎকার, তবু রুপোলি জগতের এই নামী অভিনেতার পুরুষালি আঙুলের উষ্ণতা ঠিক যেন হজম করতে পারছিল না, বরং একলহমায় তার চোখে পড়ে গেল বিবস্বানের অনামিকায় একটা দাগ, যা দীর্ঘকাল আংটি পরে থাকলেই সাধারণত হয়ে থাকে। অর্থাৎ কয়েকদিন আগেও আংটি পরতেন, আপাতত নেই। নেই কেন, এ ভাবনাটা মগজে একবার ঢালা-উপুড় করতেই সহসা তার মনে হল, তাহলে কি যে-আংটিটা বর্ণনার আঙুল থেকে পাওয়া গেছে, সেটা রোমিওর নয়, বিবস্বানের! এটা তো জানাই গেছে যে, বর্ণনার অভ্যেসই ছিল, গল্প করতে করতে তার প্রেমিক বা প্রেমিকপ্রতিমদের হাত থেকে, গলা থেকে আংটি বা হার খুলে নেওয়া। রোমিওর আঙুলেও এরকম একটি দাগ পাওয়া গেছে। আবার বিবস্বান বসুর আঙুলেও সেই একইরকম আংটি খুলে নেওয়ার চিহ্ন! ঘটনা দুটোই ভারি অদ্ভুত। কিন্তু একটু বোঝার ব্যাপার হল, যে-আংটিটা বর্ণনার আঙুলে পাওয়া গেছে, তাতে 'আর' অক্ষরটি মীনে করা। সেক্ষেত্রে আংটিটা রোমিওর হওয়াই যুক্তিযুক্ত। যদিও রোমিও আংটিটা নিজের বলে মানতে অস্বীকার করেছে পুলিশের কাছে। এখন

বিবস্বান বসুও স্বীকার করেন কি না সেটাও লক্ষ করার।

যাই হোক, আপাতত বিবস্বান বসুর পাঞ্জা যেবাবে তার কাঁধে খামচে বসেছে তা থেকে কীভাবে নিস্তার পাওয়া যায় তা ভাবতে ভাবতে গার্গী শুনল নায়কের ভরাট গলা, হুঁ, এবার শুরু করো—

গার্গী এতক্ষণে কিছুটা চোখ বুলিয়ে নিয়েছে চিত্রনাট্যের পৃষ্ঠায়। আগেও একবার পড়েছিল, এবারে ধাতস্থ হয়ে শুরু করতে যাবে, তার আগেই হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে চমকে উঠে দেখল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর শাম্ব সামন্ত কী কারণে যেন ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ নায়কের সঙ্গে নতুন অভিনেত্রীটিকে অমন অন্তরঙ্গভাবে বসে থাকতে দেখে কিছুটা স্তম্ভিত হয়েই বোধহয় দ্রুত দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিয়ে সরে পড়লেন তৎক্ষণাৎ।

গার্গী ভারি অস্বস্তিতে পড়ল এহেন নীতিবহির্ভূত একটি ঘটনায় শামিল হয়ে। তার সম্পর্কে কী অশ্লীল ভাবনা ভাবলেন ভদ্রলোক কে জানে! হয়তো ভেবেই নিলেন মেয়েটা ফিল্ম-লাইনে এসেছে যখন—

বিবস্বান বসু অবশ্য বিন্দুমাত্র বিকার দেখালেন না ঘটনাটিতে। যেন নায়কের এবম্বিধ আচার-আচরণ নিতান্তই স্বাভাবিক, তাতে বিচলিত হওয়ার কিচ্ছুটি নেই, বরং আরও সাহসী হয়ে গার্গীকে খামচে ধরে একটু কাছে টেনে নিলেন তারপর—

রেশমবাই তখন গোটা ম্যাহফিলের রাত শুধুমাত্র গানে-গানে পার করে কিছুটা বিস্মিত, কিছুটা বিব্রতও। সুগায়িকা রেশমবাই তার মন-মাতাল-করা গানে কলকাতার পত্রকারকে সম্মোহিত করে দিলেও সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না, আসলে সে একজন তবায়েফ। আর রইস আদমি একজন বাইজিকে মুজরো করতে নিয়ে এসে তার গান শোনার পর গানের অতিরিক্ত কিছু চাইবে না এ-ঘটনা বোধহয় তার কাছে আশ্চর্যের। প্রায় সারারাত গান করার পর তার ক্লান্ত, না-ঘুম চোখে তাই সেই বিস্ময়, তুমি আমাকে সত্যিই অবাক করলে, বাবুজি!

পুলক চৌধুরী প্রশান্ত হাসিতে উদ্ভাসিত হলেন, কেন, রেশম!

—যে-মেহমান গানের এত রসিক, সে আদমি সারারাত একটুও শরাব পান করল না, বাইজিকে একটু ভালবাসল না, এ বড় আজব কথা কিন্তু।

পুলক চৌধুরী হাসলেন, এমনই কিছু আজব ঘটনা জীবনে ঘটে বলেই তো পৃথিবীটা আমার কাছে ভারি আশ্চর্যের মনে হয়, রেশম।

—আমি কিন্তু এখনও বুঝে উঠতে পারছি না, তুমি কেনই বা আমাকে নিয়ে এলে এই নিভৃতে! শুধু আমার গান শুনবে বলেই।

—যদি বলি, তাইই।

—সে তো বাবুজি, আরও অনেক বড় বড় ওস্তাদ আছে, যাদের গলা আরও অনেক ভাল, যাদের তালিম অনেক বেশি, তাদের গান ছেড়ে কেন আমার গান রাত জেগে শুনবে!

পুলক আবার হাসলেন, তুমি নিজেই জানো না তুমি কত বড় গাইয়ে, রেশম। সেদিন স্টেশন থেকে একটা টাঙ্গা ডেকে টাঙ্গাওয়ালাকে বললাম, 'কেঁও টাঙ্গেওয়ালে, চকবাজার চলোগে?' তো মস্ত গোঁফে তা দিয়ে টাঙ্গাওলা জবাব দিল, 'কেঁও নহি, বাবুজি? কিসকি কোঠিপর যাওগে?' রেশমবাইয়ের নাম বলতেই কী সম্ভ্রম করে বললে, 'উয়ো তো খানদানি গানেওয়ালি হ্যায়।'

রেশম বেশ খুশি হল কথাটা শুনে, তবু বলল, তুমি কিন্তু সত্যিই অন্যরকম, বাবুজি। আমার এই ছোট্ট জীবনে একেবারে আলাদা। বোধহয় পত্রকার বলেই তুমি আমার ভেতরকার সেই

গানেওয়ালিকেই খুঁজে বার করতে চাইছ, আমার ভেতরকার তবায়েফকে নয়। কী যে আনন্দ হচ্ছে আজ আমার, বাবুজি!

পুলক হাসলেন, আসলে কী জানো রেশম, তোমার গানেওয়ালি সত্তার ভেতর লুকিয়ে আছে এক সুখী রেশম, আর তবায়েফ সত্তার ভেতর লুকিয়ে আছে এক দুঃখী রেশম। ঠিক কি না—

রেশমবাইয়ের চোখ দুটো ছলছল করে উঠল, ঠিকই বলেছ, কত যে দুঃখ এই বুকটার ভেতর লুকিয়ে আছে তা যদি জানতে, বাবুজি!

পুলক চৌধুরী এবার তন্ময় হয়ে একটা শায়ের আবৃত্তি করে শোনালেন—

ইয়ে ইনসানোঁকো টুটে হুয়ে দিল হ্যায় সাকী।

হাম সে তো টুটে হুয়ে সাগর নহি দেখে যাতে।

বলতে বলতে আবার নিজের মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন, এ তো শুধু মানুষের ভাঙা হৃদয়, সাকী, আমি তো ভাঙা পেয়ালাও দেখতে পারিনে।

রেশমবাই স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল পুলক চৌধুরীর দিকে।

সমস্ত দৃশ্যটা খুবই অনুভূতিপ্রবণ, বার দুয়েক রিহার্সাল দেওয়ার পর যখন রোমিও তার ক্যামেরায় টেক করল, একবারেই 'ও, কে' হতে পরিচালক ঋষভ মুখার্জিকে বেশ আশ্বস্ত দেখাল। ঋষভ তাঁর শারীরিক বৈকল্যের ধাক্কা সামলে উঠতে পারেননি পুরোপুরি, শটটা ও কে হওয়ার পর হাত তুলে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে উঠলেন প্যাক আপ, প্যাক আপ।

গোমতী নদীর তীরে এই বাংলোটিতে আরও কয়েকটি দৃশ্যের শুটিং হওয়ার কথা, তারপর শুটিং হবে লখনউয়ের কয়েকটি প্রধান সড়কে। সেইসঙ্গে বিখ্যাত টুরিস্ট স্পট বড়া ইমামবড়ায়, সাধারণভাবে লোক যাকে ভুলভুলাইয়া বলে চেনে।

পরিচালক 'প্যাক আপ' বলতেই অমনি পুরো সিনেমুভি টিম ব্যস্ত হয়ে পড়ল জিনিসপত্র গোছাতে, কিছুটা বিস্মিত হয়েই, কারণ এখানে আরও কয়েকটা দৃশ্য শুটিং হওয়ার কথা। সেট একবার তৈরি করে আবার এত দ্রুত ভাঙতে হবে তা ভাবতে পারেনি কেউ। কিন্তু ঋষভ সম্ভবত ভেতরে ভেতরে বেশ অসুস্থ বোধ করছেন। বোধহয় এ কদিনে একটু বেশিই চাপ দিয়ে ফেলেছেন নিজের ওপর। রানাজি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'চলুন, আপনাকে একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।' কিন্তু ঋষভ ঘাড় ঝাঁকালেন, কোনও দরকার নেই, কোনও দরকার নেই, একবেলা রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

যদিও এখনও দুপুর শেষ হয়নি, হোটেলে ফিরেও কোনও লাভ নেই গার্গীর, কারণ সায়ন নিশ্চয়ই কানপুর থেকে ফেরেনি এখনও। তবু একটু বিশ্রাম তো নেওয়া যাবে এই ভেবে রানাজিকে জিজ্ঞাসা করল, কোন গাড়িতে ফিরব?

বিবস্বান বসুও ফিরবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, গার্গীর কথা তাঁর কানে ঢুকতেই মৃদু কণ্ঠে বললেন, আমার গাড়িতেই চলো না। কিছুক্ষণ রুমে বিশ্রাম নিয়ে সন্ধের পর একবার আমার কাছে এসো। কিছু জরুরি কথা আছে তোমার সঙ্গে।

গার্গী এবার বেশ অবাক হল। এ কদিন বিবস্বান বসুকে সে দেখেছে ভারি নির্লিপ্ত, সিনেমুভির সব ব্যাপারেই যেন অপার উদাসীন, কিন্তু একটু একটু করে তাঁর ভেতরকার সত্তাটা যেন উন্মোচিত হচ্ছে তার চোখের সামনে। আজ যেভাবে দীর্ঘক্ষণ তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে, কাঁধের কাছে খামচে ধরে রিহার্সাল দিচ্ছিলেন, তাতে তার শরীর শিরশির করে উঠছিল, একটা প্রতিবাদ জানান দিচ্ছিল তার সমস্ত মন জুড়ে, কিন্তু সেই মুহূর্তে প্রতিবাদ প্রকাশ করেনি শুধু বিবস্বান

বসুকে একটু ভাল করে চিনবে বলেই। এখন আবার বিবস্বান তাকে সন্ধের পর আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন তাঁর রুমে, কোনও জরুরি আলোচনা করবেন জানিয়ে।

গার্গী অবশ্য বুঝে উঠতে পারল না তার সঙ্গে কী এমন জরুরি কাজ থাকতে পারে বিবস্বান বসুর!

বিবস্বান বসু অবশ্য তার সম্মতির অপেক্ষা না করে ততক্ষণে তরতর করে নেমে গেছেন সিঁড়ি বেয়ে। গার্গী ইতস্তত করছিল বিবস্বান বসুর সঙ্গে একই গাড়িতে যাবে কি যাবে না। কিংবা সন্ধের পর তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে কি না। কাছেই কোথাও দাঁড়িয়ে ছিলেন শাম্ব সামন্ত, ভারি শান্তশিষ্ট চেহারার এই মানুষটি নিঃশব্দে কাজ করেন, গায়ের রং কালোই বলা যায়, দাড়িগোঁফ কামানো স্বাস্থ্যল মুখ, সাধারণত রঙিন পাঞ্জাবির সঙ্গে ধবধবে ধুতি পরেন, তিনি হঠাৎ যেন গার্গীকে শুনিয়েই মন্তব্য করলেন, এরা কেন যে ফিল্ম-লাইনে আসে! এখানে টিকে থাকতে গেলে কত যে ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় মেয়েদের!

গার্গী খেয়াল করল কথাটা, এও বুঝতে পারল তাকে বিবস্বান বসুর সঙ্গে কিছুটা অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখেই, সেইসঙ্গ সন্ধের পর বিবস্বান বসুর আমন্ত্রণ জানানোর ধরন শুনেই এমন সতর্কীকরণের মন্তব্যটা করলেন শাম্ব সামন্ত।

তার নিজেরও এখন খুবই টেনশন হচ্ছে। যাব কি যাব না ভাবতে ভাবতে নীচে নেমে গিয়ে বিবস্বান বসুর গাড়িতেই চেপে বসল হঠাৎ।

গাড়িতে অবশ্য বিবস্বান বসু তেমন কথা বললেন না, দু-একটা মামুলি প্রশ্ন করতে করতেই হোটেল ইনের গেট! হোটেলের সামনে গাড়ি থেকে নামতে নামতে আবারও বললেন. তাহলে সন্ধের পর—

নিজের ঘরে গিয়ে গার্গী তখন প্রবল উত্তেজিত। সে তখনও ভেবে উঠতে পারছে না. কেনই বা বিবস্বান বসু তাকে বারবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন তাঁর রুমে যেতে, কী এমন জরুরি কথা থাকতে পারে তার সঙ্গে! গেলে কোনও বিপদ হতে পারে কি না তাও চক্কর দিতে লাগল তার মগজে।

বিবস্বান বসু সম্পর্কে যে-কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এ কদিনে সে জানতে পেরেছে তার একটি হল, তিনি একজন ঘোরতর উত্তম্যানাইজার, রুমেলা রায়ের মতো একজন সুন্দরী নায়িকার সঙ্গে দশ বছরের মতো সম্পর্ক অব্যাহত রাখার পরও হঠাৎ লখনউ এসে জড়িয়ে পড়লেন বর্ণনা সেনগুপ্ত নামের একজন নতুন অভিনেত্রীর সঙ্গে। দ্বিতীয় তথ্য, রুমেলা রায়ের কারণেই নাকি বিবস্বান বসুর স্ত্রী আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন গায়ে আগুন ধরিয়ে। লোকে অবশ্য আড়ালে বলাবলি করে, বিবস্বান নিজেই স্ত্রীকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিলেন এভাবেই। আরও একটি তথ্য হল, লোচ্চা নামের ওই বিকৃত রুচির কিশোরটিকে তিনি কাজে বহাল রেখেছেন রুমেলা রায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই।

এহেন বিবস্বান বসুর রুমে সন্ধের পর একা যাওয়াটা কতখানি নিরাপদ হবে তা ভাবতে ভাবতে বেশ বিপর্যস্ত হচ্ছিল গার্গী। হোটেলে নিজের ঘরে ঢুকে বেশবাস বদলে, মেক আপ তুলে, শাওয়ারের নীচে অভিনয়জনিত ক্লান্তি ও বিবস্বানজনিত বিরক্তি ধুয়ে ফেলতে ফেলতে সে অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল, তাকে একটু দুঃসাহসী হতেই হবে অতঃপর, না হলে সিনেমুভির টিমের এই আপাতশান্ত চেহারাটার ভেতর যে একটা চোরাস্রোত ঘুলিয়ে আছে তা পরিষ্কার হবে না তার কাছে। অতএব বেশ দামি শাড়ি ব্লাউজে নিজেকে মুড়ে, কিছুটা প্রসাধনে নিজেকে প্রেজেন্টেবল করে সন্ধের পর ধীরপায়ে গিয়ে দাঁড়াল বিবস্বান বসুর ঘরের সামনে। দরজাটা

ভেজানোই ছিল, ঠেলে ঢোকার আগে হঠাৎ খেয়াল করল, দূরে বারান্দার এক দুরূহ কোণে দাঁড়িয়ে আছেন রুমেলা। এতদূর থেকে তাঁর মুখভঙ্গি পড়তে না পারলেও গার্গীর মনে হল সন্ধের আলোয় গার্গীর ওই ঝকঝকে অভিসার নিশ্চয়ই তাঁর চোখে দ্বিগুন আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে এই মুহূর্তে।

ভেতরে ঢুকতেই প্রত্যাশামতো সে দেখল, সেন্টার-টেবিলের ওপর কোনও বিদেশি স্কচের বোতল খোলা, পাশে জলের ভরভরন্ত জগ আর দু দুটি গেলাস। তাদের একটি সোনালি পানীয়ে পূর্ণ, অপরটি এখনও খালি, সম্ভবত অপেক্ষা করছে গার্গীর জন্যই।

গার্গীকে দেখে মিষ্টি করে হাসলেন সুপুরুষ ও সুদর্শন বিবস্বান, দ্রুত উঠে এসে প্রথমে টুক করে ল্যাচকি ঘুরিয়ে লক করে দিলে দরজাটা। অতঃপর ভারি নিশ্চিন্তভঙ্গিতে বললেন, বোসো।

গার্গীর মুখে তখন একরাশ রক্ত ঢেউ খেলে যাচ্ছে। প্রবল টেনশনের মধ্যে দেখতে পেল, খালি গেলাসটায় তখন সোনালি পানীয় ঢালছেন বিবস্বান, তাতে পরিমাণমতো জল মেশাতে মেশাতে বললেন, তোমার অভিনয় সুপার্ব হচ্ছে, গার্গী। এরকম একজন অভিনেত্রীই তো এখন চাই বাংলা সিনেমায়। আমার নেক্সট বইতে পরিচালক একজন নতুন অভিনেত্রী খুঁজছেন, তোমার নামটাই তাঁর কাছে আমি রেকমেন্ড করব ভাবছি।

বলতে বলতে পূর্ণ গেলাসটা এবার গার্গীর দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, লেট আস এনজয় টু নাইট। নিজের ভেতর অত গুটিয়ে থাকলে কি চলে তোমার মতো পাকা অভিনেত্রীর!



বিবস্বান বসুর বিলাসবহুল ঘরটিতে হঠাৎ একেবারে একা হয়ে যেতে কয়েক মুহূর্ত গার্গীর বুকের ভেতর একটা ভোঁ-কাট্টা ঘুড়ির মতো অসহায়তা, সেইসঙ্গে অনিরাপত্তার শিরশিরানি। ভীষণ একা মনে হল নিজেকে, যদিও তখন সামনেই সোনালি পানীয়ের গেলাস হাতে নিয়ে তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে হাসছেন বিবস্বান বসু। তাঁর চোখ লাল, টিউবের ঝকমকে আলোয় টসটস করছে গ্ল্যামারসর্বস্ব মুখখানা, সে মুখ দেখেই গার্গী অনুভব করতে পারছে এই মুহূর্তে তার কাছে কী চান সেলুলয়েডের জগতের এই সুদর্শন নায়ক। গার্গীর হাতেও পানীয়ের গেলাস ধরিয়ে দিয়ে তিনি তখন হাসি-হাসি মুখ করে বলছেন, চিয়ার্স।

গার্গী অস্ফুটে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল, নিজেই বুঝে উঠতে পারল না কী শব্দ বেরুল তার মুখ দিয়ে, তবে তার তীক্ষ্ণ নজর তখন স্থির হয়ে আছে বিবস্বানের দিকে। তার তো জানাই ছিল, সন্ধের পর চলচ্চিত্র-জগতের এই নায়কের ঘরে ঢুকলে ঠিক কী কী ঘটবে, কী সাংঘাতিক

আমন্ত্রণ অপেক্ষা করছে তার জন্য, জেনেশুনেই সে খুবই দুঃসাহসীর মতো হোটেলের এই বিশেষ ঘরটিতে আজ ঢুকে পড়েছে বিবস্বান বসুর স্বরূপ উদঘাটন করতে।

সে তার হাতের গেলাসটার দিকে একলহমা তাকিয়ে দেখল, তাকে সম্মোহিত করতে ভেতরে টলটল করছে উষ্ণ, সোনালি স্কচ। দেখে বেশ শিউরেই উঠল। পানীয়ের ভেতরকার লোভনীয় আমন্ত্রণ কীভাবে এড়ানো যায় তাও ভেবে নিল তৎক্ষণাৎ। সেন্টার-টেবিলের ঠিক নীচেই একটা মাঝারি-আকারের উগালদান। হোটেলের মেহমানদের যাতে পানের পিক ফেলতে ঘন ঘন সোফা বা বিছানা ছেড়ে উঠতে না হয় সেজন্যে এই নকশা-কাটা তামার চমৎকার উগালদানটি রাখা আছে গার্গীর পায়ের কাছে। সে তো জানেই, বিবস্বান বসু চাইছেন, পানীয়ের প্রভাবে তাকে এহেন সন্ধের জাদু-আলোয় বশ করতে ফেলতে, ঠিক যেভাবে তিনি প্রতিরাতে সম্মোহিত করতেন বর্ণনাকে, কিংবা আরও আরও নায়িকার ভূমিকাপ্রত্যাশী মেয়েদের, কিন্তু গার্গীকে তো সেভাবে বিবস্বাদ বসুর ফাঁদে পা দিলে চলবে না। উগালদানটিই হবে তার অন্যতম পরিত্রাণের পথ।

একটু আগেই সে ঘরে ঢুকতে বিবস্বান প্রায় উপোসী বাঘের মতো যেভাবে ল্যাচকি ঘুরিয়ে ইন্টারলক করে দিয়েছেন রুমের দরজা, তাতেই বোঝা গেছে তাঁর অভিপ্রায়। এক মুহূর্ত সেই বন্ধ দরজার দিকে কাঁপন-ধরা বুকে তাকিয়ে হঠাৎ তার পানীয়ে একটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে বলল, হুঁ, কী যেন বলছিলেন?

স্কচের গেলাসে তাকে চুমুক দিতে দেখে ভারি উল্লসিত দেখাল বিবস্বানকে, তাঁর চোখ দুটোয় তখন উপচে পড়ছে এক প্রবল লালসা। দ্রুত নিজের গেলাস শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে অভ্যস্ত দক্ষতায় আবারও ভরে ফেললেন সেটা, গলায় স্ফূর্তির শব্দ করে মহা-উৎসাহে বলতে শুরু করলেন, তোমার অ্যাক্টিং দেখেই বুঝেছি, তোমার ভেতর একটা দারুণ সম্ভাবনা আছে। ঋষভদার সঙ্গে সেদিন অনেকক্ষণ আলোচনাও হয়েছে তোমাকে নিয়ে। উনিও আমার সঙ্গে একমত। বললেন, ফিচার-ফিল্মে নামলে তুমি অনেক বাঘা-বাঘা হিরোইনকে টেক্কা দিতে পারবে। তাই ভাবছি—

বলতে বলতে গেলাসে আরও বড় একটা চুমুক দিয়ে বললেন, আমার কাছে অনেকগুলো ছবির অফার এসেছে, তার মধ্যে একটা একেবারেই নায়িকা-প্রধান, খুব গ্ল্যামারাস রোল, সেটার জন্যে তোমার কথাই ভেবে রেখেছি আমি—

গার্গী শব্দ করে হাসল, সো কাউন্ড অব ইউ, মিঃ বোস।

'মিঃ বোস' শুনে বিবস্বানের ভুরু দুটো সামান কোঁচ, হঠাৎ খেয়াল হল ততক্ষণে গার্গীর গেলাসও খালি, তাই কোঁচ সিধে করে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সেটিও পুনর্বার পূর্ণ করতে, বললেন, তুমি কলকাতায় ফিরেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো। ওরা বোধহয় নভেম্বরেই শুটিং শুরু করে দেবে—

আরও অনেকক্ষণ এরকম বকবকানি শোনার পর গার্গী আবারও শব্দ করে হাসল, আপনি যে আমার অভিনয় দেখে খুশি হয়েছেন, তাতেই আমার কী যে ভাল লাগছে!

গার্গীর দ্বিতীয় গেলাসটাও খালি হয়ে যেতে তিনি তৃতীয়বার সেটা পূর্ণ করতে করতে বললেন, তুমি এটা দ্রুত শেষ করে তৈরি হয়ে নাও। আমি বাথরুম থেকে আসছি—

লখনউ-চিকনের কাজ করা কমলারঙের পাঞ্জাবি আর সাদা ধবধবে চুস্ত্ পরিহিত বিবস্বানের দীর্ঘ শরীরটা স্লিপারে ফটফট শব্দ তুলে বাথরুমের ভেতর মিলিয়ে যেতেই প্রায় দামামা বাজাতে শুরু করল গার্গীর বুকের ভেতর। সোফা থেকে উঠে ঘরের মধ্যে একবার দ্রুত চক্কর দিল দরজার

ইন্টারলকের চাবিটা কোথাও আছে কি না তার হদিস পেতে, না-পেয়ে নার্ভাস-নার্ভাস লাগল কিছুটা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিবস্বান বেরিয়ে আসবেন বাথরুম থেকে, তার আগেই পরিত্রাণের পথটা খুঁজে বার করতে হবে। খুবই হিসেব করে, জেনেশুনেই সে বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়েছে আজ, এখন বুঝে উঠতে পারছে না সত্যিই কতখানি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে।

চাবির খোঁজে প্রথমেই চলে গেল-ড্রেসিং টেবিলের কাছে, তার ড্রয়ারগুলো টেনে টেনে দেখল, সবগুলো ধূ ধূ ফাঁকা, চকিতে একবার আয়নায় চোখ পড়ে যেতে দেখে নিল নিজের অবয়বটাও, একমুহূর্ত অবাকও হল, কারণ হঠাৎ মনে হল, সে যেন একটু বেশিই সেজে ফেলেছে আজ, তাইই বেশ চেকনাই লাগছে তার মুখখানা, আর তাতেই বিবস্বান বসুকে বোধহয় একটু বেশিই লোভী-লোভী লাগছে, আর এহেন লালস-মুহূর্তেই তাঁর সঙ্গে টক্কর দিতে হবে ভেবে গার্গীর ভেতর আতঙ্কের সঙ্গে এক আশ্চর্য উল্লাসও।

ড্রেসিং-টেবিল থেকে সে দ্রুত চলে গেল ওয়ারড্রোবের দিকে, সেখানেও চাবি নেই, শুধু বিবস্বানের একরাশ বাহারি শার্ট-প্যান্ট-পাজামা-পাঞ্জাবির সমাহার। সেখান থেকে চলে গেল শৌখিন আলমারিটার কাছে, টান দিতেই হাট করে খুলে গেল পাল্লাদুটো, তার ভেতর কিছু টুকিটাকি জিনিস রাখা আছে, সবই বিবস্বানের দৈনন্দিন ব্যবহার্য, এটা-ওটা সরিয়ে দেখতে দেখতে প্রায় ঘাম করতে লগল গার্গীর শরীরে। চাবিটা কোথাও নেই। হয়তো বিবস্বানের পাঞ্জাবির পকেটেই রয়ে গেছে ওটা। তাহলে এখন কী করে পালাবে এখান থেকে! আলমারির ভেতর হঠাৎই একটা লেডিজ ভ্যানিটিব্যাগ আবিষ্কার করে খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠল গার্গী। হঠাৎ রুপোলি জগতের নায়কের আলমারিতে ব্যাগ এল কোত্থেকে তা ভেবে অবাক হল, ব্যাগটা কেনই বা রাখা আছে এখানে! কারই বা এটা!

দ্রুত ব্যাগটা তুলে নিয়ে তার ভেতরটা খুলে দেখতেই সহসা রেলগাড়ি চলে গেল তার হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়ে, তৎক্ষণাৎ মনে হল ব্যাগটা এই মুহূর্তে তার দরকার, ভীষণ দরকার, কিন্তু এখন বিবস্বানের চোখের সামনে দিয়ে ব্যাগটা নিয়ে বেরুনোও প্রায় অসম্ভব।

সেই মুহূর্তে বাথরুমের দরজায় খুট করে শব্দ হতেই একটা হিম শিহরন তার শরীর কাঁপিয়ে বয়ে গেল। ভ্যানিটিব্যাগটা চট করে এক হাতে নিয়ে অন্য হাতে শাড়ির আঁচল গায়ে জড়িয়ে টেনেটুনে ঢাকা দিল ব্যাগটা। আলমারির পাল্লা বন্ধ করে ছিটকে চলে এল তার সোফায়, যেখানে বসে ছিল একটু আগেই। তার গেলাসের তৃতীয়বারের পানীয়ও ততক্ষণে খালি করে ফেলেছে সেন্টার-টেবিলের পাশেই রাখা পানের পিক ফেলার বাহারি উগালদানটার ভেতর। নকশা-কাটা উগালদান ততক্ষণে সোনালি পানীয়ে টইটম্বুর। গার্গীর বদলে উগালদানটিই বোধহয় এতক্ষণে নেশায় টলালমান।

গার্গী তৃতীয়বারের মতো গেলাস খালি করে ফেলেছে দেখে বিবস্বান ভারি খুশি হলেন। লাল চোখদুটো তখন আরও রক্তবর্ণ, বাথরুম থেকে পাঞ্জাবি-চুস্ত ছেড়ে পরে এসেছেন গাঢ় ম্যাজেন্টারঙের একটা দামি হাউসকোট, ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট, সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, কী হল, এখনও তৈরি হওনি!

গার্গীর বুকের ভেতরটা তখন অসম্ভব ফাঁকা, হাসতে চেষ্টা করছে, কিন্তু হাসতেও পারছে না, তবু কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বাস মিশিয়ে বলল, অত তাড়ার কী আছে, মিঃ বোস, নাইট ইজ টু-উ-উ ইয়ং। আরও দু-এক রাউন্ড হয়ে যাক।

—আরও! বিবস্বান বসুকে বেশ বিস্মিত দেখাল, খুশিও হলেন সম্ভবত, ততক্ষণে সোফায় বসে

আবার দুটি গেলাস ভরতে ভরতে বললেন. তোমার খুব অবোস-টবোস আছে বলে মনে হচ্ছে!

—হ্যাঁ, তা একটু আছে, পার্টিতে মাঝেমধ্যে যেতে হয় তো—

—দ্যাট'স নাইস, বলে আবার গেলাস তুললেন, চিয়ার্স।

—চিয়ার্স, গার্গীও চুমুক দেওয়ার ভান করল, অপেক্ষা করতে লাগল বিবস্বান কতক্ষণে তাঁর গেলাসটি শূন্য করে ফেলেন। বিবস্বান অবশ্য এ কাজে যে ভারি তুখোড়, পানীয়ের খেলুড়ে হিসেবে খুবই দক্ষ, ক্রমাগত তার প্রমাণ রাখতে লাগলেন গার্গীর কাছে। এতক্ষণে তাঁর চিবুক অনেকটা ঝুলে পড়েছে, হাতও কাঁপছে একটু-একটু, চোখ টকটকে লাল, সে-দৃশ্যে যে-কোনও মেয়েরই অন্তরাত্মা উড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু গার্গী এবার বিবস্বানের চোখে চোখ রেখে তার খেলাটা শুরু করল, মিষ্টি করে হেসে বলল, আপনি নিশ্চয়ই প্রস্তুত, মিঃ বোস?

—ও, শিওর, বিবস্বান তাঁর গেলাস রেখে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন গার্গীর দিকে, কিন্তু গার্গী তা গ্রাহ্য না করে বলল, আচ্ছা মিঃ বোস, যে-রাতে বর্ণনা সেনগুপ্ত খুন হয়েছিল. সেদিন সন্ধেয় বর্ণনা আপনার ঘরে কেন এসেছিল বলুন তো?

বিবস্বান সহসা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে গিয়ে বললেন, বর্ণনা! হঠাৎ এর মধ্যে বর্ণনার কথা আসছে কেন!

—আমার একটু দরকার আছে, মিঃ বোস। বলুন তো, কেন এসেছিল বর্ণনা?

বিবস্বান রক্তবর্ণ চোখে গার্গীর দিকে তাকিয়ে ঘাড় ঝাঁকাতে লাগলেন, বর্ণনা আমার ঘরে আসতে যাবে কেন? কে বলল তোমাকে?

—আমার কাছে তার প্রমাণ আছে, মিঃ বোস। একেবারে অকাট্য প্রমাণ। আপনি এড়াতে চাইলেও এখন আর বর্ণনাকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারবেন না। আর এড়াতে চাইলেও তা একেবারেই আপনার বিরুদ্ধে যাবে কিন্তু—

বিবস্বানের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল সহসা, কী বলতে চাও তুমি?

—আমি জানতে চাই, বর্ণনা হঠাৎ কেন আপনার ঘরে সেদিন সন্ধেয় এসেছিল?

বিবস্বান এতক্ষণে একটু নরম হয়ে বললেন, এমনি। এমন তো রোজই একবার করে আসত।

—রোজ আসা, আর সেদিনকার আসার মধ্যে একটা তফাত ছিল। বর্ণনা হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে গিয়ে এসেছিল সেদিন, তাই না?

বিবস্বান ভুরু কুঁচকে বলল, সে কথা তুমি জানলে কী করে?

—যেভাবেই হোক জেনেছি। আপনার ঘরে এসে বর্ণনা কী বলেছিল আপনাকে?

বিবস্বান আর যেন চেষ্টা করেও লুকোতে পারলেন না, বললেন, বোধহয় কেউ তাকে ভয় দেখিয়েছিল কোনও ব্যাপারে। আমাকে এসে বলল, রাতে আপনার ঘরে থাকব।

—তারপর?

—না, থাকেনি শেষপর্যন্ত। ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎই আবার চলে গেল।

গার্গী তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল বিবস্বান বসুর দিকে। বোধহয় বুঝতে চাইছিল কত আউন্স সত্যিকথা বলছেন বিবস্বান, কতটাই বা মিথ্যে।

—আপনার কাছে কি কিছু রাখতে এসেছিল?

বিবস্বান বিস্ময়ে মাথা ঝাঁকালেন, নাহ্—

—কিন্তু সে-রাতে, একটু বেশি রাতেই আপনি কিন্তু আবার বর্ণনার ঘরে গিয়েছিলেন, কেন বলুন তো?

বিবস্বান এবার প্রকৃত অর্থেই বেশ কাঁপছেন থরথর করে, কিন্তু শক্ত হতে চেষ্টা করে বললেন, আমি মোটেই তার ঘরে যাইনি। ও সব আজেবাজে কথা কে ছড়াচ্ছে আমার নামে?

গার্গীর ঠোঁটের কোণে একঝলক হাসি ঢেউ তুলে মিলিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ, যদি বলি সে প্রমাণও আমার কাছে আছে।

বিবস্বান বসু আবারও একটা জার্ক খেয়ে গেলেন যেন, পরক্ষণে ভুরুতে একটা কোঁচ ফেলে বললেন, তা তুমি এসব কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? তুমি পুলিশের লোক নাকি?

'পুলিশের লোক' শুনে গার্গী একেবারে ঘর কাঁপিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল, হাসি থামিয়ে বলল, একেবারেই না। তবে পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল সেদিন তাঁর এক সাব-অর্ডিনেট অফিসারের সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা করছিলেন কিনা, তাই কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম আপনাকে।

দেবাদ্রি সান্যালের নাম শুনে হঠাৎ একদম ভয়ে সিঁটিয়ে গেলেন বিবস্বান বসু, কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, পুলিশ আমাকে নিয়ে আলোচনা করছে নাকি।

গার্গী মনে-মনে হাসছিল একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে পুলিশের নাম শুনে ভয়ে, আতঙ্কে এতখানি কুঁকড়িয়ে যেতে দেখে। বিবস্বানের কথার উত্তর না দিয়ে এবার বলল, আচ্ছা মিঃ বোস, বর্ণনা সেনগুপ্তকে আপনি কতদিন ধরে চিনতেন?

বিবস্বান তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, এই তো, লখনউ আসার দিন, ট্রেনে উঠেই তার সঙ্গে আলাপ।

গার্গী আবার তার কড়া নজর ন্যস্ত করল বিবস্বানের ওপর, আমার কাছে লুকোতে চেষ্টা করবেন না, মিঃ বোস। আমি জানি, বর্ণনার সঙ্গে আপনার আলাপ অনেকদিনের।

বিবস্বান ভয়ার্ত চোখে ঘাড় ঝাঁকাতে লাগলেন, না, না, কখনওই ওকে দেখিনি এর আগে। কী যা তা বলছ তুমি?

গার্গী তার আগের বক্তব্যে অনড় হয়ে রইল, আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন, মিঃ বোস, বর্ণনার সঙ্গে আপনার অনেকদিনের আলাপ!

বিবস্বান বসু ঘাড় ঝাঁকিয়ে আবার 'না না' বলতে যাওয়ার আগেই গার্গী বলল, কেন অস্বীকার করছেন! মিঃ বোস! আমি জানি কোনও সিনেমায় নায়িকার রোলের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বর্ণনা অনেকদিন ধরেই ঘোরাঘুরি করছিল আপনার কাছে। বর্ণনাকে আপনি বলেওছিলেন, পরের ছবিতে তার নাম সুপারিশ করবেন পরিচালকের কাছে।

বিবস্বান বসু সহসা স্তব্ধ হয়ে গেলেন যেন! তাঁর সেই সিল্যুট হয়ে যাওয়া অবয়বের দিকে তাকিয়ে গার্গী তখনও বেশ কর্তৃত্বের গলায় বলছে, তাহলে এবার বলুন তো, মিঃ বোস, রুমেলা রায়ের সঙ্গে তো আপনাব বহুদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আপনার সুপারিশেই রুমেলা রায় 'সোনালি ঘুঙুর' সিরিয়ালের নায়িকা হয়েছেন। অমৃতসর মেলের ক্যুপেয় রেল-কর্তৃপক্ষের চার্ট অনুযায়ী রুমেলা রায়ের সঙ্গেই থাকার কথা ছিল আপনার, অথচ বর্ণনা সেনগুপ্ত দিব্যি রুমেলা রায়কে হঠিয়ে নিজে জায়গা করে নিল আপনার সঙ্গে। বর্ণনা আপনার একেবারে অপরিচিত হলে কি এটা সম্ভব হত!

বিবস্বান বসুর বাকশক্তি যেন রহিত হয়ে গেল হঠাৎ।

—তাহলে এবার বলুন তো, মিঃ বোস, হঠাৎ বর্ণনা এত সাহস আর শক্তি পেল কোত্থেকে? রুমেলা রায়ের মতো একজন জাঁদরেল নায়িকাকে সরিয়ে দুদিনের একটা খুদে নায়িকা হঠাৎ

আপনার সমস্ত সত্তা এমনভাবে জুড়ে নিল শুধু কি সে একজন ফ্লার্ট-অভিজ্ঞ যুবতী বলেই! না কি আরও কোনও গোপন ব্যাপার আছে এর মধ্যে?

বিবস্বান এতক্ষণ পরে প্রতিবাদ করতে পারলেন, না, না, এর মধ্যে কোন গোপনীয়তা নেই।

—কিন্তু আমি যদি বলি, বর্ণনা আপনার কোনও গোপন দুর্বলতার কথা জানত, আর সেজন্যেই সে আপনার ওপর রেইন করছিল এ ক'দিন?

বিবস্বান বসু আবার ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলেন গার্গীর অভিযোগ, এ সব কী আজেবাজে কথা বলছ তুমি? কে তোমাকে এ সব কথা বলেছে! অল ড্যাম লাইজ।

গার্গী হেসে উঠল, আপনি জানেন, মিঃ বোস, এর একটা কথাও মিথ্যে নয়। সে-রাতে বর্ণনা আপনার কাছে এসেছিল ভয় পেয়েই, কিন্তু তারপর কোনও কারণে আপনি তাকে রাতে থাকতে দিতে রাজি হননি। আপনার সঙ্গে তার কিছু কথা-কাটাকাটিও হয়েছিল এ নিয়ে। সে তার ঘরে ফিরে যাওয়ার পর আপনাকে আবার গভীর রাতে যেতে হয়েছিল তার ঘরে। কেন বলুন তো, মিঃ বোস?

বিবস্বান বসুর মুখটা এবার ফ্যাকাসে হয়ে আসছে ক্রমশ। কিছু উত্তর দিতে পারলেন না।

—কারণ বর্ণনা কোনও কারণে আপনাকে ব্ল্যাকমেল করছিল।

বিবস্বান বসু চোখ বিস্ফারিত করে বলে উঠলেন, এতসব কথা তুমি, মানে আপনি কী করে জানলেন?

গার্গীর ভেতর ঘুলিয়ে উঠছিল হাসির লহর। একটু আগেই বিবস্বান বসু তাকে ঘরের ভেতর বন্দি করে, একটা অশ্লীল অভিপ্রায়ে প্রায় বাঘের মতো জিব চাটতে চাটতে এগুচ্ছিলেন। হঠাৎ গার্গীর জেরার সামনে সিঁটোতে সিঁটোতে বিড়াল হয়ে গিয়েছেন আপাতত। এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছেন গার্গীকে যে, 'তুমি' থেকে 'আপনি'তে প্রোমোশন দিয়ে ফেলেছেন তাকে। কিন্তু গার্গী তার খেলাটা এখানেই শেষ করতে চাইল না। আরও একটু মোচড় দিতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, লোচ্চা নামে যে-ছেলেটা আপনার সঙ্গে-সঙ্গে থাকে, সে আসলে কে বলুন তো, মিঃ বোস?

বিবস্বান থম্ হয়ে যাচ্ছেন ক্রমশ। বুঝে উঠতে পারছেন না গার্গী এবার তাঁকে আবার কোন বিপাকে ফেলবে! কিছুক্ষণ তার দিকে নির্নিমেষ নিরীক্ষণ করে ফ্যাঁসফেসে গলায় বললেন, আপনি এতসব কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন আমাকে?

গার্গী মুচকি হেসে বলল, আমি নয়, এ সব কথা পুলিশ-ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যালই দু-একদিনের মধ্যে জিজ্ঞাসা করবে আপনাকে। তার জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি থাকবেন। আর হ্যাঁ, পুলিশ আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করবে আপনাকে।

বিবস্বান হাঁ করে গার্গীর পরবর্তী তীরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। সদ্য পরিচিতা এক যুবতী যার সঙ্গে তিনি সিরিয়ালে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন, তার কাছে এমনভাবে পর্যুদস্ত হচ্ছেন যা বোধহয় তাঁর এ তাবৎ জীবনে কখনও হননি।

—আপনি কি জানেন, মিঃ বোস, বর্ণনাকে যখন পোস্ট মর্টেমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন তার আঙুলে একটা আংটি পাওয়া গেছে, যাতে 'আর' অক্ষরটি মীনে-করা। এখন প্রমাণ হচ্ছে সে-আংটিটা আদতে আপনারই।

বিবস্বান লাফিয়ে উঠতে চাইলেন, সে কি, সে-আংটি আমার হতে যাবে কেন? 'আর' শব্দের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক!

—আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাহলে আপনার হাতের অনামিকায় যে-

আংটিটা ছিল. সেটা এখন নেই কেন!

—আমার হাতে! বলতে বলতে বিবস্বান তাঁর অনামিকায় চোখ রাখতেই যেন বিস্মিত হলেন, নিশ্চয়ই তাহলে কলকাতায় ভুলে ফেলে এসেছি সেটা।

গার্গী আবার শব্দ করে হাসল, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এতসব প্রমাণের পর পুলিশ যদি আপনাকে বর্ণনা-হত্যার দায়ে সাব্যস্ত করে তবে কি খুব ভুল করবে, মিঃ বোস!

—আমি! বর্ণনাকে! বিবস্বান বসু প্রায় খেই হারিয়ে ফেললেন তাঁর কথার, কে বলছে এ সব! অল লাইজ—

—দিন তো মিঃ বোস, দরজার চাবিটা দিন। আর আজ সারারাত ধরে ভাবুন, যে-জালে আপনি নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন, তার থেকে রেহাই পাবেন কীভাবে! পুলিশ কিন্তু আরও কঠিন জেরার সামনে ফেলবে আপনাকে। দিন, চাবিটা দিন—

গার্গী শেষ-কথাটায় প্রায় ধমকই দিল বিবস্বান বসুকে। বিবস্বান সম্মোহিতের মতো তাঁর একটু আগেই ছেড়ে রাখা পাঞ্জাবির ঝুল পকেট থেকে দ্রুত বার করে দিলেন চাবির রিং। সেটা হাতে পেতেই সোফায় বিবস্বান বসুকে সন্ত্রস্ত, স্তম্ভিত করে রেখে গার্গী দরজার লক খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে। বারান্দায় পা দিয়ে একটা বড় করে নিঃশ্বাস নিল, যেন দারুণ লড়াই দিয়ে মুক্তি পেল কোনও দুর্ধর্ষ বাঘের দাঁত আর নখের আক্রমণ থেকে।

বারান্দা পেরিয়ে তার রুমের সামনে গিয়ে দেখতে পেল, সায়ন ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে কানপুর থেকে। ঘড়িতে তখন রাত নটার মতো। প্রায় দু'ঘণ্টার মতো যুদ্ধ চালাতে হয়েছে এক মাতাল লম্পটের সঙ্গে, আর যে-দাওয়াই প্রয়োগ করে কোণঠাসা করতে হয়েছে তাকে, তার কিছুটা সত্যি, কিছুটা বানানো, কিন্তু কী আশ্চর্য, তার প্রশ্ন বাণগুলো এমন ঠিক ঠিক চাঁদমারি বিদ্ধ করে ফেলল যা সে ভাবতেই পারেনি কোনও ভাবে। সায়ন ইতিমধ্যে ফিরে এসে তাকে হোটেলের ঘরে না পেয়ে অবাক হয়েছে নিশ্চয়ই, কী ভাবছেই বা কে জানে! বিবস্বানের ঘরে তার এই অভিসারের বার্তা একমাত্র রুমেলা রায়ই যা দেখেছেন, সে-সংবাদ সায়নের কানে পৌঁছোনোর কথা নয়।

রুমের বেল টিপতেই সায়ন দরজা খুলে দিয়ে তাকে দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেলল, আরে, কোথায় গিয়েছিলে?

গার্গী তার দিকে তাকিয়ে রহস্যময়ীর মতো হাসল, পরক্ষণে তার শাড়ির আড়ালে ঢাকা লেডিজ ভ্যানিটি-ব্যাগটা বার করে বলল, এটার জন্যই।

—কী ওটা! কিনে আনলে নাকি?

—উঁ হু। খুবই অমূল্য সম্পদ এটা, মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায় না। তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে রাক্ষসের সঙ্গে বহুক্ষণ লড়াই করে তবেই উদ্ধার করে আনতে হল সাত রাজার ধন এক মানিক।

গার্গীর হেঁয়ালি সায়নের বোঝার কথা নয়। সে হোটেলে ফিরে ইতিমধ্যে সাওয়ারের নীচে ফ্রেশ হয়ে পাঞ্জাবি-পাজামায় বেশ হালকা মেজাজে আছে, বলল, তুমি যে খুবই বীরাঙ্গনা সে-খবর সায়ন চৌধুরি জানে। কিন্তু যা লড়াই করে আনতে হল সে কী এমন গুপ্তধন! কী আছে ওর মধ্যে!

গার্গী আবার হাসল রহস্যময়ীর মতো। ব্যাগটা দেখিয়ে বলল, এর মধ্যেই তো আছে বর্ণনার হত্যাকারীর ঠিকানা।

সকালে ঘুম ভাঙতেই বিছানায় আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসতে বসতে গার্গীর মনে পড়ল, আজ তাদের শুটিং করার কথা লখনউয়ের বিখ্যাত ট্যুরিস্ট-স্পট বড়া ইমামবাড়ায়, যে-জটিল গোলকধাঁধাটি আজ থেকে দুশো বছরেরও আগে তৈরি করেছিলেন তদানীন্তন লখনউ-নবাব আসফ-উদ-দৌল্লা। ভুলভুলাইয়া নামে পরিচিত সেই রহস্যময় অলিন্দ আজও প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু বলেই পরিচালক ঋষভ মুখার্জি ঠিক করেছেন, তার ভেতরকার আজব সুড়ঙ্গগুলো বিশেষ কায়দায় ধরে রাখবেন ভিডিওর টেপে, যাতে দর্শকের কাছেও টানটান উত্তেজনার ও রোমাঞ্চের বিষয় হয়ে ওঠে গোটা এপিসোডটি।

কাল সন্ধের প্রবল টেনশনের কারণেই বোধহয় ঘুম ভাঙতে সামান্য দেরি হয়ে গিয়েছিল গার্গীর। চোখে ঘুম-ঘুম ভাবটা কেটে যেতেই দেখল, সায়ন ইতিমধ্যে শেভ শেষ করে বাথরুমের শাওয়ারের নীচে। আজও সকলে তার কানপুরে যাওয়ার কথা, এমনই বলেছিল কাল রাতে। ফলে তার অভাবনীয় সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখতে আজও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে যাতে বেরিয়ে পড়তে পারে তার ব্যবসায়ের পরিধি আরও একটু বাড়িয়ে নিতে। রাতে গার্গীকে একটু খোঁচাও দিয়েছিল এই বলে যে, খুব ফাঁকি দিচ্ছ, এম. ডি. সাহেব। সিনেমুভির রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্‌কে অবহেলা করছ কিন্তু!

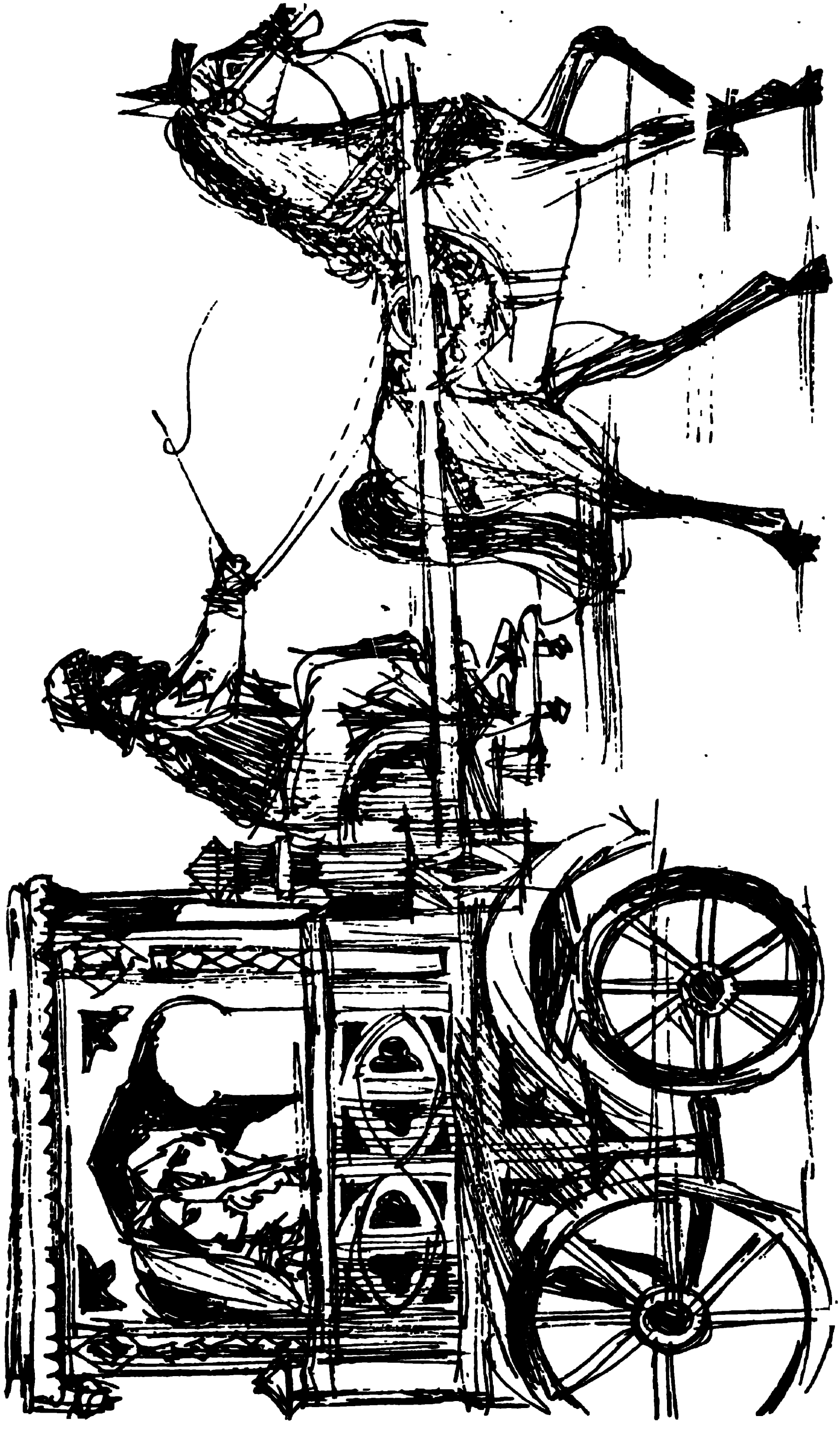
গার্গী অপরাধীর মতো হেসে বলেছিল, আর দু'তিনটে দিন আমাকে সময় দিন, চেয়ারম্যানসাহেব।

—নো প্রব্লেম। সায়ন চৌধুরি একাই একশো, বলে সায়ন হুড়হুড় করে বলে গিয়েছিল তার কানপুরের সাফল্যের কাহিনী। বলতে বলতে ঘুমিয়েও পড়েছিল এক সময়।

আজও গার্গীকে হারিয়ে দিয়ে সে ঘুম থেকে উঠে, বেলা সাতটার মধ্যেই টিপটপ তৈরি। স্যুটেড-বুটেড হয়ে ব্রিফকেস নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে গার্গীকে একঝলক প্রশস্তি বাক্যে ভূষিতও করে গেল, লখনউ এসে তোমাকে একটু বেশিই সুন্দরী দেখাচ্ছে কিন্তু।

গার্গী একঝলক হেসে, তাকে টা-টা করে এ বার ব্যস্ত হয়ে পড়ল নিজেও তৈরি হয়ে নিতে। তাকেও তো বেরোতে হবে এখনই, সাড়ে সাতটায়, কারণ তাদের পরিচালক চাইছেন, দুপুরে ট্যুরিস্টদের ভিড় বেড়ে যাওয়ার আগেই সকালের অপেক্ষাকৃত নিভৃত মুহূর্তে শুটিং শেষ করে ফেলবেন ভুলভুলাইয়ার।

তৈরি হতে হতে গার্গীর তখন মনে পড়ছে, গতকাল সন্ধের সাংঘাতিক কিছু মুহূর্তের অভিজ্ঞতা। বিবস্বানের ঘর থেকে সে বেরিয়ে আসার পর নেশায় টলোমলো শরীর নিয়ে বিবস্বান



কী আতঙ্কে ভুগেছেন বাকি রাত সে-কথা ভেবেই কৌতুক উপচে আসছিল তার চোখেমুখে। আর একটু পরেই তাঁর পাশে তাকে রেশমবাই হয়ে বসতে হবে বাহারি টাঙার সিটে, সেসময় তাঁর মনে থাকবে কি না গতরাত্রির ভয়াল অভিজ্ঞতা, থাকলে কী হবে তাঁর প্রতিক্রিয়া, তা কে জানে!

ইতিমধ্যে হঠাৎ দরজায় নক শুনে গার্গী উঠে গিয়ে ছিটকিনি খুলল। খুলেই অবাক, সামনে সাজের বাক্স হাতে নিয়ে হাসি-হাসি মুখে মাচানবাবু। কাঁধে একটা কালো রেক্সিনের ব্যাগ, তার ভেতর গার্গীর জন্য লখনউ-ফ্যাশনের একসেট দামি পোশাক। হেসে বললেন, দশ মিনিট সময় দিতে হবে, ম্যাডাম। মেক-আপটা সেরে দি।

—এখনই! গার্গী অবশ্য ভেবেছিল, আগের দিনের মতো হয়তো শুটিং-স্পটে গিয়ে মেক-আপে বসতে হবে। কিন্তু মাচানবাবুর কাছে নির্দেশ আছে অন্যরকম। আজ তারা যখন টাঙায় চড়ে লখনউয়ের পথে যাবে, চলার পথেই তাদের যাত্রাপথের কিছুটা ক্যামেরাবন্দি করে রাখবে রোমিও।

মাচানবাবুর খুবই তৈরি হাত, দশ মিনিটের মধ্যেই তার চুলের কারুকাজ সেরে, মুখে রং ঘষেটষে জানালেন, ড্রেসটা পরে তৈরি হয়ে থাকুন ম্যাডাম, যে-কোনও সময় কেউ এসে আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবে।

মাচানবাবু বেরিয়ে যেতেই তাঁর রেখে যাওয়া রেক্সিনের ব্যাগটা খুলল গার্গী। জরির কাজ করা একটা তুঁতেরঙের ছোট মুহুরির ঘুটন্না, চুড়িদারের মতোই তার নীচের ঘের, কিন্তু ওপরের ঘের ঘের ঢিলেঢালা। সেইসঙ্গে একই রঙের লখনউ-চিকনের ঘন কাজ-করা বেশ জমকালো কামিজ। সেটা পরতেই নিজের চেহারাটা যেন আর চিনতেই পারল না গার্গী। আয়নায় মুগ্ধ হয়ে নিজেকে কয়েকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে অপেক্ষা করতে লাগল, কখন তার ডাক পড়বে।

কিন্তু না, কেউই এল না। পৌনে আটটা হয়ে গেল দেখে একটু যে সে অবাক হল না তা নয়, কারণ তাদের অস্থির পরিচালক অতীব পাঙ্কুয়াল, দু'মিনিট কারও দেরি হয়ে গেলেই হাঁকডাক শুরু করে দেন।

অপেক্ষা করতে করতে গার্গী তখন ভাবছিল, কাল রাতে সায়ন ক্যাপ্টেনের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিল কিছুক্ষণ। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেনকে নাকি থানায় তলব করেছিলেন দেবাদ্রি সান্যাল। নানান জেরার মধ্যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছেন, কেনই বা হঠৎ ক্যাপ্টেন হোটেল ইনে থাকতে এলেন, সেই বিশেষ রাতেই কেন রুমেলার রুমে কাটিয়েছিলেন যে-রাতে খুন হয়েছিল বর্ণনা। হোটেলের রিসেপশন থেকে পুলিশ খবর পেয়েছে, ক্যাপ্টেন নাকি সেদিন গভীর রাতে একবার টলতে টলতে নেমে এসেছিলেন নীচে রিসেপশনে। জানতে চেয়েছিলেন এত রাতে কাছাকাছি কোথাও সিগারেট পাওয়া যাবে কি না। রিসেপশনিস্ট দু'জনই ভারি অবাক হয়েছিলেন ক্যাপ্টেনের অসংলগ্ন কথার ধরনে।

বেলা প্রায় আটটা নাগাদ সজনীবাবু প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে গার্গীকে জানালেন, চলুন ম্যাডাম, আপনার রথ তৈরি।

—রথ! শব্দটা উচ্চারণ করেই গার্গী বুঝে ফেলল, সজনীবাবু আসলে সেই রংচঙে টাঙাটার কথাটাই বলতে চাইছেন, যাতে চড়ে তাকে যেতে হবে লখনউয়ের প্রধান সড়ক বরাবর ভুলভুলাইয়ার দিকে। প্রথমে রাস্তায় কিছুটা শুটিং হবে, তারপর বড়া ইমামবাড়ায়। ভাবতে ভাবতে পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করল, আজ বেরোতে এত দেরি হল যে, সজনীবাবু?

সজনীবাবু কপাল চাপড়ে বললেন, আর বলবেন না, ম্যাডাম। সকালে হোটেলে এসেই শুনি আমাদের পরিচালক স্যারের খুব শরীর খারাপ। ভীষণ মাথা ঘুরছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্লিনিকে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনি। ডাক্তার বললেন, একদম বেডরেস্ট। তারপর একজনকে পাঠিয়ে অনেকটা ব্লাডও নিয়ে গেলেন টেস্ট করবেন বলে। স্যার তো কিছুতেই রেস্ট নিতে চাইছিলেন না। বললেন তাহলে কি শুটিং বন্ধ হয়ে যাবে! শেষে রোমিওবাবু শুটিঙের দায়িত্ব নিতে তবে উনি রাজি হলেন হোটেলে থেকে যেতে।

—তাই! রোমিওই ডিরেকশন দেবে নাকি আজ! গার্গী ভারি খুশি হল যেন। ঋষভ মুখার্জির ব্যক্তিত্ব এমনই একটা রুক্ষ, কর্কশ আবরণে মোড়া যে, তাঁর সামনে অভিনয় করতে ঠিক স্বস্তি বোধ করে না সে।

সজনীবাবু দ্রুত বেরিয়ে গেলেন সম্ভবত অন্য কুশীলবদের তাড়াতুড়ি দিয়ে গাড়িতে তুলতে। গার্গী ঘর থেকে বেরিয়ে সবে দরজা বন্ধ করেছে, সেসময় দেখতে পেল বারান্দার ওদিকে চোখমুখ ফার্নেস করে দাঁড়িয়ে আছেন রুমেলা রায়, পরনে সাদা ধবধবে গাউন। গাউনের ফ্রিল কিছুটা লুটোচ্ছেও মাটিতে, তাতে তাঁর সমৃদ্ধ শরীর বেশ আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে, কিন্তু কোনও কারণে ভীষণ উত্তেজিত। গার্গী দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে, হঠাৎ রুমেলা বেশ কঠিন গলায় ডাকলেন, শোনো—

গার্গী বিস্মিত হল, কারণ এখনও পর্যন্ত রুমেলা রায়ের সঙ্গে তার ভাল আলাপই হয়নি। এই সিরিয়ালে রুমেলার আবির্ভাব হতে আরও কয়েকটি এপিসোড বাকি, তখন তো হবেই এমন ভাবছিল সে! হঠাৎ তাকে এমন তীক্ষ্ণ, রাগত কণ্ঠস্বরে তিনি ডাকবেন তা ভাবতেই পারেনি। গার্গী পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতেই রুমেলা প্রায় হুকুমের গলায় বললেন, আমার ঘরে এসো, কথা আছে—

গার্গী হতচকিত হয়ে ঘড়ি দেখতে যাচ্ছিল কব্জিতে চোখ রেখে। ওদিকে সিনেমুভির সবাই হয়তো অপেক্ষা করছে তার জন্য, সে এখন রুমেলার সঙ্গে কাটালে দেরি হয়ে যাবে সব্বার, কিন্তু তার আগেই শুনল রুমেলার তীব্র হিসহিস স্বর, বেলেল্লাপনার একটা সীমা আছে—

রুমেলার পিছুপিছু তাঁর রুমে ঢুকতেই গার্গী আরও বিস্মিত হয়ে দেখল, ভেতরে ক্রিমরঙের স্যুট পরে বেশ ঝকঝকে হয়ে বসে আছেন ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেনকে দেখে সে ভেবে উথালপাথাল হল, তাহলে সায়ন আজ কানপুরে গেল কার সঙ্গে! একাই নাকি!

রুমেলা ঘরে ঢুকেই সপাটে দরজা বন্ধ করে দিলেন, তারপর গার্গীর দিকে তাকিয়ে আছড়ে দিতে লাগলেন গরম সীসের মতো শব্দবন্ধগুলি, তুমি কাল বি. বি-র ঘরে সন্ধের পর কেন গিয়েছিলে! তোমার তো একটা স্বামী আছে, তার সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছ, হঠাৎ তাকে ছেড়েছুড়ে তুমি বি.বি-র সঙ্গে বেলেল্লাপনা শুরু করে দিলে কেন!

এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না গার্গী, কিছুক্ষণ রুমেলার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, অতঃপর সামলে নিয়ে বলল, ব্যাপারটা আপনি এভাবে ভাবছেন কেন? উনিই আমাকে সন্ধের পর ডেকেছিলেন।

—ডাকবেনই তো। অল্পবয়সী মেয়ে দেখলে তো ওনার মাথার ঠিক থাকে না। কিন্তু তুমি নিশ্চয় একটা ভদ্রঘরের মেয়ে, অন্তত পোশাকআসাক দেখলে তো তাইই মনে হয়, কিন্তু এখন দেখছি, তোমারই চরিত্র খারাপ, নইলে ওর ফাঁদে পা দাও!

গার্গীর মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করে উঠল হঠাৎ, রি রি করে উঠছিল সমস্ত শরীর, তবু

নিজেকে সংযত রেখে বলল, আপনি যা ভাবছেন তা ঠিক নয়।

—ঠিক নয়? তুমি কাল সারা সন্ধে ধরে বি. বি-র সঙ্গে মদ খাওনি? মাখামাখি করোনি দু'ঘণ্টা ধরে? আমি কি কিছু বুঝতে পারি না মনে করেছ? আমি বি.বি-কে হাড়ে হাড়ে চিনি। কেন তোমাকে সন্ধের পর ডেকেছে, কেনই বা তুমি ওর খপ্পরে পড়েছ সব জানা আছে আমার।

গার্গীর শরীর দিয়ে ঘাম বেরোচ্ছে তখন। বিশেষ করে একজন পুরুষের সামনে এভাবে অপমানিত হওয়ার কথা সে ভাবতেই পারছিল না, কিন্তু রুমেলার কথা খণ্ডন করে যথাযথ উত্তর দেওয়াও তার পক্ষে এই মুহূর্তে অসম্ভব। কাল সন্ধের খুঁটিনাটি বিবরণ সাতকাহন করে শুনিয়ে নিজেকে অকলঙ্কিত প্রমাণ করতে হলে যে-পরিস্থিতি আর সময়ের দরকার তাও এখন তার হাতে নেই। শান্ত গলায় শুধু বলল, দেখুন, কাল সন্ধেয় কেন আমি বিবস্বান বসুর রুমে গিয়েছিলাম, তার প্রকৃত কারণ আমি পরে আপনাদের জানাব। আপাতত আমাকে ক্ষমা করুন। বাইরে সবাই অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

দ্রুত হোটেলের নীচে নেমে এসেও সে সুস্থির বোধ করছিল না, ঝাঁ ঝাঁ করছিল মাথার ভেতরটা, শরীরটাও ঝিমঝিম করছিল, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা পর্যালোচনা করার ফুরসতও তার এখন নেই। হোটেলের লনে তখন চারপাশ আলো করে এসে দাঁড়িয়েছে সবুজ ভেলভেটের ছাউনিঅলা সেই ঝকঝকে প্রায়-নতুন টাঙাটি। সহিস উধমলালের মাথায় সবুজ জরিঅলা পাগড়ি, পরনে ঝলমলে পোশাক, হাতে বাহারি ছড়ি। সিরিয়ালের নায়ক-নায়িকাকে নিয়ে ভুলভুলাইয়ার পথে যাত্রার জন্য রোমাঞ্চিত চোখেমুখে প্রস্তুত। রংচঙে গদিঅলা নরম সিটে ইতিমধ্যেই বিবস্বান উঠে বসে আছেন, তাঁর পাশে গার্গী উঠে বসতেই সহিস উধমলাল ছড়ি উঁচিয়ে তাগড়াই-চেহারার তেল-চুঁয়ানো ঘোড়াটিকে ইঙ্গিত করল, মুহূর্তে হোটেলের লন পেরিয়ে টাঙা নেমে এল হজরতগঞ্জের ঝকঝকে প্রধান সড়কটিতে। উধমলালের প্রিয় ঘোড়া প্রিন্সই তখন যেন সিরিয়ালের গ্ল্যামারাস নায়ক এমন ভঙ্গিতে লেজ উঁচিয়ে ছুটে চলল গলায় টুংটুং টুংটুং আর পায়ের খুরে টগবগ টগবগ শব্দ তুলতে তুলতে।

সিরিয়ালের নায়ক পুলক চৌধুরি আর নায়িকা রেশমবাই এভাবেই যাচ্ছেন আজ লখনউয়ের প্রধান আকর্ষণ বড়া ইমামবাড়ার গোলকধাঁধায় কিছুক্ষণ উধাও হয়ে যেতে। ক্যামেরা সেভাবেই অনুসরণ করবে টাঙাটিকে, এরকমই শুনেছল গার্গী, কিন্তু আশেপাশে বা পেছনে কোথাও রোমিও অ্যান্ড কোংকে না দেখতে পেয়ে অবাক হচ্ছিল খুব। এও বুঝতে পারছিল তার পাশে বসা বিবস্বান বসু সম্ভবত কাল সন্ধের ঘটনাক্রম স্মরণ করে খুবই গম্ভীর। ঠিক যেন স্বস্তি পাচ্ছেন না গার্গীর সঙ্গে শুটিং করতে, যদিও সিরিয়ালের চরিত্র পুলক চৌধুরির ভূমিকায় বিবস্বান বসুকে এখন বেশ উদাসীন আর নির্মোহ পুরুষের চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হবে। তাঁর পরনে এখন ইরানি চোগা, আর তেমনই জমকালো চাপকান, পায়ে বাহারি নাগরাই। কী যেন ভাবছেন চুপচাপ। মুখে গার্গীর মতোই হালকা মেক-আপ।

দু'পাশে ঝকঝকে দোকানগুলো সব এখনও খোলেনি, তবু আধুনিক চেহারার অট্টালিকাগুলো দেখতে দেখতে গার্গী এই ভাবনায় আলোড়িত হচ্ছিল যে, সোনালি ঘুঙুর-এর নায়ক পুলক চৌধুরি একজন চমৎকার চরিত্রবান পুরুষ, রেশমবাইয়ের মতো একজন সুন্দরী তবায়েফকে এত কাছে পেয়েও যেখানে সামান্যতম চাঞ্চল্যও অনুভব করেননি, সেই চরিত্রেরই রূপকার বিবস্বান বসুর চরিত্রে কী বিস্ময়কর বৈপরীত্য। বিবস্বানকে অবশ্য এজন্য ধন্যবাদ দিতে হয় যে, তিনি একজন দক্ষ অভিনেতা বলেই এহেন বিপরীত চরিত্রে মানিয়ে নিয়েছেন দিব্যি।

কিন্তু আশেপাশে কোথাও ক্যামেরার চোখ না দেখতে পেয়ে খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল গার্গীর, বাধ্য হয়ে জিজ্ঞাসা করতেই হল বিবস্বানকে, রাস্তায় কি ছবি তোলা হচ্ছে না?

বিবস্বান গম্ভীর হয়ে বললেন, হচ্ছে।

—হচ্ছে! গার্গী আবার চারপাশে তাকাল, ক্যামেরা কোথায় তাহলে?

—ওরা ঠিকঠিক জায়গায় ঠিকই তুলে নেবে।

—তাই! কিন্তু গার্গী তখনও স্বস্তিতে নেই। উধমলালের প্রিন্স তখন তেল-চুকচুকে কেশর দুলিয়ে ছুটে চলেছে গান্ধী মিউজিয়াম, রেসিডেন্সি পার হয়ে গোমতী নদীর কিনার বরাবর। হঠাৎই মনে হল একটা লাল মারুতিভ্যান তাদের অনুসরণ করে চলেছে পেছন পেছন, একটু পরেই দ্রুত তাদের পার হয়ে চলে গেল সামনে, কিন্তু ভেতরে কোনও যাত্রী আছে কি না বুঝতে পারল না। আরও একটু পরে ভ্যানটা গতি কমিয়ে তাদের বাঁ পাশে চলে এল, আর তখনই গার্গী দেখতে পেল গাড়িটির চালক আর কেউ নন, রুমেলার সঙ্গী ক্যাপ্টেন। মুখে জ্বলন্ত চুরুট, চোখে কালো চশমা, তাতে বেশ ভিলেন-ভিলেন দেখাচ্ছে ক্যাপ্টেনকে।

গার্গীর বুকটা কেন কে জানে হঠাৎ ছাঁত করে উঠল ক্যাপ্টেনকে এভাবে তাদের অনুসরণ করতে দেখে। ক্যাপ্টেনের পাশের সিটটা খালি, পেছনে কেউ আছে কি না বুঝতে পারল না কালো কাচে ঢাকা বলে।

সে সময় হঠাৎই বিবস্বান তাকে প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠলেন, এবার সামনের দিকে তাকান, ছবি তোলা হচ্ছে, আমি আঙুল তুলে যেদিকে-যেদিকে দেখাব, সেদিকে তাকাবেন শুধু।

ততক্ষণে টাঙা এসে পৌঁছেছে হুসেনাবাদ ট্রাস্ট রোডে, যে-চওড়া রাস্তাটার বাঁদিকে বড়া ইমামবাড়া, তার ঠিক পাশেই রুমি দরওয়াজা। দূর থেকে সেদিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে কিছু যেন বলছেন বিবস্বান বসু, কিন্তু গার্গীর তা বোধগম্য হচ্ছে না সম্ভবত এই কারণে যে, সংলাপ পরে ডাব্ করে নেওয়া হবে স্টুডিওতে।

বিবস্বান অর্থাৎ পুলক চৌধুরির কথা শুনতে না পেলেও গার্গী জানে সংলাপের এই অংশটুকু। আসলে কলকাতার সাংবাদিক পুলক চৌধুরী তখন ভাবছেন এই ঐতিহাসিক শহরটির রোমাঞ্চকর ঐতিহ্য আর বিস্ময়কর স্থাপত্যের কথা। অযোধ্যার নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে যাঁকে আজও শ্রদ্ধা জানানো হয় সেই নবাব সাদাত আলি খাঁ সামান্য পর্যটক হিসেবে ভারতবর্ষে এসেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। তারপর নিজের যোগ্যতায় প্রথমে অযোধ্যার শাসনকর্তা, তারপর ফয়জাবাদে স্থাপন করতে পেরেছিলেন তাঁর রাজ্যের রাজধানী। তাঁর মৃত্যুর পর একে-একে বহু নবাব সিংহাসনে বসেছেন, আর আশ্চর্য এই যে, সব নবাবই আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন রাজকীয় ঐতিহ্যের চমৎকার সব স্থাপত্য নির্মাণ করে লখনউ শহরটিকে পাশ্চাত্যের কনস্টান্টিনোপল করে তুলতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষাশেষি নবাব আসফ-উদ-দৌল্লার আমলেই ফয়জাবাদ থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় লখনউতে, তারপর থেকেই লখনউ শহরের বাড়বাড়ন্ত। তাঁর আমলেই নির্মিত হয় দৌলতখানা, বিরিয়াপুর কোঠি, বড়া ইমামবাড়া, রুমি দরওয়াজা ইত্যাদি। তাদের মধ্যে বড়া ইমামবাড়া স্থাপত্য হিসেবে এতটাই আশ্চর্যের, বিশেষ করে তার গঠনশৈলী আর সেইসঙ্গে ভুলভুলাইয়ার রোমাঞ্চকর পরিকল্পনা যে, সব ট্যুরিস্টই একবার না একবার হারিয়ে যেতে চাইবেই তার ভেতর।

বিবস্বান বসুর সঙ্গে গার্গী সেই বিস্ময়-অট্টালিকায় এসে পৌঁছতেই টাঙাঅলা উধমলাল তার প্রিন্সের লাগাম টেনে ধরল চকিতে, উতরাইয়ে সাহাব।

কিংবদন্তির এই সাম্রাজ্যে পৌঁছে গার্গীর চোখের যেন পলক পড়ছিল না তখন। বিশাল অট্টালিকা পর্যন্ত লালচে পাথরকুচি বিছানো চওড়া একঢালা পথ, পথের দুপাশে সবুজ লন, লনের মধ্যে রকমারি পাতাবাহার, ফুলেল সৌন্দর্য। সেইসঙ্গে নরম পানীয় আর স্ন্যাক্সের কিছু স্টল। কিন্তু চওড়া পথের ওপাশে যে রাজকীয় স্থাপত্য, তার গঠনশৈলী দুশো বছর পরেও নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকার মতো।

কিন্তু গার্গী আরও আশ্চর্য হচ্ছিল সিনেমুভির টিমকে কোথাও দেখতে না পেয়ে। ইতিউতি তাকিয়েও না-রোমিও না-রানাজি না-দ্বিত্বম কাউকেও না দেখে বাধ্য হয়ে বিবস্বানকে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার, শুটিং আজ হচ্ছে না নাকি!

—না হওয়ার কী আছে! হচ্ছে তো। সবাই ওপরে আছে।

তাদের দুজনকে বাহারি টাঙা থেকে নামতে দেখে সুনসান চত্বরে কোত্থেকে ফুঁড়ে বেরোল একজন পেশাদার গাইড। তাকে যেন আগে থেকে শেখানো-পড়ানোই ছিল, বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে আদাব জানিয়ে বিবস্বানকে বলল, আইয়ে সাহাব, অন্দর আইয়ে—

ইমামবাড়াটির ভেতর যে-বিশাল কক্ষটিতে বিবস্বানের সঙ্গে প্রবেশ করল গার্গী, গাইডের ধারাবাহিক বিবরণ অনুযায়ী সেটির পঞ্চাশ ফুটের উপর উচ্চতা। গম্বুজের মতো গোল হয়ে উঠে গেছে ছাদ, ভেতরে গ্যালারির অংশ ছাড়া কোথাও কাঠের ব্যবহার করা হয়নি এত বড় খিলান-অলা অট্টালিকাতে। নীচের হলঘরটিতে এত এত মোমবাতি আর প্রদীপ জ্বালানো যে, প্রখর আলোয় ঝলমল করছে বিশাল প্রকোষ্ঠ। কিন্তু ইমামবাড়ার রহস্য তার নীচের হল ঘরে নয়, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলে তবেই।

ওপরে সিঁড়ি বেয়ে উঠেই ছোট-ছোট গলির মতো পায়ে-চলার পথ। পাশাপাশি এরকম বেশ কয়েকটা গলি, একটু পরপরই একটা গলি থেকে আর একটা গলিতে যাওয়ার সংযোজক পথ। কখনও গলিতে চলতে চলতে ছোট্ট সিঁড়ি, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলে নীচের মতোই পাশাপাশি গলি আর গলি, সেইসঙ্গে একটু পরপর এক গলি থেকে আর এক গলিতে যাওয়ার সংযোজক পথ। কখনও গলি থেকে আবার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আবার গলি। কোনও গলি খুবই অন্ধকার, কোনওটা আবার উজ্জ্বল, ঝকঝকে।

নীচের হলঘরটার ওপরে, দোতলা-তিনতলা জুড়ে চারপাশেই এহেন গলির সাম্রাজ্যে ঢুকে চলতে চলতে একটু পরেই যে-কোনও পথিকের পথ গুলিয়ে যাবে নিশ্চিত। পেশাদার গাইডদের অবশ্য প্রতিটি গলির রহস্যই খুঁটিনাটি জানা। যে-গাইডটি বিবস্বান আর গার্গীকে গলি আর সিঁড়ির এই গোলকধাঁধায় পথ চিনিয়ে চিনিয়ে, কিংবা বলা যায় পথ গুলিয়ে গুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তার নাম জানাল, শের সিং। তার চিবুকে চাপদাড়ি, মাথায় কালো টুপি, পরনে সবুজ-নীল চেক-কাটা লুঙ্গির ওপর সামান্য পুরনো একটা পাঞ্জাবি, তার ওপর লখনউ-চিকনের কাজ করা হাত-কাটা কোট। বিচিত্র চেহারার গাইডটি তখন লখনউয়ের টান মেশানো হিন্দিতে বলতে বলতে চলেছে ভুলভুলাইয়ার আশ্চর্য গঠন পরিকল্পনা। রাশি-রাশি সিঁড়ি আর গলিতে চলতে চলতে বোঝাচ্ছে, এই গোলকধাঁধায় ঠিক যে-পথ দিয়ে তারা এসে পৌঁছেছে, ফিরতে হবে সেই পথেই। অন্য কোনও গলি বা সিঁড়ি দিয়ে পৌঁছনোই যাবে না নীচের হলঘরে।

ওপরের গাল দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, এক গলি থেকে আর এক গলিতে যেতে যেতে অনেক নীচের হলঘরটা বারবারই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু যারা ফেরার পথের সেই নিশানাটা জানে না, তারা হাজার চেষ্টা করলেও আর গোলকধাঁধা থেকে খুঁজে বার করতে পারবে না নীচে নামার সেই সিঁড়িটা।

গাইডের পিছুপিছু গলি আর সিঁড়ির জটাজালে জড়িয়ে যেতে যেতে যেমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল গার্গী, তেমনই এও ভেবে অবাক হচ্ছিল, তা হলে তাদের শুটিং কি আজ হচ্ছে না! পরিচালক ঋষভ মুখার্জি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণেই কি বাতিল করা হয়েছে ছবি তোলার-কাজ, না কি রোমিওরা তাদের ক্যামেরা, সাউন্ড রেকর্ডার, মনিটর ইত্যাদি নিয়ে এখনও পৌঁছতে পারেনি এখানে। যদি শুটিং বাতিলই হয়ে থাকবে, তাহলে সকালে উঠে ঘটা করে তার মুখেচোখে রং মাখাবার দরকারই বা হল কী কারণে।

জিজ্ঞাসা করবে-না করবে-এ করেও শেষপর্যন্ত তৃতীয় বারের মতো জিজ্ঞাসা করল খুবই উদাসীন-উদাসীন ভঙ্গিতে তার পাশে হাঁটতে থাকা বিবস্বানের দিকে, কাউকে দেখছি না তো আজ!

বিবস্বান কোনও জবাব না দিয়ে নির্বিকারভাবে বললেন, জায়গাটা কিন্তু বেশ গা-ছমছমে, তাই না?

বিবস্বানের এমন নির্বিকার ভঙ্গি বেশ অবাক করছিল গার্গীকে। তার কথার জবাব তো দিলেনই না, বরং ভারি উপভোগ করছেন যেন আজকের শুটিং না-হওয়াটা। সে আবারও কিছু বলার আগেই গাইড হঠাৎ থেমে গেল গলির মাঝখানে, বলল, আমাদের এখানে একটা নিয়ম আছে, সাহাব। কিছুক্ষণ আপনাদের একা-একা চলতে দেব। ফেরার পথ খুঁজে বার করতে হবে আপনাদের, দেখি পারেন কি না।

বলতে বলতে গাইড শের সিং তার পুরু ঠোঁটে একচিলতে হাসির প্রলেপ মাখিয়ে কোথায় হাওয়া! বিবস্বান যেন বেশ মজা পেলেন প্রস্তাবটিতে। বললেন, চলো তো রেশম, খুঁজে বার করি সেই সিঁড়িটা।

বিবস্বানের মুখে 'রেশম' শুনে গার্গীর বিস্ময় তখন দ্বিগুণ, বিবস্বান তার সঙ্গে মস্করা করছেন, না কি সিরিয়ালের রিহার্সাল দিচ্ছেন, তার কোনও তালহদিসই করতে পারছিল না। কিন্তু তখন আর কোনও ভাবাভাবির সময় নেই, বিবস্বান দ্রুত এক গলি থেকে আর এক গলি, সেখান থেকে কখনও সিঁড়ি দিয়ে উঠে, পরক্ষণেই আর একটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছেন নীচের হলঘরে নামার পথ। কিন্তু যতবার চেষ্টা করছেন, ততবারই ব্যর্থ হচ্ছেন নতুন একটা গলিতে ঢুকে পড়ে।

বেশ কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘোরাঘুরির পর গার্গী বলল, আমাদের খোঁজাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না, সম্ভবত এই সিঁড়ি দিয়েই নীচে নামা যাবে, বলতে বলতে গার্গী সিঁড়িটা বেয়ে নেমে দেখল, সেটা একটা নতুন জায়গা, তবে তার সামনে আরও একটা সিঁড়ি। ভাবল, সেটা দিয়ে নামলে নির্ঘাত হলঘরে নামতে পারবে, কারণ হলঘরটা বেশ কাছেই দেখা যাচ্ছে তখন।

কিন্তু না, গার্গীর অনুমানে ভুল হয়ে গেল। পেছন ফিরতেই দেখল, বিবস্বান তাকে অনুসরণ করেননি, সম্ভবত দাঁড়িয়ে আছেন আগের জায়গায়। তিনি বুঝতেই পেরেছেন, ভুল ভাঙলে গার্গী আবার ফিরে আসবে তাঁর কাছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখল, বিবস্বান সেখানে নেই। তাহলে নিশ্চয়ই সামনে কোথাও আছেন। কিছুক্ষণ এ-গলি সে-গলি ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়ল সে, কারণ না-গাইড না-বিবস্বান কেউই নেই আশেপাশে। নীচে হলঘরটাও খাঁ খাঁ শূন্য, সকালের এই নিভৃত সময়ে কোনও গাইড বা ট্যুরিস্ট কেউই নেই কোথাও। কী আশ্চর্য, সে কি তাহলে এই ভয়ঙ্কর গোলকধাঁধায় একদম একা হয়ে গেল!

গার্গী দুদ্দাড় করে ছুটতে শুরু করল হঠাৎ, নিশ্চয়ই সামনের সিঁড়ি দিয়ে নামা যাবে নীচে।

কিন্তু না, সে-সিঁড়িটা গিয়ে ঠেকেছে একটা অন্ধগলিতে। আবার উঠে এসে ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে খেতে, খেতে খেতে সহসা তার গলা শুকিয়ে কাঠ। সেসময় নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখতে পেল, তার সামনে কোত্থেকে যেন ফুঁড়ে বেরোল—একটা সাংঘাতিক-দর্শন বলশালী চেহারার দাড়িঅলা লোক।



ভুলভুলাইয়ার ভয়ঙ্কর গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে একা ঘুরপাক খেতে খেতে হঠাৎ এমন বিচিত্র চেহারার একজন বলশালী লোকের মুখোমুখি হবে, তা ভাবতেই পারেনি গার্গী। লোকটির গায়ে সবুজ নিমাজামা, তার ওপর জরির কাজ করা একটি আঙরাখা, তার ওপর চাদরের মতো মেরুনরঙের দোশালা, আর পরনে একই রঙের চওড়া বর্ডার দেওয়া পাঁয়চার পাজামা। তা ছাড়াও মাথায় দুপলড়ী টোপি যা আসলে দু পাশে দুটো ডিমের মতো দেখতে, পায়ে সলমা-চুমকি বসানো ছুঁচলো ডগার সলিমশাহী জুতো, যার ডগাটা আবার ওপর দিয়ে মোড়া, নাগরাইয়ের মতোই। লোকটির দু'গালে চওড়া গালপাট্টা, ডান চোখের নীচে একটা মস্ত আঁচিল। গার্গীর দিকে তাকিয়ে লোকটা চোখ সরু করে বলল, কেয়া চাইয়ে, মেমসাহাব?

কথায় একদম খাস্ লখনউয়ের টান, ভাবভঙ্গি মোটেই সুবিধের নয়। এরকম আন্কা পটভূমিকায় হঠাৎ এরকম রংচঙে পোশাকঅলা বিকট চেহারার একটা লোকের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ ভয় পেয়ে গেল গার্গী, কোনও কথাই তার মুখ দিয়ে সরল না। তাকে অমন বিমূঢ় দেখে লোকটা অতঃপর যে-বাক্যটি বিদ্রূপভরে বলল, তার বাংলা করলে দাঁড়ায়, পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?

গার্গী বুঝে উঠতে পারল না, হ্যাঁ অথবা না কোনটা বললে এই মুহূর্তে তার পক্ষে নিরাপদ। এতবড় গোলকধাঁধার কোন দুরূহ গলিতে বিবস্বান বসুকে সে হারিয়ে ফেলল তাও আর ঠিক করতে পারছে না। তিনি কি ইচ্ছে করেই গার্গীকে এই রহস্যময় জায়গাটিতে নির্বাসনে দিলেন, তারপর এহেন একটি অদ্ভুতদর্শন লোকের সামনে ফেলে দিয়ে তাকে শাস্তি দিলেন গত কাল রাতের ঘটনার প্রতিশোধ নিতে! না কি সমস্ত ব্যাপারটাই কাকতালীয়!

—আইয়ে মেরা সাথ, বলে লোকটি গলি বরাবর হাঁটতে শুরু করল, লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোতেই গার্গীও দ্বিধান্বিত পায়ে তার পিছু পিছু।

অতঃপর গলির পর গলি, এক লেন থেকে আর এক লেনে সাঁত সাঁত করে সেঁধিয়ে যাচ্ছে লোকটা, একবারও পিছু ফিরছে না। গার্গী তার লম্বা পায়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে

হাঁপিয়েও পড়ছে একটু। গলি থেকে সিঁড়ি, তারপর আবার গলি, গলির অজস্র গোলকধাঁধায় আবারও ঘুরপাক খেতে খেতে গার্গীর এবার সন্দেহ হতে শুরু হল, সে বোধহয় কোনও ঠগের পাল্লায় পড়েছে। হয়তো কোনও নিভৃত সুড়ঙ্গে নিয়ে গিয়ে তার ওপর—

এবার সত্যিই ঘামতে শুরু করল গার্গী। কখনও বা ঝলমলে জবরজং পোশাক পরা লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে পুরনো লখনউয়ের কোনও আমির-বাদশার মহল্লার লোক, হঠাৎ কোনও ইতিহাসের পাতা ফুঁড়ে হাজির হয়েছে তার সামনে। আবার এও মনে হল, এই ঐতিহাসিক অট্টালিকাটি তো দুশো বছরের পুরনো, কত প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতিবিজড়িত। গলিঘুঁজিময় কোনও অন্ধকার প্রকোষ্ঠের ভেতর থেকে নবাবি-আমলের ভূতপ্রেত এসে তাকে পথ চেনাবার নাম করে কোনও গুম-ঘরেটরে নিয়ে যাচ্ছে না তো!

লোকটি তখন আরও জোরে পা চালিয়ে যেন লুকোচুরি খেলছে গার্গীর সঙ্গে। হঠাৎ গা ঢাকা দিচ্ছে কোনও থামের আড়ালে, গার্গী তাকে আবিষ্কার করতেই সে পরক্ষণে আবার কোথাও পলকে অদৃশ্য।

গার্গী তখনও বুঝে উঠতে পারছে না, সে কোনও গুণ্ডাবদমাশের পাল্লায় পড়ল কি না। মনে মনে ভীষণ রাগও হচ্ছে বিবস্বান বসুর ওপর, সেই সঙ্গে সিনেমুভির গোটা টিমের ওপরই। কিছুক্ষণ পর সে এও বুঝতে পারল, তাকে কেউ উদ্ধার না করলে এই গোলকধাঁধা থেকে সে আর বেরোতে পারবে না কিছুতেই। ভয়ে, আতঙ্কে, খিদেয় হয় একটু পরেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে, না হয় কোন বিজাতীয় শক্তির খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব খোয়াবে। পরে তার এও মনে হল, হয়তো গোটা সিনেমুভি টিম তাকে এই বিপদে ফেলার জন্যই নিয়ে এসেছে ভুলভুলাইয়ার মরণফাঁদে।

একটু পরে সেই লোকটিকেও আর সামনে দেখতে পেল না। সে যেন এক অলৌকিক শক্তির মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে এই ইট-পাথরের সৌধে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে হঠাৎই ওপরে ওঠার একটা সিঁড়ি চোখে পড়ল তার, যার পাশে একটা ক্রশ-চিহ্ন আছে, গার্গীর কী মনে হতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল কয়েক ধাপ, উঠতেই দেখল, হ্যাঁ, ওই তো নীচে নামার আর একটা সিঁড়ি। হুড়মুড় করে নীচে নামতেই একেবারে সোজা হলঘরে। চারপাশে তাকিয়ে, সৌধের বাইরে সবুজ লন দেখে গার্গী একবুক স্বস্তি নিয়ে বুঝল, অবশেষে সে মুক্তি পেয়েছে গোলকধাঁধার মারাত্মক ফাঁদ থেকে।

নীচে নেমে দিগভ্রান্তভাবে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক, কোনও চেনামুখ দেখা যায় কি না তারই সন্ধানে নজর সেঁধিয়ে দিতে গিয়ে দেখল, হলঘরের উজ্জ্বল আলো নরম হয়ে গেল হঠাৎ। পরক্ষণে ওপর থেকে হাসি-হাসি মুখে রোমিও নেমে এল, প্রশান্ত মুখ করে বলল, পারফেক্টলি অলরাইট।

গার্গী ভেতরে ভেতরে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে ছিল, রোমিওকে হাসতে দেখে উষ্মা প্রকাশ করল. কী অলরাইট!

—অভিনয়। যা চমৎকার অভিব্যক্তি করে এতক্ষণ ছোটাছুটি করলেন ভুলভুলইয়ার অলিগলিতে, তাতে বোঝাই যাচ্ছিল না আপনি অভিনয় করছেন।

ততক্ষণে ওপর থেকে নেমে আসছেন বিবস্বান বসু, শাম্ব সামন্ত, সজনী দত্ত, রানাজি সান্যাল। একটু পরে মনিটর হাতে নিয়ে দ্বিত্বম রায়ও। সবাই গার্গীর হতভম্ব ভাব, উষ্মা, ক্ষোভ দেখে স্মিতহাসিতে ভরপুর। গার্গী ভেবেই পেল না এতগুলো লোক ওপরে কোন্ গোপন কুঠুরিতে সেঁধিয়ে ছিল এতক্ষণ! সে যে আতঙ্কে, অনিরাপত্তায় এতক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভঙ্গিতে ছোটাছুটি

করছে, অন্তত আধঘণ্টা, তখন কেউই তাকে সাহায্য করতে আসেনি কেন!

রোমিও হাসতে হাসতে জানাল. সে-ই সমস্ত ব্যাপারটা আজ পরিকল্পনামাফিক সাজিয়েছিল, যাতে ভুলভুলাইয়ার ভেতর পথ হারিয়ে ফেলা রেশমবাইয়ের ভয়ার্ত অভিব্যক্তি, তার আতঙ্কিত ছোটাছুটি একেবারে বাস্তবসম্মত হয়। ঋষভ মুখার্জি আজ শুটিং-স্পটে ছিলেন না বলেই তার পক্ষে সম্পূর্ণ নিজস্ব স্টাইলে এভাবে সাজানো সম্ভব হয়েছে দৃশ্যগুলো।

গার্গী বিশ্বাসই করছিল না কথাগুলো, কিন্তু দ্বিত্বম রায় তখন মনিটর চালু করে ক্যাসেট ঘুরিয়ে মিনিট কুড়ি ধরে তোলা টুকরো টুকরো দৃশ্যগুলো দেখাল, গার্গীর কখনও একক ছোটাছুটি, কখনও বিবস্বান বসু বা সেই অপরিচিত লোকটির সঙ্গে কথোপকথন ইত্যাদি বেশ কায়দা করে তোলা হয়েছে ভিডিও-তে।

অপরিচিত লোকটি হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হল, কোথায়ই বা মিলিয়ে গেল তা অবশ্য ভাঙতে চাইল না রোমিও বা অন্যেরা। গার্গী এও জানল, লখনউয়ের রাস্তায় আসার সময় যে শুটিং করার কথা ছিল, তাও তোলা হয়নি শুধু গার্গীকে এভাবে অপ্রস্তুত করে, বিভ্রান্তিতে ফেলে ভুলভুলাইয়ার ছবি তোলা হবে বলেই।

তবুও গার্গী বহুক্ষণ গুম হয়ে রইল তার এতক্ষণের আতঙ্ক, ভয় আর ক্লান্তি কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে না পেরে। বিশেষ করে বিবস্বান বসু যেরকম গম্ভীর মুখ করে তার সঙ্গে বেশ একটা দূরত্ব রচনা করে চলছিলেন, সেটা তাঁর অভিনীত চরিত্র পুলক চৌধুরির সঙ্গে কিন্তু একদম খাপ খাচ্ছিল না।

রোমিও হেসে তাও ব্যাখ্যা করে বলল, ম্যাডাম, স্ক্রিপ্টের এ-জায়গাটা আপনি ঠিক মতো পড়েননি বোধহয়। আসলে পুলক চৌধুরি যে-সময় রেশমবাইকে নিয়ে ভুলভুলাইয়ার দিকে যাবেন, সেই মুহূর্তে আগের দিনের মতোই আরও একটি চিরকুট পেয়েছিলেন, যাতে লেখা, প্লিজ, আপনি রেশমবাইকে নিয়ে বাইরে কোথাও যাবেন না, অন্তত রাত তো কাটাবেনই না তার সঙ্গে।

ছবির নায়ক পুলক চৌধুরি তাই এক ঘোর রহস্যে অন্তরিণ, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না, কে এই চিঠির লেখক, কেনই বা তিনি বারবার তাঁকে নিষেধ করছেন রেশমবাইকে নিয়ে কোঠির বাইরে বেরোতে, বিশেষ করে রাতে। তার সঙ্গে বাইরে থাকাটাই যেন পত্রলেখকের খুব অপছন্দ। একবার ভাবলেন রেশমবাইকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবেন চিঠির রহস্যটা। পরে সিদ্ধান্ত নিলেন, না থাক, রহস্যটা ভেদ করবেন তিনি নিজেই। আরও ঘন ঘন তাঁকে যেতে হবে রেশমবাইয়ের কোঠিতে, তাকে নিয়ে বেরোতে হবে বাইরে, তাহলেই বাধ্য হয়ে তাঁর সামনে এসে হাজির হবেন চিঠির লেখক, তখনই আবিষ্কার করা যাবে তাঁকে।

গোলকধাঁধার গলিতে ছোটাছুটি করার কারণে গার্গী তখন এতটাই বিধ্বস্ত যে, সকালবেলার বাকি শুটিং বাতিল করে দিল রোমিও। বারবার হেসে ক্ষমা প্রার্থনা করল গার্গীর কাছে তার এই প্রবল হঠকারিতার জন্য। হাত জোড় করার ভঙ্গি করে বলল, অধমের গোস্তাকি মাপ করবেন, ম্যাডাম। আর কক্ষনো এরকম হবে না। কভভি নেহি।

রোমিওর অবশ্য আরও কিছু দৃশ্য শুট করা বাকি ছিল বড়া ইমামবাড়ার সামনে ও ভেতরে, তার জন্য বিবস্বান বসুকে রেখে দিয়ে গার্গীকে পাঠিয়ে দিল হোটেলে, এ বেলাটা খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করুন, ম্যাডাম, আবার ও-বেলা নিয়ে যাব চকবাজারের কোঠিতে।

শুটিং থেকে আচমকা ছুটি পেয়ে কিছুটা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল গার্গী। একটা গাড়ি নিয়ে

সোজা হোটেল ইনে ফিরে এসে শুনল, পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল নাকি তাঁর বাহিনী নিয়ে খুব ছোটাছুটি করছেন সারা লখনউ শহর। কলকাতা থেকে টেলিফোনে খবর পেয়েছেন, আসল কালপ্রিট নাকি পৌঁছেছে লখনউতে। তাকে দেখতে পেলেই অ্যারেস্ট করবেন দেবাদ্রি।

গার্গীর কাছে অবশ্য ব্যাপারটা আদৌ বোধগম্য হল না। কে কালপ্রিট, সে হঠাৎ কলকাতা থেকে লখনউ পর্যন্ত ছুটে এসেছে দেবাদ্রি সান্যালের কাছে ধরা দিতে, কেনই বা, সবটাই তার কাছে হেঁয়ালির মতো। যাই হোক, ব্যাপারটা নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে, আপাতত মেক-আপ তুলে স্নান-খাওয়া সেরে ঘুম দেওয়া যাক একপ্রস্থ। পর পর কয়েকদিন কম ঝড়ঝাপ্টা যাচ্ছে না তার শরীর ও মন দুয়েরই ওপর দিয়ে। কিন্তু তাঁর অভীষ্ট দুপুরের ঘুম কপালে নেই, ডাইনিং থেকে খাওয়া সেরে নিজের রুমের দিকে যাচ্ছে, হঠাৎ দেখল, তারই ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক অনতিতিরিশ মহিলা। তিনি, যাকে বলে অতীব সুন্দরী, হলুদ ফর্সা রং, কাঁচা সোনা বললেও যেন মানানসই, ডিম ছাঁদের মুখ, মাথায় ঘন চুলের রাশ সে প্রবল সৌন্দর্যে এক অন্য মাত্রা আরোপ করেছে। পরনে তুঁতেরঙের দামি সাউথ ইন্ডিয়ান, ঠোঁটে ঘন লাল লিপস্টিক, চোখে মাস্কারা। চেহারাটা এতই উথালপাতাল যে, অনেক মেয়ে-পুরুষের ভিড়েও তাঁকে আলাদা করে চেনা যাবে। গার্গীকে দেখে এগিয়ে এসে বেশ কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কোন ঘরে রানাজি সান্যাল থাকে বলুন তো?

মহিলার কথার ধরন মোটেই পছন্দ হল না গার্গীর, বলল, সেটা তো রিসেপশন থেকেই জেনে নিতে পারতেন।

—রিসেপশনে যে জিজ্ঞাসা করতে হয় তা আমার জানা আছে। তারা বলল, সব ঘরই সিনেমুভির নামে বুক করা। তাদের টিমের কে কোন ঘরে থাকে সে-খবর তাঁরা রাখেন না।

—ও! গার্গী ব্যাপারটা বুঝল, মহিলাকে সেও বেশ কড়া নজরে দেখে বলল, কিন্তু রানাজি সান্যালকে তো এখন আপনি পাবেন না।

—কেন?

—শুটিঙে ব্যস্ত আছেন বলে।

—কোথায় শুটিং করছেন? কখন ফিরবেন?

গার্গী অবাক হচ্ছিল মহিলার কড়া গলায় জেরার ধরনে। এ সব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায় তো তার নেই। তবু রানাজি সান্যালকে খোঁজ করছেন বলেই কী এক অপার কৌতূহলে তাঁকে বাজিয়ে দেখতে চাইল গার্গী। বলল, কখন ফিরবেন বলা যাচ্ছে না, বিকেলে ফিরতে পারেন, রাতও হতে পারে। কোথায় শুটিং করছেন এখন তাও বলা যাবে না। বলে মহিলার চোখমুখের প্রতিক্রিয়া তার তীক্ষ্ণ নজর ফেলে জরিপ করে নিল কয়েক মুহূর্ত, পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে?

মহিলার চোখদুটো তখন কী এক ভীষণ টানা-পোড়েনে জ্বলছে যেন, নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ালেন একবার, তারপর বললেন, আমি কলকাতা থেকে এসেছি, ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

গার্গী তার তৃতীয়নয়নটি হঠাৎ মহিলার খরসৌন্দর্যের ওপর ন্যস্ত করে বলল, আপনি কি লাভলি তালুকদার?

—লাভলি নয়, লাভলীন, সবাই আমার নাম ভুল করে, তৎক্ষণাৎ করকর করে প্রতিবাদ জানালেন মহিলা, পরক্ষণে বাঁকানো ধনুকের মতো প্রায়-আঁকা ভুরুতে কোঁচ ফেলে কী যেন

অনুমান করলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, আমার নাম আপনি জানলেন কী করে?

গার্গী বিস্ময় চেপে বলল, আপনি একা লখনউ এসেছেন?

—সে খোঁজে আপনার দরকার কী?

নিজেকে সংযত করে গার্গী বলল, আমার কোনও দরকার নেই। আপনি রানাজি সান্যালের খোঁজ করছেন শুনেই ভাবলাম জিজ্ঞাসা করি আপনি কোথায় উঠেছেন, ওঁর সঙ্গে কী দরকার—

—সে সব তো আপনার জানার দরকার নেই। আপনার কাছে জানতে চেয়েছি রানাজি এখন কোথায়—

গার্গী হেসে ফেলল, সে প্রশ্নের উত্তর তো আমি প্রথমেই দিয়েছি। তাহলে আমি এবার আমার ঘরে যাই—

বলে গার্গী পেছন ফিরতে যাচ্ছিল, লাভলীন সামান্য বিপন্ন হয়ে বলল, কিন্তু রানাজিকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে সেটা বলুন?

—বললাম তো, কোথায় তিনি এই মুহূর্তে আছেন তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। ওরা এখানে-ওখানে শুটিং করছে। আপনি চেষ্টা করলেও খুঁজে পাবেন কি না আমার সন্দেহ। বরং আপনি কিছুক্ষণ আমার রুমে বসতে পারেন। দু-এক ঘণ্টার মধ্যে ওদের কেউ না কেউ এসে পড়বে হোটেলে।

লাভলীন ইতস্তত করে বলল, আপনার ঘরে!

—ইচ্ছে করলে লাউঞ্জেও অপেক্ষা করতে পারেন। তাতে আপনি হয়তো বোর হবেন।

লাভলীন দু-এক মুহূর্ত গার্গীর মুখের দিকে কী যেন পরখ করে অগত্যা চলেই এল তার পিছুপিছু। লাভলীনকে নিয়ে রুমের ভেতর ঢুকে দরজা ঠেলে দিতেই ইন্টারলক। এরকম একজন মারকাটারি সৌন্দর্যের মহিলাকে রানাজির সন্ধানে লখনউ ছুটে আসতে দেখে গার্গী তার সহজাত সন্ধিৎসায় কী যেন রহস্যের গন্ধ পেল, আর তাই-ই তাঁকে ডেকে নিয়ে এল ঘরের ভেতর একটু খোঁচাখুঁচি দিয়ে দেখতে। লাভলীনকে দুপুরের এই নিভৃত মুহূর্তে একা পাওয়ার এমন সুবর্ণসুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়?

লাভলীন তাঁর গাঢ় তুঁতেরঙের সাউথ ইন্ডিয়ান ডানার মতো ছড়িয়ে বিছিয়ে তাদের ড্রইংরের সোফায় বসতেই গার্গী হঠাৎ দুম করে বলে বসল, আপনি কি জানেন, পুলিশ আপনাকে খুঁজছে?

—পুলিশ! লাভলীন তাঁর তন্বী শরীরটি সোফায় আরাম করে মেলে দিয়ে সবে রিল্যাক্সড হতে যাচ্ছিলেন, গার্গীর কথায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে উঠতে চাইলেন, কেন?

বেশি ভনিতা না করে গার্গী এবার সরাসরি তার বক্তব্যে চলে এল, আপনি কি জানেন লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল এই মুহূর্তে লখনউতে? তিনি ডঃ সুস্নাত তালুকদারের হত্যারহস্য সম্পর্কে ইনভেস্টিগেশন করছেন গত কয়েকদিন ধরে—

লাভলীন গার্গীর কথায় বাধা দিয়ে উল্টে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক!

—সম্পর্ক আছে বলেই তো পুলিশ এখন তাদের তদন্তের তীর আপনার উদ্দেশে ধাবিত করছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সিনেমুভির যে-টিমটা লখনউয়ে শুটিং করতে এসেছে, তাদের সবাইকে একের পর এক জেরা করছে পুলিশ। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্লুও পেয়ে গেছে হত্যারহস্যের জট ছাড়াতে গিয়ে। সেসময় তাদেরই কেউ জেরার মুখে আপনার নাম বলেছে পুলিশের কাছে।

—আমার নাম! লাভলীন উত্তেজনায় সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন, নিশ্চয় রানাজি!

—রানাজি!

—হ্যাঁ, দ্যাট ক্যারাকটারলেস ম্যান।

গার্গী বুঝল, সে বেশ মোক্ষম জায়গায় তার তীর ছুড়তে পেরেছে, এখন দেখা যাক, চাঁদমারি বিদ্ধ করা যায় কি না।

—রানাজির সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?

লাভলীন তাঁর আগুন জ্বলতে থাকা চোখ দুটো তুলে গার্গীর দিকে তাকালেন, রানাজিকে আমি ভাল করে চিনিই না। মাঝে মাঝে আমার জ্যাঠশ্বশুরের খোঁজ করতে আমাদের বাড়িতে আসতেন। আসলে খোঁজ করাটা একটা অছিলা।

—ডঃ সুস্নাত তালুকদারের সঙ্গেই তাহলে রানাজির ঘনিষ্ঠতা ছিল!

—ঘনিষ্ঠতা কি না তা বলতে পারব না। আসলে ওঁরা একটা সিরিয়াল করবেন বলে যাতায়াত করছিলেন আমার জ্যাঠশ্বশুরের কাছে। পরিচালক ঋষভ মুখার্জির সূত্রেই রানাজির সঙ্গে আমার জ্যাঠশ্বশুরের আলাপ।

—তাহলে রানাজি আপনার বাড়িতে যেতেন কেন?

—ওই যে বললাম, আমার জ্যাঠাশ্বশুরকে খুঁজতে।

—ও, ডঃ সুস্নাত তালুকদার বুঝি আপনার কাছে প্রায়ই আসতেন?

লাভলীন হঠাৎ সতর্ক হয়ে গেলেন, গার্গীর দিকে তাকিয়ে কী যেন ভেবে বললেন, আসতেন, মাঝে মাঝে।

—সন্ধের পর?

লাভলীন আবার সতর্ক হলেন, ঠিক নেই। তবে সকালের দিকে উনি খুব ব্যস্ত থাকতেন তাঁর রোগীপত্তর নিয়ে।

—আচ্ছা, ডাক্তারের তো খুব ভালই পশার ছিল শুনেছি। তাঁর তেমন কোনও শত্রু ছিল বলেও শোনা যায় না। হঠাৎ তিনি খুন হতে গেলেন কেন অনুমান করতে পারেন?

লাভলীন তখন গার্গীকে ভীষণভাবে পরখ করছে, বললেন, আমি কী করে অনুমান করব?

—ওঁর তো কোনও উত্তরাধিকারী ছিল না। হত্যার পর আপনার স্বামী আর দেওর দু'জনেই নাকি একই সঙ্গে তাঁর সম্পত্তি দখল নিতে গিয়ে মারামারি করেছিলেন?

—আমার স্বামী মোটেই মারামারি করেননি। তিনি একজন ডাক্তার। তাঁর ভাই বিটনই তাঁকে মেরেছিল।

—কিন্তু অ্যারেস্ট হয়েছেন আপনার স্বামী।

—সে তো বিটন পালিয়ে গিয়েছিল বলেই পুলিশ মাছ না পেয়ে ছিপে কামড় দিয়েছে।

—কিন্তু পুলিশ তো সন্দেহ করছে আপনার স্বামী কিংবা দেওর এঁরাই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত।

লাভলীন পুনর্বার ছিটকে উঠতে চাইলেন, মিথ্যে কথা, আসলে রানাজিই—

লাভলীন থেমে যেতেই গার্গী টুক করে খেই ধরিয়ে দিল তাঁর অসমাপ্ত সংলাপে, তাহলে রানাজিই আপনার স্বামী বা দেওরকে ফাঁসিয়েছেন, কী বলুন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো বদমাইশিটা করল আমার সঙ্গে।

—আপনার সঙ্গে? গার্গী আরও কথা বার করতে চাইল, দেখলেই বোঝা যায় ভদ্রলোক গোলমেলে, তাই না?

—ভীষণ। লোকটা সিনেমালাইনের লোকদের সঙ্গে সারাক্ষণ জড়িয়ে থাকে। তারপর নতুন নতুন মেয়েদের সামনে হিরোইন হওয়ার টোপ ফেলে। তারপর—

—তারপর?

—ওঁর পাস্ট হিস্ট্রি তো সবাই জানে না। সাংঘাতিক লোক।

গার্গী কৌতূহলী হল, কী রকম?

—একবার শুটিং করতে ওয়ালটেয়ার না কোথায় গিয়েছিলেন। সেখানে একটা মেয়েকে নিয়ে স্নান করতে নেমেছিলেন সমুদ্রে। জলের মধ্যে হঠাৎ বেমালুম মিসিং হয়ে গেল মেয়েটা। নেহাত মেয়েটার তেমন লোকজন ছিল না বলে হইচই হয়নি। এখনও সিনেমালাইনের লোকজন বলাবলি করে, উনিই নাকি ইচ্ছে করে—

গার্গী এবার আলোচনাটা অন্য দিকে ঘোরাতে চাইল, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, ডঃ সুস্নাত তালুকদার যে ঘরে খুন হয়েছিলেন, ঠিক তাঁর ডেডবডির পাশেই একটা সোনালি ফ্রেমের চশমা পাওয়া গিয়েছিল। চশমাটা নতুন, ঠিক একই ধরনের চশমা কিন্তু সিনেমুভির টিমে একমাত্র রানাজি সান্যালই পরেন, তাই না?

লাভলীন কী যেন মনে পড়তে হঠাৎ বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে তো বলছিল ক'দিন আগে, চশমার দোকানে যেতে হবে।

গার্গী তৎক্ষণাৎ চেপে ধরল, তাহলে নিশ্চয়ই রানাজি সেদিন দুপুরে ডঃ সুস্নাত তালুকদারের ঘরে গিয়েছিলেন?

লাভলীন ঘাড় নাড়লেন, হ্যাঁ। গিয়েছিল তো।

গার্গী কয়েক মুহূর্ত গোটা ব্যাপারটা একবার চালাচালি করে নিল তার মগজের ভেতর, ভাবল, লাভলীনকে জিজ্ঞাসা করে, সে কথা তিনি জানলেন কী করে। কিন্তু পরক্ষণে অন্য প্রশ্নে চলে গেল, রানাজির সঙ্গে বর্ণনার কী সম্পর্ক ছিল বলুন তো?

—বর্ণনা! লাভলীন তাঁর লিপস্টিক রঞ্জিত, লাল টুকটুকে ঠোঁট দাঁতে কামড়ে বোধহয় রক্তারক্তি করতে চাইলেন, শি ওয়াজ অ্যা উইচ। ওই তো রানাজিকে এমনভাবে বশ করে ফেলল যে—

—কে কাকে বশ করে ফেলেছিল বলুন তো। বর্ণনা রানাজিকে, না রানাজি বর্ণনাকে?

—ওরা দুজনেই দুজনকে—, আসলে কী জানেন, দুজনেই গভীর জলের মাছ। বর্ণনা এমন ধড়িবাজ যে, ওর জন্যেই আমার—

লাভলীন কথার মাঝপথে থেমে যেতেই গার্গী তৎক্ষণাৎ টোকা দিল, আপনার কী!

—না, কিছু না।

গার্গী এবার মুচকি হাসল, বর্ণনাই আপনার বাড়াভাতে ছাই দিয়েছে, তাই না?

লাভলীন তাঁর ঝোপ চুলের রাশ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, এই জন্যেই তো মেয়েটা খুন হয়ে গেল। এ সব মেয়ের এরকমই নিয়তি হয়।

গার্গী ঝুঁকে পড়ল এবার, বর্ণনা যে খুন হয়েছে সে কথা আপনি কলকাতায় বসে কার কাছে শুনলেন? রানাজির কাছ থেকেই নিশ্চয়ই?

লাভলীন এবার গার্গীর দিকে কেমন সন্দেহভরে তাকালেন, সে কথা আপনি জানলেন কী করে?

কথাটার জবাব না দিয়ে গার্গী পরবর্তী প্রশ্নে চলে গেল, রানাজিই তো এখান থেকে আপনাকে ফোন করেছিলেন যে, বর্ণনা খুন হয়ে গেছে, সিরিয়াল বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম, এক্ষুনি দু-এক লাখ টাকা নিয়ে চলে এসো, তাই না?

লাভলীন আবার দাঁত দিয়ে ঠোঁটে রক্তপাত ঘটাতে ঘটাতে বললেন, হ্যাঁ, বলেছিল। তারপর আবার ফোন করতে বলল, এখন টাকাটা লাগবে না। হিরোইন ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু এত সব কথা আপনি জানলেন কী করে?

সে-কথারও জবাব না দিয়ে গার্গী বলল, রানাজির সঙ্গে আপনিও কিন্তু এই হত্যারহস্যের সঙ্গে বেশ জড়িয়ে গেলেন, মিসেস তালুকদার! সে দিন দুপুরে রানাজি সান্যালের সঙ্গে আপনিও ডঃ সুস্নাত তালুকদারের কাছে গিয়েছিলেন। এরপর পুলিশ গ্রেপ্তার করতেই পারে আপনাকে—

লাভলীন তালুকদারের মাস্কারা লাগানো চোখ কেমন ভয়ার্ত দেখালো হঠাৎ।



ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল তখন তাঁর দীর্ঘ শরীরটা ঝুঁকিয়ে, মুখে হাসি মাখো-মাখো করে সার্বিক সমাজদারের ফুলো-ফুলো গালদুটো একটু টিপে দিয়ে বলছেন, তা হিরো, চেহারাটা তো ভারি চমৎকার, বেশ চকোলেটমার্কা, তুমি এই নাটকে ঢুকে পড়লে কী করে?

সার্বিক সমাজদার, যে আসলে সাবু নামেই অধিকতর পরিচিত, একটু একটু করে ঘামতে শুরু করেছে। তার পরনে একটা নীলচে, রংচটা, চাপা জিনসের প্যান্ট, তার আবার সারা অঙ্গে পকেট, গায়ে লাল টকটকে গোলগলা গেঞ্জি, গলায় একটা সোনার চেন, দাড়ি গোঁফ-কামানো হালকা সবুজ ছাপঅলা ফুলো ফুলো গাল, কোঁকড়া চুলে সামনের দিকে সামান্য চুড়োমতো, স্বাস্থ্য ভরাট। এহেন নায়ক-নায়ক চেহারার যুবক হঠাৎ পুলিশের খপ্পরে পড়ে এখন রীতিমতো ঝামেলায়। কিছুটা আতঙ্কিত চোখে ঘাড় ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, বিশ্বাস করুন, স্যার, আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানিনে—

—তাই নাকি! হা হা হা, দেবাদ্রি তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় প্রবলভাবে হাসলেন কিছুক্ষণ, তা হলে তুমি কলকাতা থেকে এত পথ ঠেঙিয়ে লখনউ পর্যন্ত ধাওয়া করলে কেন, হিরো?

—আজ্ঞে স্যার, স্রেফ লাবুদির জন্য।

—লাবুদি! লাবুদি আবার কে?

—ওই যে, স্যার লাভলীন। লাভলীন তালুকদার।

—লাভলীন? নামটা একমুহূর্ত যেন অচেনা মনে হল দেবাদ্রি সান্যালের, পরক্ষণে বুঝে ফেললেন, ও, লাভলি? মানে অগ্নিশিখা?

—অগ্নিশিখা আবার কে? এবার সাবুর অবাক হওয়ার পালা।

—ওই হল আর কি! লাভলীন, না কি লাভলি। তা ওই লাভলিকে নিয়ে তোমার তো লখনউ আসার কথা নয়, এতক্ষণে বৃন্দাবনে যাওয়ার কথা, আর একটা বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করার জন্য। ভুল ট্রেনে উঠে পড়েছিলে নাকি!

—না স্যার। লাবুদি তো বলল লখনউ যাবে। এখানেই তো শুটিং হচ্ছে।

—ও, শুটিং করতে এসেছ তাহলে! হিরোর ভূমিকায়?

—না, স্যার, আমি না, লাবুদিরই তো এই সিরিয়ালে হিরোইন হওয়ার কথা ছিল।

—তাই নাকি! ভারি ইন্টারেস্টিং, দেবাদ্রি একটু অবাক না হলেন তা নয়। তা হিরোইনটি এখন কোথায় গেলেন তাঁর হিরোকে পুলিশের খপ্পরে পড়তে দিয়ে!

—কী জানি। স্যার, কোথায় গেল। আমাকে বলল, তুই ততক্ষণে হোটেলে থাক সাবু, আমি দেখি বদমাইশটাকে খুঁজে বার করা যায় কি না, তারপর তার একদিন আর আমার একদিন—

দেবাদ্রি অবাক হয়ে বললেন, বদমাইশটা কে?

—ওই যে, স্যার, রানাজি। ওই তো বিট্রে করল লাবুদির সঙ্গে।

—বিট্রে!

—হ্যাঁ, স্যার, একমাস ধরে লাবুদির কাছে ঘুরঘুর করছিল, আর বলছিল, তোমাকে এবার সিরিয়ালের হিরোইন করে দেবই দেব, লাভলীন—

—ইজ ইট। কিন্তু হিরোইন তো উনি হননি শেষপর্যন্ত।

—না, স্যার। একমাস ধরে টলিয়ে টলিয়ে শেষপর্যন্ত বর্ণনাকে তুলে নিয়ে গেল। লাবুদি তো শোকে-দুঃখে একদম ফ্ল্যাট। বলল, সাবু, আমি সুইসাইড করব। কত লোকজনকে বলে রেখেছি, আমি সিরিয়ালের নায়িকা হচ্ছি, আর লোকটা কি না একটা দুশ্চরিত্রাকে নিয়ে—

—বাহ্, বাহ্, ভেরি ইন্টারেস্টিং। কিন্তু শেষমুহূর্তে সিরিয়ালের হিরোইন বদলেই বা গেল কী করে?

—আজ্ঞে, রানাজিই তো মোক্ষম চাল চালল শেষ পর্যন্ত। লখনউ আসার দিন সাতেক আগে বলল, লাভলীন, লাখদুয়েক টাকা জোগাড় করো, নইলে সিরিয়াল হয়তো শেষ করা যাবে না। ফিন্যান্সার গড়বড় করছে।

দেবাদ্রি ভুরু কোঁচকালেন, ফিন্যান্সার কে?

—আজ্ঞে, ওই যে বুড়ো ডাক্তার। বুড়ো নাকি প্রথমে বলেছিল, সিরিয়াল তৈরির পুরো টাকাটাই দেবে। তারপর বলেছিল সবটা দেবে না। তা শুনে লাবুদি বলেছিল, দেবে না মানে? আলবত দেবে। রোজ এসে আমার কাছে ছুঁকছুঁক করে ঘুরবে, রাত দশটা-এগোরোটা পর্যন্ত, 'লাবু, চা করো', 'আজ তোমার এখানে রাতে খেয়ে যাব' বলে বায়না ধরবে, তা ছাড়া—

—তা ছাড়া?

সার্বিক সমাজদার এবার মুখে অদ্ভুত ভঙ্গি করল, বুড়ো খুব ক্যারাকটারলেস ছিল, স্যার, লাবুদির কাছে যা খারাপ খারাপ সব গল্প বলত! ওই যে, ওঁর কাছে কী বিশ্রী বিশ্রী সব রোগী আছে, তাদের কেচ্ছা—

—তাই!

—হ্যাঁ, স্যার, বুড়োর যা সব কথাবার্তা, শুনলে আপনার হাড়পিত্তি জ্বলে যাবে। শুধু হিরোইন হওয়ার লোভে লাবুদি বুড়োর সব আবদার সহ্য করত। আসলে বিয়ে-থা করেনি তো বুড়ো,

শেষ বয়সে যাকে বলে ভীমরতি। সন্ধের পর কেমন শকুনের মতো হয়ে যেত—

দেবাদ্রি হা হা করে হেসে উঠলেন, তা শেষপর্যন্ত লোভী শকুনটাকে তোমরা আর সহ্য করতে পারলে না?

—পারা যায় না কি স্যার। লাবুদি বলত, বুড়োটাকে একদিন—

—হা হা হা, একদিন বুড়োর রোঁয়া-ওঠা ঘাড়টাকে কুচ করে ছেঁটে ফেলতে হবে, অ্যাঁ? হা হা হা—

সার্বিক সমাজদার হাঁ করে দেবাদ্রির ভয়ঙ্কর হাসিকে দেখছিল একমনে। পুলিশ অফিসারদের হাসির মধ্যে একটা কেমন আতঙ্ক-আতঙ্ক ফ্লেবার থাকে। দেবাদ্রির চোখমুখও ক্রমশ শিকারি নেকড়ের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। হাসি থামিয়ে দেবাদ্রি আবার ঝুঁকে পড়লেন সার্বিকের দিকে, তারপর লাবুদি বুড়োর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারল?

—না, স্যার, ওই যে বর্ণনা বলে একটা মেয়ে ছিল না, একেবারে চাম্পু দেখতে। ওই তো ততক্ষণে বুড়োকে একদম খেয়ে ফেলেছে—

—আর হিরো, তুমি তখন কী করছিলে? একদম নির্বাক দর্শক? না কি মৃত সৈনিকের ভূমিকায়?

সার্বিক আবারও হেসে ফেলল।

—না কি জীবিত সৈনিকের ভূমিকায় রিভলভারে শান দিচ্ছিলে?

দেবাদ্রির কথার ধরন আচমকা একদম বদলে যাওয়ায় সার্বিক থতমত খেয়ে বলল, রিভলভার, স্যার?

—হ্যাঁ, বুড়ো টাকা না দিতে চাওয়ায় তার বুকে রিভলবার ধরে কুচ করে হেলিয়ে দিলে রোঁয়া-ওঠা ঘাড়টা?

—আমি, স্যার? আপনার মাথা খারাপ?

—মাথা আমার খারাপ হতে যাবে কেন, হিরো? বলতে বলতে এতক্ষণ ঘরের কোণে টেবিলের ওপর নিরীহ ভঙ্গিতে জিরোতে থাকা কালো কুচকুচে রুলটা হাতে তুলে নিলেন দেবাদ্রি, রুলটা দু-হাতের আলগা মুঠোর মধ্যে পিস্টনের মতো সজোরে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, মাথা তখন তোমার লাবুদিরই খারাপ হয়ে গেছে। হিরোইন হওয়ার এমন সুবর্ণ সুযোগ আচমকা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় তখন তোমাকে উসকোচ্ছিল, সাবু, আমাকে বাঁচা। বুড়োর কাছে থেকে যে করেই হোক—

সার্বিক তখন ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেবাদ্রির হাতের ঘুরন্ত রুলটির দিকে তাকাতে তাকাতে বলল, লাবুদি অবশ্য খুব খেপে গিয়েছিল তখন, কিন্তু আমি এর মধ্যে কোনও সাতে-পাঁচে ছিলাম না, স্যার।

দেবাদ্রি অদ্ভুতভাবে হেসে রুল উঁচিয়ে বললেন, বুড়োকে তুমি খুন করোনি?

সার্বিক আরও ঘাবড়ে গিয়ে বলল, খুন, স্যার—আমি? রক্ত দেখলে আমি বলে ভিরমি খাই। ছোটবেলায় একবার মুরগি কাটতে দেখে একদম অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, স্যার। সেই আমি কি না খুন করব!

—মাই গড, তাই নাকি? দেবাদ্রির পুনর্বার অট্টহাস্য। মুরগির রক্ত দেখে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে? তাহলে তো তুমি একদম নিপাট ভালমানুষ, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জান না।

সার্বিক চুপ করে থাকে।

—তা, ওহে নাবালক, বলতে বলতে দেবাদ্রি ঝুঁকে পড়ে সার্বিক সমাজদারের সবুজ ছোপধরা দাড়ির জায়গাটা একটু টিপে দিলেন, তোমার সঙ্গে অগ্নিশিখার সম্পর্কটা আসলে কী?

—অগ্নিশিখা, মনে লাবুদির কথা বলছেন? উনি তো আমাকে ছোট ভাইয়ের মতো ভালবাসেন। বলেন, তুই হলি সাবু, আর আমি লাবু, দুজনের মধ্যে কত্ত মিল, বল্?

—সাবু আর লাবু! হা হা হা, দেবাদ্রির হাসি আর থামে না, আর তাইই সাবু তার লাবুকে বগলদাবা করে সিধে লখনউ। তারপর কাল সন্ধেবেলা লখনউয়ের এক হোটেলে চুপচুপ করে উঠে, একই ঘরে রাত কাটিয়ে, এখন হিরো আর হিরোইন লাট খাচ্ছে আর এক ধান্দায়, কী বলো?

সার্বিক তখন ভীতচোখে তাকাচ্ছে দেবাদ্রির হাতের ঘুরন্ত রুলটার দিকে। হঠাৎ ভয়ে ভয়ে বলল, আপনি কি আমাকে মারবেন, স্যার?

—না, মারব কেন? দেবাদ্রি শরীর ঝাঁকিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, তোমাকে একটু বৃন্দাবন দেখাব। দেখেছ কখনও বৃন্দাবন?

সার্বিক ভয়ে-ভয়ে ঘাড় নাড়ল, না, স্যার, আগ্রা পর্যন্ত গেছি, তারপর আর—

—আগ্রা, হা হা হা, তা হলে তো তাজমহল দেখেই এসেছ। কার সঙ্গে গিয়েছিলে ওখানে? অগ্নিশিখার সঙ্গেই নাকি!

—না, স্যার, অন্য বন্ধুদের সঙ্গে। কলেজে পড়তে—

দেবাদ্রি জিবে চুকচুক করে বললেন, তাহলে এবার লখনউতেই তোমাদের হনিমুন! কী বলো? শুধু একটু উল্টো হয়ে গেল। লোকে আগে বৃন্দাবনে যায় রাসলীলা করতে, তারপর যায় আগ্রার সমাধিতে—

—স্যার, সার্বিক দেখছে রুলটা ক্রমশ আরও প্রবলবেগে ঘুরছে।

—তা হনিমুনের পক্ষে লখনউও খুব একটা খারাপ শহর নয়। এখানেও তো এককালে নবাবরা শহরটাকে সাজিয়েগুছিয়ে, মস্ত মস্ত হারেম বসিয়ে হনিমুনের পক্ষে প্রশস্ত করে তুলেছিলেন। তবু একবার বৃন্দাবনটা দেখেই এসো, বুঝলে?

বলতে বলতে দেবাদ্রি রুলের একটা খোঁচা দিলেন সার্বিকের হৃষ্টপুষ্টি ভুঁড়িতে, সার্বিক কোঁক করে উঠতেই রুলটা উঁচিয়ে বললেন, এবার বল, শালা, ডাক্তারকে তুইই খুন করেছিলি তো?

—না, স্যার, দিব্যি করে বলছি, আমি না—

—তা হতে কে খুন করেছিল, শিগগির বল।

—আমি কিছু জানিনে, স্যার। কোঁক। মারবেন না, স্যার, একদম মরে যাব, স্যার।

—কে খুন করেছিল? বিটন তালুকদার?

—না, স্যার, বিটন খুন করেনি।

—তাহলে? শিগগির, শিগগির। ওই রঙ্গন তালুকদার?

—না, স্যার।

—তা হলে, রানাজি?

সার্বিক এবার চুপ করে থাকে। দেবাদ্রি আবার রুল উঁচোয়, রানাজির সঙ্গে আর কে ছিল? বর্ণনা, না অগ্নিশিখা?

—না, স্যার, অগ্নিশিখা না।

—ডাক্তারের বাড়িতে নাকি দশ-বারো লক্ষ টাকা ছিল। সে টাকা তাহলে কে ঝাড়ল? অগ্নিশিখা?

—না। স্যার, টাকাটা লাবুদি পেলে তার একরকম দুরবস্থা হয়! রানাজি তো কেবলই বলছিল, মাত্র এক লাখ টাকা দিলেই লাবুদি সিরিয়ালের হিরোইন। শেষে লাবুদিকে বলল, তোমার স্বামী তো ডাক্তার, তার কাছে নিশ্চয়ই দু-চার লাখ টাকা কিচ্ছু না। সেখান থেকে নিয়ে এসো।

দেবাদ্রি থমকে গেলেন একলহমা, তা হিরোইন স্বামীর টাকা ঝেড়ে নিয়ে এসেছিল?

—না, না, রঙ্গন ডাক্তারের চেম্বারে তো কেবল মাছি ওড়ে। অত টাকা কোত্থেকে আসবে?

—কেন, মাছি ওড়ে কেন?

—ও বাবা, ডাক্তার নয় তো ট্যাঁড়শ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চেম্বারে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে, কিন্তু রোগী ঢোঁ ঢোঁ। বলে সার্বিক গলা নামিয়ে বলল, একেবারে হদ্দ বোকা লোক, স্যার, রোগী আসবে কেন!

—হদ্দ বোকা! আর তাই তুমি তার বোকামির সুযোগ নিয়ে ডুবে-ডুবে মধু খাচ্ছ!

বলে আবার রুল উঁচিয়ে মারতে উদ্যত হয়েছিলেন দেবাদ্রি, সে সময় একজন পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকে তাঁর কানে কানে কী যেন বলতেই তিনি লাফিয়ে উঠলেন, তাই নাকি! হোটেল ইনে! চলুন তো, কুইক—

সার্বিক সমাজদারকে বৃন্দাবনে পাঠানো থেকে আপাতত রেহাই দিয়ে, দেবাদ্রি সান্যাল তাঁর বাহিনীকে জিপে তুলে সেই মুহূর্তে রওনা দিলেন হোটেল ইনের উদ্দেশে। তাহলে অগ্নিশিখা কট্। মাই গুডনেস!



গার্গী তখন চকবাজারের কোঠি থেকে ডাক পেয়ে অসহিষ্ণু হয়ে ভাবছিল, লাভলীন তালুকদার নাম্নী এই অ্যাপেনডিক্সটিকে এখন কার হাতে কীভাবে সমর্পণ করবে! ঠিক সেসময় হঠাৎ একদঙ্গল পুলিশ নিলে দেবাদ্রি হন্তদন্ত হয়ে তার ঘরে ঢুকতেই হাঁপ ছেড়ে হেসে বলল, তাহলে গন্ধ পেয়ে গেছেন দেখছি!

—হ্যাঁ, কাল রাত থেকে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, পাব না মানে!

বলতে বলতে গার্গীর ঘরের সোফায় ফ্যাকাসে হয়ে বসে থাকা লাভলীন তালুকদারকে দেখে কয়েক লহমা দম ফেলতেই ভুলে গেলেন যেন। ভরদ্বাজ মুখার্জি তাহলে নামটা ঠিকই দিয়েছে মহিলার! হ্যাঁ, একখানা আগুনের শিখাই বটে, শুধু মাস্কারা-মাখানো চোখের তাকানো দিয়েই তাঁকে বেমালুম পুড়িয়ে দিচ্ছে। এ মেয়ে 'সোনালি ঘুঙুর'-এ বাইজি সাজলে অবশ্যই হিট হত সিরিয়ালটা। রানাজি কেন যে ভুলটা করলেন অগ্নিশিখাকে না নিয়ে!

এ হেন আগুনের খাপরা লাভলীন তালুকদারকে জিপে তুলে নিয়ে কোতোয়ালির দিকে

বওনা হতেই গার্গী এবার নিজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল চকবাজারে যেতে। চকবাজারের সেই বাইজি-কোঠিতে আজও পর-পর অনেকগুলি দৃশ্য টেক করবেন পরিচালক। হোটেলের লনে অপেক্ষারত একটা চকচকে অ্যাম্বাসাডারে চড়ে চকবাজারের সেই বিখ্যাত গলিতে পৌঁছে দেখল, বড়া ইমামবাড়ার বাকি শুটিং শেষ করে, সিনেমুভির টিম তাদের যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে বাইজিবাড়ির সেট। সকালে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন পরিচালক, আপাতত তিনি সেটে অবতীর্ণ। কোঠির একটা ঘরে মস্ত সোফায় গা এলিয়ে আড় হয়ে শুয়ে আছেন ঋষভ মুখার্জি। উস্কখুস্ক চুল, চোখের নীচে কালচে ভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এখনও পুরো সুস্থ নন, তবু কাজের নেশায় হোটেলের বিশ্রাম ছেড়ে চলে এসেছেন চকবাজারে। তাঁর সামনেই, একটা ফোল্ডিং চেয়ারে ঝুঁকে বসে রানাজি সান্যাল। তাঁর ডান হাতে স্ক্রিপ্টের পৃষ্ঠা খোলা, বাঁ-হাতে চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে পরিচালককে পড়ে শোনাচ্ছেন চিত্রনাট্যের পরবর্তী অংশ।

চিত্রনাট্য শুনতে শুনতে জড়ানো গলায় মাঝেমধ্যে দু-একটা আলটপকা মন্তব্য ছুড়ে দিচ্ছেন ঋষভ, কখনও আবার বলছেন, ও কে, ক্যারি অন।

সংলাপের নির্দিষ্ট অংশটি শেষ হতেই রানাজি চিত্রনাট্যের পৃষ্ঠাগুলো ঋষভের হাতে ধরিয়ে দিয়ে চশমাটা পরে নিলেন চোখে। চেয়ার থেকে উঠে এপাশে সরে আসতেই রোমিও গিয়ে বসল সে-জায়গায়, সকালে ভুলভুলাইয়ার শুটিং-পর্ব পরিচালক সমীপে-বিবৃত করতে শুরু করতেই ঋষভ পকেট থেকে তাঁর প্রিয় ডিজিটাল ডায়েরিটা বার করলেন।

রোমিও যেমন যেমন বলছে, তেমন তেমন নোট করে ফেলছেন ইলেকট্রনিক্সের আশ্চর্য মায়াজালের ভেতর।

রানাজি ওদিকে আসতেই গার্গী হেসে জিজ্ঞাসা করল, চশমাটা খুলে স্ক্রিপ্ট পড়ছিলেন কেন, মিঃ সান্যাল, চোখের পাওয়ার বেড়েছে নাকি।

রানাজি ঘাড় নাড়লেন, আমার তো মাইনাস পাওয়ারের চশমা, দূরের জিনিস দেখার জন্য। সেটা একটু বেড়েছে বটে। তবে পড়ার সময় আমার চশমা লাগে না। শর্ট-সাইটে আমার কোনও সমস্যা নেই।

—তাই। গার্গী কয়েক পলক রানাজির চোখমুখের ওপর তার নজর ন্যস্ত করল, যেন বুঝতে চাইল তাঁর কথার সত্যতা কতখানি! ডঃ সুস্নাত তালুকদারের ডেডবডির পাশে সোনালি ফ্রেমের যে চশমাটা পাওয়া গেছে, তা রানাজিরই কি না তা বাজিয়ে দেখতে। পরক্ষণেই প্রশ্ন করল, মাইনাস পাওয়ার যে বেড়েছে বলছেন, তাহলে নিশ্চয়ই ডাক্তার দেখিয়েছিলেন লখনউ আসার আগে?

—না, না, দেখাইনি তো, রানাজি যেন জোরে জোরে ঘাড় ঝাঁকিয়ে অস্বীকার করতে চাইলেন ব্যাপারটা, ডাক্তার দেখাব-দেখাব করেও শেষপর্যন্ত সময় করে উঠতে পারিনি—

আর কোনও প্রশ্নোত্তরের আগেই ঋষভ ততক্ষণে দুর্বল শরীরেও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন দৃশ্য টেক করার জন্য। এ দৃশ্যটাও বিবস্বান বসুর সঙ্গে গার্গীর।

সেদিন বিকেলেও কাহিনীর নায়ক পুলক চৌধুরী এসেছেন চকবাজারে রেশমবাইয়ের কোঠিতে। এ ক'দিনে রেশমবাই অনেকটাই সহজ হয়ে উঠেছে তাঁর সঙ্গে। আগেকার সেই দূরত্ব নেই, ইচ্ছাকৃত কাঠিন্য নেই, অপরিচয়ের ব্যবধান নেই, বরং তাঁকে দেখেই রেশমবাইয়ের চোখেমুখে একটা উচ্ছ্বাসের হিল্লোল, বাবুজি, তুমি সেদিন বলেছিলে, খোদ লখনউয়ের একটা



খেয়াল শুনবে, আজ সেই গান তোমাকে শোনাব।

পুলক চৌধুরী বেশ খুশিই হলেন, যদিও বাইজি-কোঠি থেকে পর পর দুদিনে দুটো চিরকুট পেতে উৎকণ্ঠিতও হয়ে আছেন সামান্য। দুটি লিপিতেই তাঁকে বলা হয়েছে, রেশমবাইয়ের সঙ্গে যেন বেশি মেলামেশা না করেন তিনি। ঘটনাটা খুবই আশ্চর্যের, তাঁর কাছে দুর্ভাগ্যেরও বটে। চকবাজারের বাইজিদের দরজা তো তাবৎ দুনিয়ার লোকের জন্য খোলা, যে কেউ ইচ্ছে করলেই যথোচিত মূল্যের বিনিময়ে দু'দণ্ড এসে শুনে যেতে পারে তাদের মুজরোর গান, তাহলে হঠাৎ তাঁর গতিবিধির ওপরই বা কেন আরোপিত হচ্ছে এহেন নিষেধাজ্ঞা! সে কোন অদৃশ্য চোখ তাঁদের মেলামেশা পছন্দ করছে না!

ততক্ষণে দেয়ালের কোণে ঠেস দিয়ে রাখা তানপুরাটা টেনে নিয়ে রেশমবাই সুরঠ-জ্বলদ তেতালায় শুরু করেছে তার খেয়াল-গান :

পিয়াবিন গুজর গেয়ি রয়েন মোহেকো
আজ হো নেহি আয়ে মেরি
মোহে তড়পত বিতি ঘড়ি পল ছিন ছিন

রেশমবাইয়ের গলায় একটা আশ্চর্য জাদু আছে, বিশেষ বিশেষ গানের সময় সে-জাদু যেন শ্রোতার মগজে সৃষ্টি করে এক অন্য ইন্দ্রজাল, আজও সে যখন স্থায়ীতে খুবই আস্তে আস্তে গাইতে লাগল, 'প্রিয় ছাড়াই, অতিবাহিত হল আমার রাত, আজও এসে পৌঁছল না আমার প্রিয়তম। আমার সমস্ত সময়, প্রহর, মুহূর্ত, দিন সেই চিন্তায় কাটছে।' পুলক চৌধুরির তখন মনে হচ্ছিল, সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে গাইছে সে। যেন তার হৃদয়ের গহনতম অন্দর থেকে উঠে আসছে সুরের মূর্ছনা।

পুলক চৌধুরি কিন্তু জানেন, এ গানের রচয়িতা অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজেদ আলি, যিনি নবাবি করার চেয়ে অধিকতর ব্যস্ত থাকতেন শায়ের রচনায়, নাচে গানে, রং-তামাশায়, আর সেই ফুরসতে এই কবি-শিল্পী রাজার মাথা থেকে আস্তে আস্তে মুকুট খুলে নিয়েছিলেন তৎকালীন ইংরেজ-বাদশা। লখনউয়ে বসবাসের শেষ দিনগুলিতে এ-গান লেখা হলেও গানের কলিগুলিতে উর্দু-শব্দ সামান্যই মেশানো। যা আছে তা হল লখনউ অঞ্চলের কথ্য ভাষা আর ব্রজবুলি। ব্রজভাষা তো ভারী প্রিয় ছিল ওয়াজেদ আলির।

রেশমবাই তখন স্থায়ী থেকে প্রবেশ করছে অন্তরায় :

উনকো বিয়ান তন মনমে রম বহো
বিছড়ত নহি
মোরি হতচিত শোন
তদলগি সুন্দর পিয়ারে মোরি
মোহসে তদপুয়ি মেরি জিয়াক রইল।

কলকাতার পত্রকার তখন গভীর বিস্ময়ে শুনে যাচ্ছেন সমস্ত হৃদয় উজাড় করে রেশমবাইয়ের সেই আশ্চর্য প্রেম-নিবেদন, 'তার ভাবনায় আচ্ছন্ন আমার শরীর ও মন। শূন্য হয়ে গেছে আমার চেতনা। আমার সেই সুন্দর প্রিয়কেই তো সমর্পণ করে দিয়েছি আমার সবকিছু। আমার চেয়ে তারই ওপর আমার জীবন নির্ভর।'

গানের কলিগুলো যতবার ধাক্কা দিচ্ছে পুলক চৌধুরির মগজে, ততবারই মনে হচ্ছে এ-গান তাঁর বড় চেনা, যেন দু'দশকেরও আগের এক বিস্মৃত অতীত তোলপাড় করছে তাঁর স্নায়ুর

প্রতিটি তন্তু। বারবারই তখন তাঁর মনে হচ্ছে; কে এই রেশমবাই! রেশম তাঁর চেনা হতে পারে না, তবুও কেন চেনা মনে হচ্ছে! হয়তো দেখেননি কখনও, কিন্তু এভাবেই তাকে সামনে বসিয়ে যেন কখনও তার গান শুনেছেন। কেননা এ সব গানের গায়কি, সুর, কলি প্রত্যেকটিই তাঁর বড় চেনা।

ভাবতে ভাবতে যখন ভাবছেন, গান শেষ হলেই তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'রেশম, তোমাকে বলতেই হবে, কে তোমাকে এ গান শিখিয়েছিল,' তার আগেই রেশম তাঁকে সুরের মায়াজালে অবগাহন করাতে শুরু করেছে একটি লখনউ ঠুংরি :

নেমকহারামে মুলুক বিগাড়া
হজরত যাঁতিহি লন্ডন কো
মহলে মহলে মে বেগম রোয়েঁ
গলি গলি রোয়েঁ পাথুরিয়া ॥

পুলকচৌধুরি আবারও চমকে উঠলেন, কারণ গান এ-নবাব ওয়াজিদ যখন লিখেছিলেন, তখন তিনি আর লখনউয়ে নেই, রাজ্যপাট হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন কলকাতার মেটিয়াবুরুজে। সেখানে দ্বিতীয় আর একটি লখনউ তৈরি করে কবিতা লিখছেন, মেতে আছেন গানবাজনায়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মামলা করতে ইংলন্ড যাবেন বলে তোড়জোড় করছিলেন সে সময়, কিন্তু শেষপর্যন্ত মা আর ভাইকে লন্ডন পাঠিয়ে নিজে আগের মতোই ব্যস্ত রইলেন তাঁর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে।

রেশমবাই ততক্ষণে গান শেষ করে এক মুগ্ধ আবেশে তাকিয়ে আছে কলকাতার সাংবাদিকের দিকে। হয়তো অপেক্ষা করছে তারিফ শোনার জন্য, কিন্তু তার পরিবর্তে শুনল, বলো রেশম, এ গান তুমি কার কাছ থেকে শিখেছ।

বহুবার শোনা প্রশ্ন আরও একবার শুনে রেশমবাই সেই একই জবাব দিল, গুরুর কাছ থেকে।

—কে তোমার গুরু, রেশম?

রেশমবাই হেসে আবার আগের মতোই এড়িয়ে যেতে চায়, সে কথা জেনে তোমার কী লাভ, বাবুজি?

—সে কথা জানতেই তো কলকাতা থেকে এত দূরে ছুটে এসেছি। তোমার গান শুনছি, আর বহুবছর আগের এক পুলক চৌধুরি বারবার বিস্মিত হচ্ছে, চমকে উঠছে বারবার, বিস্মিত হচ্ছে, চমকে উঠছে বারবার, আর ব্যাকুল হচ্ছে তোমার সব কথা জানতে। আজ আমাকে বলতেই হবে, রেশম।

রেশমবাই খুবই অবাক হচ্ছিল পুলক চৌধুরির আকুতিতে, হঠাৎ বলল, কিন্তু তুমি যা ভাবছ, আমি সে নই, বাবুজি। আমার শরীরে এক পাঞ্জাবি রক্ত বইছে। তার নাম শের সিং, তাকে আমি কখনও চোখেও দেখিনি, শুধু মায়ের কাছে তার কথা শুনেছি। তবে আমার জন্মই দিয়েছিলেন তিনি, আর কখনও যোগাযোগ রাখেননি।

পুলক চৌধুরি হতাশ হতে হতেও আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু কে তোমার মা, রেশম?

—কুন্দনবাই। সে-ও আমার মতো আর এক তবায়েফ।

সেই মুহূর্তে পুলক চৌধুরির নজরে পড়ল, রেশমবাইয়ের সুসজ্জিত ড্রইংয়ে দামি মসলিনের কাপড় দিয়ে টাঙানো পর্দার ওপাশে দরজায় একটি রমণীমূর্তি, কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে সে বোধহয় একমুহূর্ত, পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল সেই রহস্যময় অবয়ব।

—কাট। এক্সেলেন্ট! ঋষভ মুখার্জির কণ্ঠস্বর শুনতেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল গার্গী। মসলিনের ওপাশ থেকে তখন বেরিয়ে আসছেন রুমেলা রায়। আজই তাঁর প্রথম আবির্ভাব ক্যামেরার সামনে, তাও মসলিনের পর্দার ওপাশে তাঁর সামান্য আবছায়া মূর্তিটিই শুধু।

রুমেলা কিন্তু তখন প্রায় ভস্ম করে দেওয়ার মতো চোখে তাকিয়ে গার্গীর দিকে। এর পরের দৃশ্যেই কুন্দনবাইয়ের ভূমিকায় রুমেলার সঙ্গে গার্গীর, মানে রেশমবাইয়ের ফাটাফাটি কলহ। সেইজন্যেই কি রুমেলার চোখে এমন আগুন! না কি বাস্তবের গার্গীর ওপরই ক্ষোভে, ক্রোধে পুড়ছেন রুমেলা! বিবস্বান বসুর সঙ্গে গার্গীর মেলামেশার কারণেই!

রুমেলা রায় চরিত্রটি কিন্তু মোটেই সুবিধের নয়। সহসা কী যেন মনে হল গার্গীর, বর্ণনা-হত্যার পেছনে তাঁর কি কোনও অবদান আছে!



ভিডিও ক্যাসেটে রুমেলা রায়ের আবির্ভাব দৃশ্যটিকে খুবই রহস্যময়ভাবে তুলে রাখতে চাইছিল রোমিও দত্তগুপ্তর ক্যামেরা। সিরিয়ালে রুমেলা রায় অভিনয় করছেন কুন্দনবাইয়ের, যিনি আসলে রেশমবাইয়ের মা। এতদিন পর্যন্ত ক্যামেরার সামনে রেশমবাইকেই শুধু অভিনয় করে যেতে হয়েছে, তার জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে বারবার কৌতূহলী হয়ে উঠেছে কলকাতার সাংবাদিক পুলক চৌধুরি, কিন্তু রেশমবাই এ তাবৎ তার পরিচয় গোপন করে রেখেও অবশেষে কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে প্রকাশ করেছে যে, তার বাবার নাম শের সিং, যাকে সে কখনও চোখেও দেখেনি, আর তার মা কুন্দনবাই। কুন্দনবাই রেশমবাইয়ের কোঠিতেই থাকেন, কিন্তু রেশমবাইয়ের সঙ্গে পুলক চৌধুরির এতদিনের মেলামেশার মধ্যে একবারও পটভূমিতে আবির্ভূত হননি। এই প্রথম মসলিনের দামি পর্দার আড়ালে তাঁর আবছা মুখখানা দেখা গেল। কিন্তু সূক্ষ্ম পর্দা। অস্পষ্টতা তৈরি করেছে তাতে কোনও অভিব্যক্তিই বোঝা যায়নি কুন্দনবাইয়ের, তাইই এই রহস্যময়তা।

দৃশ্যটি গ্রহণ করা শেষ হতেই ঋষভ মুখার্জি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পরবর্তী দৃশ্যের শুটিঙে। এর পরেই তো কুন্দনবাই বেরিয়ে আসবেন পর্দার আবরণ সরিয়ে। সে-চোখে তখন একইসঙ্গে অসহায়তা, বিভ্রান্তি, ক্রোধ। তিনি তখন ভেবেই পাচ্ছেন না, কী করে কলকাতার সাংবাদিকের সঙ্গে তাঁর মেয়ে রেশমবাইয়ের মেলামেশা বন্ধ করবেন!

পর্দার আড়াল সরিয়ে কুন্দনবাই অর্থাৎ রুমেলা রায় যখন বেরিয়ে এলেন, তখনও অবশ্য নতুন দৃশ্য গ্রহণ করা শুরু হয়নি, কিন্তু তাঁর দু' চোখে সত্যিই ধকধক করে জ্বলছে এক অদৃশ্য

আগুন। রেশমবাইকে নয়, জলজ্যান্ত গার্গী চৌধুরিকেই তিনি তখন পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চাইছেন তাঁর চোখের আগুনে।

গার্গী সেই রক্তবর্ণ, ক্রোধার্ত মুখ খুব ভাল করে নজর ফেলে দেখছে। তার ভেতর জুড়ে তখন একইসঙ্গে কৌতুক আর কৌতূহল। শুধু কি তার সঙ্গে বিবস্বান বসুর এক সন্ধের 'মাখামাখি'র কারণেই রুমেলা রায়ের এত ক্রোধ, না কি অন্য কোনও গূঢ় বৃত্তান্ত আছে এর আড়ালে! বিবস্বান বসুর ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই রুমেলা রায় এক অনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করেছেন ক্যাপ্টেন অভিধার এক অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে, তাঁর রুমে তাঁকে রাত্রিযাপন করতে দিয়ে। বিবস্বান বসু যেমন তাঁর জীবনযাপন, চালচলন জটিল করে তুলেছেন অমৃতসর মেলের ক্যুপেয় ওঠার পর থেকেই, রুমেলা রায়ও তো জটিলতর করতে চাইছেন তাঁর নিজের চরিত্রও।

ঋষভ মুখার্জি তখন তাঁর আর্ট ডিরেক্টরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কীভাবে তৈরি করতে হবে পরবর্তী সেট, সেই ফুরসতে রুমেলা রায়ের ক্রোধ থেকে রেহাই পেতে গার্গী চলে এল কোঠির বাইরে। সিনেমা দলের লোকজন এ-চত্বরে এলে গত দু-তিনদিন ধরে কিছু কৌতূহলী লোকজন উঁকিঝুঁকি মারছে, তারা অবশ্য ছবির নায়ক-নায়িকা চেনে না, চেনে না বলেই গার্গী খুব সহজে চলে এল কোঠির বাইরের রাস্তায়। এসে দেখল, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট দ্বিত্বম রায় একা দাঁড়িয়ে আছে সামনের পান দোকানটির সামনে। আয়নায় মুখ দেখছে, না কি দোকানের ভেতর টাঙানো হিন্দি সিনেমার এক অভিনেত্রীর বিচিত্র শরীরী-পোজ, কে জানে! খুবই ইনট্রোভার্ট ধরনের এই যুবকটিকে একটু বাজিয়ে দেখতেই গার্গী এসে দাঁড়াল তার পাশে, পান কিনছেন নাকি, মিঃ রায়!

দ্বিত্বম রায় খুবই হকচকিয়ে গেল গার্গীর এই আচমকা হানায়, পরক্ষণেই থিতু হয়ে বলল, নাহ। আপনি খাবেন নাকি, তাহলে—

—না, আমি একেবারেই পানাসক্ত নই, বলে একটু মজা করতে চাইল গার্গী।

দ্বিত্বম ততক্ষণে সরে এসেছে পান-দোকানের সামনে থেকে। গার্গীর কথায় একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, তাই কিন্তু কে যেন বলছিল, আপনি কাল সন্ধেয় বিবস্বান বসুর ঘরে—

—ওঁর সঙ্গে খুব ড্রিঙ্ক করেছি! গার্গী হেসে উঠল শব্দ করে, কে বলল আপনাকে?

—টিমের সবাই তো জানে। সিরিয়ালের নতুন অভিনেত্রী, তাঁর সম্পর্কে সবারই তো একটা কৌতূহল। এর পর দেখবেন, সিনেমার কাগজে আপনাকে নিয়ে হয় গুঞ্জন কিংবা কোনও গসিপ কলামে লেখালিখি হয়ে গেল হয়তো।

গার্গী বেশ থমকে গেল ব্যাপারটার সুদূরপ্রসারী ফলাফল অনুমান করে, পরক্ষণেই হেসে উঠে বলল, আমি তো সখের অভিনেত্রী, লিখে বেশি লাভ হবে না কাগজঅলাদের। তবে একটা অন্য কারণে কিন্তু লেখালেখি হবে কদিনের মধ্যে।

—কী কারণে! দ্বিত্বম অবাক হল।

—সে কথা ক্রমশ প্রকাশ্য। এখন আপনার কাছে আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে। কয়েকদিন ধরে টিমের সঙ্গে কাজ করতে করতে প্রশ্নগুলো হঠৎ উদয় হল মনে কেন কে জানে—

—কী প্রশ্ন। দ্বিত্বম আরও অবাক।

—আপনি কি জানেন আপনার রুমমেট রোমিও আপাতত পুলিশের অন্যতম সন্দেহভাজন। তার বিরুদ্ধে অনেকগুলো এভিডেন্স পাওয়া গেছে যা তাকে বর্ণনা-হত্যার মামলায় জড়িয়ে দিতে পারে।

দ্বিত্বমের গলার স্বর সহসা কেঁপে গেল, কী এভিডেন্স!

—সেদিন রাতে হোটেলের অনেকেই গভীর রাত পর্যন্ত রোমিওকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে হোটেলের বারান্দায়, লনে। যে-হাতুড়ি দিয়ে বর্ণনার মাথায় আঘাত করে খুন করা হয়েছিল, তাতেও রোমিওর হাতের ছাপ পাওয়ার প্রভূত সম্ভবনা। তা ছাড়া—

দ্বিত্বম বাধা দিয়ে বলল, হাতুড়িটা তাহলে সজনীদার কাছে থেকে রোমিওই নিয়েছিল?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি নিশ্চয় মনে করেন না রোমিওই খুন করেছে বর্ণনাকে?

—না।

—তাহলে আপনি রোমিওকে বাঁচাতে এগিয়ে আসছেন না কেন? আপনারই তো রুমমেট।

দ্বিত্বম অবাক হয়ে বলল, আমি কী করে বাঁচাব?

—বাহ্। আপনিও তো সে রাতে জেগেছিলেন। অনেক রাত পর্যন্ত। রোমিও কেন ঘরে আসছে না, কেন বাইরে বাইরে ঘুরছে অস্থির হয়ে তা ভেবে আপনিও তো সে-রাতে যথেষ্ট টেনশনে ছিলেন।

— সে কথা আপনি জানলেন কী করে!

গার্গী হেসে বলল, তারপর আপনিও তো রুমের দরজা খুলে দেখতে গিয়েছিলেন, রোমিও কোথায় কী করছে।

দ্বিত্বম হাঁ করে তাকিয়ে থাকে গার্গীর দিকে। তার যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না সে-রাতে তার গতিবিধি কেউ ফলো করেছিল!

—আপনি তো সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গিয়েছিলেন রোমিওকে খুঁজতে। কিছু অস্বাভাবিক দেখেননি কোথাও?

দ্বিত্বম যেন ধরা পড়ে গিয়েছে এমন ভঙ্গিতে প্রায় সারেন্ডার করল গার্গীর কাছে, হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। পেছনদিকের লনে।

গার্গী বুঝে গেল, তার আন্দাজে ছোড়া ঢিল চাঁদমারি বিদ্ধ করেছে, বলল, কী দেখলেন সেখানে?

—না, আমাদের কাউকে দেখিনি, তবে, বলে দ্বিত্বম কণ্ঠস্বর নিচুগ্রামে নামিয়ে দিল, দেখি কি, হোটেলের পেছনদিকে পাইপ বেয়ে উঠে বর্ণনার ঘরের জানলায় চোখ লাগিয়ে বসে আছে—

গার্গীর নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেল, কে?

—ওই যে, লোচ্চা নামের ছেলেটা।

—সে কী! গার্গীর কণ্ঠস্বর থেকে প্রায় আর্তনাদ বেরিয়ে এল, কী করছিল ওখানে?

—কী জানি, আমি জানি না। তবে ওর নাকি ওরকম অব্‌সেসটব্‌সেস আছে।

—রাত কটা বাজে তখন?

—তা দুটো আড়াইটে হবে হয়তো।

গার্গী অবাক হয়ে বলল, তা আপনি লোচ্চাকে পরের দিন কিছু জিজ্ঞাসা করেননি?

দ্বিত্বম ইতস্তত করল আবার। তারপর আস্তে আস্তে বলল, করেছিলাম।

—কী বলেছিল লোচ্চা?

—সে আর শুনে কী করবেন?

গার্গী দ্বিত্বমের দিকে একবার গাঢ় নজর ফেলল, তারপর বলল, আমি জানি কাকে দেখেছিল।

—আপনি জানেন! দ্বিত্বমের চোখ ছানাবড়া।

—হ্যাঁ। রোমিও তখন বর্ণনার ঘরে। ঠিক কি না?

দ্বিত্বমের বুকে হাতুড়ির শব্দ ঠকঠক করে বাজে, হ্যাঁ। লোচ্চা তো কথা বলে না, শুধু ফিকফিক করে হাসে, আর চিবুকে হাত দিয়ে ঘষে। আমারও তখন মনে হয়েছিল রোমিওর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির কথাই বলতে চাইছে।

—ও, আপনি তারপর চলে এলেন সে-রাতে?

—হ্যাঁ। এসে বিছানায় শুয়ে পড়ি।

—রোমিও তার কতক্ষণ পরে আপনার পাশের বেডে এসে শুয়ে পড়েছিল?

—ঘড়ি দেখিনি। তবে তিনটে-টিনটে হবে।

—আপনার কি মনে হয়, লোচ্চা তারপরেও পাইপের ওপর বসেছিল!

দ্বিত্বম ঘাড় নাড়ল, সম্ভবত।

—তাহলে তো লোচ্চাই সবচেয়ে ভাল বলতে পারবে, কে খুন করেছিল বর্ণনাকে? এবং কীভাবে?

দ্বিত্বম হঠাৎ ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, লিভ ইট, ম্যাডাম। পাস্ট ইজ পাস্ট। কী হবে ওসব খুঁড়ে বার করে? আমারই বা কী দরকার, আপনারই বা কী দরকার? পুলিশের হাতে ছেড়ে দিন ব্যাপারটা—

গার্গী হেসে বললেন, না, তা দরকার নেই বটে, কিন্তু আপনি এটুকু তো চাইবেন যে, প্রকৃত হত্যাকারী ধরা পড়ুক। তার বদলে একজন নিরীহ ব্যক্তি যেন ফাঁসির দড়িতে না ঝোলে।

দ্বিত্বম হাঁ করে তাকিয়ে থাকে গার্গীর মুখের দিকে। ঠিক সে সময় সজনীবাবু তাঁর গোলগাল শরীরটা নিয়ে গড়াতে গড়াতে চলে এলেন, আরে সাউন্ডসাহেব, ওদিকে আপনাকে খুঁজে না পেয়ে পরিচালক স্যার তো রেগে আগুন। সেট তৈরি। এখন আপনাদের দুজনকেই খুঁজছেন। ম্যাডাম, চলে আসুন—

দুজনেই হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে পড়ল কোঠির ভেতর, রেশমবাইয়ের সেই নির্দিষ্ট ঘরটিতে। গিয়ে দেখল, আবার নতুন করে সাজানো হয়েছে সেট। ঘরটা একেবারে বদলে গিয়ে এখন কুন্দনবাইয়ের। তার একপাশে মস্ত একটা পালঙ্ক, তার ওপর বিছানো রয়েছে রঙচঙে চাঁদনি, চাঁদনির চারদিকে মখমলের কুঁচি-দেওয়া ঝালর ঝুলে আছে মেঝে অবধি। ঝালরের প্রান্তে রেশমের রঙিন সুতো দিয়ে চারপায়ার সঙ্গে আঁট করে বাঁধা, যাতে পালঙ্কের ওপরকার চাঁদনি একবিন্দুও কুঁচকে না যায় এপাশে ওপাশে ফিরে শোওয়ার সময়।

পালঙ্কের চওড়া দিকটায় চৌকো পাতলা পাতলা কয়েকটা নরম তাকিয়া, লাল টুল কাপড়ে ঢাকা সেই তাকিয়া আবার সূক্ষ্ম নয়নসুখ কাপড়ের খোলে ভরা। তাতে দেখতেও যেমন চমৎকার, ব্যবহার করতেও আরামের। ঘরের অন্য পাশে একটা কাঠের আলমারি, সেটাও কারুকার্যময়, প্রাচীন বার্মা টিকের তৈরি বলে তাতে একটা অন্য আভিজাত্য।

কুন্দনবাই তখন পালঙ্কের ওপর আধশোয়া হয়ে, চোখে একইসঙ্গে তিরস্কার ও অসহায়তা, ঘরের মেঝেয় দাঁড়ানো রেশমবাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে। তারপর লখনউয়ের কথ্য ভাষায় হিসহিস করে বললেন, এই মেহমানের সঙ্গে তোমার আর মেলামেশা করা চলবে না। এই আমার হুকুম।

রেশমবাই বিস্মিত হয়ে বলল, কিন্তু কেন?

—সবসময় কেনর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আমি যা বলছি তাই শুনে চলবে।

—সে-কথা তো তুমি আগেও অনেকবার বলেছ, মা। যতবারই 'কেন' জিজ্ঞাসা করেছি, তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ, কেন এড়িয়ে যাচ্ছ তাও বুঝে উঠতে পারছি না।

কুন্দনবাই ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছিলেন তাঁর মেয়ের এই বেয়াদপিতে। হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বললেন, একটা কথা ভুলে যাচ্ছ, তুমি একজন বাইজি। তোমার পেশা রাতের মেহমানদের গান শুনিয়ে উপার্জন করা। তার বাইরে তুমি যেতে পারো না। কভ্‌ভি নেহি।

রেশমবাইও চোখ খর করে বলল, আমি তাইই করেছি এ পর্যন্ত।

—কিন্তু তুমি মেহমানের সঙ্গে এখানে ওখানে ঘুরছ, তার সঙ্গে রাত কাটাচ্ছ বাইরে।

রেশমবাই চোখের দৃষ্টি আরও তীব্র করে বলল, তাতে কী হয়েছে?

—তুমি, তুমি, কুন্দনবাইয়ের ঠোঁট দুটো হঠাৎ কাঁপতে শুরু করল, কিন্তু তোমার নজর মেহমানের ওপর পড়েছে। আমি কি কিছু বুঝতে পারি না মনে করছ!

—সে তো পড়তেই পারে মা।

—না, কুন্দনবাই তীক্ষ্ণকণ্ঠে ঝনঝন করে উঠলেন, পড়তে পারে না।

—কেন পড়তে পারে না, মা? তুমিও তো বাইজি ছিলে। তোমার নজরও তো মেহমানের ওপর পড়েছিল। না হলে আমিই বা হলাম কী করে।

কুন্দনবাই স্তব্ধ হয়ে গেলেন রেশমের এহেন মুখের ওপর স্পষ্ট করে বলা বাক্যটিতে। তাঁর চোখে আর একবার ফুটে উঠল প্রবল হতাশা, অসহায়তা, সেইসঙ্গে একটা নিস্ফল আক্রোশও। তারপর হঠাৎ কেঁপে উঠলেন থরথর করে, পরক্ষণে কঠিন গলায় বললেন, তবুও বলছি, তুমি এই মেহমানের সঙ্গে আর কখনও মিশবে না।

—কিন্তু কেন মিশব না, সে-কথাও তার আগে আমাকে শুনতে হবে তোমার মুখ থেকে।

—শুনতেই হবে!

—নিশ্চয়ই। মেহমানদের খুশি করাই তো বাইজিদের পেশা। কেন তুমি হঠাৎ তাতে বাদ সাধছ, সে-কথাও জেনে রাখা আমার কাছে জরুরি। নইলে কলকাতার পত্রকারের সঙ্গে আমার যেরকম সম্পর্ক চলছে, সেরকমই চলবে। এই আমার শেষ কথা।

কুন্দনবাই হঠাৎ দ্রুত নেমে এলেন পালঙ্ক থেকে। কী এক প্রবল আক্রোশে রেশমবাইয়ের মাথাটা ধরে জোরে জোরে ঠুকতে চাইলেন পাশের দেওয়ালে। রেশমবাই বিস্মিত, হতচকিত। একরকম জোর করেই, বহু চেষ্টার পর ছাড়াতে পারল নিজেকে। নিরাপদ দূরত্বে এসে স্তম্ভিত চোখে তাকিয়ে রইল কুন্দনবাইয়ের দিকে। তার আপাতশান্ত মা যে হঠাৎ এভাবে ক্ষিপ্ত, হিংস্র হয়ে উঠতে পারে সে-সম্পর্কে তার এতাবৎকালের জ্ঞানে কোনও ধারণাই ছিল না। কুন্দনবাইকে সে আবার নতুন চোখে পড়তে চাইল, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে শুধু দেখতে পেল তার মায়ের শান্ত, নিরীহ চোখে এখন ক্রুদ্ধ বাঘিনীর আগুন।

দৃশ্যটি একবারে 'ও, কে' হতেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল গার্গী. কারণ অভিনয় করার সময় রুমেলা রায় তার মাথাটা এমনভাবে জাপটে ধরে দেওয়ালে বার দুই ঠুকে দিয়েছেন, তাতে সত্যিই ঝিমঝিম করছে তার শরীর। সেই মুহূর্তে গার্গীর একবার মনেও হয়েছিল, অভিনয় করছেন না রুমেলা রায়, আজ সকালবেলায় ভুলভুলাইয়া যাওয়ার আগে তাঁর ঘরে ডেকে যেভাবে অগ্নিবর্ষণ করেছিলেন তার ওপর, হয়তো ঘরে ক্যাপ্টেন না থাকলে তখনই এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেওয়ালে ঠুকে দিতেন তার মাথাটা। এখন অভিনয়ের সুযোগ নিয়ে সেই আক্রোশটাই যেন

মেটাতে চাইছিলেন ক্যামেরার সামনে। দৃশ্যাগ্রহণ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও সে আশ্চর্য হয়ে তাকাচ্ছিল রুমেলা রায়ের দিকে। এও ভাবছিল, বিবস্বান বসুর সঙ্গে এক সন্ধের মেলামেশার কারণেই যদি রুমেলা এতখানি নির্মম হয়ে উঠতে পারেন তার ওপর, তাহলে যে- বর্ণনা সেনগুপ্ত পর পর কয়েক রাত পুরোপুরি দখল করেছিল বিবস্বান বসুকে, তার ওপর আরও কতখানি নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারেন তিনি।

কোঠির ঘর থেকে সে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রোমিও অবশ্য এসে জিজ্ঞাসা করল, মাথায় খুব লেগেছে নাকি, ম্যাডাম?

গার্গী কিছু বলল না, শুধু হাসল একঝলক।

বাইরে বেরিয়ে কিন্তু সে বেশ অবাকই হল কোঠির সামনে রাস্তায় ক্যাপ্টেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। কালো গগ্‌ল্‌স পরে খুবই স্মার্টভঙ্গিতে সিগারেটে একমনে ধোঁয়া উড়িয়ে চলেছেন দীর্ঘদেহী মানুষটি। গার্গী বাইরে বেরোতেই তার দিকে দৃষ্টি রেখে একবার মুচকি হাসলেনও যেন, আর সেই মুহূর্তে গার্গীর হঠাৎই মনে হল, আজ সকালে ভুলভুলাইয়ার গলিতে পথ হারিয়ে ফেলার পর জবরজং পোশাক পরা যে-কিম্ভূত মূর্তিটি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, কিংবা পথ গুলিয়ে দিচ্ছিল সে-লোকটি এই ক্যাপ্টেন নয় তো! ক্যাপ্টেন আজ সায়নের সঙ্গে কানপুরে যাননি। সে আর বিবস্বান বসু যখন বাহারি টাঙাটিতে চড়ে ভুলভুলাইয়ার পথে চলেছিল, সে সময় ক্যাপ্টেন একটা মারুতিতে চড়ে গিয়েছিলেন শুটিং-স্পটে, কেনই বা গিয়েছিলেন তা তখন বুঝতে পারেনি। এখন মনে হচ্ছে তা হলে হয়তো শুটিঙের কারণেই গিয়েছিলেন, আর সেই কারণটা তার কাছে পুরোপুরি গোপন করে গেছে রোমিও বা সিনেমুভির অন্যান্যরা।

কিন্তু কী আশ্চর্য, তাহলে এই ক্যাপ্টেনই—

গার্গী সেসময় প্রবল বিভ্রান্তিতে থাকায় ক্যাপ্টেনের ছদ্মবেশ, মেক-আপ চিনে উঠতে পারেনি, নইলে তার এক্স-রে দৃষ্টিতে এহেন ছদ্মবেশ তো ধরা পড়ে যাওয়ারই কথা। আর তা ধরতে না পারাতেই তার বোকামিটা ধরা পড়ে গেছে ক্যাপ্টেনের চোখে, তাইই তাঁর ঠোঁটের কোণে এখন একটুকরো হাসির ঝিলিক।

গার্গী সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজতে চেষ্টা করল লোচ্চাকে। লোচ্চা সাধারণত বিবস্বান বসুর আশেপাশেই ঘুরঘুর করে, তাঁর টুকিটাকি ফাইফরমায়েজ খাটে, কিন্তু সবটাই নিঃশব্দে। তার গলায় স্বর আছে কি না তাও জানতে পারেনি কেউ। যদি না-ই থাকবে, তাহলে বিবস্বান বসুই বা তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন কীভাবে!

লোচ্চাকে আজ অবশ্য কোথাও দেখতে পেল না গার্গী। হয়তো রুমেলা রায় আজ শুটিঙে এসেছেন বলেই কোথাও চুপিচুপি গা-ঢাকা দিয়েছে সে। তাকে পাকড়াও করতে হলে তাহলে হোটেলে গিয়েই—

ঠিক সেই মুহূর্তে শুটিং-স্পটে হঠাৎই এসে হাজির হলেন দেবাদ্রি সান্যাল। রোজই একবার করে এখানে তাঁর হাজিরা দেওয়াটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। আজও তাঁকে দেখে সিনেমুভির এতক্ষণের স্বতঃস্ফূর্ততা মিইয়ে গেল এক মুহূর্তে, আর ভুরুতে কোঁচ পড়ল ঋষভ মুখর্জির। ঋষভ তৎক্ষণাৎ রোমিওকে ডেকে নিয়ে কোঠির ভেতরে গেলেন কোনও জরুরি পরামর্শ করতে।

দেবাদ্রি সে-দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে হাসলেন একটু, তারপর এগিয়ে এলেন গার্গীর দিকে।

কেমন শুটিং চলছে, মিসেস চৌধুরি?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে গার্গী পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, ইনভেস্টিগেশন কতদূর এগুল, মিঃ সান্যাল?

গার্গীর কিছুটা প্রয়োজন ছিল দেবাদ্রি স্যান্যালের সঙ্গে একা হওয়ার, তাই কোঠির সামনের ভিড় ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে একান্ত হল দেবাদ্রির। দেবাদ্রিকে এখনও বেশ বিমূঢ় দেখাচ্ছে, বোধহয় জট ছাড়াতে গিয়ে দেখলেন জট আরও পাকিয়েই যাচ্ছে ক্রমশ। বললেন, একটা নতুন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আমাদের তদন্তে, শুনেছেন?

গার্গী কৌতূহলী হল, কী।

—রুমেলা রায়কে জেরা করেছিলাম আজ সকালে। হোটেলে একাই ছিলেন তখন। বর্ণনার আঙুলে যে-আংটিটা পাওয়া গিয়েছিল সেটা নাকি ওঁরই।

—সে কী! গার্গী হোঁচট খেল যেন।

—হ্যাঁ। আরও বললেন, কিন্তু এ-আংটি বর্ণনার আঙুলে যাবে কী করে! বলেই অবশ্য গম্ভীর হয়ে গেলেন খুব। আর মুখ খোলাতে পরলাম না।

গার্গী খুবই অবাক হল দেবাদ্রির কাছ থেকে পাওয়া এই নতুন তথ্যে। আংটিতে মিনে করা 'আর' অক্ষরটি দেখে তারা সবাই সন্দেহ করেছিল, ওটা নিশ্চয়ই হয় রোমিওর নয় তো রানাজির। এখন তাহলে আবিষ্কার হল ওটা রুমেলার। হেসে বলল, আর কিছু জানা গেল?

—হ্যাঁ। বর্ণনার ঘর আঁতিপাতি সার্চ করার পর একটা বিদেশি লাইটার পাওয়া গেছে।

এ-তথ্যটিও গার্গীর কাছে বিস্ময়ের।

দেবাদ্রি সান্যাল তখনও বলে চলেছেন, ক্যাপ্টেন অবশ্য স্বীকার করেছেন, লাইটারটি একসময় তাঁরই ছিল, কিন্তু তিনি সিনেমুভির টিমের অনেককে এই লাইটার প্রেজেন্ট করেছেন, তাহলে তাদেরই কারও হবে এটা।

গার্গী হেসে বলল, হ্যাঁ। প্রাপকদের মধ্যে সায়ন চৌধুরিও একজন।

প্রায় অট্টহাস্য করে দেবাদ্রি সান্যাল বললেন, না, এ-যাত্রা অবশ্য এটা বলছি না যে, রাতে সায়ন চৌধুরি বর্ণনার ঘরে কোনও কারণে গিয়েছিলেন। তবে ক্যাপ্টেন যে সত্যি কথা বলছেন তা নাও হতে পারে। বর্ণনার ঘরে রুমেলার আংটিটা যখন পাওয়া গেল, তখন ক্যাপ্টেনের লাইটারও যে পাওয়া যেতে পারে তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে!

দুজনে যখন অনেকখানি পথ এগিয়ে গিয়েছে, সে সময় পেছনে কারও ডাক শুনে গার্গী ফিরে দেখল, স্পটবয় ভনা ছুটতে ছুটতে আসতে তাদের দিকে। গার্গী তাকাতেই বলল, পরিচালক স্যার এখানে আর শুটিং করবেন না বলছেন। প্যাক আপ করতে বলছেন রানাজিদাকে।

গার্গী আশ্চর্য হয়ে দ্রুত ফিরে চলল কোঠির দিকে। একটু এগোতেই দেখতে পেল, ঋষভ মুখার্জির গাড়ি হুস করে বেরিয়ে গেল তাদের পাশ দিয়ে। ধুলোয় চাপুড়চুপুড় হয়ে গার্গীর চোখে পড়ল, দেবাদ্রির দিকে জ্বলন্তদৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে চলে গেলেন পরিচালক।

গার্গী বুঝে উঠতে পারল না, দেবাদ্রির উপস্থিতির কারণেই শুটিং-স্পট ছেড়ে চলে গেলেন কি না ঋষভ মুখার্জি।

কোঠির ভেতর ঢুকতেই সে দেখল, গম্ভীর মুখে সবাই সেট ভেঙে গোছগাছ করে নিচ্ছে দ্রুত। গার্গীও তার ভ্যানিটি ব্যাগ ও নিজস্ব অন্যান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে নিতে হঠাৎই চোখে পড়ল সেই ডিজিটাল ডায়েরিটা, যেটা সারাক্ষণ পকেটে রেখে দেন পরিচালক। তাড়াহুড়োয়

বেরুবার সময় নিশ্চয়ই ভুলে ফেলে গেছেন সোফার ওপর।

ডিজিটাল ডায়েরিটা অতএব তার ভ্যানিটি-ব্যাগের মধ্যে ভরে ফেলল গার্গী। হোটেলে দেখা হলে দিয়ে দেবেখন রাগী ধরনের মানুষটাকে। ইলেকট্রনিক্সের এই ছোট্ট উপহারটি পরিচালকের আবার ভাবি পছন্দের।

কিন্তু রোমিও এসে জানাল, আজকের বাকি সময়টা কিন্তু আমিই পরিচালক, ম্যাডাম। ঋষভদা বলে গেলেন, লখনউয়ের পথে অনেকখানি আউটডোর আছে, সেটা এ-বেলা সেরে নিতে। সজনীদাকে তাই সেই টাঙাটা আনতে বললাম আবার। চলুন—



চকবাজারে গলির মুখে দু'ভুরু কুঁচকে চুপচাপ, একা দাঁড়িয়ে ছিলেন দেবাদ্রি সান্যাল। তাঁকে শুটিং-স্পটে হাজির হতে দেখে পরিচালক ঋষভ মুখার্জির আকস্মিকভাবে চলে যাওয়া, পরক্ষণে সিনেমুভির টিম তাদের সেট ভেঙে ফেলে শুটিং বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তে কেমন একটা অপমান-অপমান লাগছিল যেন। কোতোয়ালিতে ফিরে যাবেন, না কি এখানেই কাউকে পাকড়াও করে ইন্টারোগেট করতে শুরু করবেন, এমন দোটানা ভাবনার মধ্যে হঠাৎ নজরে পড়ল গার্গী চৌধুরি তাঁর ভ্যানিটি-ব্যাগ কাঁধে সামলে বেরিয়ে আসছেন বাইজিদের কোঠি থেকে। তাঁকে দেখে শুকনো মুখে এগিয়ে গেলেন দেবাদ্রি, জিজ্ঞাসা করলেন, আজকের মতো শুটিং শেষ?

গার্গী চোখমুখ কুঁচকে ঘাড় নাড়ে, নাহ, আরও দু-শিফটে নাকি কাজ হবে। তবে আউটডোর।

—তাহলে তো আপনি খুব ব্যস্ত আজ!

—তা বলতে পারেন। তবে আর দু-এক দিনের মধ্যেই লখনউয়ের শুটিং শেষ করে দেবে শুনছি।

—হুঁ! দেবাদ্রি হঠাৎই যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন, গার্গীর শেষ কথার সূত্র ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কলকাতায় ব্যাক!

—সম্ভবত। গার্গী হাসতে চাইল।

দেবাদ্রি হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আপনাদের পরিচালক লোকটি কিন্তু খুব গোলমেলে।

গার্গী অবাক হয়ে বলল, কেন।

—না, মানে, আমাকে দেখলেই কীরকম ফিউরিয়াস হয়ে উঠছে দেখছেন?

—সে তো দেখতেই পারছি। আসলে লোকটি জিনিয়াস। আমার মতো আনাড়ি অভিনেত্রীকে দিয়েও যেরকম অভিনয় করিয়ে নিচ্ছেন! মনিটরে ছবি দেখতে দেখতে আমি

নিজেই হাঁ হয়ে যাচ্ছি আমার অভিনয় দেখে। আসলে জিনিয়াসরা একটু খ্যাপাটে ধরনেরই হয়ে থাকে।

—কী করে এরকম খ্যাপা লোকের সঙ্গে কাজ করছেন বলুন তো!

গার্গী হেসে ফেলল, খুবই কঠিন কাজ। বাট হি মিন্‌স্ বিজনেস। সেইজন্যেই শুটিং করার সময় আপনি ডিসটার্ব করতে এলে এত খেপে যাচ্ছেন। কাজের সময় এত সিনসিয়ার লোকটা।

—হুঁ, আমি বারবার ডিসটার্ব করছি বলে আমাকে থ্রেট করেছেন সি. পি র কাছে কমপ্লেন করবেন আমার নামে।

গার্গী হাসল, তাই!

—হ্যাঁ। আমি সেদিন কলকাতায় আমার দু-একজন কলিগের সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলাম। তখন শুনলাম, ঋষভ মুখার্জি ইজ অ্যা ভেরি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পারসন। বড় বড় জায়গায় নাকি কানেকশন আছে।

—থাকাটাই তো স্বাভাবিক। ডিরেক্টর মানুষ যখন—

দেবাদ্রি সান্যাল পরক্ষণেই কথার মোড় ঘোরালেন, আচ্ছা, ক্যাপ্টেন লোকটিকে আপনার কীরকম মনে হয়?

—খুব মিস্টিরিয়াস।

—তাই! দেবাদ্রি উৎসাহিত হলেন, আমারও তাই মনে হচ্ছে ক'দিন ধরে। বাট হি ইজ অ্যা হার্ড নাট। জেরা করে কিছু বার করা যাচ্ছে না।

—কিছুই পেলেন না! গার্গী অবাক হয়, ওই যে বিদেশি লাইটার পাওয়া গেল, সে সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি?

—করেছিলাম। বললেন, এরকম ছ'টা লাইটার হোটেল ইনের ছ'জনকে প্রেজেন্ট করেছেন। ওই লাইটারটা তাদেরই কারও হবে।

—ছ'জন কি সায়ন চৌধুরিকে ধরে?

—হ্যাঁ। বাকি পাঁচজন হলেন ঋষভ মুখার্জি, রানাজি সান্যাল, রোমিও দত্তগুপ্ত, ভরদ্বাজ মুখার্জি, আর একজন হলেন সজনী দত্ত। সজনীবাবু অবশ্য চেয়েই নিয়েছেন তাঁর কাছ থেকে।

গার্গী হেসে ফেলল, তাই। যাই হোক, এই ছ'জনের কাছেই সে-রাতের পরও লাইটারটা আছে কি না দেখেছেন?

—শুধু একজনেরটাই মিসিং।

গার্গী বিস্মিত হল, কারটা!

—ভরদ্বাজ মুখার্জি।

—সে কী! তা লাইটার মিসিং হওয়ার ব্যাপারে ভরদ্বাজ মুখার্জি কী ব্যাখ্যা দিয়েছে?

—প্রথমে মনেই করতে পারল না কোথায় রেখেছে লাইটারটা! একবার বলল, তাহলে হয়তো বর্ণনার ঘরেই ভুলে ফেলে এসেছি। পরক্ষণে আমাকে বলল, হয়তো আঙ্কেল চেয়ে নিয়েছিলেন।

—আঙ্কেল! মানে ঋষভ মুখার্জি!

—হ্যাঁ। কিন্তু আমি ঋষভ মুখার্জিকে সে-কথা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি তো ফায়ার। ভলক্যানো বলতে পারেন। চটেমটে বললেন, কে বলেছে? ভরদ্বাজ! বাস্টার্ডটা আর দোষ চাপাবার লোক খুঁজে পায়নি! সারাদিন ফোর টুয়েন্টি করে বেড়াচ্ছে এখানে এসে,

আর—তারপর একটু থেমে কাছেই সজনী দত্তকে দেখে ডাকলেন, বললেন, সজনী, ফোর টুয়েন্টিটাকে একটা কলকাতার টিকিট কেটে ট্রেনে উঠিয়ে দাও তো—

গার্গী হেসে ফেলল, কিন্তু ভরদ্বাজ কলকাতা যাবেই বা কী করে! ওকে তো আপনি কাস্টডিতে রেখে দিয়েছেন এখনও!

—নাহ, এখানকার কোর্টে প্রোডিউস করেছিলাম। জামিন পেয়ে গেছে।

—বাহ্, তাহলে ওকে শুটিং-স্পটে দেখছি না কেন!

এবার দেবাদ্রি হাসলেন, বোধহয় আঙ্কেলের ভয়ে এদিকে মাড়াচ্ছে না। দেখলাম, সাবুর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে। দুজনে সারাক্ষণ গুজগুজ ফুসফুস করছে।

—তাই। আর লাভলীন তালুকদার!

—তিনিও তো দুই বডিগার্ডকে দু'পাশে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আসলে অগ্নিশিখাকে দেখেই ভরদ্বাজের মাথা ঘুরে গেছে। ওঁর সঙ্গেই সেঁটে আছে সারাক্ষণ।

গার্গী আবার হেসে ফেলল, আহা, বেচারি। অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, লাভলীন তালুকদার হঠাৎ কলকাতা থেকে লখনউ এসে হাজির হল কেন বুঝতে পারছেন? কলকাতার পুলিশ লখনউ এসে তদন্ত করছে এ-সংবাদ পেয়েও হঠাৎ এখানে এসে হাজির হল!

দেবাদ্রি সান্যাল একটু ভেবে বললেন, মোটামুটি দুটো কারণে। প্রথম কারণ, রেশমবাইয়ের ভূমিকায় হয়তো তাকে নেওয়া হতে পারে এ-কথা ভেবে।

গার্গী হাসল, আর?

—দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, ডঃ সুস্নাত তালুকদারের সম্পত্তির খোঁজ নিতে। রানাজি সান্যাল কিংবা বর্ণনা সেনগুপ্ত, এ দুজনের মধ্যে একজন কেউ ডঃ সুস্নাত তালুকদারের সম্পত্তির খোঁজ রাখে বলে তার ধারণা।

গার্গী জিবে চুকচুক শব্দ করে বলল, কিন্তু প্রথম যে-কারণটার কথা আপনি বললেন, সে-ব্যাপারে তো লাভলীনকে কোনও সাহায্য করতে পারলাম না।

দেবাদ্রি হাসলেন, ইন্টারোগেট করার সময় লাভলীন আপনার সম্পর্কে কী বলেছে জানেন! বলেছে, গার্গী চৌধুরি কী করে রেশমবাইয়ের রোলটা ম্যানেজ করল বলুন তো। নিশ্চয়ই রানাজি সান্যালকে এক-দু' লাখ টাকা দিয়েছে। নইলে আমাকে প্রথমে টেলিফোন করে আসতে বলেও পরে মানা করে দিল কেন!

গার্গী এবার প্রবলভাবে হেসে উঠে বলল, ইস, লাভলীনের কথা ভেবে আমার সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। কেন যে রানাজি ওর সঙ্গে এরকম খারাপ ব্যবহার করলেন!

—আমার ধারণা, সার্বিক মজুমদারের কথা ভেবেই। সার্বিক যেভাবে অগ্নিশিখাকে আগলে রেখেছে, তাতে রানাজির পক্ষে সেই দুর্গ ভেদ করে অগ্নিশিখা পর্যন্ত পৌঁছনো সম্ভব হত না।

—ভালই ভেবেছেন এ ব্যাপারটা, গার্গী তারিফ করল দেবাদ্রির ব্যাখ্যা, কিন্তু ক্যাপ্টেনের ব্যাপারটা এখনও পরিষ্কার হল না আমার কাছে। ওঁর সঙ্গে রুমেলার কী সম্পর্ক!

—ক্যাপ্টেন অবশ্য এ-ব্যাপারে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমার জেরার জবাবে। বলছেন, রুমেলার সঙ্গে তাঁর বহুকাল আগের বন্ধুত্ব। প্রায় কুড়ি বছর। তখন রুমেলার বিয়েও হয়নি, সেসময় লখনউয়ে একবার শুটিং করতে এসেছিলেন রুমেলা। ক্যাপ্টেনও তখন তাঁর নতুন চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে লখনউ এসেছিলেন কোনও কাজে। তখনই দুজনের দেখা এবং বন্ধুত্ব। তারপর

এই দীর্ঘকাল দুজনের মধ্যে তেমন দেখা না হলেও একটা যোগাযোগ ছিল। এবার লখনউ এসে সেই যোগসূত্র ধরেই—

—ও! গার্গী ব্যাপারটা ভাবল কিছুক্ষণ, কিন্তু এতকাল আগের বন্ধুত্বকে মূলধন করে হঠাৎ এভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার ভূমিকাটা রুমেলা রায়ের পক্ষে একটু বেমানান নয়!

দেবাদ্রি হো হো করে হাসলেন, কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে প্রতিশোধ সবসময়ই খুব ভয়ঙ্কর হয়, তাই না মিসেস চৌধুরি!

—কিন্তু তাহলে আমাদের ভাবতে হবে, এক্ষেত্রে সেই প্রতিশোধ কতটা ভয়ঙ্কর।

দেবাদ্রি কিছুক্ষণ থমকে গেলেন গার্গীর এই অনিবার্য প্রশ্নটিতে, ঠিকই বলেছেন মিসেস চৌধুরি। এক্ষেত্রে এটাই আমাদের জিজ্ঞাসা, প্রতিশোধটা শুধু ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একই রুমে রাত কাটিয়ে তুললেন রুমেলা, না ক্যাপ্টেনের সহযোগিতায় বর্ণনাকে হত্যা করেই!

গার্গী তৎক্ষণাৎ যোগ করল, রুমেলা রায়ের আংটি আর ক্যাপ্টেনের লাইটার—এ দুটোই একই সঙ্গে বর্ণনার ঘরে পাওয়া গেছে বলেই ব্যাপারটা আরও বেশি করে ভাবাচ্ছে আমাকে। বিশেষ করে রুমেলা রায় যখন স্বীকার করেছেন, আংটিটা তাঁরই।

দেবাদ্রি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, তাতেও এক গোলযোগ উপস্থিত হয়েছে মিসেস চৌধুরি। আজ একবার বিবস্বান বসুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আংটিটা তিনি চেনেন কি না। তিনি কিন্তু বললেন, আংটিটা তাঁরই, কোথাও খুলে পড়ে গিয়েছিল বোধহয়।

—অর্থাৎ রুমেলা এবং বিবস্বান, দুজনেই দাবি করছেন আংটিটা তাঁর। আমার কাছে কিন্তু বিবস্বান বলেছিলেন আংটিটা তাঁর নয়। যা হোক, তাঁর বক্তব্য বদলেছে।

দেবাদ্রি ইতস্তত করে বললেন, হ্যাঁ, তাই তো দাঁড়াচ্ছে।

—তাহলে প্রশ্ন, কিন্তু কেন! আংটিটা যেহেতু বর্ণনার কাছে পাওয়া গেছে, সেক্ষেত্রে দুজনেই একই আংটির মালিক বলে দাবি করতে চাওয়াটা একটু রহস্যজনক নয়!

দেবাদ্রি একটু ভেবে বললেন, যেহেতু আংটিতে 'আর' অক্ষরটি মীনে করা আছে, তাই ওটা রুমেলার হওয়াটাই আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক।

—কিন্তু বিবস্বান বসুর আঙুলে আংটির একটা দাগ আছে। তাই তাঁর হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়।

দেবাদ্রি আবার ভাবলেন, তাহলে আপনি কি বলতে চাইছেন রুমেলা আংটিটা তাঁর নিজের বলে স্বীকার করে নিয়ে বাঁচাতে চাইছেন বিবস্বানকে!

—এখনই তা নিয়ে কিছু ভাবতে চাইছি না। তবে বর্ণনা যেদিন রাতে খুন হয়, সে রাতে কিন্তু তার ঘরে অনেকেই গিয়েছিলেন। তবে বিভিন্ন সময়ে। আমি সেই হিসেবটাই করতে চাইছি, কে কে গিয়েছিলেন এবং কে কতক্ষণ কাটিয়েছেন তার ঘরে!

—তার মানে বলতে চাইছেন, প্রায় সারা রাত একটা নাটক হয়েছিল বর্ণনার ঘরে!

কথা বলতে বলতে দুজনে তখন এসে দাঁড়িয়েছে দেবাদ্রির জিপের পাশে। তখনও পর্যন্ত সিনেমুভির টিম প্রস্তুত হতে পারেনি পরবর্তী শুটিংয়ের জন্য। আপাতত ঋষভ মুখার্জি স্পটে নেই। বাকি আউটডোরের শুটিং চালাবে রোমিও দত্তগুপ্ত। রোমিও বহুক্ষণ আগেই সজনী দত্তকে বলে দিয়েছে সেই রংচঙে টাঙাটা আবার চকবাজারে নিয়ে আসার জন্য। সজনী দত্ত গিয়েছেনও বহুক্ষণ, এখনও কেন ফিরছেন না টাঙা নিয়ে সেটাই ভাবছে সবাই। ওদিকে দুপুর শেষ হতে চলল, বাইরে আলো কমে এলে আউটডোরের শুটিং করাও কষ্টকর হবে।

না কি শুটিং আজ আদৌ হবেই না! সজনীবাবুর দেরি দেখে গার্গী 'ওয়ান মিনিট, প্লিজ' বলে

দেবাদ্রিকে তাঁর জিপের কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে সোজা চলে গেল রোমিওর কাছে। সিনেমুভির টিম তখন সেট গোটাচ্ছে দ্রুত, কিন্তু সে গোটানোর মধ্যে খুব যে একটা প্রাণ আছে তাও নয়, বরং ঋষভ মুখার্জির হঠাৎ চলে যাওয়াটা কেউ পছন্দ করেনি। গার্গী শুনল, রানাজি বলছেন রোমিওকে, এইজন্যেই তো ঋষভ মুখার্জির সঙ্গে কাজ করা খুব ঝামেলা, এত্ত হুইমজিক্যাল—

গার্গীকে সেখানে দেখে রোমিও হাসল, খুব অধৈর্য হয়ে পড়েছেন নাকি, ম্যাডাম, সজনীদা এলেই —, রানাজিদা, একটু দেখবেন সজনী কেন ফিরছেন না এখন!

রানাজি সান্যাল বেশ বিরক্ত মুখে এগিয়ে গেলেন চকবাজারের মুখের দিকে। সিনেমা দলের লোকদের কাছে শুটিঙের প্রতিটি মুহূর্তই ভীষণ মূল্যবান। রোমিও পর-পর অনেকগুলো দৃশ্য টেক করবে আজ। হয়তো আবার সন্ধের পর চকবাজারে আরও কিছু শট নেবে। গার্গীকে সে-কথা জানিয়ে রোমিও হঠাৎ হাসি-হাসি মুখে বলল, বি. বি. কী বলছেন জানেন, ম্যাডাম। বলছেন গার্গী চৌধুরির সঙ্গে পুলিশের অত ভাব কীসের! উনি কি আমাদের ওপর স্পাইং করছেন!

গার্গী বেশ থমকে গেল কথাটা শুনে। দেবাদ্রির সঙ্গে তার মাঝে মাঝে কথাবার্তা বলার আলোচনার ব্যাখ্যা যে এভাবে হতে পারে তা ভাবতে পারেনি একবারও। আসলে কাল সন্ধের ব্যাপারটা নিয়ে বিবস্বান বসু যে এখনও তেতে আছেন ভেতরে-ভেতরে, কিছুটা ধন্দেও, এ ধরনের আলগা উক্তি তারই অকাট্য প্রমাণ। হঠাৎ হেসে উঠে বলল, না, স্পাই হওয়ার মতো দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মাইনি বোধহয়। তবে পুলিশ-অফিসারটির সঙ্গে আমার কলকাতা থাকতেই আলাপ। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে চাইছিলাম আমাদের কারও ওপর তিনি অহেতুক সন্দেহ করছেন কি না!

'সিনেমুভি'র টিমকে 'আমাদের' বলে উল্লেখ করায় বেশ খুশি-খুশি দেখাল রোমিওকে, হঠাৎ আস্তে করে জিজ্ঞাসা করল, কিছু আঁচ করতে পারলেন!

—নাহ, গার্গী হাসল, আসলে পুলিশ-অফিসার নিজেও এখনও শিওর নন।

সেই মুহূর্তে চকবাজারের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে দ্রুত এসে থামল সেই গাড়িটা, যেটিতে একটু আগেই ঋষভ মুখার্জি ফিরে গিয়েছিলেন হোটেলে। অন্য সবার সঙ্গে গার্গীও আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল, পরিচালক আবার তাঁর মত বদলে শুটিং-স্পটে ফিরে এলেন কি না। কিন্তু না, গাড়ির ভেতর থেকে নামলেন সজনী দত্ত। সজনী দত্তই তো পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন ঋষভকে। তারপর কথা ছিল তিনি নির্দিষ্ট টাঙাটি নিয়ে ফিরে আসবেন এখানে, তার বদলে পরিচালকের গাড়ি নিয়ে কেন!

সজনী দত্তকে কিন্তু ভারি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে দেখা গেল কোঠির দিকে। কারও সঙ্গে কথা না বলে ঢুকে গেলেন সোজা কোঠির ভেতর সেই ঘরটায় যেখানে বসে নির্দেশনায় ব্যস্ত ছিলেন ঋষভ মুখার্জি। যারা সেট গোচ্ছাচ্ছিল, তাদের সবাইকে জনে-জনে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'অ্যাই, তোরা কেউ পরিচালক-স্যারের সেই ছোট্ট যন্তরটা দেখেছিস? কেউ দেখেনি শুনে প্রবল দুশ্চিন্তায় হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে বললেন, সর্বনাশ হয়েছে, আর বোধহয় শুটিং হল না। পরিচালক-স্যার রেগে ফায়ার।

পরিচালক তো সারাক্ষণই রেগে আগ্নেয়গিরি হয়ে আছেন, সুতরাং 'শুটিং হবে না' শুনেও কেউ তত ব্যস্ত হয়ে পড়ল না। এ ক'দিন এতবার শুটিং বন্ধ হতে হতে আবার জেগে উঠেছে ফিনিক্স পাখির মতো যে, ব্যাপারটা তেমন গুরুত্ব পেল না আজ।

কিন্তু কেন শুটিং হবে না সেকথা বলতে গিয়ে সজনী দত্ত প্রায় ঋষভীয় ভঙ্গিতেই হাত-

পা ছুড়ে বলতে লাগলেন, পরিচালক-স্যার বলছেন, এ নিশ্চয়ই অন্তর্ঘাত। আমাদের ভেতরেই কেউ একটা স্যাবোটাজ চালিয়ে যাচ্ছে, এ সব তারই কাজ। অসম্ভব। ইমপসিবল। এভাবে কাজ করা—

কিন্তু ঘটনাটা কী হয়েছে, তা এতক্ষণে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সজনীবাবু জানালেন যে, ঋষভ মুখার্জির সেই প্রিয় ডিজিটাল ডায়েরিটা আজ দুপুরেই শুটিং করার সময় খোয়া গিয়েছে। নিশ্চয়ই তাঁর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে কেউ চুরি করে নিয়েছে ওটা! অথচ ওই ডিজিটাল ডায়েরিটার মধ্যেই 'সোনালি ঘুঙুর'-এর যাবতীয় পয়েন্ট্স্ সব পাই-টু-পাই নোট করা আছে। ওটা ছাড়া আর একটি দৃশ্যও শুটিং করা সম্ভব নয়।

ব্যাপারটা এতক্ষণে খোলসা হতে গার্গী হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, কারণ ডিজিটাল ডায়েরিটা তো তার ভ্যানিটি-ব্যাগের মধ্যেই যত্ন করে জিম্মা করা আছে, সে তো ভেবেই ছিল পরিচালকের সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রথম সুযোগেই ডিজিটাল ডায়েরিটা সমর্পণ করবে তাঁর হাতে। তৎক্ষণাৎ কাঁধের ব্যাগ থেকে বার করতে যাচ্ছিল ওটা, কিন্তু সেই মুহূর্তে যে-ভাবনাটা তার মাথায় উদয় হল, হঠাৎ তার কাছ থেকে ঋষভ মুখার্জির এই প্রিয় ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রটি উদ্ধার হলে একটা সন্দেহের অবকাশ থেকেই যাচ্ছে অন্যদের মনে। একটু আগেই তার কানে এসেছে, তার সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বিবস্বান বসু, তা ছাড়া ঋষভ মুখার্জি হোটেলে ফিরে গিয়ে চেঁচামেচি করেছেন, নিশ্চয়ই তাঁর ডিজিটাল ডায়েরিটা চুরি করে অন্তর্ঘাতের আয়োজন করেছে সিনেমুভির টিমের কেউ। ঠিক এরকম টেনশনের মুহূর্তে তারই ব্যাগ থেকে যদি খোয়া-যাওয়া বস্তুটি উদ্ধার হয়, তাহলে এ নিয়ে কানাকানি ফিসফিসানি শুরু হতে পারে অন্যদের মধ্যে। বরং ওটা এখন তার ব্যাগেই জিরোতে থাকুক, পরে সুবিধেমতো সময়ে কোনও ভাবে রেখে আসবে ঋষভের ঘরে বা অন্য কোনও জায়গায়, যাতে নজরে চলে আসে ঋষভের বা অন্য কারও।

টাঙা না নিয়ে সজনী দত্ত ফিরে আসায় অধৈর্য হয়ে রোমিও একটু মেজাজ হারিয়ে বলল, কী সজনীদা, একটা খুদে ডিজিটাল ডায়েরির জন্যে আমাদের শুটিং বন্ধ হয়ে যাবে! আপনি টাঙার ব্যবস্থা করলেন না!

সজনী দত্ত খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছেন পরিচালকের প্রিয় বস্তুটি খুঁজে না পাওয়ায়। তখনও স্পটবয়রা আঁতিপাতি করে খুঁজে চলেছে কোঠির ভেতরে সর্বত্র। রোমিওর বকুনি খেয়ে বললেন, আমি কী করব। ওদিকে পরিচালক-স্যারের তো মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। ওটা না নিয়ে গেলে আমাকে হয়তো ফাঁসিতে চড়াবেন, নাহলে নির্ঘাত শূলে—

রোমিও বিরক্ত হয়ে বলল, ঋষভদাকে বলবেন ওটা একসময় না একসময় পাওয়া যাবেই। তার জন্য পুরো বিকেলটা নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। আপনাকে দশ মিনিট সময় দিলাম। এর মধ্যে টাঙা না এসে পৌঁছলে—

নতুন পরিচালকের ধমক খেয়ে সজনী দত্ত তক্ষুনি আবার গাড়ি নিয়ে ছুটলেন টাঙার সন্ধানে। সেদিকে তাকিয়ে রোমিও বিড়বিড় করতে লাগল, এভাবে কি শুটিং করা যায়! মুডটাই তো নষ্ট হয়ে গেল।

গার্গী তার দিকে একবার হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে কী যেন ভাবল, তারপর এগিয়ে গেল একটু দূরেই দাঁড়িয়ে থাকা দেবাদ্রি সান্যালের দিকে। দেবাদ্রি সান্যাল ততক্ষণে কাছেই একটা চায়ের দোকান থেকে এক ভাঁড় চা নিয়ে বেশ তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দিচ্ছেন, গার্গীকে দেখে বললেন, চা খাবেন, ম্যাডাম?

গার্গী ঘাড় নাড়ল, আপাতত নয়, পুলিশ অফিসারের সঙ্গে গল্প করছি দেখেই কেউ কেউ সন্দেহ করছেন, আমি পুলিশের স্পাই কি না, তারপর যদি আবার পুলিশের পয়সায় চা খাই—

দেবাদ্রি হঠাৎ উৎসাহিত হলেন, কে সন্দেহ করছেন, ম্যাডাম৷ তাঁর নামটা নোট করে রাখি। পরে কাজে লাগবে।

গার্গী হেসে বলল, সে-নামটা না হয় পরেই শুনবেন। আপাতত আমার আর একটা জিজ্ঞাসা হল, হাতুড়ির গায়ে কারও হাতের ছাপ কি পাওয়া গেছে?

—নাহ্. দেবাদ্রি হতাশায় মুখ করুণ করলেন, তাহলে তো তদন্তের কাজ গুটিয়ে আনতে সুবিধেই হত। টুকরো-টুকরো অনেকগুলো হাতের ছাপ এখানে-ওখানে লেগে থাকলেও একেবারে শেষে যিনি হাতুড়িটা ধরেছিলেন তিনি সম্ভবত হাতে গ্লাভ্‌স্ পরে তবেই খুন করেছেন বর্ণনাকে।

—তাহলে তো খুবই ধড়িবাজ খুনি বলতে হবে। কিন্তু এত সময় তিনি পেলেন কী করে তখন, সেটাও তো ভাববার কথা, মিঃ সান্যাল।

—কিন্তু হাতুড়ির পেছন দিকের ধারালো জায়গাটায় যে-রক্তের ছিটে লেগে ছিল, সেটা কিন্তু বর্ণনার বলেই রায় দিয়েছেন ফরেনসিক-বিশেষজ্ঞরা।

গার্গী কিছুক্ষণ গভীরভাবে নিজেকে ডুবিয়ে দিল বর্ণনা-হত্যার মুহূর্তটিকে এক-একা ভাবতে রহস্যটা ক্ষীণ কুয়াশার মতো আলতো করে জড়িয়ে আছে তার মগজ। কখনও কুয়াশা ভেদ করে একটু রোদ দেখা দিচ্ছে, পরক্ষণেই নতুন কুয়াশা এসে ভরে ফেলছে জায়গাটা। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বলল, কিন্তু ঘটনাটার একজন প্রত্যক্ষদর্শী আছে বলেই মনে হচ্ছে।

—প্রত্যক্ষদর্শী! দেবাদ্রি সান্যালের চায়ের ভাঁড় হাত থেকে পড়ে যায় আর কি, কে বলুন তো, মিসেস চৌধুরি?

—কিন্তু মুশকিল হল সেই প্রত্যক্ষদর্শী কথা বলে না। সে সত্যিই ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব, না কি মূক-বধিরের ভূমিকায় অভিনয় করছে তাও বুঝতে পারছি না।

দেবাদ্রি লাফিয়ে উঠতে চাইলেন তৎক্ষণাৎ কে লোকটা! আপনি শিওর সে সব কিছু দেখেছে? নিজের চোখে!



সজনী দত্ত এতক্ষণেও সেই বাহারি টাঙাটা নিয়ে না এসে পৌঁছনোয় দু-দুটো খুনের পেছনে সম্ভাব্য মোটিভ, কলকাতায় তার কী ব্যাকগ্রাউন্ড, কলকাতা থেকে লখনউ এসে কীভাবে আছড়ে পড়েছে তার ঢেউ, সিনেমুভির কোন কুশীলবের কী ভূমিকা থাকতে পারে তার নেপথ্যে, এহেন

কূট আলোচনায় দেবাদ্রি সান্যাল মশগুল হয়ে পড়লেন গার্গী চৌধুরির সঙ্গে। এই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি তরুণীটির ওপর কলকাতা থেকেই তাঁর একটা সমীহ তৈরি হয়ে রয়েছে, তার ওপর লখনউ এসে সহসা দুঃসাহসীর মতো সিনেমুভির সঙ্গে যেভাবে জড়িয়ে পড়েছে গার্গী, তাতে তাঁর সম্পর্কে এখন আলাদা একটা সম্ভ্রমও। গার্গী চা খেতে না চাওয়ায় অগত্যা শুকনো আলোচনাটাই একটু রসালো করে তুলতে চাইলেন, দেখুন মিসেস চৌধুরি, অধিকাংশ মার্ডারের পেছনে মোটিভ খুঁজতে গিয়ে আমরা চিরাচরিত দুই রিপুকে আবিষ্কার করে থাকি, অর্থ এবং নারী, এ ক্ষেত্রেও কিন্তু সেই এক ইতিবৃত্ত। আপনি কী বলেন?

গার্গী হাসল, আপাতত তাই তো মনে হচ্ছে।

—আরও একটা আশ্চর্য ঘটনা এই যে, খুন হয়েছে দুটি, একটি কলকাতায়, অপরটি লখনউতে। কিন্তু তার পেছনে যাদের ভূমিকা থাকা সম্ভব, তাঁরা একে-একে সবাইই আপাতত লখনউয়ে উপস্থিত।

গার্গী তারিফ করল, ঠিকই। বিটন তালুকদার আগেই এসে পৌঁছেছিলেন। এখন এসে পৌঁছেছেন লাভলীন তালুকদার আর সার্বিক সমাজদার। তবে কলকাতায় আরও একজন এখনও রয়ে গেছেন, তিনি বিটনের দাদা রঙ্গন তালুকদার, তাঁর কথা কি বিস্মৃত হলেন!

দেবাদ্রি তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংশোধন করেন, একজ্যাক্টলি। তিনি পুলিশ কাস্টডিতে না থাকলে হয়তো তাঁকেও আমরা এর মধ্যে মঞ্চে অবতীর্ণ হতে দেখতাম। তবে মিসেস চৌধুরি, ক'দিন ধরে একটা ভাবনা ভেবে জেরবার হচ্ছি, দুটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নায়ক একই ব্যক্তি, না কি দুজন, না একাধিক!

গার্গী ভুরুতে ভাঁজ ফেলে ব্যাপারটা ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর হেসে বলল, ভালই ভেবেছেন তো, একাধিক! তারপর দেখা গেল আগাথা ক্রিস্টির লেখা ট্রেনের কামরায় সেই বিখ্যাত হত্যাকাণ্ডটির মতো এখানেও হয়তো উপস্থিত সবাইই প্ল্যান করে দু-দুটো মানুষকে নিঃশব্দে সরিয়ে ফেলেছে পৃথিবী থেকে। কোনও কিছুই অসম্ভব নয় কিন্তু।

দেবাদ্রি এবার বেশ সিরিয়াস চিন্তায় নিজেকে মগ্ন করে বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে, মিসেস চৌধুরি। হয়তো অনেকে মিলে ঘটিয়েছে ব্যাপারটা। কারণ এখানে উপস্থিত অনেকেরই কিছু না কিছু মোটিভ আবিষ্কার করা গেছে এ কদিনে।

গার্গী কৌতুক-কৌতুক মুখ করে বাজাতে চাইল দেবাদ্রিকে যেমন—

—প্রথমে ধরুন, ডঃ সুস্নাত তালুকদারে হত্যাকাণ্ডটি। বয়স্ক ডাক্তারটির রোরিং পশার নষ্ট হতে বসেছিল তাঁর দুই সর্বনাশা নেশার কারণে। দাবার নেশা যদিও বা ম্যানেজ করে চালিয়ে যাচ্ছিলেন ডাক্তারি, কিন্তু নারী-সান্নিধ্য উপভোগ করতে গিয়ে হারাতে হল তাঁর পৈতৃক প্রাণটাই। যে ক'জন কুশীলব আমাদের সামনে আপাতত সন্দেহভাজন হয়ে অবতীর্ণ, তাদের মধ্যে ডাক্তারের দুই ভাইপো রঙ্গন আর বিটন যেমন আছেন, তেমনই আছেন রঙ্গনের স্ত্রী লাভলীন প্রথম দু'জন যদি টাকার লোভে খুন করে থাকেন তাঁদের কাকাকে, তা হলে তৃতীয় জনের মোটিভ সিরিয়ালের অভিনয়। লাভলীনের সঙ্গী হিসেবে রানাজি সান্যালের কথা যেমন ভাবতে পারি, তেমনই মনে আসছে সার্বিক সমাজদারের মুখও। দুজনেই লাভলীনকে ভাগাবার জন্য তখন যে কোনও অপকর্মে রাজি।

গার্গী মনে মনে ব্যাপারটা ভেবে নিয়ে বলল, আর?

—ভরদ্বাজ মুখার্জিও কিন্তু ফোর টুয়েন্টির মতো সেজে বারবার ঘুর ঘুর করছে পটভূমিকায়!

সে যে কার পাল্লায় পড়ে কী অপকর্ম ঘটিয়ে ফেলবে তার কোনও ঠিক নেই। তবে সবশেষে যে নামটা ভেসে উঠছে আমার মগজে সে নাম বর্ণনা সেনগুপ্ত। হয়তো রানাজি কিংবা ভরদ্বাজ কারও সহায়তা নিয়ে, অথবা সে একাই একম একটা ভয়ঙ্কর কাজ করে থাকতে পারে।

—হুঁ। তারপর?

—তারপর তো পটভূমি সরে এল লখনউয়ে। এখানে আসার পর পটভূমিতে সবচেয়ে জোরালো রং ধরাল রোমিও দত্তগুপ্ত। সে পট করে প্রেমে পড়ে গেল বর্ণনার। আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা দিল তিনজন—বিবস্বান বসু, রানাজি সান্যাল ও ভরদ্বাজ মুখার্জি। এই চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে রুমেলা রায়ের অবস্থান যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই ভয়ঙ্কর। বিশেষ করে ক্যাপ্টেন নামের ওই রহস্যময় লোকটির ভূমিকা এক্ষেত্রে বেশ ভাইটাল বলে আমার ধারণা। কিন্তু এর মধ্যে কলকাতা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয়েছে বিটন তালুকদার। হত্যার রাতে সে লখনউতে ছিল, এবং তাকে হোটেল ইনের আশেপাশে এমনকী ভেতরেও দেখা গেছে ঘুরঘুর করতে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, সে লখনউ এসেছিল বর্ণনাকেই খুঁজতে।

গার্গী হেসে বলল, তা হলে আপনার সামনে এখন লম্বা তালিকা। আর কেউ?

—হ্যাঁ। তা ছাড়া আরও তিনটি ব্যক্তিত্ব আছেন যাদের উপস্থিতিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

গার্গী আশ্চর্য হয়ে বলল, আরও তিনজন!

—হ্যাঁ। পরিচালক ঋষভ মুখার্জি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোডাকশন ম্যানেজর সজনী দত্ত, আর সিনে মুভির আর্ট ডিরেক্টর শাম্ব সামন্ত। এই তিনজন সম্পর্কে অনেক চেষ্টা করেও কোনও নজর কাড়ার মতো ক্লু অবশ্য আবিষ্কার করতে পারিনি এখনও। তবু তালিকা থেকে এদের কারও নাম বাদ দিইনি।

গার্গী হেসে বলল, আরও কয়েকজনকেও কিন্তু আপনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনছেন না। সাউন্ড রেকর্ডিস্ট দ্বিত্বম রায়, স্পটবয় ভনা, এমনকী বিবস্বন বসুর অ্যাটেন্ডেন্ট লোচ্চা। তা ছাড়া মেক-আপ ম্যান মাচানবাবু—

—না, না দেবাদ্রি সজোরে ঘাড় ঝাঁকালেন, না, এরা সব নিতান্তই হেঁজিপেজি চরিত্র। কারও ওপর সামান্যতম সন্দেহ করারও কোনও কারণ নেই এখনও পর্যন্ত।

গার্গী ভাল করে পরখ করল দেবাদ্রিকে, আচ্ছা, দুটি খুনের পেছনে কোনও কমন নাম থাকার সম্ভাবনার কথা ভাবছেন কি, মিঃ স্যান্যাল!

—কমন নাম!

—হ্যাঁ, যদি হত্যাকারী দুজন বা বহুজন না হয়ে কোনও একজন হয়ে থাকে?

দেবাদ্রি কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, তিনজনের নাম ধরা যেতে পারে। রানাজি, ভরদ্বাজ আর বিটন তালুকদার। তবে এদের মধ্যে রানাজি আর বিটনই আমার কাছে আপাতত সবচেয়ে সন্দেহজনক। প্রথম জন যদি অতি ধুরন্ধর হয়ে থাকেন, তা হলে দ্বিতীয় জন হল চিরাচরিত ভিলেন টাইপের এবং বোকা, যারা টাকার জন্য যে কোনও অপকর্মে সিদ্ধহস্ত।

গার্গী কিছুক্ষণ এত সব রহস্যে ডুব দিয়ে হাসল অদ্ভুতভাবে, তা হলে তো আপনার সামনে এখন গোটা ইংলিশ চ্যানেল, মিঃ সান্যাল। এত চরিত্রের রহস্য বিশ্লেষণ করে, ক্লু আবিষ্কার করে ওপারে পৌঁছনো কিন্তু একটা হারকিউলিয়ান টাস্ক।

এতক্ষণের দীর্ঘ আলোচনা, তারপর একরাশ সন্দেহভাজন মুখ মনের ভেতর ঢালা-উপুড় করতে করতে খুবই অনিশ্চিতভাবে হাসলেন দেবাদ্রি। কয়েকদিনের ছোটাছুটি, রাত-জাগা

অবিশ্রান্ত জেরা, কলকাতায় ক্রমাগত ফোন, টেনশন ইত্যাদির ফলে তাঁর সুদর্শন চেহারায় এখন বেশ ক্লান্তির ছাপ। মুখখানাও কদিন ধরে ম্রিয়মাণ। কলকাতায় একটি হত্যাকাণ্ডের জের ধরে হত্যাকারীকে গ্রেফতার করতে লখনউ পর্যন্ত ধাওয়া করে, এসে জানতে পারলেন, হত্যাকারী নিজেই খুন হয়ে গেছে আর এক অদৃশ্য আততায়ীর হাতে। তারপর জেরার পর জেরা করতে গিয়ে কখনও আবিষ্কৃত হচ্ছে নতুন দিগন্ত, কখনও ডুবে যাচ্ছেন নতুন ধোঁয়াশায়, কখনও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন এর তার পরস্পরবিরোধী জবানবন্দিতে। সেসব কথাই ভাবতে ভাবতে দেবাদ্রি হঠাৎ গার্গীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো সারাক্ষণ এদের সঙ্গে সেঁটে আছেন, মিসেস চৌধুরি। কারও কোনও দুর্বলতা আবিষ্কার করতে পারছেন না?

প্রশ্নটা এর আগেও একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন দেবাদ্রি, আবার শুনে গার্গী হাসল, পারছি, আবার পারছি না। এখনও অনেকটাই কিন্তু কুয়াশায় ঢাকা। তবে আজকালের মধ্যে আরও অনেক ঘটনাই ঘটতে পারে মনে হচ্ছে।

দেবাদ্রি আশ্চর্য হয়ে বললেন, কী রকম।

—হয়তো অন্য কারও লাইফের ওপর অ্যাটেম্পট হতে পারে।

দেবাদ্রি খুবই হকচকিয়ে গেলেন গার্গীর কথায়, কার ওপর?

—সে কথা নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না। তবে হত্যাকারী, একজন, দুজন বা বহুজন, যে ক'জনই হোক না কেন, তিনি বা তাঁরা কিন্তু প্রতিনিয়ত খেয়াল রাখছেন ঘটনার গতিপ্রকৃতির দিকে। জবানবন্দিতে কে কী বলছেন, তাতে হত্যাকারীর ধরা পড়ার সম্ভাবনা কতটা তাও খেয়াল করছে, আরও কিছু বলে ফেলে কি না সে আশঙ্কাও রয়েছে, সেক্ষেত্রে দুটোর জায়গায় তিনটে খুন হয়ে যাওয়াটাও কিছু বিচিত্র নয়। এমনকী, বলে গার্গী একটু হাসল, আমার ওপর হত্যার-চেষ্টা হওয়াটাও কিন্তু অসম্ভব মনে হচ্ছে না এখন।

দেবাদ্রি চমকে উঠে বললেন, সে কী!

—হ্যাঁ, কারণ এর মধ্যে কারও কারও ধারণা হয়েছে যে, আমি পুলিশের স্পাই। সে ধারণা সঞ্চারিত হচ্ছে এক কান থেকে আর এক কানে। কিন্তু আমি এই সিরিয়ালে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ রোলে অভিনয় করছি, আর শুটিং এতটাই এগিয়ে গেছে যে, আমাকে ফেলে দেওয়াও এখন সম্ভব হচ্ছে না ওদের পক্ষে। বলতে পারেন নিজেদের জালেই ওরা জড়িয়ে পড়েছে এখন। আর হ্যাঁ, কলকাতা থেকে একটা খবর আনাবেন, ডঃ তালুকদারের ডেডবডির পাশে যে-চশমাটা পাওয়া গেছে তার পাওয়ার কত!

—আপনার ওপর অ্যাটেম্পট হবে এমন আভাস পেলেন নাকি! দেবাদ্রিকে খুবই অন্যমনস্ক মনে হল।

গার্গী হেসে ফেলল, সে কি আমাকে বলে কয়ে করবে। তবে আমাকে নিয়ে ওরা যে বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, সেটা আঁচ করতে পারছি। কিছু কিছু এমন তথ্য জেনে ফেলছি যা ওদের কাছে বিব্রত হওয়ার মতো। যাই হোক, আপনি বেশ অ্যালার্ট থাকবেন। আজ গভীর রাত পর্যন্ত শুটিং হবে। তারপর হয়তো কালও। ওরা চেষ্টা করবে কালকের মধ্যে শুটিং শেষ করে লখনউ ছেড়ে চলে যেতে। অতএব আপনাকেও খুব তৎপর হতে হবে, মিঃ সান্যাল।

দেবাদ্রি সান্যালকে খুবই দুশ্চিন্তিত দেখা গেল অতঃপর। দু-দুটি খুনের রহস্য বোতল থেকে ধোঁয়ার মতো একটু একটু করে বেরিয়ে একটি বিশালকায় দৈত্যের আকার ধারণ করেছে আপাতত। এখনও পর্যন্ত কোনও একজন বা দুজনকে তিনি হত্যাকারী বলে শনাক্ত করে উঠতে

পারেননি। রিপোর্ট লিখতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে উঠছেন বারবার। ইনিও হতে পারেন, উনিও, এমন দোটানায় পড়ে ক্রমাগত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছেন তাঁর ব্রিফকেসের ভেতর সযত্নে রক্ষিত ঢাউস ডায়েরিটা। সিনেমুভির টিম যেখানেই শুটিং করছে, সেখানেই ছুটে গিয়ে নজর রাখছেন প্রতিটি চরিত্রের ওপর। তাঁর উপস্থিতি একটা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে সবার মধ্যে তাও খেয়াল রাখছেন। এমনকী পরিচালক ঋষভ মুখার্জি এখন তাঁকে দেখলেই খেপে গিয়ে শুটিং বন্ধ করে দিচ্ছেন, তাতেও রণে ভঙ্গ দিচ্ছেন না দেবাদ্রি।

আর রণে ভঙ্গ দেবেনই বা কী করে! এ কেসে খুনি ধরতে না পারলে তাঁর চাকরির খাতায় একটা কালো আঁচড় পড়ে যাবে যে।

দেবাদ্রির এত সব ভাবনার মধ্যে হঠাৎ রণাঙ্গণে এসে পৌঁছল রোমিও দত্তগুপ্ত। সজনী দত্ত তখনও টাঙা নিয়ে না এসে পৌঁছানোয় তার চোখেমুখে একটা বিরক্তির পোঁচ, তার ওপর গার্গী চৌধুরি বহুক্ষণ যাবৎ দেবাদ্রি সান্যালের সঙ্গে খোসমেজাজে গল্পরত দেখে একটা অস্বস্তিও। সে এসে অস্বস্তিটা প্রকাশও করে ফেলল সহসা, বলল, পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টরের সঙ্গে কী এত ষড়যন্ত্র করছেন, মিসেস চৌধুরি!

রোমিওকে কাছাকাছি আসতে দেখেই দেবাদ্রি সান্যালের চোখ-মুখ মুহূর্তে শক্ত। আসামিকে হাতের মুঠোয় পেলে পুলিশ-অফিসারদের যেমন হয়ে থাকে। গার্গী অবশ্য সামাল দেওয়ার জন্য বলল, আপনিও জয়েন করুন না আমাদের সঙ্গে। সজনীবাবু যখন এখনও ফেরেননি, তখন এবার এক ভাঁড় করে চা নিতে পারি আমরা।

রোমিও তৎক্ষণাৎ চায়ের অর্ডার পেশ করতে যাচ্ছিল সামনের ঝুপড়ি দোকানটিতে, কিন্তু দেবাদ্রি হাত তুলে নিষেধ করলেন সম্ভবত এই কারণে যে, কোনও সন্দেহভাজনের আতিথেয়তা নেওয়া পুলিশ অফিসারের পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়।

অবশ্য চা খাওয়ার সময়ও পাওয়া গেল না। হঠাৎই চকবাজারের মুখে নজর পড়ল, টগবগ টগবগ শব্দ তুলে সেই বাহারি টাঙাটা ঢুকে পড়েছে বাইজি-কোঠির গলিতে। টাঙায় বেশ রাজকীয় স্টাইলে উপবিষ্ট সজনী দত্ত। কিন্তু মুখখানা ভারি করুণ। হয়তো ডিজিটাল ডায়েরিটা খুঁজে না পাওয়ার কারণে বেশ এক প্রস্থ ধমক খেয়েছেন পরিচালকের কাছে। টাঙা থেকে অত বড় শরীরটা সামলে সুমলে মাটিতে ল্যান্ড করে সেই কথাই বললেন, শুটিং বোধহয় আর হবে না, ক্যামেরাসাহেব।

ক্যামেরাসাহেব অর্থাৎ রোমিও দত্তগুপ্ত বলল, ঋষভদা বলেছেন তো? বলতে দিন—

—হ্যাঁ। যাকে বলে তিনি এখন ডবল ফার্নেস। রেগে দাউ দাউ।

রোমিও হেসে বলল, আর যেটুকু শুটিং বাকি আছে তা ঋষভদা না হলেও চলবে, সজনীদা। আমি বাকি কাজটা ঠিক ম্যানেজ করে নেব। ঋষভদাকে দিয়ে বলুন, ওঁর ডিজিটাল ডায়েরির শোকে একটা শোকসভা বসাতে, না হয় একটা গোটা তাজমহলই বানিয়ে ফেলুন লখনউতে, বলে গার্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, আসুন তো ম্যাডাম, আউটডোরটা সেরে ফেলি। খুব লম্বা শট। সময়ও লাগবে বহুক্ষণ।

অতএব দেবাদ্রির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গার্গী আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল তার নির্ধারিত শুটিঙের কাজে। আউটডোরের বিষয়বস্তুটি সে মোটামুটি জেনে গিয়েছে স্ক্রিপ্টটিতে দু-তিনবার চোখ বুলিয়ে। রেশমবাই তার মা কুন্দনবাইয়ের নিষেধ সত্ত্বেও আবার কলকাতার পত্রকার পুলক চৌধুরির সঙ্গে লখনউয়ের পথে ঘুরতে বেরিয়েছে টাঙায় চড়ে।

ক্যামেরা, সাউন্ড প্রস্তুত হতেই কোঠির ভেতর এতক্ষণ অপেক্ষামাণ বিবস্বান বসু বাইরে বেরিয়ে এলেন সিরিয়ালের নায়ক পুলক চৌধুরির ভূমিকায় অভিনয় করতে। রেশমবাইয়েব কোঠির ঠিক বাইরেই তখন দাঁড়িয়ে আছে ঝকঝকে চেহারাব টাঙাটা। টাঙার ওপবে সবুজ ভেলভেটের ছাউনি, ছাউনির নীচে নরম গদিঅলা সিট, তাতে নায়ক বসতেই তার পাশে রেশমবাইবেশী গার্গী চৌধুরিও।

চলন্ত টাঙার ছবি তুলতে তখন রোমিও দত্তগুপ্তও প্রস্তুত। টাঙা চলছে, তার পেছনে বা পাশে আর একটা গাড়িতে রোমিও আর দ্বিত্বম! সঙ্গে শাম্ব সামন্ত।

রেশমবাই আজ টাঙায় ওঠার পর থেকেই অযথা গম্ভীর। কোঠি থেকে বেরোবার মুহূর্তে তার চোখে পড়েছে, কোঠির ভেতর জাফরির জানালা দিয়ে তার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছেন তার মা কুন্দনবাই। কুন্দনবাই একেবারেই চাইছেন না তাঁর মেয়ে রেশমবাই কোনও ভাবে সম্পর্কিত হয়ে পড়ুক কলকাতার সাংবাদিকের সঙ্গে। তার কিন্তু ফল হয়েছে বিপরীত। তার মায়ের নিষেধ যতই তীব্র হয়ে দেখা দিচ্ছে, ততই জেদ চেপে যাচ্ছে রেশমবাইয়ের। ততই কী এক প্রবল টান সে অনুভব করছে কলকাতার সাংবাদিকের ওপর। কেন এই আকর্ষণ, তা খুব একান্তে নিজের ভেতর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে রেশমবাই এও অনুভব করছে হয়তো সে ভালবেসেই ফেলেছে তার দ্বিগুণ বয়সী সুদর্শন পত্রকারটিকে।

টাঙা চলতে শুরু করতেই তাই অস্ফুট কণ্ঠে বলে ফেলল রেশমবাই, আবার একটা শায়ের শোনাবে, বাবুজি, সেদিন টাঙায় চড়ে যাওয়ার সময় যেমন শুনিয়েছিল?

পুলক চৌধুরিও আজ ততটা স্বস্তিতে নেই, যেমন থাকেন সাধারণত। তার মনেও এখন উথালপাথাল পর পর কয়েকদিন পাওয়া চিরকুটগুলোর বিষয়বস্তু অনুধাবন করে। প্রতিটি চিরকুটেই রেশমবাইয়ের সঙ্গে মেলামেশার ওপর একটা কড়া নিষেধাজ্ঞা। কেনই বা এই নিষেধ তা বোধগম্য নয় তার। যিনি নিষেধ করছেন তিনি কেনই বা তাঁব সামনে বেরিয়ে আসছেন না খোলস ছেড়ে, পরিষ্কার হচ্ছে না তাও। তাঁর মনের এ হেন টালমাটাল অবস্থায় রেশমবাইয়ের অনুরোধ শুনে শায়ের নয়, গুন গুন করে শোনালেন জলদ তেতালার একটা ঠুমরি।

আরে সেইয়াঁ আর বিদেশরা
টেং কা সঙ্গে খেলুয়া
অম্বুরা কি ডালে কোয়েল কু কি ফুকিয়ে
আর পাপিহারা।
ঠুমরিটার বাংলা করলে এরকম দাঁড়ায়
সখা তো প্রবাসে, কার সঙ্গে আর
খেলি বসন্তের খেলা
আমের ডালটিতে কোকিল কু কু ডাকে
হায়রে পাপিয়া হায়।

রেশমবাই কিন্তু ঠুমরিটা শুনে বিস্মিত হল সহসা। এ ঠুমরি তো তারও জানা, তার মা কুন্দনবাই কতবার তাকে শুনিয়েছেন এ গান। কিন্তু সে গান কলকাতার পত্রকার জানলই বা কী করে। সেই একই সুর, একই গায়কী, সবকিছুই যেন একই উৎস থেকে এসে পৌঁছেছে তাদের দুজনের কাছে। কৌতূহল দমন না করতে পেরে এবার রেশমবাই পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিল, এ গান তুমি কার কাছ থেকে শিখেছ, বাবুজি!

পুলক চৌধুরি হেসে বললেন, এ ঠুমরিটাও ওয়াজেদ আলির লেখা। তবে লখনউয়ের নবাব ওয়াজেদ আলির নয়, মেটিয়াবুরুজের নবাব ওয়াজেদ আলির।

রেশমবাই তখন আরও প্রশ্ন করার জন্য তৈরি, কিন্তু তাকে সে সুযোগ না দিয়ে পুলক চৌধুরি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, রেশম, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার মনে হচ্ছে তোমার জীবনে এমন কেউ আছে, যে তোমার সঙ্গে আমার এই মেলামেশা পছন্দ করছে না।

রেশমবাই বুঝতে না পেরে বিস্মিতই হল, কী বলতে চাইছ তুমি, বাবুজি।

—বলতে চাইছি, হয়তো তোমার কোনও প্রেমিক আছে, যে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না তোমার কাছে আমার এই যাওয়া-আসা, মেলামেশা।

—প্রেমিক! আমার! রেশমবাইয়ের বাকশক্তি কিছুক্ষণের জন্য বোধহয় রুদ্ধ, তার মগজে সেঁধুলই না কী তার সম্পর্কে ভাবছেন কলকাতার পত্রকার! তারপর হঠাৎ হেসে উঠে বলল, আমার তো অনেক প্রেমিক, বাবুজি। গোটা লখনউ জুড়ে কত মেহমান আছে, যারা আমার গান শুনতে এসে প্রেম নিবেদন না করে যায়নি। শুধু লখনউ'নয়, অযোধ্যা, ফয়জাবাদ, আগ্রা থেকেও কত মেহমান এসেছে। কত গাইয়ে কত ওস্তাদ এসেছে আমার কোঠিতে, তার সবাইই তো আমার প্রেমিক, বাবুজি।

—না। সেরকম নয়, একজন বিশেষ কেউ।

রেশমবাই হেসে উঠে বলল, সেই বিশেষ একজন কিন্তু তুমিই, বাবুজি।

পুলক চৌধুরি বিস্মিত হলেন না। লখনউয়ের একজন সেরা বাইজি তার মেহমানকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে টাঙায় চড়ে। শহর ছাড়িয়ে তারা ততক্ষণে চলে এসেছে শহরের বাইরের সবুজ পটভূমিতে। এখন মেহমানের মন রাখতে এমন তোষামোদের কথা বলতেই পারে রেশম। কিন্তু পুলক যা জানতে চাইছেন, সে ইঙ্গিতে কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না তুখোড় বুদ্ধিমতী মেয়েটি! বাইজিদের নিয়মই তো এই যে-যেদিন যে মেহমানকে সঙ্গ দেবে, সেদিন সে একমাত্র তারই, আর কারও নয়। তবুও তিনি এক লহমা এও ভাবলেন, রেশমবাইয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কিন্তু টাকার নয়। তাঁর দেওয়া কোনও অর্থই এখনও পর্যন্ত গ্রহণ করেনি রেশম। তা সত্ত্বেও রেশম তাঁর প্রশ্নের জবাব কেন এড়িয়ে যাচ্ছে তা বোধগম্য হচ্ছে না তাঁর।

সেই প্রশ্নই অতএব আবারও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন পুলক চৌধুরি, তোমার যদি বিশেষ কেউ না-ই থাকবে, তবে কেন সে বারবার আমাকে তোমার সঙ্গে মিশতে নিষেধ করছে, রেশম?

—নিষেধ করছে! আপনাকে? রেশমবাই যেন বিশ্বাসই করতে পারল না।

—হ্যাঁ। একবার নয়, বারবার। তবে সে নিষেধ হুমকি-মেশানো নয়, যা আছে তা হল আকুতি। কেন, তা কে জানে।

রেশমবাই অবাক হয়ে বলল, সত্যি বাবুজি?

—সত্যিই।

রেশমবাই অতঃপর গুম হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য, যেন ঘটনাটা তার কাছে প্রথমে অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল, তারপর সত্যি হয়ে উঠল দিনের আলোর মতো। আর সে-ঘটনাও যেন তার কাছে অভাবনীয়। সেই বিস্ময় গোপনও থাকল না তার গলায়, অস্ফুটস্বরে বলে উঠল, তা হলে নিশ্চয়ই আমার মা।

—তোমার মা, মানে কুন্দনবাই! পুলকের গলায়ও বিস্ময়। পরক্ষণেই সে-বিস্ময় রূপান্তরিত

হল সেই অবধারিত প্রশ্নে, যে প্রশ্ন সুদূর কলকাতা থেকে বুকের ভেতর বহন করে নিয়ে এসেছেন পুলক, বললেন, তোমার মা কি বাঙালি, রেশম?

—বংগালি হোনে সে কেয়া ফায়দা, বাবুজি? আমার মা কুন্দনবাই খোদ পারসোর মেয়ে। পারস্য থেকে একজন দালাল গোছের লোক রাতের অন্ধকারে চুরি করে নিয়ে এসেছিল সেই গানেআলা মেয়েটাকে যার নাম পরে হল কুন্দনবাই।

—তাই! পুলক চৌধুরি হতাশ হলেন, না, তা হলে তো কিছুই মিলল না, বলে বড় একটা শ্বাস ফেলে গম্ভীর হয়ে গেলেন সহসা।

—কী মিলল না, বাবুজি! রেশম তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল পুলক চৌধুরির দিকে, তারপর হঠাৎ বলল, আমি তো আমার সম্পর্কে কত কথাই বললাম। তুমি কিন্তু তোমার সম্পর্কে এখনও কিছুই বলোনি আমাকে!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুলক চৌধুরি বললেন, আমার সম্পর্কে কী শুনবে তুমি! কী আর বলার আছে আমার!

—কেন, আমারও তো জানতে ইচ্ছে করছে, কে তুমি, কেনই বা লখনউ এসেছ, কেন দিনের পর দিন কৌতূহলী হয়ে উঠেছ আমার সম্পর্কে।

পুলক চৌধুরি হাসলেন, বলতে পার আমি একজন মুশাফির। আমি হয়তো কাউকে খুঁজছি যাকে আর কখনও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

রেশম বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কাকে খুঁজছ তুমি? কে সে! তোমার চেনা কোনও বাইজি?

পুলক চৌধুরি অতঃপর যে কাহিনী একটু একটু করে থেমে থেমে বহুক্ষণ ধরে শোনালেন রেশমবাইকে, সে কাহিনী যেমন আশ্চর্য, তেমনই অদ্ভুত। অন্য ভাবে ভয়ঙ্করও।



পুলক চৌধুরি শুরু করলেন—

সংগীতের রক্ত নিয়েই জন্ম হয়েছিল পুলক চৌধুরির, উত্তর কলকাতার এক বনেদি বংশে। শৈশব থেকেই সে দেখে এসেছে তাদের প্রাচীন বাড়িটির এ-ঘরে ও-ঘরে তানপুরা, হারমোনিয়াম, সারেঙ্গি আর তবলার ছড়াছড়ি। এ-দেওয়ালে ও-দেওয়ালে টাঙানো তার পিতৃপুরুষদের বড় বড় তৈলচিত্র, সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো সে-সব ছবিতে গানের একটা আবহ যুক্ত হয়ে থাকত প্রায় ক্ষেত্রেই। দেওয়ালে ফটোগ্রাফও বাঁধানো থাকত, সেগুলো কোনও না কোনো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের।

এহেন বনেদি গায়ক-বংশের পুত্র পুলক চৌধুরি কিন্তু শৈশব থেকে গানের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা বহন করে চলেছিল সংগীতজ্ঞ পিতার কারণেই। তার পিতা পীতাম্বর চৌধুরি ছিলেন সে-আমলের এক নামকরা গায়ক, এতটাই সুনাম ছিল তাঁর যে সারা ভারতবর্ষের গায়কসমাজ একডাকে চিনত তাঁকে। তাঁর বাড়িতে সারাক্ষণ গানের চর্চা আর মজলিশ। মজলিশ না থাকলে সারাটা দিন উপচে পড়ত তাঁক কাছে তালিম নিতে আসা শিষ্যাশিষ্যদের ভিড়। তার মধ্যেই কখনও জয়পুরে, কখনও লখনউ, কখনও মধ্যপ্রদেশ, নাগপুর, ভোপাল বা উজ্জয়িনীতে গান গাইতে যেতেন বড় বড় সঙ্গীত সম্মেলনের আসরে। সেখানে বড় বড় ওস্তাদদের বাড়িতেই ছিল তাঁর আশ্রয়। আবার সেখান থেকেও নামকরা গায়করা কলকাতায় গান গাইতে এলে আতিথ্যগ্রহণ করতেন পীতাম্বর চৌধুরির বাড়িতে। পীতাম্বর সম্পর্কে তাঁরা বলতেনও 'কলকাত্তাইয়া শের'। এমনই ছিল তাঁর ভরাট কণ্ঠস্বর, গায়কী, স্বরক্ষেপণ, সেই সঙ্গে রাগের মধ্যে নতুন নতুন কম্বিনেশন খোঁজার ঝোঁক। একজন নামকরা উত্তর ভারতীয় গায়ক তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, অ্যায়সা গাওয়াইয়া অওর সও বরসমে ইধার নহি পয়দা হোগা।

কিন্তু এমন বনেদি-বংশের বিখ্যাত গায়কের সুন্দরী স্ত্রী কেন বিয়ের তিন-চার বছরের মধ্যে আত্মঘাতী হয়েছিলেন তা পুলক চৌধুরির কাছে বিস্ময়ের। একটু বড় হতে শুনেছিল, তার বাবার জীবনযাপন বরাবরই বেহিসেবি ধরনেব, সংগীত ছাড়া আর কোনও কিছুই তাঁর স্বভাবে বা রক্তে ছিল না, সে তবু মানিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু তার বাবার চরিত্র সম্পর্কে নানান গল্প শোনা যেত এর-ওর মুখে। পুলক চৌধুরিও অল্পবয়সে শুনেছিল, তার বাবা বিয়ের অনেক অগে থেকেই জড়িয়ে পড়েছিলেন একজন সুন্দরী গায়িকার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে। সেই গায়িকা ছিলেন বিবাহিতা, হয়তো তাইই বিয়ে করা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। সে কারণেই অন্য মেয়েকে ঘরণী হিসেবে বাড়িতে নিয়ে এলেন কিন্তু আগের মতোই সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন রূপসী গায়িকার সঙ্গে। হয়তো সেই সম্পর্কের কারণেই পুলক চৌধুরির মা—

এই কাহিনী শোনার পর পুলক চৌধুরি কিন্তু তার বাবাকে ক্ষমা করতে পারেনি কখনও, আর তারই প্রমাণ হিসেবে সে তার বাবাকে প্রথমেই আঘাত করল তাঁর কাছে গান শিখতে না চেয়ে। বলেছিল, গান গাইতে ঘেন্না লাগে আমার।

তাঁর বাবা ছিলেন প্রচণ্ড তেজী, দেমাকি। সেই সঙ্গে প্রবল ডমিনেটিং। তাঁর পুত্রের এহেন অবাধ্যতায় স্তম্ভিত হয়ে বহুক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন তার দিকে। এত বড় গায়ক-বংশের ছেলে হয়ে তার এবংবিধ আচরণ বিশ্বাসই হয়নি বোধহয়। গান গাওয়াটাই তাঁদের বংশের হক। সেই অর্জিত অধিকারকে যে অবহেলা করে, প্রত্যাখ্যান করে ঘৃণা দেখিয়ে, সে সেই বংশের কুলাঙ্গার। অতঃপর পুত্রের সঙ্গে পিতার দূরত্ব হয়ে গেল সমুদ্রপ্রমাণ, আচার-আচরণে, কথায়বার্তায়, অভিব্যক্তিতে। পীতাম্বর চৌধুরি যেমন দিন দিন ডুবে যেতে লাগলেন তাঁর নিজস্ব পৃথিবীর ভেতর, পুলক চৌধুরীও অন্তরিণ হল এক আনমনা, উদাসীন, নির্লিপ্ত ঘেরাটোপের গহন গভীরে।

পীতাম্বর চৌধুরি তখন কলকাতা শহরের গানের জগতের এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তাঁর কাছে গাণ্ডা বাঁধতে, তালিম নিতে বহু ভাল-ভাল গাইয়ে, ছোটখাটো ওস্তাদরা আসা-যাওয়া করেন নিয়মিত। গভীর রাত পর্যন্ত গানবাজনার আসর চলে গানের ঘরে। কখনও মধ্যরাত পর্যন্ত, কখনও ভোরের ব্রাহ্মমুহূর্তেও। সেসব গান পুলক চৌধুরি শুনত বাড়ির দক্ষিণকোণের যে- বিচ্ছিন্ন ঘরটি

তার জন্য নির্দিষ্ট ছিল সেই ঘেরাটোপের অন্তরালে বসে বা শুয়ে। তার রক্তে গানের একটা নেশা ছিলই, কিন্তু পিতার প্রতি অত্যন্ত অনীহার কারণে সে-সুর তার রক্তে দোলা জাগালেও একটা বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক করত তার মনে। যে-ইমনকল্যাণের সুর রসিক বোদ্ধাদের কাছে বাহবা কুড়োয়, স্তব্ধ করে রাখে হাজার হাজার শ্রোতাকে, সে-গান তার কাছে মনে হত কোনও নারীর আর্ত চিৎকার, যেন কোনও বলশালী পুরুষ অত্যাচারে জর্জরিত করছে কোনও দুঃখী অসহায়া নারীকে। যে মালকোষের সুর বিদগ্ধ শ্রোতাকে পৌঁছে দেয় কোন ঐশ্বরিক অনুভূতিতে, সেই আশ্চর্য সুর তার কাছে মনে হত কোনও নিরীহ হরিণশিশুর উপর হিংস্র বাঘের রক্তাক্ত আক্রমণের প্রতীক।

পুলক চৌধুরি তার এই অস্বাভাবিক মনোবিকারের কারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কিন্তু কাটিয়ে উঠতে পারে না তার যন্ত্রণাও। নিজের বাড়িতেই তার এমন ভারী ভারী দিনগুলো কাটতে থাকে প্রায় ব্রাত্যের মতো।

এমন যন্ত্রণায় চুরচুর মুহূর্তে সহসা একদিন একটা গানের সুর তার কানে ভেসে এল তাদের গানের ঘর থেকে, যে কণ্ঠস্বর মনে হল অন্যদের থেকে একেবারেই ভিন্নরকম। গান গাইছিল কোনও তরুণী, নিশ্চয়ই তার বাবার কোনও শিষ্যাই। এমন কত শিষ্য-শিষ্যাই তো প্রতিদিন তাদের গানের ঘরে এসে তালিম নেয়, রেয়াজ করে, তাদের গান পুলক চৌধুরির মনে হয় অসহনীয়, কিন্তু এই কণ্ঠস্বর তাকে সহসা উদ্বেল করল কেন কে জানে।

বেশ কয়েকদিন গভীর মনোযোগে তার গান শুনতে শুনতে এক সন্ধেয় কী এক অনিবার্য কৌতূহলে সে গানের ঘরে উঁকি মেরে দেখতে গেল, কে এই কণ্ঠস্বরের মালকান্। কত দিন, কত দিন ইতিমধ্যে কেটে গেছে, যে দীর্ঘ সময়ে সে একবারও তাদের বাড়ির এ দিকটা মাড়ায়নি, এখন উঁকিঝুঁকি দিতেই নজরে পড়ল তাদের গানের ঘরের চেহারাটাই যেন বদলে গেছে। না, অন্য কোনও কারণে নয়, শুধু মেঝেয় পাতা ধবধবে সাদা ফরাসের ওপর একটি অপরূপ সুন্দরী তরুণীর আবির্ভাবে। তরুণীর বয়স প্রায় তারই মতো, কুড়ি-একুশ, বসে আছে পা ভাঁজ করে, প্রায় একটা কবিতার ছন্দের মতো। হাতে তানপুরা। সেটি কাঁধের ওপর চমৎকারভাবে ন্যস্ত করে, জাফরানরঙা মোমের মতো নরম আঙুল দিয়ে তার সুর তুলতে তুলতে রেওয়াজ করছে। সুরের ভেতর সে এমন গভীরভাবে মগ্ন যে, বুজে আছে তার দু'চোখের পাতা, তাতে আরও চমৎকার দেখাচ্ছে সেই আশ্চর্য সৌন্দর্য, প্রায় অপার্থিব।

কিন্তু তার পাশেই অন্য যে-দৃশ্যে তার শরীর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল—তা হচ্ছে তরুণীর সামনে বসা পীতাম্বর চৌধুরি, যিনি পরম মুগ্ধতায় অপলক তাকিয়ে আছেন সেই তরুণীর গায়নরত মুখের দিকে। পুলক চৌধুরির বুকের ভেতরটা সহসা ছাঁত করে উঠল, পরমুহূর্তে তার স্মরণে এল তার মায়ের মুখের ছবি। মায়ের যে একমাত্র ফটোগ্রাফটি তার কাছে এখনও রক্ষিত আছে, হঠাৎ সেটি পুনর্বার দেখতে দেখতে মনে হল তাঁর চোখে জল।

তারপর পরপর কয়েকদিন রাতে ঘুম এল না তার চোখে। সেই তরুণীর কণ্ঠস্বর, তার সুরের উথালপাথাল ঢেউ তাকে কেন কে জানে অস্থির করে তুলল সারাটা দিন, সারাটা রাত। কখনও তার কণ্ঠস্বর কানে এলে সে পাগলের মতো বেরিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে। কিন্তু তাতেও তো শান্তি নেই, একদিন শুনতে পেল মধ্যরাতেও ভেসে আসছে সেই সুর। আশ্চর্য হয়ে, পা টিপে-টিপে গিয়ে গানের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, তরুণী সেই একই ভঙ্গিমায় তন্ময় হয়ে সুর ভাঁজছে, আর তার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন পীতাম্বর।

পুলক চৌধুরি আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল, মেয়েটা কি রাতেও তাদের বাড়ি থাকছে! যদি থাকেই, তা হলে কোন পরিচয়ে।

কয়েকদিনের মধ্যে পুলক চৌধুরি আবিষ্কার করল, মেয়েটির প্রতি সে একটা অদ্ভুত টান অনুভব করছে, যা সে তার এতাবৎ জীবনে কখনও করেনি। প্রথম কয়েকদিন মেয়েটির প্রতি বোধহয় একটু বিকর্ষণই বোধ করেছিল, সে-বিকর্ষণ কখনও যে আকর্ষণে রূপান্তরিত হয়েছে তা জানেই না সে। তৎক্ষণাৎ তার মনে হল, মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হওয়া দরকার।

কিন্তু কীভাবে আলাপ করবে সে!

কয়েকদিন নিজের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করার পর, একদিন সন্ধেবেলা যখন পীতাম্বর দিনান্তে রেয়াজ শুরু করার আগে বড়-বড় ওস্তাদ গায়কদের মতো লুচি-পরোটা, ঘি আর সবজি দিয়ে নাশ্‌তা সারছেন, সে সময় হঠাৎ তাঁর সামনে হাজির হয়ে বলল, আমি গান শিখব।

পীতাম্বর প্রথমে বোধহয় তার দীর্ঘকাল না-দেখা পুত্রকে চিনতেই পারলেন না, কিছুক্ষণ পর যদিও বা পারলেন, সে গান শিখতে চায় এই বক্তব্যটাই বোধহয় অচেনা ঠেকল তাঁর কাছে। অতঃপর যখন ব্যাপারটা তাঁর মগজে বিদ্ধ হল, গম্ভীর হয়ে তীক্ষ্ণচোখে নিরীক্ষণ করলেন দিব্যি ডাগর হয়ে ওঠা পুত্রকে, মুখে শুধু উচ্চারণ করলেন, হুম্‌।

পীতাম্বর খুশি হলেন, না কি অখুশি, তা তখনই বোঝা যায়নি। কিন্তু পরদিন সকালে তাকে ডেকে হাতে নগদ পাঁচশো এক টাকা দিয়ে বললেন, সন্ধের সময় টাকাটা নিয়ে গানের ঘরে আসবে। গুরুর কাছে গাণ্ডা বাঁধতে গেলে টাকা দিতে হয়। এটাই এ দেশের প্রচলিত নিয়ম।

পুলক চৌধুরি তাঁর আদেশ মেনে বাবাকেই গুরু হিসেবে পাঁচশো এক টাকা দিয়ে গাণ্ডা বাঁধল সেদিন সন্ধেয়। সংগীতের রক্তে যার জন্ম, সেই তরুণের কাছে গানের তালিম নেওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়। তবু পীতাম্বরের শিক্ষকতা খুবই কঠোর নিয়মানুবর্তিতার। পুত্রকে আদেশ দিলেন, প্রতিদিন ভোর চারটের মধ্যে বিছানা ছেড়ে উঠে টানা তিন-চার ঘণ্টা রেয়াজ, তারপর স্নান ও ব্রেকফাস্ট, আবার বেলা নটা থেকে তালিম, তারপর মধ্যাহ্নভোজন, বিশ্রাম, আবার সন্ধে ছ'টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত রেয়াজ ও তালিম।

টানা এক বছর রেয়াজ আর তালিমের পর একদিন ভয়ে-ভয়ে পীতাম্বরকে জিজ্ঞাসা করল, গানে কি কোনও ভুলচুক হচ্ছে?

পীতাম্বর শুধু একটাই কথা বলেছিলেন, এক বছরে গলায় সুর লাগে না।

কিন্তু এক বছরের মধ্যে পুলক চৌধুরি মোটামুটি আলাপ জমিয়ে নিয়েছে সেই লাজুক, নম্র, রূপসী তরুণীর সঙ্গে, যার নাম অঙ্গনা, পিতৃকুল মাতৃকুলে কেউ আছে কি না তা জানেই না, মামাবাড়িতে মানুষ, গানের ওপর প্রচণ্ড ঝোঁক। বলতে গেলে গানই তার ধ্যানজ্ঞান, আর পীতাম্বর চৌধুরির মতো বিখ্যাত গুরুর সংস্পর্শে এসে ধন্য হয়ে গেছে তার মানবজীবন।

কতটা ধন্য হয়ে গেছে সে-তথ্যটিও কিছুকালের মধ্যে আবিষ্কার করে ফেলল পুলক চৌধুরি, যখন দেখল, অঙ্গনা মাঝেমধ্যেই রাতের বেলা থেকে যাচ্ছে তাদের বাড়িতে। গানের ঘর থেকে তার প্রমোশন হয়েছে অন্দরমহলে, আর তার সঙ্গে একটা জটিল সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে পীতাম্বরের। এর মধ্যে লখনউতে একটা বিশাল সঙ্গীত সম্মেলনে গান গাইতে যাওয়ার সময় অঙ্গনাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন পীতাম্বর, ফিরলেন প্রায় পনেরো দিন পর। মাসদুয়েক পরে আবার অঙ্গনাকে নিয়ে গেলেন ব্যাঙ্গালোরের এক উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের আসরে, সেবারও পনেরো দিন।

বাইরে গিয়ে অঙ্গনা কোথায় কীভাবে রাত কাটায়, পুলকের এহেন কুট প্রশ্নের জবাবে

অঙ্গনা মাথা নিচু করে উদাসীন হয়ে নখ খোঁটে। ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরে আসার পর দেখা গেল, অঙ্গনা পাকাপাকিভাবে বাসিন্দা হয়ে গেছে তাদের বাড়ির। হয়তো পীতাম্বরের রক্ষিতা হিসেবেই। দুজনের সম্পর্কটা ভারি জটিল মনে হয় পুলকের।

পীতাম্বরের সঙ্গে অঙ্গনার সম্পর্ক যতটাই জটিল, পুলকের সঙ্গে তার সম্পর্ক ততটাই সহজ। পুলক চৌধুরির বারবার মনে হয়, অঙ্গনা ভারি পছন্দ করে তার সঙ্গে কথা বলতে। পীতাম্বর যখন বাড়িতে থাকেন না, তখন অঙ্গনা তার সঙ্গে গল্প করে, খুনসুটি করে জাগিয়ে তুলতে চায় তার ভেতরকার পুরুষ। তাকে অবসরের মুহূর্তে গান শোনায়, আবার কখনও শুধরে দেয় তার সদ্য-শেখা রাগটি। অঙ্গনার গান শুনতে শুনতে পুলকের মনে হয়, অঙ্গনার গলায় এমন এক অনিবার্য জাদু আছে, যে-মাধ্যাকর্ষণ টান তাকে আকর্ষণ করে পতঙ্গের মতো। ক্রমে পুলক এও বুঝতে পারল, পীতাম্বরের রক্ষিতা হয়ে থাকাটা অঙ্গনার আদৌ কাঙ্ক্ষনীয় নয়। কিন্তু এটাও সত্যি যে, এখন এ-বাড়ি থেকে মামাবাড়ি যাওয়ার উপায়ও আর রাখেনি সে।

এরকম একটি ত্রিশঙ্কু, হৃজঘট পটভূমিকায় একদিন গভীর রাতে পুলক চৌধুরি অঙ্গনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে। দুজনের তখন বয়স কাঁচা, তেমন বোধবুদ্ধিও পাকেনি যে, নিজেদের ভালমন্দ সঠিকভাবে বিচার করতে পারে। তা ছাড়া সংসাব পাতানোর বা চালানোর অভিজ্ঞতাও তাদের কারওরই নেই।

এই দুঃসাহসী ঘটনায় ডমিনেটিং স্বভাবের পীতাম্বর স্বভাবতই জ্বলে উঠেছিলেন প্রবলভাবে। খুব বেশি দূর পালাতে পারেনি পুলক আর অঙ্গনা, কলকাতা শহরেরই একটা সস্তা আস্তানা খুঁজে তারা দিনযাপন করতে করতে সংবাদ পেয়েছিল, পুলকের খোঁজে নয়, অঙ্গনার অবস্থান সন্ধান করতে হন্যে হয়ে ছোটাছুটি করছেন পীতাম্বর চৌধুরি।

পুলক চৌধুরি তখন অঙ্গনাকে নিয়ে কোথায় পালাবে! প্রায়-কপর্দকহীন তরুণটি তখন তার সামান্য কিছু টাকা আর অঙ্গনার কয়েকটি গয়নাগাঁটি খরচ করে প্রায় নিঃস্ব। সুতরাং অবধারিত ভবিতব্যের লিখনে একদিন পীতাম্বর তাদের আস্তানা খুঁজে বার করে অঙ্গনাকে তুলে নিয়ে গেলেন প্রায় দস্যুর মতো। না, এবার অঙ্গনাকে আর তাঁর বাড়িতে তুললেন না, দু'জনে বহুদিনের জন্য উধাও হয়ে গেলেন অন্য কোথাও। পুলক চৌধুরি তখন শ্রান্ত, বিধ্বস্ত, অঙ্গনাকে খুঁজে বার করার চেষ্টাই করেনি। সে সাহস তার ছিল না, পুঁজিও। অতঃপর তার বাদবাকি জীবন বয়ে চলেছিল অন্য খাতে।

বহুদিন পর পীতাম্বর চৌধুরি ফিরে এসেছিলেন, একা, স্বভাবতই তাঁর সঙ্গে পুত্রের আর কখনও বার্তা-বিনিময় হয়নি। আগে যেরকম দূরত্ব ছিল পিতাপুত্রে, তার চেয়েও ব্যবধান বেড়ে গেল কয়েক যোজন।

অঙ্গনাকে আর ফিরে পাননি পুলক চৌধুরি। ইতিমধ্যে গতানুগতিকভাবে পাঠক্রম শেষ করে তিনি ততদিনে এক বিখ্যাত কাগজের সাংবাদিক। কাজের নেশায়, কাজের বৈচিত্র্যে একসময় অঙ্গনা স্মৃতি বিস্মৃতির আড়ালে চলে গেল। অবশ্য একেবারে হারিয়ে যায়নি, কোন অন্ধকারে মুখ গুঁজে নিশ্চয়ই বসে ছিল এই দীর্ঘকাল।

তারপর বৌবাজারের সেই বিখ্যাত বোমা-বিস্ফোরণের পর লখনউ থেকে কোনকালে আসা কয়েকজন বাইজি, দালালদের ইন্টারভিউ নিতে নিতে খবর পেয়েছিলেন, অঙ্গনার মতো একজন তরুণী এক বিখ্যাত গায়কের সঙ্গে বহুকাল আগে লখনউ এসেছিল, প্রথমে কোনও ভদ্রপাড়ায় দু'জনে বাস করতেন স্বামী-স্ত্রীর মতো, তারপর কয়েক মাস পরে সেই গায়ক হঠাৎ কলকাতায়

ফিরে যাওয়ায় খুবই বিপাকে পড়েছিল মেয়েটি। তারপর একটি সন্তানও হয়েছিল তার। অতঃপর যথা নিয়মে, লখনউয়ে যেমন হয়ে থাকে, তার স্থান হয়েছিল চকবাজারে কোনও বাইজি-কোঠিতে। কলকাতার বৌবাজারের যে-বাইজিটি অঙ্গনার সন্ধান দিয়েছিল, সে বহুকাল আগে লখনউ ছেড়ে চলে আসায় এর চেয়ে বেশি সংবাদ দিতে পারেনি পুলককে। কিন্তু খবরটি পাওয়ার পর সেই পুরনো স্মৃতি উস্‌কে উঠে আবার যেন তাড়া করে ফিরছিল তাকে। বোধহয় এক অনিবার্য পরিণতির তাগিদেই। তারপর অঙ্গনার খোঁজে তার এই লখনউ আসা।

গল্পটা বহুক্ষণ একটানা বলে দম নিতে একটু থামলেন পুলক চৌধুরি। তখন টাঙা থামিয়ে দু'জনে বসে আছেন লখনউ শহর থেকে বাইরে, অনেকখানি দূরে এসে একটা বিশাল সেগুনগাছের তলায়। বিকেলের নিবু-নিবু আলোয় সে কাহিনী শুনে কিন্তু রেশমবাইয়ের মুখ কালো হয়ে এসেছে। চকবাজারের সব বাইজিরই প্রাচীনতম এই পেশায় সাব্যস্ত হওয়ার আগে একটা-না-একটা এ ধরনের গল্প থেকেই থাকে, তবু রেশমবাই কেন যেন ভীষণ অস্থির-অস্থির বোধ করল হঠাৎ। মনে হল, এ কাহিনীর সঙ্গে তার জীবনযাপনের কোনও একটা যোগ আছে, যদিও সে তার পেডিগ্রির যে-গল্পটা তার মা কুন্দনবাইয়ের মুখ থেকে শুনেছে, তাতে তার সঙ্গে এ-কাহিনীর কোনও মিলই নেই, তাই কোনও কারণই থাকতে পারে না তার বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হওয়ার।

অনেকক্ষণ পর রেশমবাই নিজেকে সামালে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, তুমি যে অঙ্গনাকেই খুঁজতে এসেছ, তা আমাকে আগে বলোনি কেন, বাবুজি!

পুলক চৌধুরি বেশ অবাক হচ্ছিলেন রেশমবাইয়ের আকস্মিক প্রতিক্রিয়ায়। কেন তার এই ক্ষোভ, উত্তেজনা, তা ঠিকঠাক বুঝে উঠতে না পেরে বললেন, হয়তো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কখনও তোমাকে বলেও থাকতে পারি। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, এরকম কোনও বাইজিকে সরাসরি খুঁজলে চকবাজারের কেউই তার হদিস দেবে না আমাকে।

বলতে বলতে হঠাৎই খেয়াল করলেন রেশমবাইয়ের চোখে জল। ভাল করে ব্যাপারটা উপলব্ধি করার আগেই রেশমবাই তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো, বাবুজি, ঘরে চলো। আমার দেরি হয়ে গেল।

বিস্মিত পুলক চৌধুরি রেশমবাইকে নিয়ে আবার গিয়ে বসলেন উধমলালের টাঙাতে। ততক্ষণে সন্ধে একটু একটু করে ছুঁয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর শরীর। টাঙার ভেতরটা ছায়াঘন, তার ভেতর অস্পষ্ট আলোয় পুলক চৌধুরি দেখলেন, অঝোরে কেঁদে চলেছে রেশম। কেন কাঁদছে, হঠাৎ কলকাতার এক সাংবাদিকের জীবনের গল্প শুনে তার মনোবেদনার কারণই বা কী, তা অনেক জিজ্ঞাসা করেও জানতে পারলেন না তিনি। শুধু একবার হাতের পাতা দিয়ে চোখের জল মুছে রেশমবাই বলল, তুমি আমার জীবনে কেন এলে, বাবুজি। আমি তো বেশ ছিলাম।

তারপর চকবাজারে তার নির্দিষ্ট কোঠির সামনে পৌঁছে টাঙা থেকে নামতে নামতে রেশম আবার বলল, তুমি এখান থেকে চলে যাও, বাবুজি।

বিস্মিত, হতভম্ব কলকাতার সাংবাদিক তখনও ভেবেই পাচ্ছেন না রেশমবাইয়ের এহেন আচরণের কী কারণ। তার বাবা পাঞ্জাবি, মা পারস্য দেশ থেকে দালালের পাল্লায় পড়ে এসে ঠেক পেয়েছে লখনউয়ের চকবাজারে, সে কেন কলকাতার এক তরুণ-তরুণী আর এক মধ্যবয়স্ক গায়কের গল্প শুনে শোকাভিভূত হয়ে পড়বে এভাবে! না কি পুলক চৌধুরির জীবনে অন্য এক নারীর অস্তিত্ব তাকে কোনওভাবে আহত করেছে। তাই-ই ঈর্ষান্বিত হয়ে, ক্রুদ্ধ হয়ে

তাঁকে চলে যেতে বলল এমন আচম্বিতে, অশোভনভাবে!

পুলক চৌধুরি কিন্তু ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিলেন না, তাঁর মনে হল রেশমবাইয়ের কাছে আবারও যেতে হবে, তাঁকে কেনই বা চলে যেতে বলল সে-রহস্যের কারণও খুঁজে বার করতে হবে।

তবু সঙ্কোচও হচ্ছিল কম নয়। যেভাবে তাঁকে অপমানিত করল রেশম, রূঢ়ভাবে চলে যেতে বলল, সে-ঘটনার পর আবারও কি যাওয়া যায় তার কাছে! যদি তাঁকে কোঠির ভেতর ঢুকতে না দেয়, যদি তাঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। তাহলে কী হবে! তা ছাড়া, তার মা কুন্দনবাইও তো চাইছেন না তিনি তাদের কোঠিতে যাওয়া-আসা করুন।

দিন দুয়েক নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে পুলক অতঃপর সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি আরও একবার দেখা করতে যাবেন রেশমবাইয়ের সঙ্গে। অন্তত আর একবার। তাতে যদি তাঁকে অপমানিত হতে হয়, তাহলেও। দেখা করতে হবে কুন্দনবাইয়ের সঙ্গেও, শুধু এই কথাটাই জানতে, কেন তিনি চাইছেন না পুলক চৌধুরি মেলামেশা করুক রেশমবাইয়ের সঙ্গে। তবে কি কুন্দনবাই ভাবছেন, তাঁর মেয়ে কলকাতার সাংবাদিকের প্রেমে পড়ে গেল! একজন তবায়েফ হয়ে তাই তাঁর মেয়েকে রক্ষা করার জন্য এই নিষেধাজ্ঞা।

তিন দিনের মাথায় পুলক চৌধুরি আবার একটা টাঙায় চড়ে হাজির হলেন চকবাজারের সেই নির্দিষ্ট কোঠিতে। অভ্যাসমতো কোঠির ভেতর ঢুকে মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, রেশম।

অন্য দিনের মতো একরাশ হাসি মুখে বেরিয়ে এল না রেশমবাই। ভেতরে যেন অনন্ত নিঃস্তব্ধতা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও কারও দেখা নেই দেখে পুলক চৌধুরি আবার ডাকলেন, রেশম, রেশমবাই।

একটু পরে মসলিনের সূক্ষ্ম পর্দার ওপাশে দেখা গেল এক নারীর মুখ। পুলক চৌধুরি ভাবলেন, রেশমই, হেসে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পর্দা সরিয়ে যিনি বেরিয়ে এলেন, তাঁকে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলেন চল্লিশোর্ধ্ব সংবাদিকটি। অনেকক্ষণ পর আকস্মিকতার ঘেরাটোপ কাটিয়ে শুধু অস্ফুটস্বরে বলতে পারলেন, অঙ্গনা, তুমি!



চকবাজারের কোনও বাইজিকোঠিতে অঙ্গনাকে হয়তো আচমকা আবিষ্কার করবেন এমন একটা দুরূহ ভাবনা নিয়েই কলকাতা থেকে লখনউয়ের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন পুলক চৌধুরি, কিন্তু তাকে যে সহসা রেশমবাইয়ের মা হিসেবে দেখতে পাবেন, এই অস্বাভাবিক ঘটনাবলি বোধহয় তাঁর নিবিড় কল্পনার জগতেও ছিল না। অঙ্গনাকে এতকাল পরে এই কোঠিতেই আবির্ভূত হতে দেখে কিছুক্ষণ নিথর হয়ে রইলেন, তার পর আবারও উচ্চারণ

করলেন, অঙ্গনা, সত্যিই তুমি!

কুন্দনবাই কিন্তু প্রথম দিনেই চিনেছিলেন তাঁর প্রথম যৌবনের প্রেমিক পুলক চৌধুরিকে, সেই যেদিন রেশমবাই ভারি উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁকে বলেছিল, 'কলকাতা থেকে একজন পত্রকার এসেছে, মা, কী হ্যান্ডসাম, আর কী যে ভাল!' কুন্দনবাই তাঁর অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকাতেই মুহূর্তে অনুমান করেছিলেন, রেশমের চাউনিতে যেন এক অন্য উজ্জ্বলতা। তৎক্ষণাৎ কৌতূহলী হয়ে পাশের ঘর থেকে মসলিনের সূক্ষ্ম আড়াল ভেদ করে নজর চালাতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছিলেন, 'এ কী, এ যে—', কিন্তু সেদিন তিনি কিছুতেই রেশমবাইয়ের কাছে ব্যক্ত করতে পারেননি পত্রকারের প্রকৃত পরিচয়। সে-কথা রেশমবাইকে বলবেনই বা কী করে! তাঁর সেই লজ্জার কাহিনী, পাপের কাহিনী কি নিজের মেয়েকে বলা যায়। কাউকেই কি বলা যায় যে, তিনি শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিলেন একইসঙ্গে পিতা ও পুত্রের! রেশমকে তো এতদিন তাঁর জীবনের অন্য এক বৃত্তান্ত শুনিয়ে এসেছেন, বলেছেন তাঁর শিকড় সেই সুদূর পারস্যদেশে। মেয়েকে বলতে শিখিয়েছেন লখনউয়েরই কথ্য ভাষা যাতে রেশম কিছুতেই না আবিষ্কার করতে পারে মায়ের লজ্জার ইতিহাস। পুলক চৌধুরিকে সেদিন দেখামাত্র তাই চমকে উঠেছিলেন, কীভাবে তাঁর ছোঁয়া থেকে বাঁচাবেন মেয়েকে সেই চিন্তায়ই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন কদিন। অথচ পুলক চৌধুরির সামনে গিয়ে তাঁকে যে নিষেধ করবেন সে উপায়ও ছিল না তাঁর। তাই কখনও পুলক চৌধুরিকে চিরকুট পাঠিয়ে, কখনও মেয়েকে নিষেধ করে বা তাকে চোখ রাঙিয়েও ঠেকাতে পারছিলেন না তাদের মেলামেশা। বাধ্য হয়েই আজ পুলক চৌধুরির সামনে আত্মপ্রকাশ করতে হল তাঁকে। তাঁর চোখের কোণে তখন ধকধক করে জ্বলছে বহু বছরের জমে থাকা আগুন, কিন্তু কণ্ঠস্বর শান্ত, সংযত। শুধু বললেন, তুমি শেষপর্যন্ত রেশমের দিকেও হাত বাড়ালে!

পুলক চৌধুরির কানে সে-কথা পৌঁছল না, শুধু কী এক মুগ্ধ আবেশে তখন বিড়বিড় করছেন, অঙ্গনা, অঙ্গনা।

—তুমি যে এতখানি নীচ তা ভাবতে পারিনি। তোমার কাছে আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ, তুমি আজই এখান থেকে চলে যাও—

পুলক চৌধুরি ছোট্ট একটা ধাক্কা খেলেন, বিভ্রান্তও হলেন একটু। সেদিন রেশমবাই যখন তাঁকে লখনউ ছেড়ে কলকাতা চলে যেতে বলেছিল, সেদিন ভারি অপমানিত মনে হয়েছিল নিজেকে, ভেবেওছিলেন আর কখনও আসবেন না বাইজিকোঠিতে। তবু কী যেন একটা সংকেত লুকোনো ছিল রেশমের কথায়। কদিন ধরে একটু-একটু করে যে-সংকেত প্রকাশিত হচ্ছিল তার গায়কীতে, গানের কলিতে, তার তানে লয়ে। সেই টানেই তো আসছিলেন এ-কোঠিতে, আজও এসেছেন সেদিনকার অপমানের পরও। আর এসে যে ভুল করেননি তা এই মুহূর্তে তাঁর সামনে অঙ্গনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উপলব্ধি করছেন। যদিও এখনও তাঁর মনে হচ্ছিল, দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য।

অঙ্গনা তাঁকে চলে যেতে বললেও কোঠির মেঝেতে অনড় হয়ে রইলেন পুলক চৌধুরি। স্থির গলায় বললেন, আমি তো তোমাকেই খুঁজতে কলকাতা থেকে লখনউ ছুটে এসেছি অঙ্গনা।

কুন্দনবাইয়ের গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে বেজে উঠল, কে তোমাকে আসতে বলেছে এখানে,

—কেউ নয়। আমি এসেছি আমার বিবেকের তাড়নায়, আবার বিড় বিড় করলেন পুলক চৌধুরি।

কুন্দনবাইয়ের ঠোঁটের কোণে একচিলতে বাঁকা হাসির উদ্রেক হল, তোমার বিবেক এখনও

বেঁচে আছে বুঝি। তাইই রেশমকে নিয়ে তোমার সেই খেলায় মেতে উঠলে!

পুলক চৌধুরি আবার একটা ধাক্কা খেলেন. তুমি আমাকে শুধু-শুধু ভুল বুঝছ, অঙ্গনা। সেদিন তোমাকে যে আমি ধরে রাখতে পারিনি, সে আমার অক্ষমতা।

কুন্দনবাই পরক্ষণে আরও তীক্ষ্ণ হয়ে বললেন, আমার নাম কুন্দনবাই! তুমি যাকে অঙ্গনা বলে চিনতে, সে এখন আর বেঁচে নেই।

এরকম একটা নিষ্ঠুর জবাব পাবেন, তা বোধহয় আন্দাজ করেছিলেন পুলক চৌধুরি। কিছুক্ষণ অঙ্গনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন স্তব্ধ হয়ে, তারপর বললেন, হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি যে কতদিন ধরে তোমাকে খুঁজেছি—

—কেন খুঁজেছিলে বলতে পারো। যেটুকু সুখ আমি নিজের চেষ্টায় অর্জন করেছি, তাও নষ্ট করে দেবে বলে!

—না, পুলক চৌধুরি ঘাড় ঝাঁকালেন, যে-জীবন তোমার প্রাপ্য ছিল, তা আবার তোমাকে ফিরিয়ে দিতে চাই, অঙ্গনা।

কুন্দনবাই খুক খুক করে ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে উঠে বললেন, এতদিন পর পুরনো সেই বস্তাপচা কথাগুলো আর নাই বা বললে তুমি। বাইজি হওয়ার পর এত লোক এতবার ফাটা রেকর্ডের মতো এ ধরনের কথা শুনিয়েছে যে, এখন শুনলেই হাসি পায়।

—কিন্তু তারা কেউই আমার মতো তোমাকে ভালবাসেনি, অঙ্গনা।

কুন্দনবাই আবার খুকখুক করে হাসলেন, এসব ভালবাসার গল্প আপাতত থামাও। এসব গল্পের আর সামান্যতম মূল্যও নেই আমার কাছে। শুধু আমাকে রেহাই দাও এখন। তুমি যেখান থেকে এসেছিলে, আজই সেখানে চলে যাবে। আমি চাই না তোমার জন্য আমার অর্জিত শান্তি আবার বিঘ্নিত হোক।

—আমি চলে যেতে আসিনি, অঙ্গনা। যখন এতদিন পর তোমাকে খুঁজে পেয়েছি, তোমাকে নিয়েই ফিরতে চাই।

—না, কুন্দনবাই সহসা আরও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বেজে উঠলেন, আমার জীবন নষ্ট করে তোমাদের সাধ মোটেনি! এখন রেশমের জীবনটাও নষ্ট করে দিতে চাও!

প্রতিটি শব্দই তীব্রভাবে বুকের ভেতর গেঁথে গেল পুলক চৌধুরির। অঙ্গনার জীবনটা যেভবে নষ্ট হয়েছে, তার কিছুটা জানতেন এতদিন, আরও অনেকখানি জেনে গেলেন এই মুহূর্তে। একটি তরুণী, যার ধ্যানজ্ঞান ছিল সংগীত, গানের জন্যই যে তার শিকড় ছিন্ন করে, লোকলজ্জা হেলায় ঠেলে ফেলে আশ্রয় নিয়েছিল পীতাম্বর চৌধুরির কাছে, তাকে পাঁকের গভীরে রেখে যাওয়ার দায় যেমন পীতাম্বর চৌধুরির, তেমনই তাঁরও। পুলক চৌধুরি সে দিন অঙ্গনাকে নিয়ে পালিয়ে না গেলে হয়তো অন্যরকম হত অঙ্গনার জীবনের ইতিহাস। অঙ্গনা তাঁর প্রথম জীবনের প্রেম, তাঁর বাবার শেষ জীবনের পাপ।

আত্মপক্ষ সমর্থনে কী বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না পুলক চৌধুরি। অঙ্গনার সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর বহু বছর অতিক্রান্ত। সেই দীর্ঘ বছরগুলি পার করেছেন কখনও অঙ্গনার কথা ভেবে, কখনও না-ভেবেও। হয়তো শেষদিকে ভুলতেও শুরু করেছিলেন অঙ্গনার মুখ যা একসময় পাগল করে তুলেছিল তাঁকে। অথবা হয়তো সত্যিই ভোলেননি, না হলে অঙ্গনার সামান্য সন্ধানটুকু পাওয়ামাত্র কেনই বা তৎক্ষণাৎ এতখানি দূরত্ব অতিক্রম করে ছুটে আসবেন লখনউয়ে। আর এসে যে-অঙ্গনাকে দেখলেন, তা তাঁর ধারণা থেকে খুব একটা অন্যরকম নয়।

যে পরিবেশে, যে অবস্থার মধ্যে বাস করছে অঙ্গনা, তাতে জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। আজ কুড়ি-বাইশ বছর হয়ে গেল এই নরকে বাস করছে সে। এই দীর্ঘ সময়ে বহু পুরুষকে সঙ্গ দেওয়া কুন্দনবাই এখন একজন পোড়-খাওয়া, অভিজ্ঞ বাইজি, যে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখেছে, ভেঙে চুরমার হয়েছে লক্ষবার, এখন আর কোনও স্তুতি, কোনও মন-ভোলানো স্পর্শই করে না তাকে। সে-কথা অভিজ্ঞ সাংবাদিক পুলক চৌধুরি জানেনও। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, জানতাম, তুমি আমাকে ভুল বুঝবে। কিন্তু বিশ্বাস করো, সে সময় যতখানি ভালবাসতাম তোমাকে, আজও সেভাবেই—

এতক্ষণ ঠারে ঠোরে, বাঁকানো কথার ছুরি দিয়ে আঘাত করছিলেন কুন্দনবাই, এখন প্রায় দপ করে জ্বলে উঠে তাঁকে ফালফাল করে দিতে চাইলেন তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে, তোমাদের পুরুষদের লজ্জা, রুচি বলতে কি কিছুই নেই। তুমি জান, রেশম তোমারই মেয়ে। তাকে নিয়ে তুমি—

আর বলতে পারলেন না কুন্দনবাই, থরথর করে কাঁপতে লাগলেন হঠাৎ। আর পুলক চৌধুরি স্তব্ধ হয়ে কেবল বিড় বিড় করতে পারলেন, আমার মেয়ে, রেশম!

পর মুহূর্তে কুন্দনবাই একেবারে ভেঙে পড়লেন, তোমার কাছে মিনতি করছি, বাবুজি। রেশমকে তুমি ছেড়ে চলে যাও। তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি, বাবুজি—

'বাবুজি' শব্দটা পুলক চৌধুরির কানে গরম লাভার মতো জ্বলতে জ্বলতে ঢুকছিল। রেশম এতদিন তাঁকে 'বাবুজি' সম্বোধন করেছে, সে বাইজি বলেই মানিয়ে গেছে, সেটাই তাদের সহবত, কিন্তু অঙ্গনাও তাঁকে 'বাবুজি' বলে সম্বোধন করে তার কোঠিতে আসা আরও বহু লম্পট মেহমানদের পর্যায়ে নামিয়ে দিল তাঁকে। স্তব্ধ বিস্ময়ে বহুক্ষণ সেই কুন্দনবাইয়ের দিকে অপলক তাকিয়ে শুধু বিড় বিড় করে বলতে পারলেন, রেশম কে, তা আমি জানতাম না ঠিকই, কিন্তু আমি তাকে এ কদিন মেয়ের মতোই ভালবেসেছিলাম। ঠিক আছে। তুমিও যখন আমাকে চাইছ না—

বলে আর সেখানে দাঁড়ালেন না পুলক চৌধুরি, ধীর পায়ে বেরিয়ে এলেন কোঠি থেকে। তিনি তখন দেখতেও পেলেন না, এতক্ষণের তীব্রতম সংলাপগুলি পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে পাথরের মূর্তির মতো শুনে ফেলল রেশম।

—কাট্। কাট্। ক্যামেরা থেকে চোখ তুলে যেন নিজেই নিজেকে শোনাল রোমিও দত্তগুপ্ত। বহুক্ষণ একটানা শুটিং করে ভারি পরিতৃপ্ত দেখাচ্ছে তার ফ্রেঞ্চকাট মুখ। প্রথমে আউটডোরে বিবস্বান বসু আর গার্গীকে নিয়ে, অতঃপর আবার চকবাজারের বাইজি কোঠিতে ফিরে এসে বিবস্বান বসু আর রুমেলা রায়কে নিয়ে ইনডোর শুটিং করার পর শেষ দৃশ্যে সে ক্যামেরার ফ্রেমে ধরে রাখল মসলিনের সূক্ষ্ম পর্দার আড়ালে রেশমবাইয়ের স্তম্ভিত হয়ে থাকা অস্পষ্ট মুখখানা। গার্গী চৌধুরির অভিব্যক্তিও ভারি চমৎকার হয়ে ওঠায় রোমিও তাকে একটা এক্সট্রা-থ্যাঙ্কস্ দিয়ে জানাল, ওয়েল ডান, ম্যাডাম। কাল আপনি শেষ এপিসোডটা উতরে দিলেই আমাদের কাজ খতম।

উফ্, গার্গীও তাহলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। শেষদৃশ্যের স্ক্রিপ্টটাও সে শুনে ফেলেছে ইতিমধ্যে। তাতে তার একটা নাচের দৃশ্য আছে বাইজির পোশাক পরে। তারপরই ক্লাইম্যাক্স। সেটা পরিচালক এখনও খুলে বলেননি কাউকে। গার্গী অবশ্য প্রথমেই বলে দিয়েছে, শৈশব থেকে সে ঘুঙুরই ছোঁয়নি কখনও। বস্তুত নাচের স্কুলে যাওয়ার কথা কখনও ভেবেই উঠতে পারেনি। তার পক্ষে সিরিয়ালে নাচের দৃশ্যে নামার কোনও প্রশ্নই নেই। রোমিও অবশ্য তাতে একটুও

না দমে বলেছে, আপনার কয়েকটা নাচের ভঙ্গিমার স্টিল দৃশ্য নিয়ে নেব, ম্যাডাম! তা ছাড়া আমাদের শাম্বদা এককালে ডান্সার ছিলেন, তিনিই আপনাকে কয়েকটা পোজে হাত-পা নাড়তে শিখিয়ে দেবেন'খন। দু-একটা আঙুলের মুদ্রা, চোখের নড়া চড়া। বাকিটা কলকাতা গিয়ে ডামি দিয়ে কাণ্ড সেরে নেব। ও নিয়ে আপনার কোনও চিন্তা নেই। আমাদের ক্যামেরা না পারে হেন কাজ নেই। সিনেমায় ফাইটিঙের দৃশ্যগুলো দেখেন না? সত্যি সত্যি কি আর ফাইটিং হয়!

সে সব কূট ভাবনা অবশ্য গার্গীর নয়। কোঠি থেকে বেরিয়ে দেখল, অনেকক্ষণ আগেই সন্ধে পেরিয়ে গেছে। ঘড়িতে তখন প্রায় আটটার মতো। এতক্ষণ শুটিঙে ব্যস্ত থাকার জন্য খেয়ালই করেনি এত রাত হয়ে গেছে এর মধ্যে। কোঠির বাইরে বেরিয়ে অপেক্ষমাণ গাড়িতে উঠতে উঠতে এও ভাবল, হয়তো এতক্ষণে কানপুর থেকে ফিরে এসেছে সায়ন। এসে নিশ্চয়ই তাকে খোঁজাখুঁজি করছে। না পেয়ে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে হয়তো। সেটাই স্বাভাবিক। সায়ন ক'দিন ধরে টানা ছোটাছুটি করছে লখনউ থেকে কানপুর, কানপুর থেকে আরও কোথায় না কোথায়, আর ক্লান্ত হতে হতে নিশ্চয়ই ভাবছে, গার্গী কোম্পানির কাজে ফাঁকি দিয়ে দিব্যি আরামে আছে হোটেলে। তার ওপর যদি এসে দেখে গার্গী হোটেলেও নেই—

তার এত ভাবাভাবির মধ্যেই গাড়িটা ঢুকে পড়েছে হোটেলের চত্বরে। নামতেই দেখল, সজনীবাবু আগেই এসে অপেক্ষা করছেন তাদের ফেরার জন্য। গার্গী নামতেই বললেন, আপনাকে একবার পরিচালক-স্যার ডাকছেন, ম্যাডাম।

—আমাকে! বুঝিবা একটু অবাক হল গার্গী। ঋষভ মুখার্জি এ কদিনের মধ্যে তেমন বেশি কথাবার্তা বলেননি তার সঙ্গে। শুটিঙের প্রয়োজনে যেটুকু নির্দেশনা দিয়েছেন তার বাইরে বলার দরকারও হয়নি বোধহয়। আজ প্রায় সারা দিনই তিনি শুটিঙে অনুপস্থিত, কিছুটা নিজের অসুস্থতাবশত, কিছুটা দেবাদ্রি সান্যালের ওপর রাগ দেখিয়ে। তবে সে যাই হোক, গার্গীর এখন একটু উচিতও অসুস্থ পরিচালকের সঙ্গে দেখা করা। কতক্ষণই বা আর লাগবে!

সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত উঠতে উঠতে হঠাৎই সজনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, সজনীবাবু, লোচ্চা কোথায় আছে বলতে পারেন?

—লোচ্চা! সজনীবাবু অবাক হলেন, তাকে আবার কী কাজে লাগবে, ম্যাডাম?

গার্গী ইতস্তত করে বলল, একটু দরকার আছে—

—যা দরকার আমাকেই বলুন না, ম্যাডাম। এই সজনী দত্ত থাকতে ফচকেটাকে নিয়ে আবার টানাটানি করেন কেন! শুনছেন তো ওর কাণ্ড-টাণ্ড।

গার্গী ভারি ফাঁপরে পড়ল কথাটা বলে। এখন সজনী দত্তর কাছে তার কোন দরকারটার কথা বলবে!

ততক্ষণে অবশ্য দোতলায় উঠে তারা ডানদিকে মোড় নিয়েছে ঋষভ মুখার্জির ঘরের দিকে। ঢুকে দেখল, পরিচালক বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আছেন খুবই বিধ্বস্ত অবস্থায়। তাঁর বিছানার কাছে একটা বেতের চেয়ার এগিয়ে নিয়ে গিয়ে রানাজি বসে আছেন উদ্বিগ্ন মুখে। কী যেন কথা বলছিলেন দুজনে নিচুস্বরে, গার্গীকে দেখেই সে-আলোচনা থামিয়ে ঋষভ বললেন, এসো, কেমন হল শুটিং?

—ভালই, গার্গী ঋষভের উস্কখুস্ক চেহারাটার দিকে নজর রেখে বলল, আপনি একটু কাহিল হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে।

—ও কিছু না, ঋষভ তাঁর অসুস্থতাটা ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন তৎক্ষণাৎ, প্রেশারটা একটু হাই।

—না, ম্যাডাম, সজনী দত্ত হামরে পড়লে, ব্লাড-রিপোর্টটা একবার দেখুন, তিনশোর ওপর সুগার। তার ওপর কোলেস্টরেলও হাই...

ঋষভ মুখার্জির বিছানায় পড়ে থাকা ব্লাড রিপোর্টটা তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল গার্গী। হঠাৎ দরজায় শব্দ শুনে পেছনে তাকিয়ে দেখল, সিনেমুভির আরও অনেকেই পরিচালকের অসুস্থতার খবর পেয়ে দেখতে এসেছেন। তাদের মধ্যে আছেন বিবস্বান বসু, রুমেলা রায়, রোমিও, দ্বিত্বমও। গার্গী অতএব ও-ঘর থেকে চলে যাবে কি যাবে না ভাবছে, সে সময় ঋষভ বললেন, কাল দুপুরে বাকি শুটিংটা শেষ করে ফেলব।

—আপনি যেতে পারবেন! রোমিও অবাক হল, আমিই না হয়—

—না, না, আমিই শেষটা করতে চাই। ভয় নেই, কিছু হবে না আমার। বলে ঋষভ কিছুক্ষণ আনমনা থেকে বললেন, শেষ দৃশ্যটা তো খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। রেশমবাইয়ের সোলো অভিনয়। কী, পারবে তো?

শেষ প্রশ্নটা গার্গীর উদ্দেশে ধাবিত হতেই সহসা সে বেশ হকচকিত হল। এ কদিন দিব্যি চালিয়ে দিয়েছে বর্ণনার প্রক্সি হিসেবে। সবাইই তো ধন্য ধন্য করেছে তাকে। আর এখন কিনা পরিচালক জিজ্ঞাসা করছেন, কী, পারবে তো!

শুনে সামান্য একটু নার্ভাস বোধ করলেও গার্গী স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করল, কেন পারব না!

ঋষভ বোধহয় স্বস্তি বোধ করলেন, তাহলে সজনী, শাম্বকে বলে দাও, কাল সকালে ওকে কয়েকটা নাচের পোজ তালিম দিয়ে দিক। বাকিটা ম্যানেজ করে নেওয়া যাবে।

সজনী দত্ত তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে বললেন, সামন্তবাবুকে সব বলে দিয়েছি স্যার। আপনার কোনও চিন্তা নেই। এই সজনী দত্ত যখন আছে—

রানাজি এতক্ষণে মুখ খুললেন, সজনীদা, মিসেস চৌধুরির জন্যে যে নতুন ড্রেসটা কেনা হয়েছে, সেটা ওঁর ঘরে পাঠিয়ে দিন। আর ঘুঙুর, বলতে বলতে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, একসেট ঘুঙুর কিনে আনতে বলেছিলাম, কেনা হয়েছে?

সজনী দত্ত এবার আমতা আমতা করলেন, আজ্ঞে আগের সেটটা তো একদম নতুন রয়েছে। বর্ণনা দিদিমণি তো ছোঁননি বলা যায়। আমি সব গুছিয়ে রেখে দিয়েছি। এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি ওঁর ঘরে। আর হ্যাঁ, ম্যাডাম, আপনি যে লোচ্চাকে খুঁজছিলেন, কী যেন দরকার আছে বলে!

লোচ্চার কথা উঠতেই ভারি বিব্রত বোধ করল গার্গী। কিন্তু তার চেয়েও অবাক হলেন বিবস্বান বসু, লোচ্চাকে কী জন্য দরকার!

শুধু বিবস্বানই নয়, বিস্মিত হলেন রুমেলা রায়। মুখে কিছু না বললেও চোখে আগুন হেনে তাকিয়ে রইলেন গার্গীর দিকে, যেন লোচ্চার খোঁজ করে সে একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ করে ফেলেছে। বিব্রত গার্গী চট করে বলল, না। তেমন কিছু নয়, ভাবছিলাম, একটা পান কিনে আনতে বলব।

—পান! তার জন্যে তো আমিই আছি, ম্যাডাম, সজনী দত্তর কথায় যেন গার্গীর সঙ্গে বাকিদের গায়েও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

ইতিমধ্যে রুমেলা সজনী দত্তকে ডেকে কী যেন বলায় তা কোনও ভাবে শুনে ফেললেন বিবস্বান বসু, এ ক'দিন রুমেলা রায়ের সঙ্গে শুটিঙের বাইরে একটিও কথা হয়নি তাঁর, এখন গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ঘুমের ট্যাবলেট নেই তা আমাকে বললেই হত', বলে তাঁর হাতে একটা ছোট্ট ব্যাগ ছিল, সেটা খুলে আট-দশটা ট্যাবলেটের একটা স্ট্রিপ ছুড়ে দিলেন যেখানে রুমেলা রায় বসেছিলেন

সেদিকে। রুমেলা হাত বাড়িয়ে নিলেন বটে, কিন্তু দ্বিগুণ গম্ভীর দেখালো তাঁর মুখ।

ট্যাবলেটের স্ট্রিপটার দিকে তাকিয়ে সহসা ছাঁত করে উঠল গার্গীর বুক। ঠিক এই ট্যাবলেটের স্ট্রিপই তো ছেঁড়া অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল বর্ণনার ডেড বডির পাশে। যদিও বর্ণনার স্টম্যাকে ট্যাবলেট পাওয়া যায়নি, পাওয়া গিয়েছিল অ্যালকোহল, তবু বিবস্বান বসু আর রুমেলা রায় দুজনেই যে এই কোম্পানির তৈরি ঘুমের ট্যাবলেট খান, এটা বর্ণনা-হত্যার পটভূমিকায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লু। ব্যাপারটা গার্গীকে বেশ ভাবাল কিছুক্ষণ।

পরিচালককে গুডনাউট করে গার্গী অতঃপর চলে এল তার নিজের রুমের দিকে। ঘরে ঢুকে দেখল, অনেকক্ষণ আগেই কানপুর থেকে ফিরেছে সায়ন, একা-একা সোফায় হেলান দিয়ে বসে পরের পর সিগারেট খেয়ে ভরিয়ে ফেলেছে অ্যাশট্রে। অভ্যাসমতো হেসে জিজ্ঞাসা করল, কতক্ষণ!

সায়নকে কে জানে কেন ভারি গম্ভীর দেখাচ্ছে আজ। তার দিকে তাকাচ্ছেও কেমন একটা অভিযোগ-অভিযোগ চোখে। গার্গী বুঝে উঠতে পারল না, কলকাতা থেকে কোনও ঝামেলার খবর এসেছে কি না সায়নের কাছে, না কি কানপুরের প্রগ্রেস ব্যাহত হয়েছে কোনও ভাবে!

—তোমার কি রোজই এরকম রাত হয়!

—রোজ হয় না। আজই একটু দেরি হয়ে গেল।

—আজও কি নায়কের ঘরে দরজা লক করে দিয়ে ড্রিঙ্ক করতে গিয়েছিলে?

গার্গী সহসা একটা প্রবল ধাক্কা খেল নিজের ভেতর। হোটেলে ফিরতে দেরি হওয়ায় সে এমনিতেই কিছুটা সংকোচে ছিল, তার ওপর সায়নের এ ধরনের প্রশ্নে বিপর্যস্ত হয়ে গেল একেবারে। নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেনের কাছ থেকেই এই বিশ্রী ইঙ্গিতটা পেয়েছে সায়ন।

সেই মুহূর্তে দরজায় নক শুনে গার্গী এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই সজনীবাবু। তাঁর হতে একসেট বাইজির ড্রেস, সঙ্গে পলিথিন ব্যাগে একজোড়া ঘুঙুর। এক গাল হেসে বললেন, কাল সকলে রেডি হয়ে থাকবেন, ম্যাডাম। সামন্তবাবু আপনাকে নাচের তালিম দিতে আসবেন।

সজনীবাবু চলে যেতেই গার্গী সেগুলো রাখতে যাচ্ছিল আলমারির ভেতর। হঠাৎ সায়ন বলল, কী ওগুলো! দেখি—

গার্গী হাসল, এগুলো লখনউ-স্পেশাল।

সায়ন প্যাকেটটা খুলে রেশমবাইয়ের ঘাগরা, চোলি, আংগিয়া, দোপাট্টা, ঘুঙুর ইত্যাদি দেখতে দেখতে অবাক হয়ে বলল, এ সব তোমার কাছে দিয়ে গেল কেন!

গার্গী খুব স্বাভাবিকভাবেই বলল, কাল ওদের সিরিয়ালে শেষ এপিসোডাটির শুটিং যে। আমাকে পরতে হবে।

সায়ন আরও বিস্মিত হয়ে বলল, তুমি ওদের ছবিতে অভিনয়ও করছ নাকি!

গার্গী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। সিনেমুভির কাজে সহায়তা করছে এটুকুই সে জানিয়েছিল সায়নকে, ঠিক স্পষ্ট করে কখনও বলেনি সে অভিনয় করছে। জানালে সায়ন কী ভাবে নেবে ব্যাপারটা তা বুঝে উঠতে পারেনি বলেই। সায়ন আপত্তি করলে তো পূরণ হত না তার অভীষ্ট লক্ষ্য, কিন্তু এখন সমস্ত ঘটনাটা তার কাছে খুলে বলতেই হবে গার্গীকে।

সায়ন তার কথা ভাল করে শোনার আগেই স্তম্ভিত স্বরে বলে উঠল, সে কী, তুমি ওদের সিরিয়ালে একটা বাইজির ভূমিকায় অভিনয় করছ। কই এতদিন তো বলনি আমাকে।

গার্গী বেশ বিব্রত বোধ করছিল সায়নের জেরার জবাবে। ভেবেছিল, আর একটা দিন

কোনওক্রমে পার করে তবেই সব খুলে জানাবে সায়নকে। কিন্তু তার আগেই—

—আসলে অভিনয়টা অভিনয়ই। অভিনয় করতে করতেই বুঝতে চাইছিলাম, কী সেই কারণ যার ফলে দু-দুটো খুন হয়ে গেল ক'দিনের মধ্যে!

সায়ন তার কথায় একেবারেই গুরুত্ব না দিয়ে অসহিষ্ণু হল, তাই বলে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের মতো একটা কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে তুমি একটা সিরিয়ালে বাইজির ভূমিকায় অভিনয় করছ, এটা আমি ভাবতেই পারছি না।

গার্গী বিধ্বস্ত হয়ে গেল ভেতরে ভেতরে। কোন পরিপ্রেক্ষিতে, কেনই বা সে এরকম একটা ঝুঁকি নিতে রাজি হল, সেটা সায়নকে বোঝানো হয়তো শক্ত হত বলেই সে এ কদিন কথাটা গোপন রেখেছিল। আর মাত্র একটা দিন পার হলেই সে শেষ করে ফেলতে পারে তার আরব্ধ কাজ। কিন্তু তার আগেই সায়ন—

সায়ন সোফা থেকে উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে বলল, কাল থেকে আর ওদের ওখানে যাবে না। সকালে উঠেই ওদের ড্রেস ফেরত দিয়ে আসবে।

গার্গী স্তম্ভিত হয়ে গেল সায়নের কথাবার্তায়, হাবভাবে। তার মতো শিক্ষিত মানুষও যদি গার্গীর কার্যকলাপ বুঝতে না পারে, তাহলে গার্গীর এ-ধরনের অনুসন্ধিৎসার নেশার এখানেই সলিলসমাধি। জোড়া খুনের হত্যাকারী কে বা কারা, তা না জানা পর্যন্ত তো তার স্বস্তি নেই। কিন্তু সায়নের কথা শুনে তাহলে এখানেই কি ইতি করে দেবে খুনের উৎসের সন্ধান করা!

সেদিন রাতে ডিনারের টেবিলে আর একটাও কথা হল না দুজনের মধ্যে। এমনকী সায়ন বিছানায় শুতে চলে গেল গার্গীকে না ডেকেই। তাদের বিয়ের পর সম্ভবত এই প্রথম।

খুব অভিমান হল গার্গীর। বেডরুমের বাইরে তাদের ছোট্ট ড্রইংরুমের সোফায় বসে অনেক রাত পর্যন্ত একা-একা ভাবল গত কয়েক দিনের ঘটনাগুলো। সোফার একপাশে পড়ে থাকা পলিথিনের প্যাকেট থেকে বার করল ঘুঙুরের সেটটা। সোনালি ঘুঙুরজোড়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন ঝুমঝুম ঝুমঝুম শব্দ শুনতে পেল কানে। নির্জন রাতের নৈঃশব্দের ভেতর একা সোফায় বসে সহসা ভাবতে শুরু করল, তার সামনে এখন জীবনের গভীরতম সমস্যা। কাল শুটিঙের শেষপর্বে যদি সে সত্যিই অংশ নেয়, তাহলে সায়নের সঙ্গে তার একটা অনিবার্য সংঘাত। সেক্ষেত্রে সে কাল শুটিঙে যাবে না।



লখনউয়ে এসে যে-দুটি হত্যাকাণ্ডের জটাজালে আবর্তিত হচ্ছে গার্গী, সে-রহস্য উন্মোচন না করা পর্যন্ত একবিন্দু স্বস্তি নেই তার, তা সায়ন জানে, অথচ যে-মুহূর্তে দুই হত্যাকাণ্ডেরই

মোটিভ প্রায় পরিষ্কার হয়ে এসেছে তার সামনে, তখনই সায়ন এমন উষ্মা প্রকাশ করায় সে যতখানি ক্ষুব্ধ, ততটাই সংকটে। বিয়ের পর এ পর্যন্ত একবারও সায়নের কথার সে অবাধ্য হয়নি, হওয়ার কথাও নয়, কারণ সায়ন একেবারেই ডমিনেটিং স্বভাবের নয়। তা ছাড়া সায়ন তো তার আচার-আচরণ, চরিত্র, স্বভাব সবই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চেনে। এহেন সায়নের তো বোঝাই উচিত, গার্গী এই রহস্যের অন্তরালে থাকা কুশীলবদের শনাক্ত না করা পর্যন্ত নিরস্ত হবে না। তারপরও কেন যে সে নিষেধাজ্ঞা জারি করল গার্গীর উপর! শুধু তা-ই নয়, নিতান্ত স্বার্থপরের মতো একা-একা ঘুমোতেও চলে গেল! বিমূঢ়, হতচকিত গার্গী চারপাশের বিপুল নৈঃশব্দ্যের ভেতর জেগে বসে আছে অপাঙক্তেয়র মতো। সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে এখন তাঁর যা রাগ হচ্ছে সায়নের ওপর!

বেডরুমের ওপাশে ছোট্ট ড্রইংটার নরম সোফায় হেলান দিয়ে বসে সোনালি ঘুঙুরজোড়া নেড়েচেড়ে দেখছিল গার্গী, আর আনমনা হয়ে ভাবছিল, সিনেমুভির টিমকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে সে এখন সত্যিই গুডবাই করে দেবে কি না 'সোনালি ঘুঙুর'কে। ভাবনার মধ্যে ঘুঙুরজোড়া বাজিয়ে ঝুমঝুম শব্দও তুলল কিছুক্ষণ। কাল সিরিয়ালের শেষ এপিসোডটিতে বাইজির পোশাক পরে কয়েকটা নাচের পোজ দিতে হবে তাকে। শাম্ব সামন্ত সাকি এককালে ভাল নাচতেন। শান্তশিষ্ট মানুষ, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে তিনি যে এত বড় একজন গুণী তা প্রকাশ করেন না কিছুতেই। ঋষভ মুখার্জি তাঁর এই সুপ্ত প্রতিভাটিকে কাজে লাগাতে চাইছেন এই সিরিয়ালে। কাল শাম্ব সামন্তই হবেন গার্গীর নাচের শিক্ষক।

ক'দিন আগেই কার কাছে যেন গার্গী শুনছিল, লখনউ এককালে খ্যাত ছিল নাচের শহর হিসেবেও। কালকা ও বান্দাদিন নামে দুই ভাই ছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুই নর্তক। তাঁরা এই শহরে বহু বছর ধরে নাচের শৈলী দেখিয়ে মাত করে রেখেছিলেন দর্শকদের। নাচের সময় তাঁদের পা এত নরম হয়ে পড়ত যে, ধারালো তলোয়ার পেতে রাখলেও নাকি পা কাটত না তাঁদের। আসলে গুণীরা বলেন যে, নাচের ওস্তাদি হচ্ছে তোড়া আর টুকড়াকে নানারকম ভাবে বাজিয়ে দেখানো। যে-কোনও ধরনের ঘুঙুর পায়ে বেঁধে তাকে এমনভাবে বাজাতে হবে, তা যেন যে-কোনও প্রাজ্ঞ দর্শককেই শিহরিত করে।

নাচের এতসব কলাকৌশল গার্গী কখনও শেখেনি, সে তো কখনও ভাবেইনি যে তাকে এতসব কাণ্ডটাণ্ড করতে হবে কোনও দিন। এখন শুধু অপেক্ষা করা, শাম্ব সামন্তর বিদ্যা আর রোমিও দত্তগুপ্তর ক্যামেরা তাকে কতটা নর্তকী হিসেবে খ্যাতি এনে দিতে পারে।

তার আগে গার্গীর মাথায় সেই অবশ্যম্ভাবী প্রশ্ন, কাল তো তাকে সায়নের কথার অবাধ্য হতে হবে। তারপর, তার পরে কী হবে!

সোনালি ঘুঙুরজোড়া নাচাতে নাচাতে হঠাৎই তার চোখে পড়ল, একটা ঘুঙুরের গায়ে অদ্ভুত কালচে রং ধরে আছে ছিটছিট-ভাবে। চোখ তীক্ষ্ণ করে দাগটার ওপর নজর ফেলতেই ভীষণ চমকে উঠল সে। ছিট-ছিট দাগগুলো কি রক্তের! রক্ত শুকিয়ে গেলে এরকমই কালচে-ভাব ধারণ করে। ঘুঙুরটা প্রথম বর্ণনাকেই দিয়েছিলেন সজনী দত্ত, তারই তো এই সিরিয়ালে নাচার কথা ছিল রেশমবাইয়ের ভূমিকায়। হত্যার রাতে তার ডেডবডির পাশেই নাকি পড়ে ছিল ঘুঙুরজোড়া, সজনীবাবু দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে তুলে রেখেছিলেন যত্ন করে। তবে কি বর্ণনার শরীরেরই রক্ত এটা।

হঠাৎ এই ভীষণ নৈঃশব্দ্যের ভেতর কথাটা তার মগজে চলকে উঠতেই কেন যেন কেঁপে উঠল গার্গী। একটা তরতাজা মেয়ে হঠাৎ মধ্যরাতে খুন হয়ে গেল, এখনও তার কিনারা করা গেল না সেটাই

ভারি আশ্চর্যের। পুলিশ তো একে ওকে গ্রেফতার করে, মারধর করে শূন্যে তলোয়ার ঘুরিয়ে চলেছে, আর গার্গী এক কুয়াশা থেকে ক্রমে ঢুকে পড়ছে আর এক ধোঁয়াশার গভীরে।

ঘুঙুরজোড়া সন্তর্পণে পলিথিন ব্যাগের ভেতর গুটিয়ে রাখতে রাখতে গার্গীর ভেতর তখন একটাই কূটভাবনা, রক্তটা বর্ণনার শরীরের, না কি অন্য কারও!

ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎই তার হাতে উঠে এল কোঠিতে কুড়িয়ে পাওয়া সেই ডিজিটাল ডায়েরিটা। একটু আগে যখন অসুস্থ ঋষভ মুখার্জিকে দেখতে গিয়েছিল, তখনই মনে পড়েছিল এটার কথা, কিন্তু দেব-দেব করেও আর দিতে পারেনি তখন। যদি কেউ কিছু ভেবে বসে, তাই। যাই হোক, আপাতত রাত্রির নিঃশব্দ প্রহর পার করতে করতে বরং এই ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রটা নিয়েই কিছুক্ষণ খেলা করা যাক।

বোতাম টিপতেই ঋষভ মুখার্জির রোজনামচার একটা কাঠামো স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে ক্রমশ। ছোট্ট একটা জিনিস, হাতের পাঞ্জার মতো আকার, তার ভেতর কী পরম যত্নে তাঁর প্রতিটি দিনের নিখুঁত বিবরণ ভরে রেখেছেন একটু-একটু করে। ডিজিটাল ডায়েরিটার ভেতর পরিসর খুব একটা বেশি নয়, যথেষ্ট তথ্যও এর মধ্যে ভরে রাখা যায় না, তবু তারই ভেতর শুটিংয়ের দিনপঞ্জী ছোট ছোট সঙ্কেতচিহ্ন দিয়ে ভারি সুকৌশলে ভরেছেন ঋষভ।

বোতাম টিপে টিপে অত বড় মাপের মানুষটাকে আবিষ্কারে মত্ত হয়ে উঠল গার্গী। কী মনে হতে কিছু কিছু নাম খুঁটিয়ে দেখল মন দিয়ে, সেই সঙ্গে লখনউ আর কলকাতার কিছু ঘটনাবলিও। কলকাতায় ক'দিন আগে এক বিশ্বখ্যাত সিনেমা-পরিচালক এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর মন্তব্য : ফ্যান্টাস্টিক এক্সপিরিয়েন্স।

ইলেকট্রনিক্সের লিখনে আরও ফুটে উঠল, কবে কী বই পড়েছেন, কখন কার সঙ্গে দাবা খেলেছেন, কখন ক্যাসেটে কী ছবি দেখলেন, কিংবা কবে কোথায় কার সঙ্গে তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, তারপর কী ফলাফল হল সাক্ষাৎকারের পর, সবই।

কিছুক্ষণ পর গার্গী ভাবল, লোকটা সত্যিই অদ্ভুত!

বহুক্ষণ ঋষভ মুখার্জির রোজনামচার ভেতর ঘোরাঘুরি করার পর হঠাৎই গার্গী শুনতে পেল ঘরের বাইরে কোথাও নারী ও পুরুষের সংলাপ। কথার আওয়াজ কানে যাওয়া মাত্র তার স্বাভাবিক তৎপরতায় স্প্রিঙের মতো লাফিয়ে উঠল সোফা থেকে। একবার বেডরুমের ভেতর উঁকি দিয়ে ঘুমন্ত সায়নকে দেখে চট করে বেরিয়ে এল বাইরে। মস্ত বারান্দাটায় হাল্কা আলো জ্বালানো। এত বড় হোটেলের ঠিক কোন দিক থেকে যে কথার আওয়াজ ভেসে আসছে তা ঠাহর করতে পারল না সেই মুহূর্তে। তাদের ঘর পেরিয়ে ডাইনে বাঁক নিলেই রানাজি আর ভরদ্বাজের ঘর, সেদিকে উঁকি দিতেই দেখল, ঘরের দরজা সামান্য খোলা, কিন্তু ভেতরটা অন্ধকার। গার্গীদের ঘর থেকে বেরিয়ে বাঁদিকের ঘরগুলোয় থাকেন যথাক্রমে, বি. বি., রুমেলা রায়, তারপর সিঁড়ি, তার পরের ঘরটা এখন খালি—যেটায় বর্ণনা থাকত, তারপর রোমিও-দ্বিত্বমের ঘর, একেবারে শেষে ঋষভ। তারপর বাঁয়ে বাঁক নিলেই ডাইনিং-এ যাওয়ার পথ।

গোটা বারান্দাটায় একবার চক্কর দিতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল ডাইনিংয়ের সামনে এসে।

ডাইনিং পেরিয়ে যে ওপেন-এয়ার লাউঞ্জ, তার আলো-আঁধারি পটভূমিকায় কথা বলতে বলতে গিয়ে বসলেন দুই নারী-পুরুষ, কথা বলছেন চাপাস্বরে। কিন্তু কথা তো নয়, আস্ফালন। গার্গী চমকে উঠে দেখল রানাজির সঙ্গে ভীষণভাবে চোপা করছেন লাভলীন। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে গার্গী যা দু-একটা সংলাপ উদ্ধার করতে পারল তা হল, লাভলীন বলছেন, 'তুমি কী ভেবেছ বলো তো! তোমার মুখোশ আমি খুলে দেব।' রানাজি তাকে শান্ত করার বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছেন নানান স্তোকবাক্য দিয়ে।

গার্গী বিস্মিত হল এই হোটেলে লাভলীনকে দেখে। হয়তো এ-হোটেলের কোনও ঘরে লাভলীন এসে উঠছেন, সারাদিনে রানাজিকে কব্জা করতে পারেননি, এখন মধ্যরাতে রোলার চালাচ্ছেন আচ্ছা করে।

হঠাৎ পেছনদিকে কার পায়ের শব্দ শুনে দ্রুত হোটেলের সামনের বারান্দায় চলে এল গার্গী। দেখল, রুমেলা রায় হঠাৎ তাঁর রুম থেকে বেরিয়ে এদিকে-ওদিক তাকিয়ে সহসা ঢুকে পড়লেন বিবস্বান বসুর রুমে। বিবস্বান বসুর ঘরের দরজা যে খোলা ছিল তা একবারও বুঝতে পারেনি গার্গী। কিন্তু রুমেলা 'দরজা খোলা থাকবে' এমন খবর নিশ্চয়ই জানতেন আগে থেকে। তার মানে এ ক'দিনের টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে বোধহয় হঠাৎ ভাব হয়ে গেছে দুজনের। গার্গী খুবই দুঃসাহসীর মতো পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল বিবস্বান বসুর ঘরের দিকে। ততক্ষণে ভেতর থেকে লক হয়ে গেছে দরজাটা, কিন্তু আলো জ্বলে উঠেছে ভেতরে। পরক্ষণেই দুজনের বাকবিতণ্ডার ঝড় কানে এল তার। অনেক চেষ্টা করেও বন্ধ ঘরের কোনও সংলাপই সে উদ্ধার করতে পারল না। বরং হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল সিঁড়ির দিক থেকে পুরুষের গলার শব্দ পেয়ে।

গার্গী আরও দুঃসাহসী হয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। দোতলা থেকে তিনতলার সিঁড়িতে তবু কিছুটা আলো আছে, কিন্তু তিনতলা থেকে ওপরে ছাদে ওঠার সিঁড়ি একদম অন্ধকার। তিনতলা পেরিয়ে সেই অন্ধকার ভেদ করে সে কয়েক ধাপ উঠেছে, হঠাৎই নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখল, দোতলার সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে আসছেন লাভলীন, প্রায় ছুটেই আসছেন বলা যায়, তার পেছন পেছন কী যেন বলতে বলতে রানাজি। অন্ধকারের ভেতর গার্গী দমচাপা হয়ে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামান্য নার্ভাসও লাগছে ভেতরে ভেতরে। ওরা যদি ছাদের দিকে চলে আসে তাহলে গার্গীকে অন্ধকারের ভেতর আবিষ্কার করে ফেলবে কি না কে জানে!

কিন্তু না, ওরা ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেল তিনতলার বারান্দার দিকে। হয়তো লাভলীন তিনতলার কোনও রুমই বুক করেছেন—

সেই মুহূর্তে ছাদের ওপর হঠাৎ পায়ের ধুপধাপ আওয়াজ পেতে আবার সতর্ক হয়ে উঠল সে। এত রাতে ছাদের ওপর ঘোরাঘুরি করছে কারা! হোটেলের অন্য কোনও বোর্ডার নাকি। ছাদের ওপর গিয়ে একবার দেখে আসবে কি না ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কানে এল, হোটেলের পেছনদিকে একটা শব্দ হল ধুপ করে। বেশ জোরেই হল শব্দটা। কীসের শব্দ তা দেখার জন্য ছাদের মুখের কাছে পৌঁছেছে, সেই মুহূর্তে কে যেন তার পাশ দিয়ে দ্রুত নেমে গেল হুড়মুড় করে। লোকটা সামান্য টলছেও যেন। তার হতচকিত ভাব কেটে যাওয়ার আগেই তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আরও একজন লোক দ্রুত নেমে গেল নীচের দিকে।

তা হলে আরও কেউ আছে নাকি ওপরে, এমন ভাবতে ভাবতে ওপরে যাবে, না কি নীচে, তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই নীচের সিঁড়ি বেয়ে সেই লোক দুটো হাওয়া।

খুবই নার্ভাস হয়ে পড়ল গার্গী। পরপর যে দুজন নেমে গেল ছাদ থেকে, তাদের কাউকেই

সে ঠিক চিনতে পারল না অন্ধকারে। একটি লোক টালয়মান, অপরটি বেশ শক্তপোক্ত। শেষের লোকটি ক্যাপ্টেন নয় তো!

তৎক্ষণাৎ তার মনে হল, ছাদে গিয়ে একবার দেখে আসা উচিত ব্যাপারটা। সে একলা-একা যুবতী, হঠাৎ অন্ধকার ছাদে গেলে কী পরিণতি হতে পারে তা বেশি গভীরে না ভেবেই দ্রুত উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। তিনতলার ওপরে এই ছাদটা এতটাই অন্ধকার যে নিজেকেই মনে হল ভূত-ভূত। ছাদের ধারে গিয়ে প্যারাপিটের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা। হোটেলের পেছনদিকে অবশ্য অল্প আলো আছে। সেই নরম আলোয় চোখ রাখতে রাখতে হঠাৎই তার নজরে এল, নীচে পাতাবাহারের ঝোপের আড়ালে চিৎ হয়ে পড়ে আছে একটা মানুষ।

দৃশ্যটা দেখামাত্র ছ্যাঁৎ করে উঠল গার্গীর বুকের ভেতরটা! কে পড়ে আছে ওভাবে, সংজ্ঞাহীন, হাত-পা ছড়িয়ে! সিনেমুভির টিমেরই কেউ নয় তো!

নিষ্পন্দ শরীরটা দেখতে দেখতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল গার্গী। একটু আগেই দু-দুজন লোক হঠাৎ হুড়মুড় করে নীচে নেমে গেল, তার আগেই নীচে কিছু একটা ভারী জিনিস সপাটে পড়ে যাওয়ার শব্দ, তারপর হোটেলের লনে একটা সংজ্ঞাহীন মানুষ, সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ ভয়ঙ্কর। ছাদে আরও কেউ আছে কি নেই তা একবার তন্ন তন্ন করে দেখে নিয়ে সে আবার দ্রুত নামতে থাকল নীচে। তিনতলার কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ দেখল, বারান্দার দিক থেকে বেরিয়ে আসছে সার্বিক সমাজদার। সার্বিক প্রথমটায় তাকে দেখতে পায়নি, তারপর হঠাৎ তার দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠল প্রায় ভূত দেখার মতো। পরক্ষণেই অ্যাবাউট টার্ন করে আবার দ্রুত পায়ে মিলিয়ে গেল তিনতলার বারান্দার দিকে।

গার্গী তখন আরও বিভ্রান্ত। এই মধ্যরাতে হোটেলের রুমে প্রত্যেকেরই নিদ্রা যাওয়ার কথা। সায়ন তার ওপর রুষ্ট না হলে এতক্ষণ সেও তো তলিয়ে যেত গভীর ঘুমের ভেতর। পরিবর্তে একজোড়া নারী-পুরুষের সংলাপের শব্দ শুনে রুমের বাইরে বেরিয়ে যে ভীষণ অভিজ্ঞতা হচ্ছে একের পর এক, তা প্রায় অভাবনীয়। হঠাৎ এত রাতে সার্বিকই বা কেন ঘোরাঘুরি করছে এখানে! সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হল, সার্বিক যে তাকে হঠাৎ দেখে ফেলল এখানে, এটা সে নিশ্চয়ই কারও না কারও সঙ্গে আলোচনা করবে। গার্গী কীসের সন্ধানে এত রাতে ওপরে গিয়েছিল তাও কানাকানি হবে সিনেমুভির টিমে। তাতে আরও সতর্ক হয়ে যাবে কালপ্রিট।

কিন্তু হোটেলের পেছনদিকে কে ওভাবে নিষ্পন্দ পড়ে আছে, সেটাই তাকে সবচেয়ে ভাবাচ্ছে এখন। দোতলায় নেমে অতএব মনে পড়ল সায়নের কথা। সায়ন তার ওপর ক্ষুব্ধ হলেও তাকে এখন ঘুম ভাঙিয়ে সমস্ত ঘটনাটা বলা দরকার।

অবশ্য সায়নের ঘুম ভাঙানোর দরকার হল না। গার্গীকে ঘরে না দেখে সে কখন যেন বেরিয়ে এসেছে বাইরে। বারান্দায় ওদিকে-ওদিকে টহল দিয়ে গার্গীর খোঁজে কিছুক্ষণ ঘুরে এখন ক্রুদ্ধই দেখাচ্ছে তাকে। গার্গীকে দেখে বিরক্ত মুখে বলল, কী ব্যাপার বলো তো! মধ্যরাতে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ তোমরা!

গার্গী অবাক হয়ে বলল, তোমরা মানে!

—তুমি ওপর থেকে হন্তদন্ত হয়ে নেমে এলে। ওদিকে রানাজি আর একজন মহিলা একটু আগে ছুটতে ছুটতে নেমে গেলেন নীচের দিকে!

—ওঁরা নীচের দিকে গেলেন নাকি! চলো তো, একবার হোটেলের পেছন দিকটা দেখে

আসি।

সায়ন আরও বিরক্ত হয়ে বলল, ওদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তুমিও কি ওদের মতো মধ্যরাত্রে পাগলামি শুরু করে দিলে।

সায়নের বিরক্তি দেখে বিব্রতবোধ করছিল গার্গী। বেশ কাঁচুমাচু মুখে বলল, ছাদ থেকে কিছু একটা ভারী জিনিস নীচে পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। প্লিজ, চলো না, একটু দেখে আসি গিয়ে।

সায়ন ক্রমশ বিস্মিত হচ্ছিল মধ্যরাতের এতসব উটকো ঝামেলায়। তবু গার্গীর নাছোড় ভঙ্গি দেখে বাধ্য হয়ে নেমে এল নীচে। সম্ভবত রানাজি আর লাভলীন আগেই নেমে এসে ঘটনাটা জানিয়েছে রিসেপশনের দুই যুবককে। তারাও ছুটতে ছুটতে ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে ঘটনাস্থলে।

রাত তখন আড়াইটের মতো। হোটেলের লনের আলো কিছু জ্বালা কিছু নেভা থাকায় চারপাশে আলো-আঁধারি ভাব। থমথম করছে গোটা লখনউ শহর। গাড়ির হর্ন কিংবা টাঙার টুংটুং—কিছুই শোনা যাচ্ছে না আপাতত। এমন একটা ঘোর নিশুতির পরিবেশে গার্গী সায়নকে নিয়ে দ্রুত পায়ে হোটেলের পেছনে এসে দেখল, দুই রিসেপশনিস্ট যুবক. তাদের সঙ্গে রানাজি আর লাভলীন, ঝুঁকে পড়ে দেখছে সেই সংজ্ঞাহীন দেহটা। সায়নের সঙ্গে গার্গীও ঝুঁকে পড়ে থম হয়ে গেল প্রবল বিস্ময়ে, ইস্, এ তো লোচ্চা।

বছর ষোলোর কিশোরটি চিত হয়ে পড়ে আছে রক্তাক্ত অবস্থায়। অত ওপর থেকে নীচে পড়ায় হোটেলের নীচে প্লিন্থের ধার ঘেঁষে যে-সিমেন্টের চাতাল আছে, তাতেই মাথাটা ফেটে গেছে তার। কিন্তু সেই সঙ্গে চোখ দুটো বেরিয়ে আসছে ঠিকরে, জিবটাও কিছুটা বেরুনো।

রানাজিই প্রথমে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ডেড।

—ডেড! লাভলীন প্রায় আর্ত চিৎকার করে উঠলেন, কী করে হল!

লাভলীনের পরনে একটা শ্লিভলেস নাইটি, সম্ভবত রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগেও তিনি চোখের পাতায় মাস্কারা আর ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতে ভোলেন না। মধ্যরাতের পরেও তাই যথেষ্ট আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে তাঁকে। কিন্তু এই পোশাকে তিনি কীভাবে রানাজির সঙ্গে হোটেলে ওপেন-এয়ার লাউঞ্জে বসে গল্প করছিলেন, মানে বাকযুদ্ধ করছিলেন, তা গার্গীর মাথায় ঢুকল না।

ততক্ষণে ঘটনাস্থলে ছুটে এসেছেন বিবস্বান আর রুমেলা, আরও একটু পরে ক্যাপ্টেন। লোচ্চাকে ওভাবে ওপর থেকে আছাড় খেয়ে পড়ে থাকতে দেখে রুমেলা চিৎকার করে উঠলেন, নিশ্চয়ই পাইপ বেয়ে উঠে আমার ঘরে উঁকি দিতে গিয়েছিল।

গার্গী ওপরের দিকে তাকিয়ে খেয়াল করল, যে-জায়গাটায় লোচ্চা আছাড় খেয়ে পড়েছে, সেটা ঠিক রুমেলার জানলার নীচেই। রুমেলা রায়ের কথাটা সবারই মনে ধরল বেশ। রানাজি বললেন, ছেলেটা একদম পারভার্ট।

বিবস্বান বসুকেই সবচেয়ে বিচলিত দেখাল, খুবই শোকার্ত মুখে তিনি অপলক তাকিয়ে দেখছেন কিশোরটির বীভৎস মুখখানা। শুনছেন রুমেলা রায়ের উক্তিটিকে কেন্দ্র করে আরও অনেকে লোচ্চার এই বিকৃত রুচিকে ধিক্কার জানাচ্ছেন একের পর এক।

ক্যাপ্টেনের পরনে একটা মেরুন রঙের ঢাউস হাউসকোট, তার সামনের দুটি ঝুলপকেটে হাত রেখে বললেন, হি হ্যাজ বিন রাইট্‌লি পানিশ্‌ড্।

কথাটা ঠিক যেন পছন্দ হল না বি. বি.-র, মুখ তুলে ক্যাপ্টেনের দিকে কটমট করে তাকালেন কিছুক্ষণ।

ক্যাপ্টেনের কথাটা গার্গীর কানেও কেমন বেসুরো মনে হল। একটু আগেই হোটেলের ছাদে যে সাংঘাতিক নাটকটা ঘটে গেছে, তা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন, তারা কেউ না কেউ জানেন নিশ্চয়ই। লোচ্চার মৃত্যু যে সেই নাটকের অবদান, তা জেনেও কী সুন্দর অভিনয় করছেন এখন। গার্গী বুঝতে পারছে সবই, কিন্তু এই মুহূর্তে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করতে চাইছে না। একেবারে চুপচাপ থেকে, মানুষগুলির চালচলন, কথাবার্তা দেখে, শুনে আঁচ করতে চাইছে কী সেই অনিবার্য কার্যকারণ যার ফলে প্রাণ দিতে লোচ্চাকে।

কিশোরটির নিথর হয়ে থাকা শরীরটা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরখ করে একটু দূরে সরে এল গার্গী। তার সঙ্গে সায়নও। ততক্ষণে সারা হোটেলে খবরটা চাউর হয়ে যেতে রোমিও আর দ্বিত্বম এসে হাজির। ছুটে এসেছেন হোটেলের অন্য বোর্ডাররাও। লোচ্চার রক্তাক্ত শরীরটা দেখে একটা ভীষণ আতঙ্ক তখন ছড়িয়ে যাচ্ছে বোর্ডারদের মধ্যেও। তারাও তখন শুনে ফেলেছে, পনেরো-ষোলো বছরের কিশোরটি আসলে বিকৃত স্বভাবের, তার অন্যতম নেশা হল পাইপ বেয়ে হোক বা দরজার ফাঁকফোকর দিয়ে হোক, বাথরুমে বা বেডরুমের ভেতর মেয়েদের নিভৃত মুহূর্তগুলি তারিয়ে তারিয়ে দেখা। আজ রাতেও সেভাবেই কলকাতার এক নামী হিরোইনের ঘরের পেছনের পাইপ বেয়ে উঠতে গিয়ে তার এমন অস্বাভাবিক মৃত্যু। বিষয়টি এমনই স্পর্শকাতর যে, গোটা হোটেলের সমস্ত বোর্ডার একযোগে ধিক্কার জানাল লোচ্চাকে। কেউ কেউ বললেন, পারভার্টদের এরকম মৃত্যুই হয়ে থাকে। কেউ বললেন, ছিঃ ছিঃ, কী নোংরা স্বভাব।

এত সব মন্তব্য, কুটকাচালির মধ্যে যা দাঁড়াল, লোচ্চা নামের এই কিশোরটির বীভৎস মৃত্যু কারও কাছ থেকেই কোনও সহানুভূতির ছোঁয়া পেল না, বরং স্বস্তিই পেলেন অনেকে।

গার্গী ততক্ষণে তীক্ষ্ণচোখে সিনেমুভির চালচলন লক্ষ করতে করতে ভাবছিল, ঋষভ মুখার্জিকে বোধহয় কেউ খবরটা দেয়নি। সম্ভবত তিনি অসুস্থ বলেই। তাঁর না-আসাটা তত আশ্চর্যের নয়, কিন্তু সে যে একটু আগেই তিনতলায় সিঁড়ির সার্বিক সমাজদারকে দেখে এল, তাকে দেখেই সার্বিক চমকে উঠে পিছু হঠে গেল বারান্দার দিকে, সেই বা এত চেঁচামেচি হইচই শুনেও একবারও কেন ঘেঁষল না এদিকে!

সায়ন হতভম্ব হয়ে ভিড়ভাট্টার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, পুলিশকে খবর দিলে হত।

গার্গীর ভুরুতে তখনও কোঁচ, বলল, রিসেপশনিস্ট দুজনের একজনকে আমি একটু আগেই বলে দিয়েছি। এতক্ষণে টেলিফোন করে ওরা জানিয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কী আশ্চর্য দ্যাখো, পাইপ বেয়ে ওঠার সময় স্লিপ করে পড়ে গেছে এই গল্পটা কীরকম খেয়ে গেল পাবলিক!

সায়ন আশ্চর্য হয়, মানে!

—ছেলেটার জিব বেরিয়ে আছে দেখে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে সামথিং ফিশি।

—তাই!

একটু পরেই লখনউ কোতোয়ালির মোচঅলা পুলিশবাহিনীর সঙ্গে এসে পৌঁছলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল। হয়তো গভীর রাতে ঘুমোতে গিয়েছিলেন, এখন কাঁচা ঘুম ভেঙে ছুটে আসতে হওয়ায় বেশ বিরক্ত। ডেডবডির কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে বললেন, আরে, এটাও তো মার্ডার। গলার কাছে এটা কীসের দাগ! মনে হচ্ছে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে ছেলেটাকে। তারপর ওপর থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে কেউ।

গার্গীও ঠিক এরকমই ভাবছিল।



লোচ্চা নামের কিশোরটির নৃশংস হত্যাকাণ্ড বেশ তোলপাড় করল সিনেমুভি টিমের সদস্যদের। পাইপ বেয়ে উঠতে গিয়ে হাত বা পা ফস্কে পড়ে মারা গেলে যত না হা-হুতাশ হত, তার চেয়ে ঢের আলোড়ন হল তাকে খুন করা হয়েছে এই খবরে। অনেকেই গুম মেরে গেল এই অদ্ভুত ঘটনার পর। সারা সকাল ফিসফিস, কানাকানি হল নিজেদের ভেতর। লোচ্চার অপরাধ যে ঠিক কী, তা নিয়ে কিছু কূট গবেষণাও হল চাপা ফিসফিসানির আড়ালে। তবে রুমেলা রায়ের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখার জন্যই তাকে খুন হতে হল এই কারণটা অনেকের কাছে যথেষ্ট বলে মনে হল না, তেমনই কেউ কেউ এই সন্দেহও প্রকাশ করলেন, তা হলে লোচ্চা নিশ্চয়ই কোনও গোপন সংবাদ জেনে ফেলেছিল কোনওভাবে, তাই-ই—

গার্গী অবশ্য অনুমান করে ফেলেছে লোচ্চা-হত্যার প্রকৃত কারণ। লোচ্চা যে সেই এইটথ্ সেপ্টেম্বর রাতে বর্ণনার রুমের পেছন দিকের পাইপ বেয়ে দেখে ফেলেছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য, সে-তথ্য নিশ্চয়ই গার্গীর মতো আরও কাউকে জানিয়ে দিয়ে থাকবে দ্বিত্বম। বর্ণনার হত্যাকারীও হয়তো জেনে ফেলেছে কথাটা। তাতে সে যথেষ্ট টেনশনে ছিল এ ক'দিন। কিন্তু লোচ্চাকে হত্যা করার মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারত না, যদি না কাল সন্ধেয় গার্গী লোচ্চার খোঁজ করত। সজনীবাবু একঘর লোকের সামনে যেই মাত্র জানিয়ে দিলেন, গার্গী খোঁজ করছে লোচ্চার, তখনই সতর্ক হয়ে গেল হত্যাকারী। বিশেষ করে গার্গীকে নিয়ে সিনেমুভির টিমে এখন ঘোর সন্দেহ। অনেকেরই ধারণা, গার্গীর সঙ্গে পুলিশের বেশ চেনাজানা আছে। তার পক্ষে স্পাই হওয়াটাও কিছু অস্বাভাবিক নয়। সেই গার্গী যখন খোঁজ করছে লোচ্চার, তখন হত্যাকারী নিশ্চয়ই ধরা পড়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে লোচ্চাকে সরিয়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

বিবস্বান বসুর বিশেষ অনুরোধে হোটেল কর্তৃপক্ষ দোতলার ডাইনিং হলের কোথাও রাতে ঘুমোনোর বিশেষ অনুমতি দিয়েছিলেন লোচ্চাকে, যাতে তাঁর প্রয়োজনমতো তাকে এটা-ওটা ফাইফরমাস করতে পারেন। আর দোতলায় থাকাটাই কাল হল লোচ্চার।

কিন্তু গার্গী ভেতরে-ভেতরে স্তম্ভিত হচ্ছে হত্যাকারীর সাহস দেখে। এত বড় একটা হোটেল, এতগুলো রুমে এত বোর্ডার ঘুমোচ্ছে, নীচে ডিউটি করছে রিসেপশনিস্টরা, তার মধ্যেই ডাইনিং হল থেকে লোচ্চাকে ডেকে ছাদে নিয়ে গিয়ে—

আর বেচারি লোচ্চা তো জানত না, তাদের টিমেরই কেউ তাকে ছাদে নিয়ে গিয়ে এভাবে খুন করবে গলা টিপে, তারপর ছুড়ে ফেলে দেবে নীচে। কাল রাতে ছাদের সিঁড়িতে গার্গী যে-দুজনকে অন্ধকারের মধ্যে ছুটে নামতে দেখেছিল, তারাই হয়তো লোচ্চার হত্যাকারী। কিংবা

দুজনের মধ্যে যে কোনও এক জন! না কি রানাজি আর লাভলীনই ওপেন-এয়ার লাউঞ্জ থেকে ওভাবে লোচ্চাকে—

গার্গী এখন আর কিছু যেন ভাবতেই পারছিল না। কিন্তু ছাদের ওপর থেকেই বা কারা নেমে এল ছুটে।! তিনতলা থেকে ছাদে ওঠার সিঁড়িটা যদি অন্ধকার না হত, তা হলে গার্গী অবশ্যই চিনতে পারত তাদের। পারেনি বলে ভারি আফসোস হচ্ছে এখন। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে বিভ্রান্ত হয়ে যাওয়ার কারণেই ---

এ রকম অসংখ্য টালমাটাল ভাবনা, আলোচনা, ফিসফিসানির মধ্যে অবশেষে ভোর এসে পৌঁছল হোটেল চত্বরে। আবারও একটি খুনের ঘটনায় হোটেল-কর্তৃপক্ষ এ বার যে রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছেন, তা বোঝা যাচ্ছে তাদের হাবভাবে, আচার-আচরণে। আর দ্বিগুণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন দেবাদ্রি সান্যাল। গার্গী দেখছিল, আক্রোশে, হিংস্রতায় সারাক্ষণ দাঁত কিড়মিড় করছেন পুলিশ ইনস্পেক্টরটি। গার্গীকে একান্তে পেয়ে একবার বললেন, এবার একটা মোক্ষম ক্লু পেয়ে গেছি, মিসেস চৌধুরি। কালপ্রিটকে আর ছাড়াছাড়ি নেই, হেস্তনেস্ত কিছু একটা করে ফেলব নিশ্চিত। আগে পোস্টমর্টেমটা হয়ে যাক।

ওদিকে সকাল হয়ে আসতেই ঋষভ মুখার্জিকে ঘুম থেকে ডেকে জানানো হল কাল রাতের ভয়ঙ্কর ঘটনাটা। শুনে ঋষভ বাইরে বেরিয়ে ঘুম-ভাঙা চোখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তারপর সহসা ফেটে পড়লেন রাগে, কী করছে কি পুলিশ-অফিসারটা, গভর্নমেন্টের পয়সায় লখনউ এসে দেদার আরামে কাটাচ্ছে, আর এ দিকে জলজ্যান্ত একটা ছেলে খুন হয়ে গেল! অল বোগাস, রাবিশ, ওয়ার্থলেস।

বলতে বলতে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়লেন যে, দেবাদ্রিকে সামনে পেলে হয়তো ঝাঁপিয়েই পড়তেন বাঘের মতো।

কিছুক্ষণ পর অবশ্য রাগ থামিয়ে বললেন, বাট হু ইজ দ্য কালপ্রিট! সে কেন আমার কাজে এত বাধার সৃষ্টি করছে। আর মাত্র একটা দিন হলেই তো আমার কাজ শেষ হয়ে যায়। সেটাও সে করতে দেবে না! কী ভেবেছে কি সে? তার উদ্দেশ্যটাই বা কী?

ঋষভকে ঘিরে তখন গোটা সিনেমুভি টিম। খুবই হতাশভাবে তিনি তখন এর-ওর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে বলছেন, কী চাও তোমরা, বলো? আজই এই মুহূর্তে প্যাক আপ করে কলকাতা ফিরে যাই!

একটু দূরে দাঁড়িয়ে গার্গী খুব মন দিয়ে শুনছিল পরিচালকের কথাগুলো। তাঁর উত্তেজিত-কণ্ঠস্বর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল তার স্নায়ু। সায়ন ততক্ষণে কানপুর যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে, এখনই বোধহয় বেরুবে বাথরুম থেকে। রুমের ভেতর গিয়ে খুবই তন্ময় হয়ে ভাবছিল, তার এখন কী করা উচিত! মগজের ভেতর ঘুরছে একলক্ষ ভাবনা, কোনটার পর কোনটা করবে তাও সাজিয়ে নিচ্ছিল তার মাথার ভেতরকার ছোট্ট কমপিউটারটিতে, অথচ সায়নের সাবধানবাণীটিও ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার ভেতর।

একটু পরেই সায়ন প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে, একেবারে স্যুটেড-বুটেড, কিন্তু ভারি গম্ভীর। নিজেই ফোন করে ডাইনিং থেকে আনিয়ে নিয়েছে কফি-টোস্ট-ওমলেট। নিঃশব্দে হু-হু করে প্লেট সাফ করে বলল, এই সব ট্র্যাশ লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করাটা যে কী রিস্কি তা নিশ্চয় বুঝতে পারলে! নাউ লিভ ইট। কাল সকালের ট্রেনেই কলকাতা ফিরে যাব। টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে ফেলেছি।

সায়নের পাথর-চেবানো কথাগুলো বেশ গম্ভীর হয়ে শুনল গার্গী। এতকালের মধ্যে এতখানি রাগতে কখনও দেখেনি তাকে। রাগার সঙ্গত কারণ একেবারে নেই তা নয়। পরপর দুটো খুন চোখের সামনেই ঘটতে দেখল তারা। নিজেকে বাঁচাতে হত্যাকারী এরপর হয়তো আরও কাউকে কাউকে সরিয়ে দিতে পারে পৃথিবী থেকে। কাল রাতে লাভলীন তালুকদার যেভাবে উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিল রানাজির সঙ্গে, তার জেরে আরও খুনোখুনি শুরু হয়ে যায় কি না তারই বা ঠিক কি? গার্গী নিজেও তো টার্গেট হতে পারে।

হোটেল থেকে সায়ন বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে গার্গী একবার ভাবল বলবে, 'চলো, তোমার সঙ্গে আমিও তা হলে ঘুরে আসি কানপুর।' কিন্তু বলি-বলি করেও বলল না। সায়ন নিজে থেকে বললে গার্গী কী করত কে জানে।

সায়নের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও গার্গী কিন্তু তখন ছটফট করছে সিনেমুভির পরবর্তী কার্যকলাপ কোন গতিপথে এগোয়, কী-ই বা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সবাই, সে দিকে তার তীক্ষ্ণ নজর রাখতে। সায়ন বেরিয়ে যেতেই সে হঠাৎ ঘরের টেলিফোনটা নিয়ে বসল। পর পর দুটো টেলিফোন করল, দুটোই কলকাতায়। একটা ক্যামাক স্ট্রিটের এক ব্যাঙ্কে, সেখানে উত্তর পেল, একঘণ্টা পরে ফোন করলে পাওয়া যাবে খবরটা। দ্বিতীয় ফোনটা ডালহৌসিপাড়ার একটা চশমার দোকানে। দিনক্ষণ ও কাস্টমারের নাম বলে জানতে চাইল কিছু তথ্য। তাতেও উত্তর পেল, দু'ঘণ্টা পরে ফোন করতে। দু-জায়গাতেই গার্গী অবশ্য জানাল, সে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ থেকে কথা বলছে। ব্যাপারটা সিক্রেট।

রিসিভার রাখতে না রাখতে হঠাৎ দরজায় নক শুনে গার্গী দরজা খুলল দ্রুত। সামনেই রোমিও দত্তগুপ্ত দাঁড়িয়ে। খুবই বিষণ্ণ দেখাচ্ছে রোমিওকে, চোখমুখ শুকনো, ম্লান হেসে বলল, ঋষভদা আপনাকে একবার ডাকছেন।

গার্গী যেন অপেক্ষাই করছিল পরিচালকের ডাকের। তৎক্ষণাৎ ঘর লক করে বেরিয়ে পড়ল রোমিওর পিছুপিছু। বারান্দা পেরুতে পেরুতে জিজ্ঞাসা করল, কী সিদ্ধান্ত হল আপনাদের? শুটিং বন্ধ?

রোমিও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আর শুটিং! এখনই সবাই কলকাতা ফিরতে পারলে বাঁচি।

—পরিচালক কী বলছেন?

—পরিচালক আর কী বলবেন! গোটা টিমই এখন আতঙ্কে, বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছে। কেউ আর কাজ করতে চাইছে না।

ঋষভ মুখার্জির ঘরে ঢুকে গার্গী দেখল, অনেকেই তাঁর ঘরে ভিড় করে আছে সন্ত্রস্ত-সন্ত্রস্ত চেহারা করে। ঋষভ সোফায় আড় হয়ে শুয়ে, ভারি চিন্তিত, শুধু ধোঁয়া ওড়াচ্ছেন সিগারেট থেকে। সেন্টার-টেবিলে ইতিমধ্যেই চারটে নেভামুণ্ড। গার্গীকে দেখেই বললেন, তুমি কী বলো? তুমি যা বলবে তাই হবে।

—আমি! গার্গী ভারী আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল ঋষভ মুখার্জির দিকে। কী জানতে চাইছেন পরিচালক!

ঋষভ মুখার্জি সিগারেট একটা লম্বা টান দিয়ে গার্গীর চোখে চোখ রাখলেন, তুমি তো এখন সিনেমুভিরই একজন মেম্বার। বলা যায় ওয়ান অব দ্য ইম্পর্ট্যান্ট মেম্বারস। মেইন রোলে অভিনয় করছ। শুধু তাই নয়, যে শেষ এপিসোডটি শুটিং করতে বাকি আছে, সেটিতে তোমারই একক অভিনয়। তার মধ্যে অবশ্য আগের কিছু কিছু দৃশ্য এডিটিঙের সময় রিপিট হবে, কিন্তু

শুটিং হবে একমাত্র তোমাকেই নিয়ে। এখন তুমি কী সাজেস্ট করো? সিরিয়ালটা যে-পর্যন্ত তোলা হয়েছে, সেই পর্যন্ত রেখেই ফিরে চলে যাব কলকাতা, না কি আজ শুটিং হবে?

গার্গী খুব মাথা ঠাণ্ডা করে ব্যাপারটা ভাবছিল। ভাবনাটা অবশ্য অনেকক্ষণ থেকেই নাড়াচাড়া করে চলেছে সে। খুবই জরুরি ও অনিবার্য ভাবনা। বেশ জোর দিয়েই বলল, আমার মনে হয়, কাজটা আজ শেষ করে ফেলা উচিত। যখন মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার।

ঘরের ভেতর এতক্ষণ ঘিরে ছিল একটা বিপুল নৈশঃব্দ্য, এখন গার্গীর কথায় কারও অভিব্যক্তিতে বিস্ময়, কারও স্বস্তি। ঋষভ মুখার্জি কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন তাঁর সিরিয়ালের এই নবতম অভিনেত্রীটির দিকে। বোধহয় টিমের অন্য সবাই যখন মুষড়ে পড়েছে, সে সময় সদ্য জয়েন করা নতুন মেয়েটি এ রকম আশাব্যঞ্জক কথাবার্তা বলছে দেখে খুবই আশ্চর্য হলেন পরিচালক। রানাজির দিকে তাকিয়ে বললেন, এই হচ্ছে শিল্পের প্রতি ভালবাসা। তোমরা কেউই যখন সাহস অর্জন করতে পারছ না—

রানাজি ঘাড় ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, আসলে সবই হল ভাগ্য। এবার প্রথম থেকেই দেখছি, লাক একদম ফেবার করছে না। সে জন্যেই বলছিলাম—

—ভাগ্য! ঋষভ হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠলেন, তুমি খুব ভাগ্যে বিশ্বাস করো বুঝি! কিন্তু আমি ওই সব ভাগ্যটাগ্যে বিশ্বাস করি না। পাণিণির ভাগ্যরেখা ছিল না বলে কোনও এক অ্যাস্ট্রলজার নাকি মন্তব্য করেছিলেন, তাঁর পক্ষে ব্যাকরণে বুৎপত্তি লাভ সম্ভব নয়। তাতে পাণিণি একটা ছুরি দিয়ে করতলে একটা লম্বা আঁচড় কেটে হাত রক্তারক্তি করে বলেছিলেন, 'আমার নিজের ভাগ্য আমি নিজেই তৈরি করি।' এই দ্যাখো, পাণিণির মতো আমার করতলেও কোনও ভাগ্যরেখা নেই। তাতে আমারও কোনও খেদ নেই। পুরুষ তার নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তোলে—

বলতে বলতে হা হা করে হেসে দুই করতল সবার চোখের সামনে মেলে ধরলেন তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করতে। গার্গীও ঋষভ মুখার্জির করতল দেখে কম আশ্চর্য হল না। আরও অবাক হচ্ছিল ষাটোর্ধ্ব মানুষটির অভাবনীয় মনোবল দেখে। এত এত অঘটনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সিরিয়ালের শুটিং শেষ করার কথা ভেবে চলেছেন এখনও। গার্গী তাতে সমর্থন জানিয়েছেন বলে ভারি সাহস পেয়েছেন এখন।

—তা হলে রানাজি, ওই বদমাশ পুলিশ অফিসারটা আবার হামলা করার আগেই শুটিংটা শেষ করে ফেলি আমরা। বেলা বারোটা নাগাদ চকবাজারের কোঠিতে সেট তৈরি করে ফেলো। অ্যান্ড দিস ইজ মাই লাস্ট। আর ছবি তৈরির কাজে যাচ্ছি না। এনাফ ইজ এনাফ। যা অভিজ্ঞতা হল এবার—

পরিচালকের ঘরের মিটিং যখন শেষ হল, তখন বেলা আটটার মতো। সিনেমুভির সবাই কিন্তু বেশ আতঙ্কে আছেন কখন পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল এসে নিয়ে যাবেন তাঁদের। রাতের ঘটনাটা সবার কাছেই এখন একটা দুস্বপ্নের মতো। বিবস্বান বসু সেই যে শেষ রাতের দিকে তাঁর রুমে গিয়ে অন্তরিণ হয়েছেন, আর দেখা যায়নি এখনও। এখন যা টিমের অবস্থা তাতে সবাই সবাইকে সন্দেহ করছে। গার্গী নিজেও কম টেনশনে নেই।

গার্গীর সামনে এখন দু'রকম টেনশন। প্রথমত, সায়নের কথার অবাধ্য হতে হচ্ছে তাকে। বাধ্য হয়েই। সায়ন ফিরে এলে যতটা সম্ভব বুঝিয়ে বলতে হবে গোটা ঘটনাটা। দ্বিতীয় টেনশন অবশ্য আরও মারাত্মক। তৃতীয় খুনটি হওয়ার পর এখন তার কাছে সমস্ত রহস্যের প্রায় তিন-

চতুর্থাংশ উন্মোচিত। তবু আরও কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। তার আগে কলকাতা থেকে আর একবার সেই খবর দুটো নিতে হবে টেলিফোন করে। দুটো খবরই এই তিনটি খুনের রহস্যভেদে ভাইটাল পয়েন্ট।

কিন্তু তারও আগে তাকে একবার লখনউয়ের কোনও প্যাথলজিস্টের শরণাপন্ন হতে হবে, সেটা এখনই, শুটিং আরম্ভ হওয়ার আগেই।

তার রুমে ঢুকতেই হঠাৎ সজনী দত্ত যেন ফুঁড়ে বেরুলেন পাতাল থেকে, ম্যাডাম, সামন্তবাবু আপনার কাছে একবার আসবেন, আপনি সময়টা যদি বলে দেন—

—ও, হ্যাঁ, গার্গীর মনে পড়ে যায় তাকে কিছুক্ষণ নাচের তালিম নিতে হবে শাম্ব সামন্তর কাছে। মনে মনে হাসিও পেয়ে গেল তার অভিনয়ের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা হচ্ছে এই ভেবে।

—ঠিক আছে, ঘণ্টাঘানেক পর আসতে বলুন।

সজনী দত্ত যেমন দ্রুত পায়ে এসেছিলেন, তেমনই হু-হু করে মিলিয়ে যেতেই গার্গী এ বার তার ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল পলিথিনের প্যাকেটে মোড়া ঘুঙুরদুটো। হোটেল থেকে বেরিয়ে ওদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা অটোয় উঠে পড়ল হঠাৎ। মৃদুকণ্ঠে অটোঅলাকে বলল, চলো তো, গ্রিনভিউ নার্সিংহোম।

নার্সিংহোমটা ঠিকমতো চেনে না অটোঅলা, না চেনাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, অতএব তাকে নির্দেশ দিয়ে এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে গার্গী এসে নামল সেই সবুজে ঘেরা নার্সিংহোমটিতে যেখানে রক্তাক্ত অবস্থায় দু'দিন আগে ভর্তি করা হয়েছিল বর্ণনাকে। মাত্র কয়েকদিন আগের কথা। এর মধ্যে বর্ণনা-প্রসঙ্গ একদম ধুয়েমুছে গেছে সিনেমুভির টিম থেকে।

পরক্ষণেই গার্গী আবার ভাবল, একেবারেই কি মুছে গেছে! বর্ণনার ভূত তো তাড়া করে বেড়াচ্ছে সিনেমুভিকে। দেবাদ্রি সান্যালের হাতের মুঠোর মধ্যে রাখা সেই অশ্চর্য ভূতটা, সারাক্ষণ জুলজুল করে তাকাচ্ছে সিরিয়ালের সঙ্গে জড়িত সমস্ত কুশীলবের দিকে। এমনকী গার্গীও যে আজ সকালে উঠে পলিথিনের প্যাকেটে মুড়ে বর্ণনার ব্যবহৃত ঘুঙুর-জোড়া নিয়ে এসেছে এই নার্সিংহোমটায়, তাও তো সেই বর্ণনার ভূতের কারণেই।

নার্সিংহোমের ভেতরে ঢুকে সোজা চলে গেলে প্যাথোলজিকাল ডিপার্টমেন্ট, খুঁজে পেতে সেখানকার হেড প্যাথোলজিস্টকে বার করে গার্গী দেখাল রক্ত-লাগা ঘুঙুরটা, বলল দেখুন তো, এই রক্তের জমাট-বাঁধা দাগটা পরীক্ষা করে কিছু বলতে পারেন কি না।

প্যাথোলজিস্ট ভদ্রলোক সাউথ ইন্ডিয়ান, খুবই অবাক হলেন এক বাঙালি যুবতীর এহেন অদ্ভুত অনুরোধে। ঘুঙুরটা উল্টোপাল্টে বললেন, এ তো বেশ কয়েকদিন আগের রক্ত।

গার্গী সেদিনকার ঘটনাটা মনে করিয়ে দিল তাঁকে, হিসেবটিসেব করে বলল, হ্যাঁ, রক্তটা লেগেছে ইংরেজি মতে এইটথ্ সেপ্টেম্বর ভোরের দিকে, রাত তখন তিনটে-টিনটে হবে।

মাঝবয়সী ভদ্রলোক তাঁর পরনের সাদা অ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে বললেন, তাও তো বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল! এতদিন পর কি আর—

—তবু দেখুন না চেষ্টা করে। বুঝতেই পারছেন, আমি বর্ণনার বান্ধবী। তার রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে আমরা সবাই ক্ষুব্ধ। রিপোর্টটা পুলিশের কাজে লাগতে পারে ভেবেই এই অনুরোধ। একটু চেষ্টা করুন না প্লিজ। আমি ঘণ্টাখানেক পরে নিয়ে যেতে চাই।

—ঘণ্টাখানেক! মাঝবয়সী প্যাথোলজিস্ট আরও অবাক। তারপর কী ভেবে বললেন, লেট মি ট্রাই—

—কিন্তু ব্যাপারটা খুব কনফিডেন্সিয়াল।

ভদ্রলোক বুঝলেন, বললেন, ও. কে।

—আমি একটা নাগাদ আবার আসব। তার মধ্যেই কিন্তু চাই। টাকা যা লাগবে—

ডক্টর রেড্ডি নামের প্যাথোলজিস্টটি খুবই কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন গার্গীর দিকে। রক্ত-লাগা ঘুঙুরটি নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন, আবার ফিরেও এলেন মিনিট দশেকের মধ্যে। বললেন, ও. কে, ইট উইল বি রেডি বাই ওয়ান পি.এম।

—থ্যাঙ্কু ডক্টর, বলে গার্গী কিছুটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে বেরিয়ে এল নার্সিংহোম থেকে। তার হাতে তখন অন্য ঘুঙুরটি। আপাতত এই ঘুঙুরটির সঙ্গে ডিজাইন মিলিয়ে তাকে এক সেট নতুন ঘুঙুর কিনতে হবে লখনউয়ের কোনও দোকান থেকে। তার জীবনের শেষ অভিনয়টি করার জন্যেই।

আবার একটা অটো ধরে লখনউ শহরের পথে ঘোরাঘুরি করতে করতে সে তখন চোখ রাখছে দোকানগুলোর দিকে। জিজ্ঞাসা করতে করতে লখনউয়ের অভিজাত পল্লী পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত একটা ঘিঞ্জি-এলাকার দিকে এগোচ্ছে, সে সময় হঠাৎই একটা বটলগ্রিন রঙের মারুতি গাড়ি যেন হুমড়ি খেয়ে একেবারে গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল তাদের অটোটার। আর একটু হলেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেত নিশ্চিত। অটোঅলা বছর বাইশ-তেইশের একটি তরুণ, ছোট করে চুল ছাঁটা, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, খুবই দক্ষতায় পাশ কাটিয়ে নিজের অটোটাকে বাঁচাতে পেরে বলল, শালা, ডাকু কাঁহিকা—

বলে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে পেছন ফিরে একবার তাকাল গার্গীর দিকে। বোধহয় দেখতে চাইল তার অটোর আরোহীর মুখখানা। অতঃপর বিড়বিড় করে কিছু বকল নিজের মনে।

গার্গীও কিছুটা অবাক হচ্ছিল ড্রাইভারের আচরণে। ছেলেটি যে ড্রাইভিঙে খুবই এক্সপার্ট, তা তার চালানোর ধরন দেখেই গার্গী বুঝে ফেলেছে, কিন্তু যে অতিদ্রুততায় অটোটাকে বাঁচাল অ্যাক্সিডেন্টের হাত থেকে, তাতে বেশ সম্ভ্রমই হল তার ওপর। দুর্ঘটনাটি ঘটলে অটোঅলার সঙ্গে গার্গীর ভবিতব্যও এতক্ষণে কোন খাতে বইত কে জানে!

অটোঅলা ততক্ষণে তার সামনের আয়নার ভেতর দিয়ে একবার পেছনের রাস্তাটার দিকে তাকাচ্ছে, একবার গার্গীর দিকে। আয়নার ভেতর দিয়ে গার্গীর সঙ্গে দু-তিনবার চোখাচোখিও হল অটোঅলার। তার চোখে কী দেখল কে জানে, গার্গীও হঠাৎ পেছন ফিরে দেখল, সেই বটল-গ্রিনরঙের মারুতিই আবার তাদের পেছনে ছুটে আসছে হু-হু করে।

অটোঅলা তার গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল হঠাৎ। গার্গীরও মনে হল, মারুতিতে চড়ে কেউ একজন ফলো করছে তাদের অটোটা। একটু আগেই অটোটায় ধাক্কা মেরে একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটানোর তালে ছিল, না পেরে আবারও তার গাড়ি ঘুরিয়ে ধাওয়া করে আসছে পেছনে।

গার্গী হঠাৎ বেশ ঘাবড়ে গেল, কেন না ততক্ষণে অটোঅলা মারুতিটার খপ্পরে না পড়ার বাসনায় প্রবল গতিবেগে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অটোটা। প্রায় উড়ে চলেছে যেন। মারুতিটাও নাছোড়, তারও যেন জিদ চেপে গেছে যে-কোনওভাবেই হোক অটোটার ঘাড়ে গিয়ে পড়বেই পড়বে। গার্গী মাঝেমধ্যে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে চাইছে মারুতির ভেতর লোকটাকে! কিন্তু দেখতে পারছে না অটোর পেছনটা ঢাকা থাকায়, বরং দেখতে গিয়ে যেই একটু মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিয়েছে বাইরের দিকে অমনি অটোঅলা এত দ্রুত বাঁক নিল যে, আর একটু হলেই গার্গী হয়তো পড়েই যেত। সময়মতো টাল সামলেছিল ভাগ্যিস।

কিন্তু সামলেও তো রেহাই নেই। মারুতিটা তখন গাঁক গাঁক করে আরও হিংস্রভাবে ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। অটোঅলা অবশ্য ঝড়ের মতো চালিয়ে যাচ্ছে, বাঁচতে চাইছে এই আচমকা হানা থেকে, স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে একবার বললও বিড়বিড় করে, কোই দুশমন হোগা!

গার্গীর এতক্ষণে সন্দেহ হল, হয়তো তারই কোনও দুশমন হঠাৎ তাকে এই ভিন পটভূমিকায় একলা পেয়ে চেষ্টা করছে গোয়েন্দাগিরি করার শখ মিটিয়ে দিতে। এতদিন শুটিঙে ব্যস্ত থাকায় তার গতিবিধি ছিল নিয়ন্ত্রিত, একটা বাঁধা ধরার মধ্যে। হঠাৎ আজ বিশেষ দরকারে যে-ই বেরিয়েছে বাইরে, অমনি তাকে নিকেশ করার প্ল্যান এঁটেছে তার দুশমন।

অটোর ভেতর বসে হু-হু করে লখনউয়ের ঘিঞ্জি এলাকা থেকে পশ-এলাকা, সেখানে থেকে আধা-পশ এলাকা, তারপর আবার ঘিঞ্জি, এভাবে বহুক্ষণ পাল্লাপাল্লির পরে হঠাৎই তরুণ অটোচালক তার দক্ষতার চূড়ান্ত নজির দেখাল একটা কাণ্ড করে। মারুতিটা যেই মাত্র তার ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলেছে, সে সময় একটা বাঁকের মুখে এসে সহসা কব্জির মোচড়ে বাঁয়ে একটা গলির মধ্যে তার অটোটা ঢুকিয়ে দিতেই মারুতিটা গিয়ে সোজা ধাক্কা মারল একটা উঁচু পাঁচিলের গায়ে।

বেশ জোরেই ধাক্কা মেরেছে, ফলে পুরনো পাঁচিল খানিকটা ভেঙেও পড়ল হুড়মুড় করে, আর মারুতির ভেতর একটা অস্ফুট গোঙানির শব্দ।

গার্গী অটো থেকে নামার আগেই অটোঅলা ছুটে গিয়ে দেখতে চাইল, মারুতির আরোহীরা কতখানি জখম হয়েছে। কিন্তু ভেতরে কোনও আরোহীই নেই, শুধু যুবক ড্রাইভারের মাথা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে গলগল করে। তাকে গাড়ির ভেতর থেকে টেনে বার করতে করতে অটোঅলা জিজ্ঞাসা করল গার্গীকে, আপকি সাথ কোই দুশমনি থা?

রক্তাক্ত, সংজ্ঞাহীন অবস্থায় যাকে দেখল গার্গী, তাকে কিন্তু সন্দেহভাজনদের তালিকায় রাখেইনি সে। কিন্তু তা হলে কেনই বা যুবকটি তার ওপর এই অ্যাটেম্পট নিতে চাইছিল তা একেবারেই বুঝে উঠতে পারল না গার্গী।

তবে কি এত সব কলকাঠি নাড়ার পেছনে এরও কোনও ভূমিকা আছে! কী আশ্চর্য!



বট্‌ল্ গ্রিন রঙের একটা মারুতি লখনউয়ের ঘিঞ্জি এলাকায় ঠিক বাঁকের মুখে ধাক্কা মেরেছে পুরনো পাঁচিলের গায়ে, তার ফলে পাঁচিলটা যেমন ভেঙেছে, তেমনই প্রচণ্ডভাবে আহত হয়েছে সাতাশ-আঠাশ বছরের একটি যুবক, খবরটা চারপাশে ছড়িয়ে পড়তেই হুহু-করে জুটে গেল এক দেড়শো লোক। তারা যুবকটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে সঙ্গে সঙ্গে একটা গাড়ি জোগাড় করে

নিয়ে ছুটল হাসপাতালের দিকে।

গার্গী তখনও থ হয়ে আছে একগলা বিস্ময়ে। সে হোটেল ইন থেকে বেরিয়ে দ্রুত বড় রাস্তায় পৌঁছে একটা অটো ধরেছিল, গ্রিনভিউ নার্সিং হোমে তার কাজ মিটিয়ে চলেছিল একজোড়া নতুন ঘুঙুর কিনতে, এতক্ষণ পর্যন্ত সে একবারও অনুমান করতে পারেনি, তার গতিবিধি অনুসরণ করছে কেউ। আসলে সিনেমুভির টিমের সবাই তখন নিজেদের ঝামেলা নিয়ে এতই ব্যস্ত যে, গার্গী বুঝেছিল এই মুহূর্তে তার এই বেরিয়ে পড়াটা খেয়াল করবে না কেউ। কিন্তু সার্বিক সমাজদারের কথাটা তার মাথায় ছিল না।

কাল রাতে লোচ্চার মৃতদেহ আবিষ্কার হওয়ার আগে সেই যে একবার সে সার্বিক সমাজদারকে দেখেছিল হোটেলের তিনতলার বারান্দায়, তারপর থেকে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, কিন্তু তাকে আর ধারে কাছে দেখা যায়নি। তার সম্পর্কে গার্গীর মনে সামান্যতম সন্দেহও ছিল না এতক্ষণ। তার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে, সার্বিক সমাজদার কোনও ভাবে জড়িত লোচ্চার খুনের ব্যাপারে।

কিন্তু সে যদি জড়িত না-ই থাকবে, তাহলে সেই রাত থেকে এতক্ষণ লুকিয়ে থেকে হঠাৎ এখন কেনই বা গার্গীকে অনুসরণ করে এভাবে দুর্ঘটনায় ফেলতে চেয়েছিল তাকে। তবে কি এটাই সত্যি যে, লোচ্চাকে সে-ই খুন করেছে ছাদে নিয়ে গিয়ে, তারপর তাকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে মিলিয়ে গিয়েছিল তিনতলার বারান্দায়! তখন হয়তো অন্ধকারে সে খেয়াল করতে পারেনি গার্গীকে ধাক্কা মেরেছিল নামার সময়, খেয়াল করা সম্ভবও নয় যেহেতু খুনের মতো সাংঘাতিক একটা অপরাধ করার পর তখন সিঁড়ি বেয়ে নেমে পালিয়ে যাওয়াটাই ছিল তার লক্ষ্য। পরে তিনতলার বারান্দা থেকে বেরিয়ে সম্ভবত নীচে নামতে যাচ্ছিল, সে সময় হঠাৎ গার্গীকে সিঁড়িতে দেখে ভূত-দেখার মতোই চমকে ওঠে, তারপর ভয় পেয়ে আত্মগোপন করেছিল এতক্ষণ, বোধহয় তখন তার ধারণা হয়েছিল গার্গী তাকে সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখেছে, তাহলে গার্গী নিশ্চয়ই তাকে লোচ্চার-হত্যাকারী বলে শনাক্ত করতে পারে পুলিশের সামনে। আর দেবাদ্রি সান্যাল তো ইতিমধ্যেই সার্বিকই অনুমান করেছেন ডঃ সুস্নাত তালুকদারের সম্ভাব্য হত্যাকারী হিসেবে।

এতসব কথা সার্বিক সমাজদার নিশ্চয়ই ভেবে ফেলেছিল, তাকে অতঃপর এও সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল, গার্গীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে না পারা পর্যন্ত তার রক্ষা নেই। আর গাড়িতে গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়ে মেরে ফেলাই হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ উপায়।

সার্বিক সমাজদারকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেই তখন অটোঅলাকে ঘিরে জিজ্ঞাসা করছে কী করে দুর্ঘটনাটা ঘটল! গার্গীর দিকেও তাকাচ্ছে অনেকে, কেননা অটোঅলা গলা নামিয়ে নিশ্চয়ই গার্গী সম্পর্কেই কিছু বলছে তাদের। হয়তো বলছে, যুবকটির কোনও দুশমনি ছিল গার্গীর সঙ্গে।

গার্গী সে-প্রসঙ্গ চাপা দিতেই তক্ষুনি অটোঅলাকে নিয়ে বেরিয়ে এল ভিড়ের বাইরে। অটোয় চেপে কিছুক্ষণ এ-বাজারে ও-বাজারে ঘোরাঘুরি করে একজোড়া ঘুঙুর কিনে ফেলল আগের ঘুঙুরটার সঙ্গে ডিজাইন মিলিয়ে। হোটেলে ফিরে এসে দেখল, সবাই তার খোঁজে ব্যতিব্যস্ত। তার হঠাৎই উধাও হয়ে যাওয়াটা বেশ তোলপাড় ফেলে দিয়েছে সিনেমুভির ভেতর। রাতে লোচ্চার নৃশংসভাবে খুন হওয়া, তারপর গার্গীর অন্তর্ধানে তখন সবার ভিতরেই প্রবল ত্রস্তভাব। সে অটো থেকে নামতেই তাকে ঘিরে ধরল রোমিও, দ্বিতম, সজনীবাবু। শুনল, তার অন্তর্ধানে

ব্যস্ত হয়ে বার বার খোঁজখবর করছেন পরিচালক ঋষভ মুখার্জিও।

গার্গী সবাইকে আশ্বস্ত করে বলল, না, না, কোনও বিপদ ঘটেনি আমার। লখনউ থেকে ফেরার আগে কিছু টুকটাক মার্কেটিং বাকি ছিল, তাইই—

সজনী দত্ত স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললেন, পরিচালক-স্যার তো মাথা চাপড়ে বলছিলেন, গার্গীই তো আমার সিরিয়ালের শেষ ঘুঁটি। তাকেও বোধহয় সেই অদৃশ্য শক্তি খেয়ে নিয়ে কিস্তি মাত করতে চায়।

পরিচালকের কথা অনুসরণ করে গার্গী তখন ভাবতে চাইছিল, অদৃশ্য শক্তিটি সত্যিই কে। উনি কি অদৃশ্য খুনির কথাই বলতে চাইছেন!

—ম্যাডাম, সামন্তবাবু কিন্তু অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন আপনার জন্য। বেলা এগারোটা বাজতে চলল যে—

গার্গী সচকিত হয়ে বলল, শুটিংটা একঘণ্টা পিছিয়ে দিন, সজনীবাবু, অন্তত দেড়টা দুটোর আগে যেতে পারব না।

বেশ পাকা অভিনেত্রীর মতোই গার্গী বলল কথাটা। শুনে সজনী দত্ত শশব্যস্ত হয়ে বললেন, তা তো হবেই, ম্যাডাম। এই সবে আপনি এত কষ্ট করে ফিরলেন হোটেলে। একটু বিশ্রাম নেবেন। সে আমি পরিচালক-স্যারকে এখনই গিয়ে বলে দিচ্ছি।

বলতে বলতে একটু থেমে ইতস্তত করে আবার বললেন, তাহলে ম্যাডাম, সামন্তবাবুকে—

—আধঘণ্টা পর, গার্গীকে ব্যস্ত অভিনেত্রীর মতোই গম্ভীর দেখাল। আজ সে অবশ্যই ভি.আই.পি।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, একটু বিশ্রাম নিয়ে নিন। তারপর আপনার লাঞ্চ কি ঘরে পাঠিয়ে দেব?

গার্গী একটু অবাক হল। সিরিয়ালে অভিনয় করলেও সে যথারীতি নিজেদের অ্যাকাউন্টেই ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সেরেছে এ ক'দিন। সিনেমুভির খরচের তোয়াক্কাই করেনি। সে তো আর প্রফেশনাল হিরোইন নয়। এখনও ট্যুরিস্ট বলেই ভাবছে নিজেকে। তার অভিনয় করাটা নিতান্তই অ্যাকিসিডেন্ট।

হ্যাঁ, অ্যাকসিডেন্টই। একটু আগেই একটি দুর্ঘটনা আমন্ত্রণ করে আনছিল. বেঁচে গেছে একটুর জন্য, সামনে আরও কী ভবিতব্য অপেক্ষা করে আছে কে জানে!

নিজের রুমে ফিরে এসেই আবার দুটো ফোন করল পর পর। প্রথমে ক্যামাক স্ট্রিটের সেই ব্যাঙ্কটিতে, আর তার প্রত্যাশামতোই পেয়ে গেল খবরগুলো। দ্বিতীয় ফোনটি ডালহৌসি পাড়ার চশমার দোকানে। সে-খবরও তার অনুমানের সঙ্গে মিলে যেতেই বুকের ভেতর দিয়ে একটি দমকল শব্দ করতে করতে ছুটে গেল সহসা।

একটু পরেই দরজায় নক শুনে খুলে দেখল শাম্ব সামন্ত। নম্রস্বভাবের এই মানুষটির মুখ আজ বেশ গম্ভীর। তার রুমে ঢুকে সামান্য হেসে বললেন, ঘুঙুরটা পরে আসবেন, ম্যাডাম?

অস্বস্তিও হচ্ছিল গার্গীর, মজাও লাগছিল বেশ। শেষপর্যন্ত তাকে ক্যামেরার সামনে বাইজির বেশে নাচতেও হবে—এই ভাবনাটাই তাকে ভারি পুলকিত করছিল আজ। ঘুঙুর জোড়া পরে ঝমঝম শব্দে পা ফেলতেই তার শরীরে এক অন্য শিহরন।

শাম্ব সামন্ত অবশ্য আধঘণ্টার সামান্য ফুরসতে তাকে লখনউয়ের সেরা নর্তকী করে তোলার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেন না। কিছু শরীরী-ভঙ্গিমা, আঙুলের মুদ্রা, চোখের নড়াচড়া, পায়ের কাজ

শেখাতে শেখাতে বললেন, আপনি যথেষ্ট ট্যালেন্টেড। এভাবে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে রোমিও ঠিক ধরে নেবে'খন আপনাকে। বাকিটা ডামি দিয়ে কাজ চালিয়ে নেবে।

প্রমাণসাইজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকবার রিহার্সাল দিতেই গার্গীও অবাক। চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে! মেক-আপ নিয়ে ড্রেস পরে এহেন পোজে দাঁড়ালে তাকে সেরা নর্তকী হিসেবে না মেনে উপায় থাকবে না দর্শকদের।

শাম্ব সামন্তও সন্তুষ্ট হলেন গার্গী তার সহজাত প্রতিভায় নাচের ভঙ্গিমাগুলো দ্রুত পিক আপ করে ফেলল বলে। তিনিও স্বস্তিতে রুমের বাইরে বেরোতে বেরোতে বললেন, আপনি অভিনয়-লাইনে থাকলে খুব শাইন করতে পারবেন, ম্যাডাম।

—তাই! গার্গী খুশি হয়ে বলল, কিন্তু অদ্যই আমার লখনউয়ে শেষ রজনী। অভিনয়েও তাই।

শাম্ব সামন্ত মাথা ঝাঁকালেন, আমি বুঝতে পারছি আপনি এ-লাইনের নন। তবে একটু সাবধানে থাকবেন আজ—

শাম্ব সামন্ত বাইরে বেরিয়ে যেতেই গার্গী কিছুক্ষণ আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে। শান্তশিষ্ট স্বভাবের মানুষটা চলে যাওয়ার মুহূর্তে যে সতর্কবাণীটি তার কানে ভরে দিলেন, তা কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশিয়া গেল মুহূর্তে। গার্গী বহুক্ষণ ধরে তার বুকের ধক ধক শব্দ শুনতে পেল। সায়ন তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে আবার পা বাড়িয়ে দিচ্ছে বিপদের মুখে।

ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ দেবাদ্রি সান্যাল। বারান্দা পেরিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে গার্গী একটু অবাক হল, লোচ্চার ডেডবডি কি পোস্টমর্টেমে চলে গেছে, মিঃ সান্যাল!

দেবাদ্রি সান্যালের অতবড় শরীরটা আজ যেন হতাশায় ধুঁকছে। ক্লান্তস্বরে বললেন, হ্যাঁ। এতক্ষণ তো মর্গেই ছিলাম। ডাক্তারকে গাড়ি করে তুলে নিয়ে মর্গে পৌঁছে দিলাম যাতে সঙ্গে সঙ্গে পোস্টমর্টেমটা করে ফেলা যায়।

—হল পোস্টমর্টেম! গার্গীর স্বরে উত্তেজনা।

—নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করালাম, মিসেস চৌধুরি, ভেবেছিলাম, নিশ্চয়ই একটা ক্লু পেয়ে যাব আজ। কিন্তু ব্যাড লাক।

—পেলেন না ক্লু!

—নাহ্। ছেলেটাকে গলা টিপে মেরেছে যখন, তখন আশা ছিল নিশ্চয়ই ফিঙ্গার-প্রিন্ট পাবই পাব, কিন্তু আশ্চর্য, খুনি এত চালাক যে এবারও হাতে গ্লাভ্‌স পরে কাজটা সেরেছে।

—এবারও মানে!

—মানে, এর আগে যে দু' দুটো মার্ডার হয়েছে সেখানে কোনও হাতের ছাপ পাইনি। ডাঃ সুস্নাত তালুকদারকে যে-রিভলভার দিয়ে খুন করা হয়েছিল তাতেও কোনও হাতের ছাপ ছিল না। বর্ণনাকে যে হাতুড়ির ঘা মেরে খুন করা হয়েছিল তাতেও কোনও হাতের ছাপ ছিল না। এবার লোচ্চার গলায়ও কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই।

গার্গীকে চিন্তিত দেখাল, তাহলে উপায়!

—কোনও উপায়ই তো দেখতে পাচ্ছিনে আপাতত। কাল রাতে হুমকি দিয়ে গিয়েছিলাম, গোটা সিনেমুভির টিমটাকেই লক-আপে ভরে দেব। তাদেরই কেউ না কেউ যখন কাণ্ডটা ঘটাচ্ছে, তখন সবার ওপরই একটা থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করে দেখব খুনি ধরা যায় কি যায় না।

বুঝলেন মিসেস চৌধুরি, এর পিছনে কোনও বড় রহস্য আছে, তাতে এদের সবাই কোনও না কোনও ভাবে জড়িত।

গার্গী হাসল, সেটা তো মুখে বললে হবে না, মিঃ সান্যাল। কাগজে-কলমে প্রমাণ করতে হবে।

দেবাদ্রির মুখটা পলকে শক্ত পাথরের মতো হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, ওরা নাকি দু-একদিনের মধ্যেই লখনউ ছেড়ে চলে যাবে বলছে!

—যেতে পারে, শুটিং কিন্তু আজই শেষ।

—শেষ! তাহলে তো আপনারও ছুটি?

—হ্যাঁ, আমরা তো কালই সকাল দশটার অমৃতসর মেল ধরছি। সেরকমই টিকিট কাটা হয়েছে শুনলাম।

—তাই! দেবাদ্রি সান্যালকে হঠাৎ ভীষণ অসহায় দেখাল।

—কিন্তু আজ আপনি শুটিং দেখতে আসবেন না! শেষ দিন যখন—

—আমি যাব! দেবাদ্রির মুখ একটু করুণ-করুণ দেখাল, আমি গেলে তো আপনাদের পরিচালক বেগুনপোড়ার মতো মুখ করে বলবেন, প্যাক আপ। প্যাক আপ।

গার্গী হেসে উঠল, একটু বেলার দিকে আসুন, চারটে নাগাদ, ততক্ষণে হয়তো খেল খতম।

—খেল খতম! গার্গীর ভাষা প্রয়োগ যেন অবাক করল দেবাদ্রিকে, কার খেল খতম!

—হয়তো আমার, বলে গার্গী ভারি রহস্যজনক ভাবে হাসল, আসলে শুটিংও খতম হবে কি না।

দেবাদ্রি কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল এই অসম্ভব বুদ্ধিমতী তরুণীটির দিকে। গার্গীর কথাবার্তা, চালচলন প্রায়শ বুঝে উঠতে পারে না সে। একটু পরেই বলল, জানেন, একটা নতুন ডেভেলপমেন্ট হয়েছে বর্ণনার আঙুলে পাওয়া সেই আংটিটার ব্যাপারে। রুমেলা রায় বলেছিলেন আংটিটা তাঁরই, কিন্তু এখন বিবস্বান বসু বলছেন ওটা তাঁর।

—সে, তো আগেই বলেছিলেন।

—কিন্তু বিবস্বান এখন অকাট্য প্রমাণ দিয়েছেন আমাকে।

—তাই! গার্গী এবার অবাক হয়, কীরকম! আংটিটায় তো 'আর' লেখা, কী করে বিবস্বান বসুর হবে!

—হ্যাঁ, 'আর' বলেই তো এ ক'দিন মনে হচ্ছিল, ওটা রুমেলার। কিন্তু এখন বিবস্বান বলছেন আসলে ওতে 'বি' লেখা ছিল। মীনে করা অক্ষরটা থেকে নীচের দিকে কিছুটা সোনা কেটে পড়ে যাওয়ায় 'বি' এখন 'আর'-এর মতো দেখাচ্ছে। আমিও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম, বিবস্বানের কথাই ঠিক।

—তাতে রুমেলার কী বক্তব্য!

—রুমেলা বলছেন, বি. বি ইজ অ্যা ড্যাম লায়ার।

—তাহলে তো বেশ জমেছে। সাতকাণ্ড রামায়ণ চলছে এদিকে, আর ওঁরা দুজন একটা আংটির মালিকানা নিয়ে কামড়াকামড়ি করছেন!

দেবাদ্রি এতক্ষণে যেন থই খুঁজে পেয়ে বললেন, বিবস্বান বসুকে আমার এখন ভারি মিস্টিরিয়াস চরিত্রের লোক বলে মনে হচ্ছে। বিশেষ করে লোচ্চা খুন হওয়ার পর।

গার্গী জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

—একটা অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কার করা গেল আজ। লোচ্চার জিবটা কাটা তা জানতেন?

—সে কী! গার্গী আঁতকে উঠল প্রবলভাবে।

—হ্যাঁ। আমি সিনেমুভির অনেককেই জিজ্ঞাসা করেছি এ-ব্যাপারে। কেউ কিছু মুখ খুলছে না। অথচ আমার মনে হচ্ছে কেউ কেউ জানে ব্যাপারটা। কিন্তু চেপে যাচ্ছে স্রেফ। রুমেলা তো লোচ্চার নাম শুনলে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করলে স্পিকটি নট।

—ও, হ্যাঁ, গার্গীর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আপনাকে যে বলেছিলাম, ডঃ সুস্নাত তালুকদারের ডেডবডির পাশে যে-চশমাটা পাওয়া গিয়েছিল, তার পাওয়ার কত তা জেনে নিতে। ফোন করেছিলেন কলকাতায়?

দেবাদ্রি হাসলেন, করেছিলাম মিসেস চৌধুরি। কিন্তু যে চশমাটা পাওয়া গেছে সেটি প্লাস পাওয়ারের।

—তাই! গার্গী যেন মজা করে বলল, তাহলে তো আপনি ভাল খবরই এনে দিলেন আমাকে। রানাজির তো প্লাস পাওয়ারের চশমাই দরকার হতে পারে, তাই না!

দেবাদ্রি ভুরু কুঁচকে ভাবতে চাইল ব্যাপারটা, তা হতে পারে অবশ্য।

—যাই হোক, আপনি কি শুনেছেন, সার্বিক হ্যাজ বিন হসপিটালাইজ্‌ড্?

—সে কী! দেবাদ্রি চমকে উঠলেন, কীভাবে?

—সেটা না হয় পরে শুনবেন। কিন্তু সিরিয়াসলি ইনজিওরড। হি ইজ নাউ মোস্ট ইনডিসপেনসিব্‌ল্। হি নোজ আ লট।

দেবাদ্রি উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছেন, কেউ কি ওকে অ্যাটেম্পট করেছিল নাকি! অথবা বিটনের সঙ্গে মারামারি করেছে?

গার্গী অবাক হয়ে বলল, বিটন আবার এর মধ্যে এল কী করে! সে তো লক-আপে, তাই না?

—না। কাল দুপুরে ছাড়া পেয়ে গেছে কোর্ট থেকে। তেমন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ তো এখনও জোগাড় করতে পারিনি তার বিরুদ্ধে। কতকাল আর কোর্ট আটকে রাখবে!

—তাই! গার্গীর সহসা একমুহূর্ত মনে হল, কাল রাতে সিঁড়ির ওপর দেখা গুঁট চেহারার লোকটা বিটন নয় তো! বিটন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কোনও কারণে লোচ্চাকে—

সমস্ত ব্যাপারটা গুছিয়ে ভাবতে গিয়ে গার্গীর মনে হল, আরও যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে ঘটনাগুলো। কিন্তু দেবাদ্রির সঙ্গে এ-বিষয়ে এইমুহূর্তে আর আলোচনা করার সময় নেই। এখনই তাকে প্রস্তুত হতে হবে চকবাজারের কোঠিতে যাওয়ার জন্য। তার আগে স্নান খাওয়া, ড্রেস করা, মেক-আপ—

দেবাদ্রিও তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁর তদন্তের পরবর্তী পর্যায়ে এগোতে। সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ঠিক আছে, বিকেল চারটেয় আবার দেখা হবে আপনাদের ওখানে।

দেবাদ্রি চলে যাওয়ার পর ঠিকঠাক প্রস্তুত হয়ে গার্গী যখন গ্রিনভিউ নার্সিং হোম হয়ে চকবাজারে পৌঁছল, ততক্ষণে সেট তৈরি। ক্যামেরা, সাউন্ডও প্রস্তুত। গার্গী ঢুকতেই ঋষভ মুখার্জি তার দিকে স্ক্রিপ্টটা এগিয়ে দিলেন, একবার চোখ বুলিয়ে নাও দ্রুত। প্রচুর সংলাপ আছে! তবে একক অভিনয়। টুকরো টুকরো দৃশ্যে তোলা হবে সেগুলো। একদম ফাটাফাটি অভিনয়

করতে হবে। শেষ দৃশ্যে যেন স্পেল-বাউন্ড হয়ে বসে থাকে দর্শক।

সিরিয়ালের পত্রকার পুলক চৌধুরি চলে যাওয়ার পর তখনও স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রেশমবাই। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তার মা কুন্দনবাইয়ের দিকে তাকাচ্ছেও না। তাকাতে পারছেই না। তার সামন গোটা পৃথিবীটা তখন ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। তার জীবন কখনওই সুখের ছিল না। এক তবায়েফের গর্ভে তার জন্ম। জন্মইতক সে তার পিতাকে চোখে দেখেনি, শুধু জানত তার পিতা শের সিং নামের এক পাঞ্জাবি মেহমান, যে তার জন্মের পর আর কখনও লখনউ আসেনি। তাঁর সম্পর্কে কিছু কিছু আভাস শুনেছিল কুন্দনবাইয়ের কাছ থেকে, তবে শোনার চেয়ে না-শোনাই ছিল বেশি। আজ যখন জানল, কলকাতা থেকে আসা পত্রকার, যিনি তার কাছে এ ক'দিন মেহমান হয়ে এসেছেন, তাঁরই আত্মজা সে, তখন তার বিস্ময় ছাপিয়ে যা তাকে তোলপাড় করল তা হল একধরনের পাপবোধ। এ ক'দিন সে অবাক হয়েছিল কলকাতার এই মেহমানটিকে দেখে। মেহমান নয়, পত্রকার যেন কী এক অদ্ভুত স্নেহের দৃষ্টিতেই তার দিকে তাকিয়েছিলেন এ ক'দিন। তাঁর ব্যবহারও ছিল একজন পিতার মতো। রেশমের বারবারই মনে হয়েছিল কলকাতার পত্রকার তার কোঠিতে আসা আর পাঁচজন মেহমানের চেয়ে ভিন্নতর। গত কয়েকদিন ধরেই তার গান শুনে যেমন তারিফ করেছেন, তেমনই বারবার শুনতে চেয়েছেন তার জীবনকাহিনী। তাঁর আচার আচরণ, হাবভাব, কথাবার্তায় একজন পিতাই যেন বড় হয়ে উঠেছিল বারবার।

রেশম তো বোঝেনি, বুঝবেই বা কী করে! তার মা তো তার জীবনবৃত্তান্ত ডুবিয়ে রেখেছিলেন এক ঘোর অন্ধকারে। তার গান শুনতে প্রতিদিন কত-কত মেহমান আসে, সে কত-কত বাড়িতে মুজরো করতে গিয়েছে মেহমানদের আমন্ত্রণে, তার পক্ষে কি বোঝা সম্ভব, কলকাতার পত্রকার আর পাঁচজনের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তার পরিচয় স্বতন্ত্র!

তার মা কুন্দনবাই কতবার তাকে শুনিয়েছে, তবায়েফ হল এক নদী, যে বহুঘাটের সিঁড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে যায় জীবনভর, সে অন্যের পাপ ধুয়ে দেয়, কিন্তু তার গায়ে কোনও পাপ লাগে না। রেশম এতকাল তার নিজের শরীর ও মন এভাবেই পবিত্র বলে জেনে এসেছে, কিন্তু এই প্রথম তার মনে হল তার মনে পাপ বাসা বেঁধেছিল। নিজের অজান্তে কলকাতার পত্রকারের দিকে তার দৃষ্টি ফেলেছিল অন্যভাবে। এই পাপ মন নিয়ে তার আর এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই।

রেশমবাই তখন তার নিজের ঘরেই দরজা বন্ধ করে শেষবারের মতো পরে নিল বাইজির সাজ। চোলি, আংগিয়া, ঘাগরা, দোপাট্টায় নিজেকে ভূষিত করে প্রবলভাবে সাজাল নিজেকে। তার জীবনের শেষ সাজ। তারপর একা-একা নাচল বহুক্ষণ। ঘুঙুরের শব্দ তার রক্তের ভেতর আলোড়ন তুলছিল, তাকে ভেঙেচুরে খান-খান করে দিচ্ছিল, তার সমস্ত সত্তাকে এক হিমশীতল অন্ধকারের ভেতর ডুবিয়ে দিচ্ছিল আস্তে আস্তে। নাচতে নাচতেই সে অনুভব করছিল, তার সমস্ত শরীর, মন এখন পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। সে এবার বহুদিন ধরে তার সংগ্রহে রাখা বিষের পুরিয়াটা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারে।

বিষপানের ঠিক আগের মুহূর্তে রেশমবাই একটি ছোট্ট চিরকুটে গোটা-গোটা অক্ষরে লিখবে: আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। তারপর ধীরস্থির ভাবে সে গ্রহণ করবে ছোট্ট পুরিয়াটা। পরক্ষণেই তীব্র বিষের জারকরসে সে ঢলে পড়বে বিছানায়।

স্ক্রিপ্টটিতে চোখ বোলানোর সময় 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়' শব্দগুলো তার

হৃৎপিণ্ডে ধক ধক শব্দ তুলছিল তুমুল দামামা বাজিয়ে। এরকম একটি চিরকুটই তো পাওয়া গিয়েছিল বর্ণনার ডেডবডির পাশে, আরও একটি ডঃ সুস্নাত তালুকদারের ডেডবডির পাশে। নিজের হাতে সেই কথাগুলো লেখার সময় গার্গীর হাতটা কাঁপছিল যেন। পরক্ষণেই সজনীবাবুর দেওয়া পুরিয়াটা তার আংগিয়ার ভাঁজ থেকে বার করে খেয়ে নিল পরম আরামে।

পুরিয়াটা খাওয়ার পরক্ষণেই রেশমবাইয়ের শরীর টলতে শুরু করে। রেশমবাই নয়, বাইজির বেশ পরে গার্গীর শরীরই তখন টলছে বেসামালভাবে।। পুরিয়াটায় কী ছিল কে জানে, তার চোখ জুড়ে নেমে এল ঘোর অন্ধকার। টলতে টলতে ধুপ করে গড়িয়ে পড়ল বিছানার ওপর। তারপর নিস্পন্দ হয়ে গেল তার শরীরটা।

—কাট্। কাট্। এক্সেলেন্ট, সুপার্ব অ্যাকটিং, বলতে বলতে ঋষভ মুখার্জি ঢুকে পড়লেন যেখানে পালঙ্কের ওপর নিথর হয়ে শুয়ে আছে গার্গী।

ততক্ষণে ক্যামেরা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে রোমিও, মনিটরে দৃশ্যটা রি-ওয়াইন্ড করে গোড়া থেকে দেখে নিতে চাইছে সাউন্ড রেকর্ডিস্ট দ্বিত্বম রায়। কিন্তু গার্গী তখনও উঠছে না দেখে রোমিও এগিয়ে গিয়ে বলল, উঠে পড়ুন, ম্যাডাম। টেক্ শেষ হয়ে গেছে।

গার্গীর তাতেও সাড়া ফিরছে না দেখে রোমিও ঝুঁকে পড়ল তার মুখের ওপর, ম্যাডাম, মিসেস চৌধুরি—

ঋষভ ব্যস্ত হয়ে বললেন, কী ব্যাপার, কীরকম স্টিফ দেখাচ্ছে না ওকে! পুরিয়াটা খাওয়ার পরই এরকম হল নাকি! দেখি দেখি—

পুরিয়ার কাগজটা তখনও গার্গীর হাতের মুঠোয় ধরা, শরীর নিস্পন্দ, শ্বাসও পড়ছে বলে মনে হল না, ঋষভ হঠাৎ চমকে উঠে বললেন, এ পুরিয়াটা কে ওর হাতে দিল! সজনী, সজনী, এটা তো সত্যিকারের বিষ মনে হচ্ছে!

—বিষ! গোটা সিনেমুভির টিম তখন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে গার্গীর নিথর শরীরটার দিকে।



চকবাজারের বাইজি কোঠির ভেতর সিনেমুভির টিমের সব ক'জন কুশীলবই তখন ভীত, সন্ত্রস্ত, এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে ভয়ার্তদৃষ্টিতে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রোমিওর মুখও। গার্গীর হাতের মুঠোয় ধরা পুরিয়াটার দিকে তাকাচ্ছে ফ্যালফ্যাল করে। সমস্ত ঘটনাটাই যেন অবিশ্বাস্য, অসম্ভব। রানাজি সজনীবাবুকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখে বললেন, কীসের পুরিয়া দিয়েছিলেন আপনি?

সজনীবাবু ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন, তিনি চিত্রনাট্য অনুযায়ী একটা পুরিয়া তৈরি করেছিলেন

হোমিওপ্যাথির দোকান থেকে একধরনের পাউডার কিনে এনে, সেই গল্পটাই কোনওক্রমে শোনালেন কাঁপতে কাঁপতে। পরিচালকের দিকে তাকিয়ে আরও বললেন, আমি তো সাদা কাগজে মোড়া একটা পুরিয়া দিয়েছিলাম রানাজির হাতে। কিন্তু ধোঁয়াটে রঙের কাগজে মোড়া এই পুরিয়াটা কোত্থেকে এল ম্যাডামের হাতে!

ঋষভ মুখার্জি তড়পে উঠে বললেন কী বলছ কি তুমি, সজনী! রানাজি পুরিয়াটা বদলে গিয়েছে বলতে চাও!

রানাজি মুখ শক্ত করে বললেন, আমি কেন পুরিয়া বদলে দিতে যাব! আমি তো পুরিয়াটা ওই তাকের ওপর রেখেছিলাম।

ঋষভ মুখার্জি স্তম্ভিত চোখে গার্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তাহলে কি মেয়েটা সুইসাইড করল! যখন চিরকুটে 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়' কথাগুলো লিখছিল, তখনই খেয়াল করেছিলাম, ওর আঙুলগুলো কাঁপছে থরথর করে। তবে কি ওর প্রাইভেট লাইফে কোনও সমস্যা হয়েছিল!

শুটিঙের শেষ দিন বলে রুমেলা রায়, বিবস্বান বসু, এমনকী ক্যাপ্টেনও এসেছিলেন চকবাজারের এই স্পটটিতে। দুর্ঘটনার খবর কানে যেতেই তাঁরা সবাই একে-একে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছেন ঘরের ভেতর। গার্গীকে ওভাবে নিশ্চল শুয়ে থাকতে দেখে সবারই মধ্যে তখন ছুঁয়ে যাচ্ছে ভয় আর সন্দেহের ছায়া। রুমেলা মাথা নেড়ে বললেন, ও যে আমাদের সঙ্গে শুটিং করছে, এ-কথা ওর হাজব্যান্ডকে একবারও জানায়নি।

ক্যাপ্টেন রুমেলার কথায় সায় দিয়ে বললেন, এক্‌জ্যাক্টলি। নিশ্চয় ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে হাজব্যান্ডের সঙ্গে। কাল মিঃ চৌধুরি আমার কাছ থেকে সব শুনে আকাশ থেকে পড়লেন। রাগে ফার্নেস হয়ে উঠেছিল ওঁর মুখ। বললেন উনি কিছুই জানেন না।

ঋষভ মুখার্জি চমকে উঠে বললেন, কী সর্বনাশ, তাহলে তো ওর এই সিরিয়ালে অভিনয় করতে আসাটা একেবারেই উচিত হয়নি। নিশ্চয়ই এটা তারই জের। রানাজি, তুমি এক্ষুনি একে হসপিটালাইজ করার ব্যবস্থা করো। নইলে আমাদের ঘাড়েই সব দোষ চেপে যাবে। আর সজনী, তুমি যে-দোকান থেকে পাউডারটা কিনেছিলে, তার ক্যাশমেমো রেখেছ তো!

সজনীবাবু ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আছে তো মনে হয়। তবে এত-এত খরচ, এত-এত কাগজপত্র জমেছে যে, এখন সেটা খুঁজে পাব কি না কে জানে! নইলে আমার হাতেই তো হাতকড়া পড়বে। ঋষভ মাথা চাপড়ে বললেন, তোমার একার যেন, আমাদের সবাইকেই হাতকড়া পরানোর জন্য পুলিশ অফিসারটা তো রেডি হয়ে আছে। সে তো আর বিশ্বাস করবে না এটা সুইসাইড কেস। তাক থেকে পুরিয়াটা আমিই তো ওর হাতে—

শাম্ব সমস্ত অনেকক্ষণ ধরে গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে ছিলেন গার্গীর মুখের দিকে, হঠাৎ বললেন, আমার মনে হচ্ছে, এখনও পাল্‌স্‌ আছে। দেরি না করে হাসপাতালে ভর্তি করে দিই না!

বিবস্বান বসু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও কোনও লাভ নেই। মনে হচ্ছে পটাসিয়াম সায়ানাইড।

—পটাসিয়াম সায়ানাইড! একসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠস্বর শিউরে উঠে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিল বাতাসে। একটা হিমশিহরন বয়ে গেল কোঠির ভেতর সাজানো সেটটির পটভূমিকায়। দ্বিত্বম রায় কর্কশকণ্ঠে বলল, আপনি কী করে জানলেন এটা পটাশিয়াম সায়ানাইড?

বিবস্বান বসু সহসা সতর্ক হয়ে গিয়ে বললেন, দেখলেই বোঝা যায়।

রোমিও হঠাৎ বলল, মনে হচ্ছে আপনার পটাসিয়াম সায়ানাইড নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার অব্যেস আছে!

সেই মুহূর্তে কে যেন বলল, পুলিশ, পুলিশ এসে গেছে।

কোঠির বাইরে হঠাৎ পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যালকে দেখে তখন আরও এক শিরশির আতঙ্ক। দেবাদ্রি জিপ থেকে নামতেই খবর পেলেন, কে যেন মারা গেছেন শুটিঙের সময়। দ্রুত কোঠির ভেতর ঢুকে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় হুঙ্কার ছাড়লেন, কে মারা গেছে?

পালঙ্কের ওপর গার্গীর নিথর শরীরটা দেখে তিনি স্তম্ভিত, এ কী, এ তো মিসেস চৌধুরি! পয়জনিং কেস নাকি! কে বিষের পুরিয়া দিয়েছিল ওঁর হাতে?

ক্যাপ্টেন তৎক্ষণাৎ বললেন, কে আবার দেবে। সজনীবাবুই তো তৈরি করেছিলেন ওটা।

সজনীবাবু কাঁপতে কাঁপতে চোখ উল্টে পড়েই যাচ্ছিলেন প্রায়, তাঁকে ধরে বসিয়ে দেওয়া হল পালঙ্কের উপর।

দেবাদ্রি তৎক্ষণাৎ হুঙ্কার ছাড়লেন, তাহলে আরও একটা মার্ডার!

তখনই ঘরসুদ্ধ লোককে বিস্মিত করে বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে পালঙ্কের উপর উঠে বসল গার্গী, বলল, মার্ডার নয়, মিস্টার সান্যাল, তবে অ্যাটেম্পট টু মার্ডার। আমাকে খুন করতে পারলেই ষোলোকলা পূর্ণ হত মার্ডারারের।

কোঠির ভেতর বাকি সবাই তখন যেন ভূত দেখার মতোই চমকে উঠেছে। গার্গীকে উঠে বসতে দেখে দেবাদ্রিও হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, কী ব্যাপার কি, মিসেস চৌধুরি!

গার্গী তার চারদিকে জড়ো হওয়া মুখগুলো একবার ভাল করে নিরীক্ষণ করে বলল, রেশমের মৃত্যুদৃশ্যের অভিনয়টা আমি ওভাবেই সাজিয়েছিলাম হত্যাকারীকে একবার বাজিয়ে দেখতে। তবে যে-পুরিয়াটা আমার হাতে দেওয়া হয়েছিল সেটা দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল তার ভেতর বিষ আছে। এখন মনে হচ্ছে সেটা পটাসিয়াম সায়ানাইডই। নইলে এঁরা জানবেনই বা কী করে! সেদিনই আপনাকে আমি বলেছিলাম, যে কোনও মুহূর্তে হত্যার চেষ্টা হতে পারে আমার ওপর। কারণ হত্যাকারী জেনে গেছে আমার কাছে এমন সব তথ্য পৌঁছে গেছে যা দিয়ে যে-কোনও সময় আমি তার মুখোশ খুলে দিতে পারি।

দেবাদ্রি অবাক হয়ে বললেন, আপনি জেনে গেছেন কে হত্যাকারী!

—হ্যাঁ। কয়েকদিন ধরেইএকটু একটু করে বুঝতে পারছিলাম। গত কাল এবং আজ, এই দু'দিনে চূড়ান্তভাবে আবিষ্কার করতে পেরেছি হত্যার মোটিভই বা কী, কীভাবেই বা সে হত্যা করে চলেছে একটার পর একটা তাজা মানুষ।

রানাজি গম্ভীর হয়ে বললেন, পুলিশ অফিসাররা সব ঘোল খেয়ে যাচ্ছে হত্যাকারী কে খুঁজে বার করতে। আর আপনি তেমন কোনও তদন্ত না করেই জেনে ফেললেন হত্যাকারীর মোটিভ, তার কার্যকলাপ!

বিবস্বান বসু মুচকি হেসে বললেন, হিন্দি সিনেমায় এ রকম বীরাঙ্গনাদের দেখা যায়, এখন তাহলে বাংলাতেও আবির্ভূত হল!

ঋষভ মুখার্জি স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে ছিলেন গার্গীকে ওভাবে উঠে বসতে দেখে, এখন ক্রুদ্ধভঙ্গিতে বললেন, এ তো একটা আস্ত উন্মাদ দেখছি! এতগুলো লোককে ভিরমি খাইয়ে দিয়েছিল পাগলামো করে। এখনই একে উন্মাদ-আশ্রমে পাঠিয়ে দিন, ইনস্পেক্টর।

গার্গী হেসে বলল, সজনীবাবু যে-পুরিয়াটা আত্মহত্যার দৃশ্যে খাওয়ার জন্য তৈরি করেছিলেন, আজ ঋষভ মুখার্জি আমার হাতে দিয়েছিলেন সেটা, তা খেলে এতক্ষণে উন্মাদ-আশ্রমে নয়, পরপারের কোনও আশ্রমেই যেতে হত আমাকে।

দেবাদ্রি অবাক হয়ে বললেন, তাহলে সজনীবাবুই!

গার্গী পালঙ্ক থেকে নেমে বলল, সব কথা বলার আগে এককাপ চা পেলে ভাল হত। অনেকক্ষণ শুটিং করে খুব টায়ার্ড লাগছে। তার ওপর এতক্ষণ কী টেনশন! সজনীবাবু, সবাইকে কি একরাউন্ড চা দেওয়া যাবে?

সজনীবাবু তখনও বিষাদে স্তব্ধ হয়ে আছেন, চায়ের কথা শুনে নড়েচড়ে বললেন, এই পরিস্থিতিতে কি কারও চা খাওয়ার মুড আছে, ম্যাডাম! ঠিক আছে, যখন বলছেন—

চায়ের ট্রে অবশ্য একটু পরেই ঢুকে পড়ল স্পটবয়দের হাতে হাতে। তার থেকে একটা কাপ তুলে নিয়ে বেশ আয়েস করে চুমুক দিয়ে গার্গী বলল, এবার শুনুন মিঃ সান্যাল, হত্যাকারীর যাবতীয় কীর্তিকলাপ। কলকাতার একটা হত্যাকাণ্ড চাপা দিতে গিয়ে লখনউতে আরও দু-দুটো হত্যা করে ফেলতে হল বেচারি হত্যাকারীকে, তাতেও যখন বুঝতে পারলেন ধরা পড়ে যাবেন খুব শিগগির, তখন টার্গেট করলেন আমাকেই। আজই শুটিঙের শেষদিন, হত্যাকারীরও শেষ সুযোগ। তাই যাঁদের আজ শুটিঙে আসার কথা নয়, তাঁরাও হাজির হয়েছেন ঘটনাস্থলে—

বলে গার্গী ইঙ্গিত করল কাছেই দাঁড়ানো বিবস্বান বসু, ক্যাপ্টেন আর রুমেলা রায়ের দিকে।

দেবাদ্রি সান্যালের পুলিশবাহিনী তখন ঘিরে ফেলেছে বাইজিপাড়ার কোঠিটা। সিনেমুভির সদস্যরা ফিসফিস করে আলোচনা করছেন নিজেদের মধ্যে। গার্গীর কথা শুনে খুবই যে ভয় পেয়ে গিয়েছেন সবাই, তা স্পষ্ট হচ্ছে তাঁদের আলোচনা, কানাকানির দৃশ্যে। বিবস্বান বসু একটা সোফায় বসে আছেন থম হয়ে, তাঁর পাশে বসে নিচুস্বরে কথা বলছেন রুমেলা রায় আর ক্যাপ্টেন। তিনজনের মধ্যে হঠাৎ বেশ ভাব হয়ে গেছে দেখে বেশ আশ্চর্য হচ্ছিল গার্গী। এককোণে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে উদাসীন ভঙ্গিতে সিগারেট খাচ্ছেন ঋষভ মুখার্জি। দ্বিত্বম আর রোমিও ম্লান মুখে তাকিয়ে আছে জানালায় চোখ রেখে। রানাজি গলা নামিয়ে আলোচনা করছেন সজনী দত্ত আর শাম্ব সামন্তর সঙ্গে।

গার্গী চায়ে চুমুক দিয়ে, রুমাল দিয়ে মুখ, ঘাড়পিঠ মুছে একটু থিতু হয়ে বসল পালঙ্কের ওপর। তার পরনে তখনও বাইজির পোশাক, পায়ে নতুন কেনা ঘুঙুর জোড়া, কিন্তু চোখে গোয়েন্দার মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি। বলল, তাহলে মিঃ সান্যাল, শুনুন তিন-তিনটি হত্যাকাণ্ডের পেছনে লুকিয়ে রয়েছে কী রোমাঞ্চকর আর আশ্চর্য ইতিহাস। একজন মানুষের লোভ আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা কী সাংঘাতিক পরিণতি এনে দিতে পারে তাঁর জীবনে, সেইসঙ্গে অন্যদের জীবনেও! আর পৃথিবীর যাবতীয় অপরাধের পেছনে সাধারণত যে দু'টি কারণ নিহিত থাকে, এখানেও সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ফর্মুলা, অর্থ এবং নারী।

সমস্ত ঘটনার উৎস খুঁজতে হলে আমাদের কিন্তু প্রথমেই পাড়ি দিতে হবে সেই কলকাতায় যেখানে 'সোনালি ঘুঙুর' নামে একটি টিভি সিরিয়াল তৈরি হওয়ার পরিকল্পনা থেকেই সমস্ত দুর্ঘটনার শুরু। বহু বছর আগে পরপর কয়েকটা ফিচার-ফিল্ম তৈরি করে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন পরিচালক ঋষভ মুখার্জি। তখন তাঁর বয়স কম ছিল, দেখার চোখও ছিল পরিষ্কার, কমার্শিয়াল ফিল্ম করলেও তার মধ্যে আর্ট ফিল্ম হয়ে ওঠার সব উপকরণই মজুত ছিল। কিন্তু আর্ট ফিল্ম কখনও করতে চাননি তিনি, এ-ব্যাপারে তাঁর বক্তব্যও খুব স্পষ্ট, বলতেন, 'আর্ট' ফিল্ম

দেখানো হবে পর্দায়, আর সিনেমা হলে মাছি উড়বে, ছারপোকা, মাকড়শা আর বাদুড়রা দর্শক হবে ছবির, সে রকম ছবি করা আমার পোষাবে না। আমার ছবি দিনের পর দিন হাউসফুল হবে, টিকিটের জন্য বিশাল লাইন পড়বে, সবাই হই-হই করে এসে দেখতে চাইবে ছবিটা, তবেই না এত খাটাখাটুনি সার্থক।' আর সত্যিই ঋষভ মুখার্জির ছবিগুলো প্রত্যেকটিই প্রায় হিট। একটা ছবি শেষ না করতেই অন্য ছবির প্রযোজকরা ঘুরঘুর করতেন তাঁর দরজায়।

কিন্তু বেশিদিন ছবি করতে পারলেন না ঋষভ, কারণ ছবি করার ব্যাপারে তিনি বড় আপসহীন, কারও সঙ্গেই ঠিকমতো অ্যাডজাস্ট করতে পারেন না। নামী নায়ক-নায়িকারাও তাঁর ব্যবহারে বিব্রত, ক্ষুব্ধ, তিতিবিরক্ত। দু-তিনটে ছবি আরম্ভ করেও কোনওটা মাঝপথে, কোনওটা মহরতের পরই পরিত্যক্ত। কারণ ওই একটাই, তাঁর বদমেজাজি, রুক্ষ স্বভাব।

ঋষভ একটা সিগারেট ধরিয়ে ভুরু কুঁচকে শুনছিলেন গার্গীর কথাগুলো, এখন টানতে গিয়ে দেখলেন তাতে আগুন নেই। বিরক্ত হয়ে জানলার তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, রাবিশ।

—ঋষভ মুখার্জি দীর্ঘকাল পর হঠাৎ এ বছর ঠিক করলেন, আর ফিচার-ফিল্ম নয়। এখন টিভি-সিরিয়ালগুলোই ভারি জনপ্রিয় হচ্ছে, মুখে মুখে ঘুরছে সিরিয়ালগুলোর নাম, অতএব প্রথমে একটা তেরো কিংবা ছাব্বিশ পর্বের টিভি-সিরিয়াল তুলে হাতের মরচেটা তোলা যাক, তারপর একটা মেগা-র কথা ভাবা যাবে। এ ব্যাপারে তাঁকে প্রথমেই মদত দিতে চাইলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডঃ সুস্নাত তালুকদার। সাদার্ন অ্যাভেনিউয়ের ডঃ সুস্নাত তালুকদার একটি অতিপরিচিত নাম, এককালে এলাকায় তাঁর রোরিং পশার ছিল, ওখানকার অনেক ভি. আই. পি.-ও তাঁকে হাউস-ফিজিসিয়ান হিসেবে বাড়িতে কল দিতেন নিয়মিত। প্রথম জীবনে ডাক্তারিটাই ছিল তাঁর জীবনে এক এবং একমাত্র প্যাশন, এলাকার পেশেন্ট দেখা নিয়ে এতই মত্ত ছিলেন যে, বিয়ে করার সময়টুকুও পাননি। কিছুকাল পর স্বাভাবিকভাবেই যখন একাকীত্ব অনুভব করতে শুরু করলেন, তখন বন্ধু-বান্ধব আর দাবা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ডাক্তারির ফাঁকে ফাঁকে। বন্ধুদের মধ্যে ঋষভ মুখার্জিই প্রধানতম, তিনিই প্রায় নিয়ম করে প্রতিদিনই তাঁর বাড়িতে সকালের দিকে বেলা দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ যেতেন, দেড়-দুঘণ্টা ধরে দাবা খেলতেন দু'জনে।

এহেন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও একদম না জানিয়ে ডঃ সুস্নাত তালুকদার হঠাৎ লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁর এক অবদমিত গোপন কামনার ভেতর। সন্ধের পর তাঁর চেম্বারে প্রায়ই রোগী থাকছিল না ইদানীং। সম্ভবত অধিকাংশ দিনই তাঁকে চেম্বারে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে পেশেন্টরাই আর আসত না শেষ দিকে। আসলে তখন ডঃ তালুকদার সঙ্গ পেতে শুরু করেছিলেন নানান ধরনের যুবতী নারীর, তাদের মধ্যে অন্তত দু'জন শেষ দিকে দারুণভাবে রেইন করতে শুরু করে তাঁর ওপর। একজন বর্ণনা সেনগুপ্ত, অন্যজন লাভলীন তালুকদার।

সফল বিত্তবান ডাক্তার, ভালই জীবনযাপন করছিলেন ডাক্তারি করে, দাবাটাবা খেলে যাহোক কাটাচ্ছিলেন, হঠাৎই প্রবল নারীসঙ্গলিপ্সা তাঁর জীবনে এনে দিল কিছু সুখের মুহূর্ত, সেইসঙ্গে একরাশ জটিল টানাপোড়েন। যে-দু'জন নারী সবচেয়ে ঘিরে রইল তাঁর সত্তা বা তাঁর জীবনযাপন, তাদের দু'জনেই ফ্লার্ট ধরনের, অ্যাম্বিসাস, যদিও দু'জনের মধ্যে কিছু চরিত্রগত পার্থক্য আছে। বর্ণনা অবিবাহিতা যুবতী, অতি-দুঃসাহসী, তার জীবনযাপন বানভাসি জলের মতো, সামনে যাকে পাবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বন্যার টানে, নিজেও ডুববে, অন্যকেও ডোবাবে। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে খুব সহজ, স্বাভাবিক, মজার ব্যাপার, তাতে অন্যের জীবনে কী

হল না হল তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। পাশাপাশি লাভলীন উচ্চাকাঙক্ষী, কিন্তু অনেক হিসেবি, স্বামীর সঙ্গ পায় না বলে অন্য এক যুবকের সঙ্গে একটা অ্যাফেয়ার চালিয়ে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে প্রায়-বৃদ্ধ জ্যাঠশ্বশুরকে সঙ্গ দিয়ে, তার মন ভুলিয়ে আদায় করতে চেয়েছে তাঁর অর্থসম্পদ।

বর্ণনা আর লাভলীনের মধ্যে স্বভাবতই শুরু হয়েছিল একটা ঠাণ্ডা যুদ্ধ। ঠাণ্ডা এই কারণেই যে, তারা কখনও মুখোমুখি হয়নি, কিন্তু দু'জন দু'জনের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে, সারাক্ষণ, কখনও সুস্নাত তালুকদারের হাবভাবে, কথাবার্তায়, কখনও তাদের দু'জনের মাঝখানে হঠাৎ ক্যাটালিস্টের মতো ঢুকে পড়া রানাজি সান্যালের উপস্থিতিতে। দুই যুবতীরই একই লক্ষ্য, প্রথমে ছিল ব্যাচেলর ডাক্তারের অর্থসম্পদের মালিক হওয়া, পরে ডাক্তারের টাকায় তৈরি হওয়া সিরিয়ালের নায়িকা হওয়া।

এ ব্যাপারে দু'জন এগুচ্ছিল দু'রকমভাবে। বর্ণনা ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল সুস্নাত তালুকদারের সঙ্গে তার সহজাত ফ্লার্টচারিতায়, কেননা তার কোনও পিছুটান নেই, ডাক্তারের সঙ্গে যে কোনও রকম সম্পর্ক তৈরি করতে তার চরিত্রিক বা নৈতিক কোনও বাধাই ছিল না। কিন্তু লাভলীন ফ্লার্টে পারঙ্গম হলেও সে একজনের স্ত্রী, সুস্নাত তালুকদারের সঙ্গে তার একটা পারিবারিক সম্পর্ক আছে, কিছু নৈতিক বাধাও আছে ডাক্তারের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়ার। তবে তার একটা অ্যাডভান্টেজ ছিল যেহেতু তার স্বামী রঙ্গন ডঃ সুস্নাত তালুকদারের আইনত উত্তরাধিকারী।

দুই নারীর মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধটি জিইয়ে রাখতে খুব বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করেছিলেন রানাজি সান্যাল। কখনও বর্ণনাকে আশ্বাস দিচ্ছিলেন তাকেই সিরিয়ালের নায়িকা হিসেবে নির্বাচন করা হবে যদি সে ডাক্তারের কাছ থেকে সিরিয়াল তৈরির টাকাটা পাইয়ে দিতে পারে। আবার কখনও লাভলীনকে বলছিলেন তিনিই নায়িকা হবেন যদি ডাক্তারকে পটিয়ে—

দুই হবু নায়িকাই তখন ডাক্তারের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে তাদের উচ্চাকাঙক্ষা পূর্ণ করতে। তাদের লড়িয়ে দিয়ে রানাজির লক্ষ্য ছিল, যেভাবেই হোক ব্যাচেলার ডাক্তারের টাকাটা ম্যানেজ করে ফেলা। তাতে তাঁর একইসঙ্গে দু'টি উদ্দেশ্য সাধিত হবে—সিরিয়ালের প্রোডাকশন ম্যানেজার হিসেবে বেশ কিছু অর্থ আসবে হাতে, আবার সুন্দরী যুবতীদের সঙ্গে হবনবিং চালানোও যাবে প্রাণভরে।

এদের মধ্যে আরও একটি বিদঘুটে চরিত্র এসে জুটেছিল, সে ভরদ্বাজ মুখার্জি। ভরদ্বাজ নারীঘটিত ব্যাপার-স্যাপারের টানেই সেঁটে থাকত রানাজির সঙ্গে। সে জানত, রানাজির কাছাকাছি থাকলেই কিছু মধু তার বরাতে অমনি জুটে যাবে। সেভাবেই সে কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করছিল কখনও বর্ণনার, কখনও লাভলীনের। ডাক্তারের কাছেও দু-একবার ঘোরাঘুরি। শুঁকতে চেষ্টা করছে ডাক্তারে অর্থসম্পদের হালহদিস। ডাক্তার বেঁকে বসায় সিরিয়াল যে বরবাদ হতে বসেছে তা জানতে পারায় রানাজি হয়তো উস্কাচ্ছিলেন ভরদ্বাজকে। এহেন উস্কানিতে ভরদ্বাজের পক্ষে যে কোনও অপকর্মে জড়িয়ে পড়াটা সম্ভব।

বস্তুত রানাজি সান্যাল বেশ একটি ইন্টারেস্টিং চরিত্র এই টিমে। বিতর্কিতও বটে। তাঁর চেহারাটা নায়কোচিত, মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করার ব্যাপারে খুবই পারঙ্গম, কিছু দুর্নামও কুড়িয়েছেন এ-কাজে। তাঁর পক্ষে একটা অসুবিধে হল, অভিনয় করার ক্ষমতা তাঁর একেবারেই নেই, অথচ ফিল্ম-লাইনে জড়িয়ে থাকার প্রবল বাসনা। অতএব নানানভাবে এরওর মাথায় টুপি

পরিয়ে, কখনও নিজের অফিসের ক্যাশ ভেঙেও তাঁকে থাকতে হয় প্রোডাকশন ম্যানেজার সেজে। 'সোনালি ঘুঙুর'-এর নায়িকা যিনিই হোন না কেন, বর্ণনা আর লাভলীন দু'জনকেই এই ধারণা দিয়ে রেখেছিলেন যে, ঋষভ মুখার্জি সিরিয়ালের নায়িকা নির্বাচনে তাঁর ওপরই পুরোপুরি নির্ভরশীল।

বলতে বলতে গার্গী একটু থামল দম নিতে। চার চোখে একবার তাকিয়ে দেখলও, রানাজি সান্যাল তার দিকে তাকিয়ে আছেন স্তম্ভিত চোখে। অন্য সব কুশীলবরাও অবাক হয়ে তাকাচ্ছে রানাজির দিকে।

মুচকি হেসে গার্গী আবার শুরু করল, ডঃ সুস্নাত তালুকদারের খুন হওয়ার প্রেক্ষাপটে কিন্তু অনেকগুলো ছবি সাজানো যায় পাশাপাশি। ব্যাচেলর ডাক্তারের উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্য তাঁর দুই ভাইপো রঙ্গন তালুকদার আর অঙ্গন ওরফে বিটন তালুকদারের। প্রথমজন ডাক্তার, কিন্তু পশারহীন বলে আপাতদৃষ্টিতে অনুমিত হয় তত বুদ্ধিমান নন। জ্যাঠার সম্পদের ওপর তাঁর কতটা নজর ছিল তা আমার কাছে পরিষ্কার না হলেও তাঁর স্ত্রী লাভলি বা লাভলীন যে সেদিকে শ্যেনদৃষ্টি দিয়ে অপেক্ষা করছিলেন তা ঘটনাক্রম থেকে পরিস্ফুট। সংবাদ থেকে প্রকাশ, সুস্নাত খুন হওয়ার পর দুই ভাইপো সম্পত্তি দখল নিতে গিয়ে লিপ্ত হয়েছে মারামারিতে, তার ফলে জ্যেষ্ঠ রঙ্গন আহত হয়ে পুলিশি-হেপাজতে, কনিষ্ঠ বিটন উধাও। দু'জনের কেউই যে জ্যাঠার অর্থ-সম্পদের খোঁজ পায়নি তার প্রমাণ, বিটন তৎক্ষণাৎ লখনউ ছুটে এসেছে বর্ণনার খোঁজে, কয়েকদিন পর সার্বিক সমাজদারকে সঙ্গে নিয়ে লাভলীনও। দুই তরফেরই নিশ্চিত ধারণা বর্ণনা কিংবা রানাজি কোনওভাবে ক্যাশ টাকা বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়ে এসেছে ডঃ সুস্নাত তালুকদারের কাছ থেকে।

লাভলীন তালুকদারের অবশ্য আরও একটি কারণ আছে লখনউ ছুটে আসার। কলকাতায় বসেই সে রানাজি মারফত টেলিফোনে সংবাদ পেয়েছে বর্ণনা মারা গেছে, অতএব 'সোনালি ঘুঙুর'-এর নায়িকার ভূমিকাটি খালি, যদি কোনওক্রমে তাতে একটি চান্স পাওয়া যায়। সঙ্গে নিয়ে এসেছে তার প্রেমিক সার্বিক সমাজদারকে। সুস্নাত-হত্যার পেছনে সার্বিকের ভূমিকা কতখানি সে-ব্যাপারে ছোট্ট একটি প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায় এই কারণে যে, সিনেমুভির লখনউযাত্রার মাত্র ক'দিন আগে যখন টাকা দেওয়ার ব্যাপারে বারবার হ্যাঁ-না হ্যাঁ-না করছেন সুস্নাত, তখন লাভলীনকে নায়িকা করতে হবে এই দাবিতে সার্বিকও ছিল সোচ্চার। ডাক্তার শেষে টাকা দিয়েছেন বটে কিন্তু তা, বর্ণনাকে নায়িকা হিসেবে মনোনীত করার সুপারিশ করে। বেশ অনুমান করা যায়, সংবাদটি লাভলীনের উচ্চাশায় জল ঢেলে দিয়েছিল, খর্ব করে দিয়েছিল তার অহঙ্কার যেহেতু অনেককেই সে বলে রেখেছিল সিরিয়ালের নায়িকা হচ্ছে সে-ই। লাভলীন তাতে কতখানি স্তম্ভিত, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ হয়েছিল তা তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেই বোঝা যায়। তার প্রতিপত্তি এভাবে চুরমার হয়ে তো গেলই, উপরন্তু হাতছাড়া হয়ে গেল জ্যাঠাশ্বশুরের অগাধ সম্পদ, আর তাতে সার্বিকের সাহায্যে ডাক্তারকে খুন করে ফেলার দুরভিসন্ধি তার সেই মুহূর্তে হয়েছিল এ-কথা ভাবা অন্যায্য হবে না। ঘটনার দিন দুপুরে রানাজি আর লাভলীন সম্ভবত বেলা একটা নাগাদ ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন তাঁর সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করতে। কে জানে, হয়তো সার্বিকও ছিল তাঁদের সঙ্গে। ডাক্তারের সিদ্ধান্ত বহাল থাকায় তিনজনে মিলে—

রানাজি স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন গার্গীর দিকে।

কৌতূহলের বিষয় হল, সেদিন দুপুরে ওঁরা ছাড়া অন্তত আরও একজনের উপস্থিতির প্রমাণ পাচ্ছি, সে হল বর্ণনা। ডাক্তারের কোনও একজন পেশেন্টের টেলিফোনের জবাবে বর্ণনা নিজের নাম বলে ফেলেছিল সেদিন। সুস্নাতহত্যারহস্যের ক্লু হিসেবে আরও পাওয়া যাচ্ছে তাঁর ডেডবডির পাশে একটি সোনালি ফ্রেমের চশমা, একটি লেডিজ হ্যান্ডব্যাগ ও একটি সুইসাইডাল নোট যাতে লেখা 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়'। আসলে হত্যাকারী ঘটনাটিকে সাজাতে চেয়েছিল আত্মহত্যা হিসেবে, হয়তো পুলিশ বিশ্বাসও করত সেটা, কিন্তু পরে জানা গেল, সুইসাইড নোটের হস্তাক্ষরটি ডাক্তারের নয়, আর চশমাটা নতুন। চশমার পাওয়ার বা ফ্রেম কোনওটি ডাক্তারের চশমার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে সেটি অন্য কারও। তদন্তে আরও জানা গেছে, ভ্যানিটিব্যাগের ভেতর কিছু লেডিজ ওনলি টুকিটাকি ছাড়া আরও দু'টি চিরকুটে একই হস্তাক্ষরের সুইসাইড নোট। ভ্যানিটিব্যাগটি যেহেতু বর্ণনার বলে শনাক্ত করা গেল। তাই পুলিশের নজর গিয়ে পড়ল তারই ওপর। কিন্তু খুনটা বর্ণনা করেনি,কারণ যে-রিভলভারটি দিয়ে সুস্নাত তালুকদারকে হত্যা করা হয়েছিল, সেটির গায়ে কোনও আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। তাতেই অনুমান করা যায় বর্ণনার মতো সাধারণ মগজের মেয়ে হাতে গ্লাভ্‌স্ পরে ডাক্তারকে খুন করবে এটা কষ্টকল্পনা। তাছাড়া চিরকুটের হাতের লেখাটিও বর্ণনার নয়। সেক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, ঘটনাস্থলে অন্য একজন ছিল, যে আরও সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের, সুস্নাত-হত্যার ব্যাপারটা সে-ই ঘটিয়েছিল। যদিও শেষরক্ষা করতে পারল না হত্যাকারী।

দেবাদ্রি সান্যাল ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আপনি কাকে হত্যাকারী বলে সাব্যস্ত করছেন?

—আমি তো সেই প্রসঙ্গেই যেতে চাইছি, কিন্তু তার আগে হত্যাকারীর দ্বিতীয় হত্যাটির কথা বলতে হবে আমাকে। মজার ব্যাপার হল, বর্ণনাকে হত্যা করতে গিয়েই হত্যাকারী আরও অনেক ক্লু আমাদের চোখের সামনে ফেলে গেল, সেগুলোই এবার বলব একে-একে—

রানাজি এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন একপাশে। হঠাৎ বলে উঠলেন, কী যে সব বানিয়ে বানিয়ে বলছেন আপনি!

—সত্যি বলতে কি, ডঃ তালুকদারের হত্যাটি ছিল অনেক সহজ, স্বাভাবিক। তাঁর বিশাল অর্থসম্পদের লোভে তাঁকে কেউ খুন করবে এটা তো হতেই পারে অপরাধতত্ত্বের সাধারণ সূত্র অনুযায়ী। আর সে খুন যে-ই করে থাকুক, খুনের সঙ্গে জড়িত এক বা একাধিক ব্যক্তি অমৃতসর মেলে চড়ে পাড়ি দিল সুদূর লখনউয়ে, পরদিন লখনউ পৌঁছল শুটিং শুরু করতে। তার ঠিক তিনদিন পর পৌঁছল পুলিশ। সেই তিনদিনে লখনউতে অবশ্য তিনশো নাটক ঘটে গেছে, যার ক্লাইম্যাক্স বর্ণনার খুনে। বর্ণনা-হত্যার আগের দিন অন্তত দুটো ঘটনা ঘটেছে যা এই হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি, কলকাতা থেকে বর্ণনার পিছু ধাওয়া করে বিটনের লখনউ আগমন, অন্যটি বিবস্বান-বর্ণনার মাখামাখির কারণে ক্রুদ্ধ রুমেলা-কর্তৃক তাঁর পুরনো বন্ধু ক্যাপ্টেনকে সন্ধের পর হোটেলে নিয়ে আসা ও রাতে তাঁর রুমে রাত্রিযাপন করানো। আরও কয়েকটি ঘটনাও খুব ভাইটাল—নতুন অভিনেত্রী বর্ণনাকে ঘিরে রানাজি, রোমিও ও ভরদ্বাজের কখনও নিঃশব্দ, কখনও সশব্দ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। লখনউয়ে আসার পর কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতি একেবারেই বদলে গেল, কেননা সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু তখন বর্ণনা। ট্রেনে ওঠার পর থেকেই বর্ণনা ভিড়ে গেছে বিবস্বান বসুর ক্যাম্পে। লখনউয়ে নামার পর রানাজি আর ভরদ্বাজের সঙ্গে

রোমিও-ও তখন বর্ণনার মায়াজালে জড়িয়ে। বর্ণনা তার সহজাত প্রবৃত্তিতে নতুন নতুন পুরুষ-সঙ্গী খোঁজে, তাদের সঙ্গে একের পর এক অ্যাফেয়ার গড়ে তোলার কাজে সে অক্লান্ত। তার সঙ্গে বিবস্বান বসুর একটা সম্পর্ক আগে থেকে ছিলই, হঠাৎ এই সিরিয়ালে কাজ করার পর আবারও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে দু'জনে। বর্ণনা নিশ্চয়ই বিবস্বানের কোনও গোপন খবর জানত, সেটা বিবস্বান কর্তৃক তাঁর স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার ঘটনাও হতে পারে, অথবা সুস্নাত-হত্যার পেছনে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপস্থিতি। তাই রুমেলার সঙ্গে বহু বছরের সম্পর্কও বর্ণনার কারণে ভাঙতে হয় বিবস্বানকে। আবার রানাজির সঙ্গেও বর্ণনার কিছুকাল ধরে একটা বোঝাপড়া চলছিল এই সিরিয়ালে তার কাজ পাওয়া-না-পাওয়া নিয়ে। ভরদ্বাজের সঙ্গেও গড়ে উঠেছিল একটা অদ্ভুত সম্পর্ক। লখনউয়ে এসে যুক্ত হল আর একটি নাম, রোমিও।

বর্ণনা-হত্যার ব্যাপারে এরাই হয় এককভাবে, কিংবা কয়েকজন মিলে যুক্ত এমনই মনে হচ্ছিল আমাদের। এবার সেই জটিল সম্পর্কটাই বিশ্লেষণ করব।



বস্তুত রোমিওর সঙ্গেই কিন্তু বর্ণনার সম্পর্কটা টার্ন নিয়েছিল প্রেমের দিকে। সেটা রোমিওর দিক থেকে একটু বেশিই ছিল, কতটা বর্ণনার ছিল সেটা ঈশ্বর জানেন, কারণ বর্ণনা সবসময়েই পিচ্ছিল, আন্‌প্রেডিকটেব্‌ল্‌।

যাই হোক, বর্ণনার এই ফ্লার্টচরিত্রের হওয়াটাই লখনউয়ের প্রেক্ষাপট ধারণ করল জটিলতার, টেনশনের। যেমন পারস্পরিক শত্রুতার সৃষ্টি হল রোমিও-ভরদ্বাজ-রানাজির মধ্যে, তেমনই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলেন রুমেলা রায়। বিবস্বান বসুর সঙ্গে তাঁর দশ বছরের সম্পর্ক, তা অবৈধ হলেও ফিল্মলাইনে এ ধরনের অ্যাফেয়ার খুবই চালু, বাইরে আউটডোর করতে বেরুলে সে-সম্পর্ক আরও গাঢ়, রঙিন হয়ে ওঠে। এবারও সেরকমটি হওয়ার কথা, অমৃতসর মেলে টিকিটও কাটা হয়েছিল সেরকমই, কিন্তু কোথা থেকে বর্ণনা এসে জুড়ে বসল বিবস্বান বসুর মন ও শরীর। সে-সম্পর্ক আরও কায়েম হল লখনউয়ে এসে।

বিবস্বান বসু, নাকি বর্ণনা, কাকে টাইট দেওয়ার জন্য কে জানে, রুমেলা রায় হঠাৎ হোটেল ইনে আমদানি করলেন ক্যাপ্টেনকে। ক্যাপ্টেন পটভূমিতে আসার পর আরও জটিল হল রহস্য।

বর্ণনাকে পাওয়ার জন্য একদিকে যখন লড়াই চলেছে ভরদ্বাজ-রানাজি-রোমিওর মধ্যে, তখন তার বিরুদ্ধে ক্ষোভে, ক্রোধে তোলপাড় হচ্ছেন রুমেলা। ক্যাপ্টেন সম্পর্কে কারও তেমন জানা নেই, লোকটি কেমন, তাঁর সঙ্গে রুমেলারই বা কী সম্পর্ক হঠাৎ, কেনই বা তিনি আবির্ভূত হলেন পটভূমিতে তার তালহদিস করা ভারি শক্ত লাগল সবার কাছে।

তবে সবচেয়ে টানাপোড়েন চলছিল রানাজি-রোমিও-ভরদ্বাজের মধ্যে। তিনজন তিনরকম চরিত্রের, ভরদ্বাজ অবস্থাপন্ন ঘরের বখে-যাওয়া স্বভাবের, রানাজির স্বভাব উঠতি-নায়িকাদের নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করা, আর রোমিও আদ্যোপান্ত প্রেমিক, কিন্তু তার ভেতরে প্রবহমান ফল্গুর মতো অন্তঃসলিলা ক্রোধ। হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ির নীচে বর্ণনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে সেভেন্‌থ্‌ সেপ্টেম্বর মধ্য রাত্রি পর্যন্ত রোমিও বর্ণনা-ভাবনায় এত বেশি মগ্ন ছিল যে, তাতে বহু টেনশনের মুহূর্ত তৈরি হয়ে গেল হোটেল ইনের ঘরে ও বাইরে।

বর্ণনাকে নিয়ে এতগুলি পুরুষ ও নারীর মধ্যে এক ভয়ংকর জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার অবশ্যম্ভাবী কারণে মধ্য রাতে খুন হল বর্ণনা—এ কথাটাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল তখন। ভেবেছিলাম প্রথম খুনটি যদি অর্থসম্পদের কারণে হয়ে থাকে তো দ্বিতীয় খুনটি হল ত্রিভুজ অথবা চতুর্ভুজ প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। তখন অবশ্য একেবারেই ভাবা যায়নি প্রথম খুন ও দ্বিতীয় খুনের মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে কি নেই। আমাদের সামনে তথ্য শুধু একটাই, দুটো খুনের ক্ষেত্রেই সিনেমুভির সদস্যরাই সম্ভবত কোনও না কোনওভাবে জড়িত। তবে সুইসাইড নোটের হস্তাক্ষর একই ব্যক্তির।

সিনেমুভির বেশির ভাগ সদস্যই তখনও অনুমান করতে পারছে না দু-দুটো খুন কেন হল, ভেতরের রহস্যটাই বা কী! নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে, গোপনে নানা কথা ভাবছে, সেইসঙ্গে 'আমাদেরই মধ্যে কেউ?' একথা ভেবে যেমন আতঙ্কিত হচ্ছে, শিউরে উঠছে, তেমনই চাপা দিতে চাইছে পাছে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ে এই ভয়ে।

ঠিক এরকম একটা পরিস্থিতিতে আমার কাছে যখন রেশমবাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করার প্রস্তাব এল, সেইমুহূর্তে ভালমন্দ কিছু না ভেবেই আমি রাজি হয়ে গেলাম অভিনয় করতে। তেমন ভাবে অভিনয় করিনি কখনও, কোনও দিন অভিনয় করতে হবে তা ভাবিওনি এতকাল, পারব কি পারব না তাও চিন্তা করিনি, আমার তখন একটাই লক্ষ্য একটি জলজ্যান্ত যুবতী আমাদের রুমের পাশের কোনও একটা রুমে খুন হয়ে গেল, পুলিশ বহু তদন্ত, জেরা, জোরাজুরি করেও কূলকিনারা কিছু খুঁজে পাচ্ছে না, এ ক্ষেত্রে আমাকে একটা চেষ্টা করে দেখতে হবে, হত্যারহস্য দুটির কোনও ভাবে থই পাওয়া যায় কি না। আমি জানতাম, এসব কাজে প্রচণ্ড ঝুঁকি, জীবনহানির আশঙ্কাও পায়ে-পায়ে, তা ছাড়া এ সম্ভাবনাও ভেবে রেখেছিলাম, সায়ন আমার এই অনধিকারচর্চা হয়তো পছন্দ করবে না, বিশেষ করে বাইজির ভূমিকায় আমার অভিনয় করাটা। এতসব ভেবেও রাজি হয়ে গেলাম রোমিওর এই অভাবনীয় প্রস্তাবে, কেননা আমার জানাই ছিল যে, এই জটিল রহস্যগুলি ভেদ করতে গেলে সিনেমুভির দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যেই আমাকে সেঁধিয়ে যেতে হবে।

পুলিশ-ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল এসে পৌঁছলেন ঠিক এরকম সময়, সুস্নাত-হত্যার সূত্র ধরে খোঁজ করতে করতে বর্ণনাকে গ্রেপ্তার করার অভিপ্রায়ে। দেবাদ্রি নিশ্চিত ছিলেন বর্ণনাই হত্যা করেছে ডাক্তারকে, এসে দেখলেন যতটা সহজ বা সরল ভেবেছিলেন সুস্নাত-হত্যার প্রেক্ষাপট, ঘটনাটা তার চেয়ে ঢের ঢের সূক্ষ্ম জটিল, গোলমেলে। কেননা হত্যাকারী হিসেবে যাকে টার্গেট করে এসেছিলেন, সে নিজেই খুন হয়ে গেছে তার আগের দিন মাঝরাতের পর। বিষয়টা আরও জট পাকিয়ে গেল বর্ণনার খোঁজে লখনউ ছুটে আসা বিটন তালুকদারের কাছ থেকে সুইসাইড নোট লেখা দুটি চিরকুট উদ্ধারের পর।

এই চিরকুটগুলিই হল রহস্য ভেদের প্রধান অন্তরায়। মোট ছটি এরকম চিরকুট উদ্ধার করা

গেল, সুস্নাতর ডেডবডির পাশে দুটি, সুস্নাতর ঘরে যে-লেডিজ হ্যান্ডব্যাগটি পাওয়া গেল তার ভেতর থেকে দুটি, আর বিটন তালুকদারের কাছ থেকে আরও দুটো একই হস্তাক্ষরের চিরকুট। সব কটি চিরকুটেই যেহেতু একই ব্যক্তির হাতের লেখা তার থেকে দুটো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়। প্রথমত, দুটি হত্যার ক্ষেত্রেই খুনি একই ব্যক্তি, দ্বিতীয়ত, খুনি চেয়েছিল দুটি হত্যাকেই আত্মহত্যা বলে পুলিশের চোখে প্রতিপন্ন করতে। কিন্তু দুবারই ব্যর্থ হল প্রধানত চিরকুটে একই হাতের লেখা প্রমাণিত হওয়ায়। হাতের লেখাটা যদি বর্ণনার হত, তবে ভাবা যেত, হয়তো বর্ণনাই সুস্নাত তালুকদারকে হত্যা করে তার ডেডবডির পাশে লিখে রেখেছিল একটি চিরকুট, তারপর নিজে সুইসাইড করার আগে সেই একই চিরকুট লেখার ফলেই আমরা একই হাতের লেখা পেলাম। কিন্তু পরে জানা গেল, চিরকুটের হাতের লেখা আদৌ বর্ণনার নয়।

সুতরাং চিরকুটের বিষয়টাই সৃষ্টি করল এক অদ্ভুত ধোঁয়াশার। একই সঙ্গে সিনেমুভির অনেক সদস্যই ঘুরেফিরে সন্দেহভাজনদের তালিকায় পড়লেন। সিরিয়ালের নায়ক-নায়িকা-পরিচালক সবাইই অদ্ভুত আচরণ করে নজর কাড়লেন আমাদের। সিনেমুভির সদস্য ছাড়া আর যারা ছিলেন তাদের মধ্যে বিটন তালুকদার, সার্বিক আর লাভলীনও তালিকার বাইরে রইল না। যাদের সন্দেহভাজন বলে মনে করা হল, সেই চরিত্রগুলির মোটিভ আর আচার-আচরণ নিয়ে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা যাক একে-একে।

দুটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য যাদের ওপর আমার সবচেয়ে বেশি নজর ছিল, তাদের মধ্যে বিটন তালুকদার, রানাজি সান্যাল আর ভরদ্বাজ মুখার্জিই প্রধান। যথেষ্ট সামাজিক কুখ্যাতি আছে বিটন তালুকদারের, ব্যবসায়ী হলেও এলাকায় মাস্তান হিসেবে পরিচিত, তার পক্ষেই সুস্নাত তালুকদারের সঞ্চিত অর্থসম্পদ পাওয়ার ইচ্ছেটা প্রবল হওয়া সম্ভব। এরকম হতেই পারে যে, প্রায়-বৃদ্ধ ডাক্তার যুবতী মেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন শেষবয়সে, হয়তো তারাই ডাক্তারের মাথায় টুপি পরিয়ে অতগুলো টাকা হাতিয়ে নেবে এই আশঙ্কায় সে ফুরসত বুঝে চাপ সৃষ্টি করে চলেছিল ডাক্তারের ওপর। শেষে মরিয়া হয়ে খুন করল জ্যাঠাকে, কিন্তু দেখল তার আগেই টাকাটা উধাও। খোঁজখবর করে অনুমান করল সম্ভবত বর্ণনাই হাতিয়েছে টাকাটা, তখন তার পিছু ধাওয়া করে সোজা লখনউ আর এখানে এসেও যখন বর্ণনার কাছ থেকে টাকাটা আদায় করতে পারল না, তখন রাগে উন্মত্ত হয়ে তাকে খুন করাটা খুবই স্বাভাবিক। তার কাছে দুটি একই হাতের লেখার চিরকুট পাওয়া যাওয়ায় সে-ই যে হত্যাদুটি আত্মহত্যার ঘটনা হিসেবে সাজাতে পারে তা ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে চিরকুটের হাতের লেখা তারও নয়, সেজন্য অবশ্য তাকে সন্দেহভাজনদের তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছি না।

ঠিক তার পরের নামটিই রানাজি সান্যালের। বস্তুত রানাজি খুবই বিতর্কিত চরিত্রের, তার সম্পর্কে আগেই বলেছি, সে-প্রসঙ্গে আর একবার আলোচনা করার আগে আমরা ভরদ্বাজ মুখার্জির উপস্থিতি বিশ্লেষণ করি।

ভরদ্বাজ একজন বড়লোকের যাওয়া ছেলে বখে যে তার পরিচালক-কাকার কাঁধে ভর করে সিনেমা লাইনের জুস খাওয়ার জন্য ঘুরঘুর করে। তার নিজস্ব কোন চিন্তাভাবনা নেই, ব্লান্ট-হেডেড ললিপ-ধরনের এই যুবকটি সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও ধারণা করা মুশকিল। ঋষভ মুখার্জির তিরিক্ষি-মেজাজকে সে বেশ ভয় পায়, কিন্তু তাঁর যে-কোনও-আদেশ মান্য করে যাতে তাঁর গুডবুকে থেকে নিশ্চিত করতে পারে তার টিমে থাকাটা, যদিও তাতেও গড়বড় করে ফেলে প্রায়শ তার বদস্বভাবের সুবাদে। তখন কোপে পড়ে পরিচালকের। রানাজির সঙ্গে সে একটা

ভাল সম্পর্ক রাখতে চায় যেহেতু রানাজি বেশ করিতকর্মা, রিসোর্সফুল। কিন্তু তাদের সেই মধু-সম্পর্কিত আঁতাত হঠাৎ টাল খেয়ে গেল বর্ণনা-নাম্নী একটি আগুনের টুকরো তাদের মাঝখানে এসে যাওয়ায়।

ভরদ্বাজ এমন একটি চরিত্র যার পক্ষে রানাজির পাল্লায় পড়ে যেমন সুস্নাত-হত্যার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়াটা সম্ভব, তেমনই লখনউ এসে বর্ণনার পিছুপিছু ছুঁকছুঁক করে ঘুরে হালে পানি না পাওয়ায় রাগে অন্ধ হয়ে তাকে খুন করতেও পিছপা হবে না। ভরদ্বাজ সেভেনথ সেপ্টেম্বর রাতে বর্ণনার ঘরে গিয়েছিল তা সে নিজেই স্বীকার করেছে, বর্ণনা যে তার গলা থেকে যিশুর লকেটঅলা হারটা খুলে নিয়েছিল গল্প করতে করতে তাও এখন আর অজানা নয়। কিন্তু চটুল ধুরন্ধর বর্ণনা তার কাছে ধরা দেয়নি, তাতে সে রাতে সে বর্ণনাকে --

তবে ভরদ্বাজের চেয়েও যে-যুবক বর্ণনাকে না-পাওয়ার যন্ত্রণায় রাগে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল সে-রাতে, সে রোমিও! সিনেমুভির টিমে সত্যিকারের একমাত্র প্রেমিক চরিত্র এই যুবক ক্যামেরাম্যানটি। সিনেমুভির আরও কারও কারও মতো বর্ণনাকে ভোগ করতে নয়, ভালবাসতেই চেয়েছিল রোমিও। বর্ণনারও হয়তো কিছুটা দুর্বলতা এসে গিয়েছিল রোমিওর প্রতি, যদিও ব্যাপারটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। বর্ণনা তার চরিত্রানুযায়ী সিনেমুভির আরও অনেককেই সঙ্গ দিতে শুরু করেছিল। আর আশ্চর্য, এ-ব্যাপারটা কৈশোর থেকেই এত ভালভাবে রপ্ত করে ফেলেছিল যে, সঙ্গ দেওয়াতেই তার যত উল্লাস, ভালবাসায় তত নয়। কেউ তাকে ভালবাসলে সে উপভোগ করে ঠিকই, কিন্তু প্রেমের সিরিয়াসনেস তার ভেতরে কখনই ছিল না বলে তার অগুনতি প্রেমিকদের কপালে শুধু যন্ত্রণাই। অফিস ক্লাবে অভিনয় করার সময় সে বহু পুরুষের মাথা ঘুরিয়েছে, ঘাড়ও ভেঙেছে কারও কারও, কিন্তু কারও কাছে পুরোপুরি ধরা না দেওয়ার যে আশ্চর্য কৌশলটি সে আবিষ্কার করেছিল, তাতে বিবস্বান বসুর মতো পুরুষদের সুবিধে হয়, জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যায় রোমিওর মতো প্রেমিকরা। রোমিও তার যৌবনের একেবারে প্রথমে একবার ঘা খেয়েছিল এক অবৈধ প্রেমের জ্বালায়, তারপর বর্ণনাও যখন তার কাছে ধরা দিচ্ছে অথচ দিচ্ছে না এমন একটা অদ্ভুত খেলায় মেতে উঠল, তখন তার সমস্ত শরীর ঘিরে শুধু ক্রোধ আর ক্রোধ। ঘটনার দিন রাতে রোমিওকে তার ঘরে ডেকেছিল বর্ণনা, বলেছিল তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহারটি তুলে দেবে রোমিওর হাতে, সেইমতো রোমিও রাত এগারোটার সময় গিয়েছিল তার ঘরের সামনে। কিন্তু যথারীতি বর্ণনা তখন ব্যস্ত ছিল তার একজন পুরুষকে সঙ্গ দিতে। সে-রাতটা বর্ণনার জীবনে যেমন ঘটনাবহুল, তেমনই রোমিওর। সে-রাতে বর্ণনার জীবন ঘিরে অনেক পুরুষের একজন হল রোমিও, বহুবার ফিরে ফিরে গিয়ে রোমিও যখন বর্ণনার ঘরের প্রবেশপত্র পেল তখন রোমিও অপেক্ষা করে করে ক্ষোভে, বিরক্তিতে, ঈর্ষায় উন্মত্ত।

সে-রাত সত্যিই রোমিওর কাছে তার জীবনের স্মরণীয় রাত। গত কয়েকদিনে বর্ণনার অনেকগুলো ছবি তুলেছিল রোমিও, রূপসী বর্ণনার বিভিন্ন ভঙ্গিমার সেসব ছবি খুবই অপরূপ ছিল, রাগে উন্মত্ত রোমিও সেই ছবিগুলো বর্ণনার সামনেই একটা-একটা করে পুড়িয়েছিল সে রাতে। সে-সব পোড়া ছবির কিছু পাওয়া গিয়েছিল বর্ণনার ঘরে, কিছু তার ঘরের পেছনে, হোটেলের নীচে। ক্রোধী রোমিওর এমনই ছবি-পোড়ানোর স্বভাব, বোধহয় সব শিল্পীই রাগে অন্ধ হলে তার নিজের হাতে গড়া শিল্প এভাবেই ধ্বংস করে নিজের হাতে। বর্ণনার ফ্লার্টচরিত্র তাতে হঠাৎ ধাক্কা খায় সম্ভবত। তার নিজের ফটো এভাবে চোখের সামনে পুড়তে দেখে হয়তো নাড়া খেয়েছিল তার চরিত্রহীন স্বভাব। আর তার পরেই সে ধরা দিয়েছিল রোমিওর কাছে।

হয়তো মন বদলেছিল তার। সে-রাতে সে রোমিওর হয়েছিল। রোমিওর কাছে সে এক পরম পাওয়া। বর্ণনার দেওয়া সেই উপহার তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। তারও অনেকক্ষণ পর সে ফিরে গিয়েছিল তার বিছানায়। দ্বিত্বম জানেও, কখন রোমিও ফিরে এসেছিল তার পাশের খাটটিতে। কিন্তু রোমিওকে সে দেখেছিল প্রায় মাতাল অবস্থায়। না, মদ্যপানের নেশায় নয়। অন্য কোনও আশ্চর্য কারণে যেন টলমল করছিল তার নিশিজাগা শরীর।

কেন তার এই টলায়মান চেহারা, তা নিয়ে অবশ্যই গবেষণা চলতে পারে অনুসন্ধিৎসু মানুষদের ভেতর। এমনও হতে পারে, বর্ণনার বহুগামিতা ভেতরে ভেতরে হিংস্র করে তুলেছিল রোমিওকে। যে-মুহূর্তে বর্ণনাকে তার নিজের করে পেল, সেই মুহূর্তটিকেই স্মরণীয় করে রাখার জন্য সে বর্ণনাকে তারপর স্তব্ধ করে দিয়েছিল চিরকালের মতো। যাতে বর্ণনা আর কখনও কারও না হতে পারে। বর্ণনার জীবনে সে-ই হবে শেষতম পুরুষ।

আসলে রোমিওর জিনের চরিত্রটিই বোধহয় এমনই অদ্ভুত আর অন্যরকম। নইলে আগের মুহূর্তে যে-রোমিও হিংস্রতম হয়ে অমন সুন্দর ফটোগুলো পোড়াতে পারে, সে-ই আবার পরমুহূর্তে কী ভাবে গ্রহণ করে বর্ণনাকে! অতএব তার পরবর্তী মুহূর্তে সে যে পুনর্বার হিংস্র না হয়েছিল তারই বা গ্যারান্টি কোথায়!

রোমিও সম্পর্কে একটি প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে রেখে আমরা চলে আসি বিবস্বান বসুর রহস্যময় ভূমিকাটি খতিয়ে দেখতে। বিবস্বান এই সিরিয়ালের নায়ক, তিনি যথেষ্ট খ্যাতিমান, তার ওপর অতীব সুদর্শন, সুপুরুষ। ফলে তাঁর ওপর মেয়েদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকবেই। কিন্তু বিখ্যাত ব্যক্তিত্বেরা যদি নারীশিকারি হন, সেক্ষেত্রে তাঁর জীবনে একের পর এক অনুপ্রবেশ ঘটবে অন্য নারীর, যারা পতঙ্গের মতো ছুটে এসে পুড়তে চাইবে তাঁদের খ্যাতির আগুনে। বিবস্বানের জীবনে এভাবেই একসময় এসেছিলেন রূপসী অভিনেত্রী রুমেলা রায়, পরে-পরে আরও অনেক নারী, তাদেরই মধ্যে একজন বর্ণনা। উঠতি-অভিনেত্রী বর্ণনার ওপর স্বভাবতই দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল বিবস্বানের। ফলে অপেক্ষাকৃত বর্ষীয়ান রুমেলা প্রবলভাবে খেপে ওঠেন বিবস্বানের ওপর। সেই ক্রোধ বিস্ফোরিত হয় যখন অমৃতসর মেলে ওঠার পর থেকে বর্ণনার কবলে আত্মসমর্পণ করেন বিবস্বান। তবে বলা যায়, আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন বিবস্বান। আসলে বর্ণনা কলকাতা থাকতেই বিবস্বানের কিছু দুর্বলতার কথা জেনে ফেলেছিল, তার একটি বিবস্বানের স্ত্রীর গায়ে আগুন লাগানোর ঘটনাটি। আমি যতদূর খোঁজখবর নিতে পেরেছি, তাতে জানা গেল, বিবস্বানের স্ত্রীর এই গায়ে আগুন লাগানোর পেছনে সেসময় নেপথ্যনায়িকা হিসেবে ছিলেন রুমেলা রায়। আর তখন বিবস্বানের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে থাকা বর্ণনা কোনওভাবে আবিষ্কার করে ফেলেছিল সেই অপ্রিয় ঘটনাটি। সেই জানাটাই ছিল তার ট্রাম্প কার্ড। বলা যায় বর্ণনা শেষদিকে ব্ল্যাকমেল করেই রেইন করছিল বিবস্বান বসুর উপর।

বর্ণনার হত্যাকারী হিসেবে বিবস্বান বসুর নাম মনে করার কিন্তু যথেষ্ট কারণ আছে। একেই তো বর্ণনা তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করে হঠিয়ে দিয়েছিল রুমেলা রায় নামের জাঁদরেল অভিনেত্রীটিকে, তাতে ক্রমশ অসহায় হয়ে পড়েছিলেন বিবস্বান, দেখছিলেন রুমেলা রায় ফার্নেস হতে হতে হয়ে উঠছিলেন এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। তার ওপর রুমেলা রায় কোত্থেকে জোগাড় করে ফেললেন ক্যাপ্টেন নামের এক প্রাক্তন বন্ধুকে। হয়তো রুমেলা রায় আরও কোনওভাবে থ্রেট করে থাকবেন বিবস্বানকে, যার ফলে বিবস্বান মুক্তি পেতে চাইছিলেন বর্ণনার খপ্পর থেকে।

ঘটনার দিন সন্ধেয় বর্ণনা দিয়েছিল বিবস্বানের ঘরে। তার কাছে তখন সেই ভ্যানিটি-ব্যাগটি

যেটি আমি চুরি করে আনি বিবস্বানের রুমের আলমারি থেকে। কেন বর্ণনা সেই সন্ধেয় বিবস্বানের ঘরে ভ্যানিটি-ব্যাগ রাখতে গিয়েছিল, সে-কাহিনীতে আমি পরে আসছি। তবে বর্ণনার সঙ্গে বিবস্বানের সে-রাতে দেখা হওয়ার সেটাই শেষ ঘটনা নয়, রাত্রি গভীর হলে বিবস্বানকে আবার যেতে হয়েছিল বর্ণনার ঘরে। শুধু গিয়েছিলেন তাই নয়, বর্ণনার সঙ্গে বহুক্ষণ ড্রিঙ্কও করেছিলেন মধ্যরাতে।

অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত বর্ণনার ঘরে সে-রাতে কে কখন ঢুকেছিলেন, কী উদ্দেশ্যে, তার একটা তথ্যপঞ্জি তৈরি করলে তাজ্জবই হতে হবে আমাদের। রাত্রি ন'টা নাগাদ বর্ণনা কিছুটা ত্রস্ত, কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে বিবস্বানের ঘরে গিয়েছিল তার ভ্যানিটি-ব্যাগ রাখতে। সেখানে রাতে থাকার অনুমতি না পাওয়ায় বিবস্বানের আলমারির মধ্যে ব্যাগটা লুকিয়ে রেখে সে ফিরে এসেছিল তার ঘরে। তার একটু পরেই ভরদ্বাজ মুখার্জি গিয়েছিল ভাব জমাতে, সেসময় ভরদ্বাজের সঙ্গে গল্প করতে করতে তার গলা থেকে যিশুর লকেটঅলা সোনার চেনটা খুলে নেয় বর্ণনা। সে-দৃশ্য রানাজি দেখতে পায় বাইরে থেকে। ভরদ্বাজ বেরনোর পর কিছুক্ষণ দরজা বন্ধ ছিল বর্ণনার। সম্ভবত ভেতরে কেউ ছিল। কে ছিল সেটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক এসময় রুমেলা আর ক্যাপ্টেন হোটেলে ফিরলেন রীতিমতো টলায়মান অবস্থায়, দুজনে হাত ধরাধরি করে ঢুকে গেলেন রুমেলার ঘরে। সে-দৃশ্য রোমিও দেখে। তার একটু পরেই রানাজি আর ভরদ্বাজকে দেখা যায় হোটেলের লনে কলহরত। রোমিও তাদের খোঁজে নীচে যায়, কিন্তু কাউকেই পায় না। ফিরে এসে এগারোটা বাজতেই বর্ণনার দরজা ঠেলে। তখনও ঘর বন্ধ, ভেতরে ক্যাসেট চালানো, সেইসঙ্গে কোনও পুরুষের কণ্ঠস্বর। রোমিও আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে যায়। ইতিমধ্যে বর্ণনার ঘর থেকে ড্রিঙ্ক করে বেরিয়ে আসেন বিবস্বান বসু। রোমিও ফিরে এসে দেখে বর্ণনার ঘর খোলা। সেখানে রোমিও ফটো পোড়ায়, পরে ভাবও হয়ে যায় বর্ণনার সঙ্গে, তারপর—

গার্গী চারপাশে তাকিয়ে হাসল একবার, রোমিওই কিন্তু বর্ণনার ঘরে শেষ ব্যক্তি নয়, তারপর আরও একজন—

চকবাজারের বাইজিবাড়ির এক কোঠিতে একঘর শ্রোতার সামনে গার্গী তখন তার বিশ্লেষণের জাল মেলে ধরছে একটু একটু করে, কিন্তু পুলিশ-ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল তাতে একটুও সন্তুষ্ট না হয়ে তাঁর লম্বা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, এখনও কিন্তু আপনি শুধু অনুমানের উপর ভিত্তি করে হত্যাকারীর সন্ধান করছেন, একটিও প্রমাণ হাজির করতে পারেননি, মিসেস চৌধুরি।

গার্গী একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলে একটু থেমেছিল দম নিতে, এবার হেসে বলল, সেই প্রসঙ্গেই এখন আসছি, মিঃ সান্যাল। এখনও তো বলিনি এঁদের মধ্যে কে হত্যাকারী, কী সেই রহস্যময় কারণ যার জন্য এতগুলো মানুষ খুন হয়ে গেল কয়েকদিনের মধ্যে। অকাট্য প্রমাণ হাজির করেই আমার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করব আপনাদের সামনে। মনে আছে নিশ্চয়ই, আমি আগেই বলেছি, সিরিয়াল তৈরি করার সময় পরিচালক ঋষভ মুখার্জি টাকার জন্য দুজন মানুষের উপর নির্ভর করেছিলেন প্রধানত, তাঁদের একজন হলেন তাঁর বহুকালের পুরনো বন্ধু, দাবা খেলার সঙ্গী ডঃ সুস্নাত তালুকদার, অন্যজন সিনেমা লাইনের এক পোড়-খাওয়া ধুরন্ধর ব্যক্তি রানাজি সান্যাল। বন্ধু সুস্নাতর সঙ্গে ঋষভের একটা কথা হয়েছিল, কথার উপর ভিত্তি করে বহুকাল পর তিনি সম্মত হয়েছিলেন একটি টিভি সিরিয়াল করতে। সুস্নাত বলেছিলেন, অন্তত দশ-বারো লক্ষ টাকা তিনি ঋষভের সিরিয়ালের জন্য দেবেন, তা শুনে রানাজি জানিয়েছিলেন তিনি বাকি টাকাটা

জোগাড় করে দেবেন, এবং ছবির মার্কেটিঙের দায়িত্বও তাঁর। সিনেমুভির টিমের সঙ্গে কথাবার্তায় যেটুকু জানতে পেরেছি, তাতে সুস্নাত তাঁর বন্ধুর এই সিরিয়ালটিতে টাকা ঢালতে রাজি হয়েছিলেন দুটি কারণে, একটি—ঋষভের প্রতিভার উপর তাঁর অগাধ আস্থা, তাই তাঁর কেরিয়ারে একটা ব্রেক দেওয়া, দ্বিতীয় কারণটিই অবশ্য আসল, সিরিয়ালের নায়িকা হিসেবে বর্ণনাকে মনোনীত করা। বর্ণনা তখন ডাক্তারের জীবনে একটা মস্ত পাখনা মেলে তাঁকে ছায়া দিচ্ছে। তুখোড় তরুণীটি জানে, ডাক্তারের অনেক টাকাপয়সা, তাঁর কোনও উত্তরাধিকারী নেই, সেই টাকায় সে অনায়াসে তার অভীষ্ট অ্যাম্বিশন ফলপ্রসূ করতে পারে, অতএব তার বায়নাক্কায় সুস্নাত রাজি হয়ে গেলেন তাঁর কষ্টার্জিত টাকা ঋষভের সিরিয়ালে ঢালতে।

ঋষভ সেভাবেই তাঁর স্ক্রিপ্ট লিখলেন, রানাজিকেও দায়িত্ব দিলেন টিম তৈরি করতে। রানাজি এগুচ্ছিলেনও সেভাবে, কিন্তু এর মধ্যে কয়েকটা বিপত্তি ঘটে গেল, যার প্রথমটা ঘটাল বর্ণনা। বর্ণনা যে-মুহূর্তে জেনে গেল, সুস্নাত রাজি হয়েছেন সিরিয়াল প্রোডিউস করতে, আর ঋষভ তার পরিচালক ও রানাজি প্রোডাকশন ম্যানেজার, তৎক্ষণাৎ সে তার চরিত্রানুযায়ী সঙ্গ দিতে শুরু করল রানাজিকে। ব্যাপারটা কিন্তু পছন্দ করলেন না সুস্নাত তালুকদার। দ্বিতীয় বিপত্তি ঘটালেন লাভলীন তালুকদার। লাভলীন রূপসী মহিলা, ফিল্ম বা সিরিয়ালে নামার উচ্চাকাঙক্ষায় আক্রান্ত, যখন জানতে পারলেন, যে-জ্যাঠাশ্বশুর প্রায়শ সন্ধের পর ছুটে আসেন তার 'সান্নিধ্য' নিতে, তিনিই হচ্ছেন সিরিয়ালের প্রযোজক, তখন সুযোগ বুঝে তাঁর কাছে আবদার ধরলেন তাঁকেই সিরিয়ালের নায়িকা করতে হবে।

ডাক্তারের পক্ষে তখন সিদ্ধান্ত নেওয়াই দায়, তিনি তখন ঋষভ মুখার্জিকে দেখিয়ে জানালেন নায়িকা নির্বাচনের দায়িত্ব পরিচালকেরই, অথচ ঋষভ মুখার্জিকে গোপনে ইশারা করে দিলেন তিনি যেন বর্ণনাকেই নির্বাচিত করেন নায়িকা হিসেবে, লাভলীনকে নয়। ঋষভ চালাক মানুষ, তিনি এ-ব্যাপারটা চাপিয়ে দিলেন রানাজি সান্যালের ওপর। এরকম একটা লোভনীয় দায়িত্ব হাতে পেয়ে রানাজি তখন বর্ণনা আর লাভলীনকে দুই হাতে জাগলিং করছেন তাঁদের সামনে নায়িকা হওয়ার টোপ ফেলে।

ঋষভ শুধু নায়িকা নির্বাচনের দায়িত্বই রানাজিকে দিয়েছিলেন তা নয়, সুস্নাত তালুকদারের সঙ্গে টাকাপয়সা সংক্রান্ত কথাবার্তার ভারও দিলেন যাতে এই অপ্রিয় ঝামেলা থেকে দূরত্বে থাকতে পারেন। এ-ব্যাপারটাও রানাজি ভালই ট্যাক্‌ল্ করতে পারেন, ডাক্তারকে পটিয়ে কীভাবে টাকা আদায় করতে হয়, সে কলাকৌশলও তার করায়ত্ত। সবকিছু এগুচ্ছিলও ঠিকঠাক, ঠিক সেসময় প্রথমে গোলমাল বাধালেন রানাজি নিজেই। ডাক্তারের সঙ্গে লেনদেনের কথাবার্তা চালানোর ফাঁকে ফাঁকে তিনি একটু হাত লম্বা করেছিলেন বর্ণনা আর লাভলীনের দিকে। নারী-সম্পর্কিত দুর্নাম তাঁর বরাবরের, এর আগেও দক্ষিণ ভারতের কোনও সমুদ্রে স্নান করতে নেমে এক উঠতি নায়িকাকে ডুবিয়ে মারার অভিযোগ তাঁর নামে আছে, নতুন সিরিয়ালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একসঙ্গে জোড়া-সুন্দরী হাতের কাছে পেয়ে এমন বাড়াবাড়ি করে ফেললেন যে তাতে ভারি চটে গেলেন প্রযোজক। হঠাৎই বেঁকে বসে বললেন তিনি আর টাকা দেবেন না।

গোলমালের সূত্রপাত ঠিক এখান থেকেই।



ডঃ সুস্নাত তালুকদার হঠাৎই এ ভাবে শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসায় ভারী ঝামেলায় পড়লেন রানাজি। অনেক চেষ্টা করেও ডাক্তারকে রাজি করাতে না পেরে ঋষভকে জানালেন ঘটনাটা। ঋষভ প্রথমে অবাক হলেন বন্ধুর এই আকস্মিক মত পরিবর্তনে, অতঃপর নিজে অনুরোধ করে ফোর্থ সেপ্টেম্বর সকালেও দু'-লাখ টাকার বেশি আদায় করতে পারলেন না বন্ধুর কাছ থেকে।

ঘটনাটা সিনেমুভির প্রায় কোনও সদস্যই জানতেন না। ঋষভ যেমন চিন্তায় পড়লেন কী ভাবে শুটিং শেষ করবেন এই ভেবে, তেমনই বাড়া ভাতে ছাই পড়ল রানাজির। সেই সঙ্গে বর্ণনার ভবিষ্যৎও একগলা জলে। এ দিকে লখনউ যাওয়ার দিনক্ষণ সব ঠিকঠাক, টিকিটও কাটা, হোটেল-বুকিংও হয়ে গেছে, কিন্তু খোদ ফিন্যান্সার মোচড় দিচ্ছেন দেখে মাথা চাপড়ালেন ঋষভ, চিন্তায় পড়লেন রানাজি, খেপে গেল বর্ণনা। বেলা বারোটা নাগাদ ঋষভ রানাজিকে ফোন করে ব্যাপারটা জানাতে রানাজি ডাক্তারের কাছে ছুটলেন, সার্বিক ও লাভলীনকে সঙ্গে নিয়ে।

ঠিক এ রকম পরিপ্রেক্ষিতে দিনেদুপুরে নিজের ঘরে খুন হলেন ডাক্তার। সে সময় তাঁর বাড়িতে রান্নার ঠাকুর, বাড়ির কাজের লোক কেউই ছিল না। কিছুদিন যাবৎ দুপুরের দিকে বাড়িতে একা থাকাই পছন্দ করছিলেন ডাক্তার, কারণ এ সময় প্রায়শ বর্ণনা এসে দু'-তিন ঘণ্টা করে থাকছিল তাঁকে সঙ্গ দিতে। বর্ণনা ততদিনে এ-বাড়ির অনেককিছুই জেনে গেছে। কোথায় ডাক্তারের গোপন কুঠুরি যার ভেতর নগদে লক্ষ-লক্ষ টাকা থাকে, কোথায় ব্যাঙ্কের পাশবই, চেকবই, কোথায় আলমারি-সিন্দুকের চাবি, এমনকী কোথায় থাকে রিভলভার, তাও। বলতে গেলে শেষ দিকে বর্ণনাই হয়ে পড়েছিল তাঁর প্রধান অভিভাবক। লক্ষণীয় এই যে, খুনের দিনও দুপুরে বর্ণনা তাঁর কাছে যথারীতি হাজির। একদিকে রানাজি-লাভলীন, সার্বিক, ওদিকে বর্ণনা। তবে লাভলীন আর বর্ণনা সম্ভবত মুখোমুখি হয়নি। তা হলে তাদের যে কেউ হয়তো সে দিন হাসপাতালে যেত বা খুন হয়ে যেত।

কিন্তু এঁদের যে কোন একজনকেই সুস্নাতর খুনি হিসেবে ভাবা যেতে পারে। তবে আমি নিশ্চিত বর্ণনা খুন করেনি। সে অবশ্য খুনের অন্যতম সাক্ষী।

ঠিক এই সময় রানাজি উসখুস করে বলে উঠলেন, তা হলে কি আপনি বলতে চান, আমিই খুনটা করেছিলাম।

—সে কথা একটু পরেই জানতে পারবেন সবাই। তবে বর্ণনা জানত না হঠাৎ খুন হবেন ডাক্তার। তার সামনেই এহেন একটি সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যাওযার প্রথম দিকে সে নিশ্চয়ই শক্‌ড্‌ হয়েছিল। তার কয়েক দিন আগেই অবশ্য সে ডাক্তারের কাছ থেকে কয়েকটা মোটা

অঙ্কের চেক লিখিয়ে নিয়েছিল প্রতিদিন দুপুরে তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার ফুরসতে। খুনের ব্যাপারটা সে পরে মেনে নিয়েছিল। কারণ খুনি তাকে বুঝিয়েছিল, ডাক্তারের কাছ থেকে যে করেই হোক বাকি টাকাটা আদায় করতে না পারলে সিরিয়াল তোলা যাবে না, তাতে বর্ণনার ভবিষ্যৎও অন্ধকার। তা ছাড়া ডাক্তারের কাছ থেকে চেকগুলো লিখিয়ে নেওয়ার পর সে আর পছন্দও করছিল না বয়স্ক লোকটিকে। ডাক্তার খুন হওয়ায় সেও যেন মুক্তি পেয়ে গেল আপাতত।

ডাক্তারকে তাঁরই রিভলভার দিয়ে খুন করে হত্যাকারী তখন চেষ্টা করল, গোটা ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে সাজাতে। খুনিও হয়তো ভাবেনি শেষপর্যন্ত মার্ডার করতে হবে ডাক্তারকে। কিছুক্ষণ কথা-কাটাকাটির পর হঠাৎই রেগে গিয়ে—

খুবই অপরিকল্পিত হত্যা, খুনি অন্তত পাঁচটা চিরকুট লিখেছিল তাড়াহুড়ো করে, কেনই বা এতগুলো চিরকুট তা ঠিক বোধগম্য হয়নি আমার। সম্ভবত আত্মহত্যার বয়ানটা ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না তাঁর, লিখছিলেন আর ফেলে দিচ্ছিলেন পাশে। এহেন অস্থিরতায় মেঝে ছড়িয়ে রইল সেগুলো, সেটা কিন্তু খেয়াল করল না খুনি, ততক্ষণে তিনি ডাক্তারের জমানো কয়েক লক্ষ টাকা, ব্যাঙ্কের চেক, পাশবই ইত্যাদি ভর্তি করে নিয়েছেন কয়েকটা ব্যাগে। বেরিয়ে আসার সময় দুটো চিরকুট বর্ণনার চোখে পড়ে যাওয়ায় সে তার ব্যাগে ভরে নিয়েছিল, কিন্তু পরিস্থিতির ভয়াবহতায় সে এতই ঘাবড়ে গিয়েছিল যে, পালানোর সময় ব্যাগটাই ফেলে এল সেখানে।

অতঃপর দু'জনে সেই টাকা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে দিনরাত খোলা থাকে এমন একটা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত করল খুনির অ্যাকাউন্টে।

বর্ণনা অতএব একই সঙ্গে সুস্নাত-হত্যার সাক্ষী, আবার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত করারও, সে ক্ষেত্রে তাকে খুশি রাখাই খুনির তখন একমাত্র পথ। ব্যাঙ্কের চেক, পাশবই সবই বর্ণনার কাছে দিয়ে রাখল, তাতে খুনির পক্ষে নিরাপদ থাকাও সম্ভব হল, খুশি করাও হল বর্ণনাকে। বর্ণনা অবশ্য বুদ্ধিতে তুখোড়, সে আবার ঋষভের কাছ থেকেও লিখিয়ে নিল কিছু পোস্টডেটেড চেক যাতে লখনউ থেকে ফিরে এসেই ভাঙাতে পারে সেগুলো।

অতঃপর দু'জনে যার-যার বাড়ি গিয়ে ফ্রেশ-ট্রেশ হয়ে অমৃতসর মেল ধরার জন্য হাজির হল হাওড়া স্টেশনে।

এ পর্যন্ত সবই ঠিকঠাক ছিল, হত্যাকারী নিশ্চিত ছিল ডাক্তারের হত্যার ব্যাপারটা আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, তার ধরা পড়ার আর কোনও সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু মুশকিল হল চিরকুটগুলো নিয়ে। খুনির লেখা বাকি চারটে চিরকুটই তখন পড়ে আছে ডাক্তারের ঘরে, দুটো লেডিজ-ব্যাগের ভেতরে, দুটো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে। লেডিজ-হ্যান্ডব্যাগে থাকাটাই সবচেয়ে আতঙ্কের কারণ, কেননা ওটা যে বর্ণনার ব্যাগ তা ধরা পড়ে যাবে পুলিশের চোখে। আর বর্ণনাকে চেপে ধরলেই পরিচয় প্রকাশ হবে পড়বে খুনির।

খুনির প্রথম ভুল হয়েছিল তার নিজের হাতে আত্মহত্যার বয়ানটি লেখা। যদিও তখনও পর্যন্ত তার ধারণা ছিল ডাক্তার ইংরেজিতে প্রেসক্রিপশন লেখেন, তাঁর বাংলা হাতের লেখা কেউ কস্মিনকালেও দেখেনি, অতএব ধরা পড়ার ভয় থাকবে না। দ্বিতীয় ভুলটি হল, দুটো চিরকুট বর্ণনার হ্যান্ডব্যাগের ভেতর পড়ে থাকা। মেঝেয় পড়ে থাকা অন্য দুটো চিরকুট বিটন তালুকদার ঘটনাস্থলে এসে কুড়িয়ে পায়। সে তার পকেটে সে-দুটো রেখে দিয়েছিল পরে পুলিশকে দেখাবে বলে। বিটন ভেবেছিল চিরকুটের হাতের লেখা দেখে পুলিশ নিশ্চয়ই শনাক্ত করতে পারবে হত্যাকারীকে, পরিবর্তে তার কাছে চিরকুট দুটো পাওয়া যাওয়ায় তাকেই গারদে পুরেছিল

পুলিশ। কী যে দুর্দশা হয়েছিল বিটনের!

লখনউ আসার পর খুনি প্রথমে ভেবেছিল বর্ণনার ওপরই দায়ভার চাপিয়ে দেবে খুনের। কিন্তু অসুবিধেয় পড়ে গেল বর্ণনার কাছে ব্যাঙ্ক-সম্পর্কিত তার যাবতীয় কীর্তিকলাপ রয়ে যাওয়ায়। তার বাঁচার তখন একমাত্র উপায় হল যেভাবেই হোক বর্ণনার হেপাজত থেকে সেগুলো উদ্ধার করা। কিন্তু লখনউয়ের হোটেলে এত-এত লোকের ভিড়ে না পারছে বর্ণনার ওপর চাপসৃষ্টি করতে, না পারছে তার কাছ থেকে সেগুলো আদায় করতে। বাধ্য হয়ে রাতের বেলা সবার চোখের আড়ালে তার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে চাপ সৃষ্টি করছিল রোজ। সেই জন্যই বর্ণনার ঘর রোমিও নির্দিষ্ট সময়ে খোলা পায়নি পরপর দুটো রাতেই।

খুবই ঝামেলায় পড়ে গেল বর্ণনা। সে জানত, যতক্ষণ এই চেকবই পাশবই তার কাছে থাকবে, ততক্ষণই সে নিরাপদ। ও-দিকে রোমিওকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছে-কিন্তু খুনি তার ঘরে থাকার কারণে দরজা বন্ধ রাখতে হচ্ছে তাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চাপান-উতোর চলছে দু'জনের মধ্যে। হুমকিও দিচ্ছে খুনি। পাছে সেই তর্কবিতর্ক জানাজানি হয়ে যায়, তাই নাচের রিহার্সালের একটা ক্যাসেট অন করে রাখত টেপ-রেকর্ডারে। খুনির হুমকিতে বিপন্ন হয়ে বর্ণনা সেই চেকবই আর পাশবই একটা ব্যাগে ভরে শরণাপন্ন হল বিবস্বান বসুর, তাঁর কাছে আশ্রয় চেয়েছিল রাতের বেলা, কিন্তু হয়তো রুমেলার সঙ্গে বোঝাপড়ার কারণেই বিবস্বান সে-রাতে থাকতে দিতে চাননি বর্ণনাকে। বাধ্য হয়ে বিবস্বানের চোখের আড়ালে তাঁরই আলমারির মধ্যে ব্যাগটা গুঁজে রেখে বর্ণনা ফিরে যায় নিজের ঘরে।

খুনি যখন বর্ণনার কাছ থেকে চেক আর পাশবই উদ্ধার করতে পারল না, উপরন্তু বর্ণনা তাকে হুমকি দিল বেশি বাড়াবাড়ি করলে পুলিশকে জানিয়ে দেব সব কথা, তখনই খুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে বর্ণনার উপর। দু'জনে প্রবল ধস্তাধস্তি হয়, বর্ণনা হাতের কাছে একটা ঘুঙুর পেয়ে সেটা দিয়েই এলোপাতাড়ি মারতে থাকে খুনিকে, খুনিও সে দিন দুপুরে সজনীবাবুর কাছে চেয়ে নেওয়া হাতুড়িটা বার করে উপর্যুপরি আঘাত করে বর্ণনার মাথায়। বর্ণনা মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায়। এই খুনটাও আত্মহত্যা বলে সাজানোর চেষ্টা করেছিল খুনি। সে রকমই একটা সুইসাইড নোট নিজের হাতে লিখে রেখে এসেছিল বর্ণনার অচেতন শরীরের পাশে। সেই সঙ্গে ঘুমের ট্যাবলেটের ছেঁড়া স্ট্রিপও। সেই ট্যাবলেট আসলে খুনির ব্যবহারে লাগে তাই তার ছেঁড়া স্ট্রিপ জোগাড় করতে অসুবিধা হয়নি তার। আসলে সন্ধেরাত্রে তার হুমকি নিস্ফল হওয়ায় বেশি রাতে বর্ণনাকে খুন করবে ভেবেই এত সব প্রস্তুতি নিয়ে তার ঘরে সে-রাতে এসেছিল খুনি।

বর্ণনার আত্মহত্যাও খুন বলে প্রমাণিত হল পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়ার পর। উত্তেজনার মাথায় খুনি হাতুড়িটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল হোটেলের পেছনে একটা ঝোপের মধ্যে, সেটাও পাওয়া গেল পরদিন, কিন্তু হত্যাকারী ধরা পড়ল না।

হত্যাকারী নিশ্চিন্তও হচ্ছিল ক্রমশ, কিন্তু বাদ সাধল লোচ্চা নামের কিশোরটি। যেহেতু সিনেমুভির টিমে প্রচার হয়ে গেল সে-রাতের যাবতীয় দৃশ্য লোচ্চা দেখে ফেলেছে, শুধু তাই নয়, আমি হঠাৎ খোঁজ করছি লোচ্চার। বেচারি লোচ্চা যে এ ভাবে খুন হয়ে যাবে তা ভাবাই যায়নি, কিছুটা আমারই অসতর্কতার কারণে। আমার উচিত ছিল গোপনে তাকে কাছে ডেকে সে-রাতের ঘটনাবলি শুনে নেওয়া, অন্তত আকারে ইঙ্গিতেও তার কাছ থেকে হত্যাকারীর পরিচয় জেনে নেওয়া। যাই হোক, লোচ্চাকে হত্যা করে হত্যাকাবী আর নিজেকে গোপন রাখতে পারল না। এত বড় হোটেল, কারও না কারও চোখে পড়ে যেতেই পারে গভীর রাতে একটা

কিশোরকে ছাদে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন সিনেমুভির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, তাকে গলা টিপে মেরে ফেলে দিচ্ছেন ছাদ থেকে, সে দৃশ্য চোখে পড়বেই কারও। সার্বিক মজুমদার এমনই একজন দুর্ভাগা যে ছাদে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে ফেলার পর খুব ভয় পেয়ে যায়। বেশ নার্ভাস টাইপের যুবক এই সার্বিক, খুনি সিনেমুভির টিমে একজন ঘ্যামা লোক, সে এ রকম একটা নৃশংস কাজ করছে দেখে তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। অতঃপর ছাদ থেকে প্রথমে নেমে আসে হত্যাকারী, তার একটু পরেই সার্বিক, নামতে গিয়ে ধাক্কা মারে আমার গায়ে, তার পর ভয়ে আত্মগোপন করে ঘরের মধ্যে। পরে সার্বিক ভাবে আমি তাকে চিনে ফেলায় তাকেই হত্যাকারী ভাবব নিশ্চিত, কাজে-কাজেই তাকে ধরিয়ে দিতে পারি পুলিশের হাতে। পরবর্তী ঘটনাক্রমটি সে নিজে মাথা খাটিয়ে বার করেছিল, না কি লাভলীন পরামর্শ দিয়েছিল কে জানে। সার্বিকের হঠাৎ ধারণা হল সে আমাকেই যদি কোনও ভাবে মেরে ফেলতে পারে তা হলে সে বেঁচে যাবে। তখন থেকেই আমার ওপর গোপনে নজর রাখছিল সে, আমি হোটেল থেকে বেরোনোমাত্র কোত্থেকে একটা গাড়ি জোগাড় করে চেষ্টা করেছিল আজ সকালের দুর্ঘটনাটি ঘটানোর, কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্য তার, নিজেই গুরুতরভাবে আহত হয়ে এখন হাসপাতালে, আমার ধারণা সে সুস্থ হয়ে ফিরে এসে অবশ্যই শনাক্ত করতে পারবে হত্যাকারীকে।

যাই হোক, হত্যাকারী কিন্তু ততক্ষণে নিশ্চিত হয়ে গেছে পুলিশের চোখে সে ধুলো দিতে পারলেও আমি তার অপরাধজনিত কার্যকলাপের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই হাতে পেয়ে গেছি। তাই তার পরবর্তী টার্গেট হলাম আমিই। আজই আমাদের লখনউবাসের শেষ দিন, শুটিংও আজ শেষ, অতএব হত্যাকারী আজ শুটিংয়ের সময়টাই বেছে নিয়েছিল আমাকে হত্যা করতে। সেই পরিকল্পনামতো সজনীবাবুকে হুকুম দিয়েছিলেন কোনও হোমিওপ্যাথির দোকান থেকে সাদা পাউডার কিনে এনে একটা পুরিয়া তৈরি করে রাখতে, আর সজনীবাবু সেটা তৈরি করার পর খুনি গোপনে সেই পুরিয়াটা বদলে দিয়ে নিজের তৈরি একটা পুরিয়া তুলে দিয়েছিল আমার হাতে, যাতে পটাসিয়াম সায়ানাইড ভরা সেই পুরিয়াটা আমি অভিনয় করার দৃশ্যে খেয়ে ত্যাগ করতে পারি এই ধরাধাম।

বলতে বলতে গার্গী পালঙ্কের কোণ থেকে আর একটা পুরিয়া বার করে ঘরের টেবিলের ওপর রাখল, মিঃ সান্যাল, এই হচ্ছে সেই পুরিয়াটা যেটা ঋষভ মুখার্জি নিজে তৈরি করে বদলে দিয়েছিলেন সজনী দত্তর পুরিয়াটার সঙ্গে। এর ভেতর আছে পটাসিয়াম সায়ানাইড, পরীক্ষা করলেই জানা যাবে সেটা। আমি কিন্তু সাবধান ছিলাম, তাই নিজে আগে থেকেই একটা পুরিয়া তৈরি করে রেখে দিয়েছিলাম কাছে, সেটাই শুটিংয়ের সময় খাই। তার পর মরে যাওয়ার ভান করে দেখছিলাম, সিনেমুভির টিমে কার কী প্রতিক্রিয়া। দেখলাম, ঋষভ মুখার্জিই পাগলের মতো আবোলতাবোল বকে নিজের মুখোশটা খুলে দিলেন নিজেই।

—ঋষভ মুখার্জি! দেবাদ্রির কণ্ঠস্বরে কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা সংশয়ও। বললেন, আমারও কিন্তু সন্দেহ হয়েছিল ঋষভের চালচলন, অভিব্যক্তি অনুসরণ করে, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ কই। প্রমাণ ছাড়া তো কেস ধোপে টিকবে না।

ঋষভ মুখার্জি সহসা মুখচোখ কঠিন করে হা হা করে হেসে উঠলেন বীভৎসভাবে। দেবাদ্রি সান্যালের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতেই বললেন, এ মেয়েটা উন্মাদ, ইনস্পেক্টর, বদ্ধ উন্মাদ। একে এখনই কোনও মেন্টাল অ্যাসাইলামে পাঠিয়ে দিন। নইলে—

গার্গী অল্প অল্প হাসছিল পরিচালকের কথা শুনে, বলল, আসলে ঋষভ মুখার্জি কয়েক দিন

ধরে পুলিশ দেখলেই যেভাবে রিঅ্যাক্ট করছিলেন তাতে সবারই নিশ্চয় একটু একটু সন্দেহ হচ্ছিল তাঁর ওপর। কিন্তু সন্দেহ হলেই তো হবে না। তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ হাজির করতে হবে, নইলে কোর্টে তো কেস ধোপে টিকবে না। সেই প্রমাণই এ বার একে একে হাজির করছি আপনাদের সামনে।

আপনারা সবাই জানেন, আমাদের এই পরিচালকটি ভীষণ একরোখা, হট-হেডেড, খুব অল্পেই মাথা গরম করে ফেলেন বলে দীর্ঘকাল কোনও ছবি করতে পারেননি। কয়েকটি ছবি হিট হওয়ার পরও আর ছবি না করার কারণ, অল্প কারণেই তাঁর ছবি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। নায়ক-নায়িকা বা অন্য কুশীলবদের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করে তাদের চটিয়ে দেন প্রায়শ। এবার কিন্তু প্রথমেই ঝগড়া করে ফেললেন তাঁর বহুকালের পুরনো বন্ধু সুস্নাত তালুকদারের সঙ্গে। সুস্নাত তাঁর ছবি প্রোডিউস করবেন কথা দিয়েও শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে গিয়েছিলেন এই কারণে যে-যে বর্ণনাকে খুশি করার জন্য তাঁর প্রোডিউসার হওয়া সেই বর্ণনাই ক্রমে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তাঁর।

সুস্নাতের এই হঠাৎ পিছিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঋষভের মাথায় আগুন ধরিয়ে দিল। সে দিন সকালে দাবা খেলার সময় বেশ কয়েক বার বলেও যখন পুরো টাকা দিতে রাজি করাতে পারলেন না বন্ধুকে, তখন রানাজিকে ফোন করে জানালেন টাকা পাওয়া যায়নি, ছবি হবে না। রানাজি তখন দুপুরে এক বার শেষ চেষ্টা করলেন, জোঁকের মতো লেগে থাকলেন লাডলীন, যদি কোনও ভাবে ডাক্তারকে রাজি করানো যায়। রানাজি ব্যর্থ হয়ে চলে যাওয়ার পর ঋষভ আর একবার এলেন দুপুরের শেষে। ততক্ষণে বর্ণনাও এসে গেছে সেখানে। তখনও ডাক্তার রাজি না হওয়ায় ঋষভ উন্মত্ত হয়ে বন্ধুর কাঠের আলমারি খুলে তাঁর রিভলভার দিয়েই তাঁকে হত্যা করলেন আচমকা। সম্ভবত এর পর রানাজিকে ফোন করে জানিয়েছিলেন, ডাক্তারকে রাজি করানো গেছে শেষ পর্যন্ত। ঋষভই যে হত্যা করেছিলেন, তার প্রমাণ—

ঘটনাস্থলে বর্ণনার লেডিজ হ্যান্ডব্যাগ ছাড়া আর যা পাওয়া গিয়েছিল তা হল একটি সোনালি ফ্রেমের চশমা। চশমাটা কার এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন ঘোরাফেরা করেছিল আমার মনে। এই টিমে একমাত্র রানাজি সান্যালই এ ধরনের ফ্রেমের চশমা পরেন, কিন্তু তাঁর চশমার পাওয়ার মাইনাস, অথচ ঘটনাস্থল থেকে যে-চশমাটা পাওয়া গেল সেটি প্লাস পাওয়ারের। রানাজির প্লাস পাওয়ারের চশমার যে দরকার নেই তা আগেই জেনে গিয়েছিলাম, তা হলে চশমাটা নিশ্চয়ই অন্য কারও, আর সে-ই হত্যাকারী। প্লাস পাওয়ারের চশমা বলেই তার সব সময়ে চোখে পরার দরকার হয় না, তার ওপর উনি ডালহৌসি স্কোয়ার এলাকার একটা চশমার দোকান 'গ্রিন অপটিক্স'-এ চোখ দেখিয়ে সদ্য নিয়েছিলেন এই চশমাটা। চশমায় অনভ্যস্ত বলে, হয়তো হাতে ছিল চশমাটা। খুন করে টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ভুল করে সুস্নাত তালুকদারের ঘরে সেটা পড়ে রইল। যেহেতু আগে চশমা পরতেন না বলে কেউ ভাবেননি ওটা ঋষভ মুখার্জির চশমা হতে পারে।

ঋষভ মুখার্জির প্লাস পাওয়ারের চশমার দরকার তা প্রথম বুঝতে পারি যখন দেখি, কোঠির দেওয়ালে স্ক্রিপ্ট টাঙিয়ে অনেকটা দূর থেকে সেটা পড়ার চেষ্টা করছেন উনি। শর্ট সাইট খারাপ হলে এভাবে অবজেক্ট দূরে রেখে পড়া যায় সেটা আপনারা জানেন। আরও এক দিন দেখলাম, রানাজি তাঁর মাইনাস পাওয়ারের চশমাটা খুলে ঋষভকে খালি চোখে স্ক্রিপ্ট পড়ে শোনাচ্ছেন। এ দৃশ্য থেকে এও প্রমাণিত হল, রানাজির শর্ট-সাইট ভালই, কিন্তু ঋষভের পড়তে

হয়তো অসুবিধে হচ্ছে, তাই তিনি সাহায্য নিচ্ছেন রানাজির। সুস্নাত-হত্যার কারণ ঋষভই, তার আরও একটা প্রমাণ রিভলভারে কারও হাতের ছাপ না পাওয়া। কেন, সে কথায় পরে আসছি।

বর্ণনাকেও যে ঋষভই হত্যা করেছেন, তার অনেকগুলো প্রমাণ আমি একে-একে করছি।

প্রথম প্রমাণ, বর্ণনা-হত্যার পর দিন ভোরবেলা তার রুমে গিয়ে যে-যে দৃশ্য আমার নজর কেড়েছিল তার মধ্যে একটি হল, রুমের এখানে ওখানে কয়েকটি নেভা উর্ধ্বমুণ্ড সিগারেটের দাঁড়িয়ে থাকা। প্রথম দর্শনেই যে-দৃশ্যটি আমার কাছে মনে হয়েছিল আধ-খাওয়া সিগারেটের শরশয্যা। অর্থাৎ সে রাতে ভরদ্বাজ, ঋষভ, বিবস্বান, রোমিও পর্যায়ক্রমে ঘুরে যাওয়ার পর বর্ণনার রুমে শেষ পর্যটকটি ছিলেন আবার ঋষভ মুখার্জি। শেষরাতে বহুক্ষণ বর্ণনাকে বুঝিয়ে, চাপ দিয়ে চেষ্টা করছিলেন ব্যাঙ্কের পাশবই, চেকবই ইত্যাদি আদায় করতে। সওয়ালের সময় তিনি একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়েছেন অভ্যাসমতো, বিরক্ত হয়ে মনুমেন্টের মতো দাঁড় করিয়ে রেখেছেন আধ-খাওয়া অবস্থায়।

দ্বিতীয় প্রমাণ, বর্ণনাকে রাজি করাতে না পেরে (তার আগেই সেগুলো বর্ণনা একটা ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে রেখে এসেছে বিবস্বান বসুর আলমারির ভেতর) ঋষভ হঠাৎ উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে বর্ণনার ওপর। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, বর্ণনার মৃত্যুর পরের দিন সকালে ঋষভকে কনুইয়ে, কপালে ব্যান্ডেজ অবস্থায় দেখা গিয়েছিল। উনি বলেছিলেন বর্ণনার আত্মহত্যার সংবাদ পেয়ে উনি বাথরুমে পড়ে যাওয়ায় এই ক্ষত। অবশ্যই সে-রাতে ঋষভের শারীরিক শক্তির সঙ্গে বেশিক্ষণ যুঝে উঠতে পারেনি বর্ণনা। সজনী দত্তর হাতুড়িটা দিয়ে ঋষভ তখন মোক্ষম আঘাত করেছেন বর্ণনার মাথার পেছন দিকে।

প্যাথলজিক্যাল টেস্টে হাতুড়িতে যেমন বর্ণনার রক্ত পাওয়া গেছে, তেমনই ঘুঙুরে ঋষভের রক্তের ছিটে। আমি প্যাথলজিক্যাল টেস্ট করিয়ে জানতে পারলাম ঘুঙুরে লেগে আছে Rh+ গ্রুপের রক্ত। আপনাদের মনে আছে এর মধ্যে অসুস্থ ঋষভের ব্লাডটেস্ট করানোর যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে তাতেও লেখা আছে Rh+ গ্রুপ। ঋষভের ব্লাডগ্রুপ Rh+ হওয়াতেই তাঁর রক্ত সে দিন গুরুতরভাবে আহত বর্ণনার শরীরে ট্রান্সফিউজ করা যায়নি, কারণ বর্ণনার ব্লাডগ্রুপ ছিল Rh(-)। আমরা জানি যে, Rh(-) গ্রুপের কারও শরীরে Rh+ গ্রুপের রক্ত যদি ট্রান্সফিউজ করা হয়, তবে প্রথমোক্ত ব্যক্তির শরীরে তৈরি হয় Rh(+) এর বিরুদ্ধ অ্যান্টিবডি। তাতে সেই মুহূর্তে কোনও ক্ষতি না হলেও পরবর্তিকালে আবার কখনও যদি প্রথমোক্ত ব্যক্তির শরীরে Rh(+) গ্রুপের রক্ত ট্রান্সফিউজ করা হয়, তা হলে তার রক্তে আগে থেকেই Rh(+) অ্যান্টিবডি থাকার কারণে দ্বিতীয় বারে সমস্ত রক্ত জমাট বেঁধে যাবে। ঠিক এই কারণেই ঋষভের ব্লাডগ্রুপ Rh(+) হওয়ায় তাঁর রক্ত সে দিন বর্ণনার শরীরে দেওয়ার জন্য নিতে পারেননি ডাক্তার।

প্রশ্ন উঠতে পারে ঘুঙুরে লেগে থাকা রক্তের ছিটে থেকে ব্লাড গ্রুপ জানা যায় কি না। আমার উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ যায়। আমরা অবশ্য এ-কথা জানি যে, রক্তের দাগ থেকে কোনও প্যাথলজিস্ট বলতে পারেন না, সে-রক্ত কারও মৃত্যুর আগের, না পরের রক্ত। তেমনই এও বলতে পারেন না সে-রক্ত কার, সেটা খুনির রক্ত, না যাকে খুন করা হয়েছে তার রক্ত। আবার এও বলতে পারেন না সে-রক্ত কোনও বৃদ্ধের শরীরের, না কোনও যুবার। তবে রক্তের দাগ দেখে প্যাথলজিস্ট এটুকু বলতে পারেন সেটা কোন গ্রুপের রক্ত।

তৃতীয় যে-প্রমাণটি আমি পেশ করতে চাই, তা তিনটি খুনের পেছনেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। লোচ্চা

খুন হওয়ার পর দেবাদ্রি সান্যাল বলেছিলেন, এবার নিশ্চয়ই লোচ্চার গলায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাবে খুনির। না পেয়ে হতাশ হয়েছিলেন দেবাদ্রি। কিন্তু আমি একেবারেই হইনি। আসলে আমি লক্ষ করেছিলাম, এর আগে দু-দুটো খুনে ব্যবহৃত রিভলভার আর হাতুড়িতেও খুনির হাতের বা আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। এবার লোচ্চার গলায়ও যে পাওয়া যাবে না তা মনে হয়েছিল আমার। তার নিশ্চিত কারণ বুঝতে পারলাম আজ সকালেই। আপনারা অনেকেই দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন, সকালে ঋষভ তাঁর করতল দেখিয়ে বলেছিলেন, তিনি ভাগ্যে বিশ্বাস করেন না। কারণ তাঁর হাতে ভাগ্যরেখাই নেই। আমি তখন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম তাঁর করতল দেখে। তাঁর হাতে শুধু ভাগ্যরেখা কেন, কোনও রেখাই নেই। এরকম সাদা, ধবধবে, রেখাহীন করতল কোনও মানুষের হতে পারে তা আমার ধারণার জগতে ছিল না। আমি পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম, কলেজে পড়তে ল্যাবরেটরিতে কী একটা অ্যাসিড টেস্টটিউবে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে টেস্টটিউব ভেঙে সেই অ্যাসিডে মাখামাখি হয়ে আধপোড়া হয়ে গিয়েছিল তাঁর দুটো করতল। পরে ক্ষত সেরে গিয়ে করতল স্বাভাবিক হয়ে গেলেও করতলের রেখাগুলো আর ফুটে ওঠেনি।

চতুর্থ প্রমাণ, 'সোনালি ঘুঙুর'-এর স্ক্রিপ্টে আজই চোখ বোলাতে গিয়ে দেখি, শেষ দৃশ্যে রেশমবাই যে কথাগুলো লিখবে, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়' সেটা ঋষভের হাতে লেখা, আর সেই হস্তাক্ষর দুটো ডেডবডিরই পাশে পাওয়া চিরকুটের হাতের লেখার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। দেবাদ্রি সান্যাল ঋষভের হাতের লেখা কেন যে নেননি এতদিন তাই মন হচ্ছিল তখন। স্ক্রিপ্টটা লেখার উত্তেজনায় সত্যিই হাত-পা কাঁপছিল আমার।

পঞ্চম প্রমাণ, ঋষভের খোয়া-যাওয়া এই ডিজিটাল ডায়েরি---

বলতে বলতে গার্গী তার ব্যাগ থেকে ছোট্ট ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রটা বার করে এগিয়ে দিল দেবাদ্রি সান্যালের দিকে, বুঝলেন মিঃ সান্যাল, এই ছোট্ট জিনিসটা যে এত কাজের হতে পারে তা একবারও ভাবিনি যখন এটা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম কোঠির মেঝেয়। কাল রাতে সায়নের সঙ্গে কিছু কথা-কাটাকাটির পর যখন মন খারাপ করে সোফায় বসে কী করব ভেবে না পেয়ে এটা নিয়ে খেলছিলাম একা-একা, তখনই হঠাৎ ঋষভ মুখার্জির গত কয়েক দিনের জীবনের অনাবিষ্কৃত অধ্যায়গুলো একে-একে ফুটে উঠল এর ছোট্ট স্ক্রিনে। তাতেই জানা গেল, সেপ্টেম্বরের দু-তারিখে ডালহৌসি স্কোয়ারের এক চশমার দোকানে তিনি চোখ দেখিয়েছিলেন, তিন তারিখে ডেলিভারি নিয়েছিলেন চশমাটা, চার তারিখে বিকেল আড়াইটের সময় গিয়েছিলেন সুস্নাত তালুকদারের বাড়িতে, পাঁচটার সময় গিয়েছিলেন ক্যামাক স্ট্রিটের ব্যাঙ্কে, সাতটা কুড়িতে উঠেছিলেন অমৃতসর মেলে। তাতেই পরিষ্কার হয়ে গেল পুরো ছবিটা।

ষষ্ঠ প্রমাণ, এই ভ্যানিটি-ব্যাগ, যার ভেতর সুস্নাত তালুকদারের চেক বই, পাশ বই, সেই সঙ্গে ঋষভ মুখার্জির চেক বই, পাশ বই, আর বর্ণনার নামে লেখা কয়েকটা পোস্টডেটেড চেক। সব মিলিয়ে পনেরো-কুড়ি লক্ষ টাকার হিসেব।

দেবাদ্রির হাতে ব্যাগটা তুলে দিয়ে গার্গী বলল, এটাই আমার পেশ করা নিশ্চিততম প্রমাণ। কথা শেষ করার আগে শুধু বলি, সায়ন চৌধুরির অমতে, প্রবল বিপদের ঝুঁকি নিয়েই এই অনুসন্ধানে আমি নেমেছিলাম শুধুমাত্র আমার অতিসন্ধিৎসু মানসিকতার কারণেই। সায়ন তাতে খুবই অসন্তুষ্ট হবে নিশ্চয়ই, সায়নের সঙ্গে আমার ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে যখন কানপুর থেকে ফিরে এসে সব শুনবে, জানবে ও।

ঋষভ এতক্ষণ পাথরের মতো শক্ত মুখে শুনছিলেন গার্গীর একনাগাড় বিশ্লেষণ ও তার একের পর এক প্রমাণ উপস্থাপনা করা। হঠাৎ গর্জে উঠে বললেন, এ সব বানানো, সমস্তটাই মিথ্যে। যেরকম মিথ্যে এই পুরিয়াটার ভেতর পটাসিয়াম সায়ানাইড আছে বলাটাও।

বলতে বলতে এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখা পুরিয়াটা দ্রুত হাতে তুলে নিয়ে সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন, তোমরা তো শুনলে এই মেয়েটা বলল তাকে আমি নিজের হাতে বিষ দিয়েছি। কই দেখি, এতে সত্যিই বিষ ছিল কি না—

পুরিয়াটা চট করে খুলে উপুড় করে জিভে ঢালতেই ঋষভের শরীরটা মুহূর্তে কেঁপে উঠল একবার, পরক্ষণে সপাটে পড়ে গেল মেঝের ওপর। এমন চকিতে ঘটে গেল ঘটনাটা যে, কেউই বাধা দেওয়ার কোনও সুযোগ পেল না। দেবাদ্রি সান্যাল লাফিয়ে এসে ঝুঁকে পড়লেন ঋষভের শক্ত শরীরটার ওপর, কী সর্বনাশ, শেষে সুইসাইড করল খুনি!

অন্য সবাই-ই তখন ঝুঁকে পড়ে দেখছেন, তীব্র পটাসিয়াম সায়ানাইড মুহূর্তে থামিয়ে দিয়েছে একরোখা, হট-হেডেড মানুষটার হৃৎপিণ্ড। হঠকারিতা করে একটা খুন করার পর তার দায় ঢাকতে খুন করেছেন একটার পর একটা তাজা জীবন।

গার্গীও তখন দেখছে, একটু অন্যমনস্ক হলে তার ভাগ্যেও ঘটতে পারত যে-পরিণতি, এখন ধূসর মৃত্যু তার বাঁকানো দাঁড়া বাড়িয়ে সেভাবেই গ্রাস করে নিয়েছে এতগুলো হত্যাকাণ্ডের নায়ককে।

গোটা বাইজিকোঠির মানুষ তখন বিস্মিত, স্তব্ধ।
